দি প্লেগ

আলবেয়ার কামু

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

আলবেয়ার কামু

দি প্লেগ

অনুবাদ
কাজী মুজাম্মিল হক

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২৬৯

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
মাঘ ১৪১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

প্রকাশক
হুমায়ুন কবীর
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

বানান সমন্বয়
সেলিম আলফাজ
ফরীদুল আলম

মুদ্রণ
গ্রাফসম্যান রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড প্রিন্টিং
৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
দুইশত দশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0268-6

THE Plague : Bengali Translation of Albert Camu's, The Plague by Kazi Muzzammil Huq.
Published by Bishwo Shahitto Kendro, 14 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka 1000 Bangladesh.
Cover Design : Dhrouba Esh, First Edition : February 2006. Price : Tk. 210 Only.

প্রসঙ্গ কথা

আধুনিক মননশীলতার জনক আলবেয়ার কামু। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা *The Plague*-এর বঙ্গানুবাদ পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।

তৎকালীন ফরাসি উপনিবেশ আলজিরিয়ার পটভূমিতে রচিত *দি প্লেগ* একটা বিচিত্র ক্যানভাস। মহামারী আক্রান্ত ওরাও বন্দরে রোগ ও মৃত্যু-যন্ত্রণার সঙ্গে দেখানো হয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মাঝে কামুর চিরন্তন মানবিক চেতনা পাঠককে বিস্মিত করে, আলোড়িত করে।

মূল ফরাসিভাষা থেকে অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি বিধায় ভাষান্তরে কিছুটা স্বাদ-হানি হতে পারে। তবুও কামুর সাথে বাঙালি পাঠকের পরিচয় হবে কিছুটা, এটাও কম কথা নয়।

কাজী মুজাম্মিল হক

কামু এবং তাঁর দি প্লেগ : অ্যাবসার্ডিটি এবং অনিঃশেষ আশাবাদ

ফরাসি উপনিবেশ আলজেরিয়ার সমুদ্র-উপকূলবর্তী একটি শহর—ওরাও। এ এমন এক শহর যেখানে পাখির ডানা-ঝাপটানি নেই, নেই পাতার মর্মরধ্বনিও, যেখানে ঋতুপরিবর্তনও হয় বৈচিত্র্যহীনভাবে—বুঝতে রীতিমতো কষ্ট হয়। যেমন 'দেহে মৃদু বাতাসের স্পর্শ অথবা শহরতলি থেকে ফেরিওয়ালাদের চুপড়ি ভরে ভরে শহরে ফল আমদানি করার দৃশ্য এখানে বসন্তের আগমনবার্তা বয়ে আনে।' আর 'এখানে জীবন বড় একঘেয়ে, অবসাদময়।' এখানকার অধিবাসীদের একমাত্র পক্ষ্য 'বড়লোক' হওয়া। আর তাই জীবনের আনন্দ-উৎসবের চেয়ে তাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে অর্থ-উপার্জনের চিন্তা। এমনকি প্রেমও এখানে প্রাণহীন। 'প্রণয়লীলা বলতে এখানে যা বোঝায় তা হচ্ছে এই যে, পুরুষ ও নারী পরস্পরকে দ্রুত নিঃশেষ করে ফেলে, অথবা তা সাধারণ দাম্পত্য-সম্পর্কের নিরুত্তেজ অভ্যাসমাত্রে থিতিয়ে যায়।... প্রেমের তেমন কোনো উপলব্ধি ছাড়াই নারী-পুরুষের একে অপরকে ভালোবাসতে হয়।' এই শহরের অধিবাসীরা স্পষ্টভাষী, অমায়িক ও পরিশ্রমী। কিন্তু মৃত্যুর সময় মানুষকে এখানে ভীষণ কষ্ট পেতে হয়। তাপে ঝলসানো দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়ে মুমূর্ষু মানুষ মৃত্যুর প্রহর গোনে আর অন্যরা ব্যস্ত থাকে আড্ডায় বা ব্যবসার কাজে। যেন অসুস্থ হয়ে পড়া মানেই হল প্রচলিত জীবনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। এমনই এক নিষ্প্রাণ শহরের বর্ণনা দিয়েছেন আলবেয়ার কামু তাঁর উপন্যাস দি প্লেগ-এর শুরুতেই। এই বর্ণনাকে এ উপন্যাসের ভূমিকা হিসেবেও বিবেচনা করা চলে। কারণ, এর পরই তিনি এই শহরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব আর তার ফলে শহরের মানুষের জীবনযাত্রার আকস্মিক পরিবর্তনের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়ে গেছেন পুরো উপন্যাস জুড়ে। ওরাও -এ প্লেগের সংক্রমণ শুরু হয়, একের-পর-এক মানুষ আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে থাকে, প্রতিরোধের সময়ই পাওয়া যায় না; কিন্তু কর্তৃপক্ষ সহজে এটাকে প্লেগ বলে ঘোষণা দিতে চান না—শহরের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়বে—এই যুক্তিতে। কিন্তু খুব বেশিদিন চেপেও রাখা যায় না ব্যাপারটা। প্লেগের সংক্রমণ মহামারী আকার ধারণ করলে আর মৃতের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকলে এবং প্রতিরোধের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হতে থাকলে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়, এবং সংক্রমণ যেন বাইরের কোনো জনবসতিতে ছড়িয়ে না পড়তে পারে তার জন্য ওরাওকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়।

যেন বাইরে থেকে কেউ ভেতরে না ঢুকতে পারে বা ভেতর থেকে কেউ বাইরে না বেরুতে পারে সেজন্য শহরের সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়া হয়। আর এখানেই শুরু হয় উপন্যাসের মূল পর্ব।

২

সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়ার ফলে প্লেগ-আক্রান্ত এই শহরের অধিবাসীরা এক অনাকাঙ্ক্ষিত ভয়ংকর বন্দিত্বের শিকার হল। প্লেগের ভয়াবহ আক্রমণ, যে-কোনো সময় যে-কেউ এর শিকার হতে পারে এবং হলে দুঃসহ যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু অবধারিত, তবু ইচ্ছে করলেই পালানোর উপায় নেই। শহরের প্রবেশপথগুলোই যে শুধু বন্ধ তাই নয়, শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াটা রীতিমতো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই অদ্ভুত বন্দিদশাকে তাই নিয়তিনির্ধারিত শাস্তি বলে মেনে নেয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকে না, যদিও তারা জানে না তাদের অপরাধটা কী! শুধু অনুভব করল—'একটা সম্পূর্ণ অজানা অপরাধের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে।' যারা মারা যায় তারা যেন এক অর্থে মুক্তি পেয়ে যায়, কারণ বেঁচে থাকা মানুষগুলোর সামনে মৃত্যু, নিজে অথবা স্বজনদের আক্রান্ত হবার আতঙ্ক, অনন্ত অনিশ্চয়তা আর স্বজন হারানোর বেদনা ছাড়া আর কিছুই নেই। যেন এক মৃত্যু-উৎসব শুরু হয়েছে এই শহরে। আর এই অবস্থার মধ্যেই—'অবসাদময় একটার পর একটা সপ্তাহ কেটে গেল।' মানুষের যা স্বভাব, সব পরিস্থিতিই একসময় তার গা-সওয়া হয়ে যায়, এখানেও তাই হল। এমনকি মৃতের সৎকারের ব্যবস্থাটিও যখন হয়ে উঠল অতিমাত্রায় সংক্ষিপ্ত এবং আনুষ্ঠানিকতাবিহীন সেটাও তাদেরকে মেনে নিতে হল। তাছাড়া আর উপায়ই বা কী? কোনো আর্তি, কোনো হাহাকার, কোনো অশ্রুপাতেই যখন পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হচ্ছে না, প্রতিদিন শত-শত মৃত্যুদৃশ্য প্রত্যক্ষ করাই যখন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন উদ্দেশ্যবিহীন অনিশ্চিত জীবন কাটানো ছাড়া আর কী-ই বা করার থাকে? মানুষ বুঝে ফেলল—'দয়ামায়া শব্দগুলো অর্থহীন, হৃদয়ের বেদনাগুলো প্রকাশ করা নিরর্থক।' আর এই হয় যখন অনুভূতি তখন জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নির্লিপ্ত-নিরাসক্ত হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

৩

কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে, পুরো বিষয়টিকে নিয়তিনির্ধারিত হিসেবে মেনে নিয়ে আকস্মিক-অনিবার্য মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া মানুষের কি আর কিছুই করার নেই? আছে, বলাই বাহুল্য। লেখক সে-কথা ভুলে যাননি। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা আর বিপর্যয়কে অধিকাংশ মানুষ নিরুপায়ভাবে মেনে নিলেও কিছু মানুষ বরাবর এসবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, একে জয় করতে চেয়েছে, আর সেটা চেয়েছে বলেই মানবসভ্যতা টিকে আছে, এগিয়েছে এতদূর। এই উপন্যাসেও আমরা এমন কিছু হার-না-মানা মানুষের দেখা পাই। ডাক্তার রিও তাদের মধ্যে প্রধান। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রোগ-ব্যাধি-মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এক মানুষ তিনি। আর তাঁর সঙ্গে জুটে যায় আরও কিছু মানুষ—গ্রাঁদ, তারিউ, ফাদার প্যানালু, র‍্যাঁবেয়ার। এরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মানুষ, কারো সঙ্গে কারো মিল নেই—কিন্তু এই বিপর্যয়ে তারা হয়তো চারিত্রিক বিভিন্নতার কথাটি ভুলেই যায়, একত্রিত হয় দুর্যোগের মোকাবিলা করার জন্য। এরা কেউই প্রচলিত অর্থে মহামানব নয়, কিন্তু আমরা অনুভব করি—এক বিপুল মানবিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে তারা মহান হয়ে উঠেছে, উঠে গেছে সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে।

এই চরিত্রগুলোর দিকে আমরা একবার মনোযোগ দিয়ে ফিরে তাকালেই তাদের চারিত্রিক বিভিন্নতার ব্যাপারটা বুঝতে পারব। ফাদার প্যানালু শহরের প্রধান গির্জার পুরোহিত, এই মহামারীকে তিনি সংজ্ঞায়িত করেন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মানুষের অবাধ্যতার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি হিসেবে। এবং তার বক্তৃতার পর মানুষ অনুভব করে—সম্পূর্ণ অজানা অপরাধের কারণে তাদের এই শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তিনি যদিও একসময় রিও-র নেতৃত্বে প্লেগ-বিরোধী সংগ্রামে যোগ দেন, কিন্তু সেটা চালিয়ে যেতে পারেন না। একের-পর-এক মৃত্যু তাকে ভেতর থেকে ভেঙে ফেলে, তার মনে হয়—এই যুদ্ধ আসলে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, এবং অতঃপর তিনি নিজেকে ঈশ্বরের ইচ্ছের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন এবং প্লেগ-আক্রান্ত হয়ে কোনোরকম চিকিৎসা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে শান্তভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নেন।

তারিউ এই শহরের বাসিন্দাই নয়। উপন্যাসের শুরুর দিকে সে কেবলই এক বহিরাগত পর্যবেক্ষক, শহরের জনজীবনকে ডায়রির পাতায় নিপুণভাবে ধরে রাখা ছাড়া তার আর কোনো কাজ আছে বলে মনেই হয় না। তার মধ্যে অবশ্য মহান হবার আকাঙ্ক্ষা আছে, আছে 'মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত' মানুষের ত্রাণকর্তা হবার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু চাইলেই তো আর মহান হওয়া যায় না, ত্রাণকর্তা হওয়া তো সুদূরতম কল্পনা; কিন্তু আমরা দেখি মহামারীর বিরুদ্ধে তার আমৃত্যু সংগ্রাম তাকে সত্যিই মহান করে তুলেছে। তার যুদ্ধই আমাদের কাছে তাকে বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমৃত্যু মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রবল সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে একসময় সে নিজেই যখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তখন একজন বীরের মৃত্যুতে আমরা শোকাচ্ছন্ন হয়ে উঠি, যদিও প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবার সময়ও তার ভূমিকা বীরোচিতই ছিল। র‍্যাঁবেয়ার-এর চরিত্র তারিউ-র উল্টো। সেও এ-শহরের বাসিন্দা নয়। সংবাদপত্রে কাজ করার সূত্রে এই শহরে এসে সে আটকা পড়ে যায় এবং কোনোভাবেই নিজেকে এসবের অংশ হিসেবে ভাবতে পারে না। উপন্যাসের অনেকখানি অংশ জুড়ে নিজ শহরে প্রেমিকার কাছে ফিরে যাবার জন্য তার আকুল আকাঙ্ক্ষা এবং মরিয়া চেষ্টা দেখে আমরা ব্যথিত হলেও অবাক হই না (ব্যথিত, কারণ—একরম একটা বিপর্যয়ের মধ্যে একজন মানুষ কীভাবে কেবল নিজের কথা ভাবতে পারে! আবার অবাক হওয়া যায় না, কারণ নিজের অবস্থান খুব পরিষ্কার করেই তুলে ধরে সে—'শুধুমাত্র সংবাদপত্রে নিবন্ধ লেখার জন্য পৃথিবীতে আমার জন্ম হয়নি। বরং একজন নারীকে ভালোবাসব, তাকে নিয়ে একসঙ্গে বাস করব, এজন্যই আমি জন্মেছি। সেটাই তো সঙ্গত, তাই না?')। কিন্তু পালানোর সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করার পর, দিনক্ষণ পর্যন্ত ঠিকঠাক, সে যখন আকস্মিকভাবে

সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে রিও-র দলে যোগ দেয় তখনই সে উঠে যায় উঁচুতে, হয়ে ওঠে মহান। উপন্যাসের শেষদিকে—প্লেগ যখন তার থাবা গুটিয়ে নিয়েছে আর শহরের প্রবেশপথগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেয়া হয়েছে—আমরা দেখি, তার প্রেমিকাই ছুটে এসেছে এই শহরে, তাকে আর প্যারিসে ফিরে যেতে হয়নি!

এমনকি গ্রাদও, অতি সাধারণ এবং বৈশিষ্ট্যহীন একজন মানুষ, যার কাজই হচ্ছে একটি কাল্পনিক উপন্যাসের প্রথম পঙ্‌ক্তিটি নানাভাবে লেখার চেষ্টা করে যাওয়া, তার ব্যক্তিগত সমস্ত যন্ত্রণা সঙ্গে নিয়েই যখন এই কর্মযজ্ঞে শরিক হয়, প্রাণপণে খেটে যায়, আমাদের কাছে মহতের মর্যাদা পেয়ে যায়।

ডাক্তার রিও তো এক অসামান্য চরিত্র। প্রথমদিকে মনে হয়েছিল চিকিৎসকসুলভ কর্তব্যবোধের খাতিরেই তিনি এই দায়িত্বগুলো পালন করে যাচ্ছেন, কিন্তু পুরো উপন্যাসজুড়ে তার বিশ্রামহীন নিরন্তর যুদ্ধ তাকে মহামানবের জায়গায় পৌঁছে দেয়। প্লেগ-আক্রমণের আগেই তিনি তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে স্যানেটোরিয়ামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আরোগ্যলাভের আশায়, এই কয়েকমাসে একবার খোঁজ নেবারও সময় হয় না তার, আর উপন্যাসের শেষে—প্লেগের আক্রমণ যখন থিতিয়ে এসেছে, শহরের প্রবেশপথ খুলে দেয়া হয়েছে, মানুষ মেতে উঠেছে মুক্তির আনন্দ-উৎসবে—তখন তিনি তার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ গ্রহণ করেন এক অস্বাভাবিক নির্লিপ্ততায়। আমাদের হৃদয় ভিজে ওঠে, মনে হয় মহামানবদের পরিণতি হয়তো এইরকমই; মানবিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে, মৃত্যু-রোগ-শোক-ব্যাধি ইত্যাদির বিরুদ্ধে যার জীবনপণ লড়াই, কোনো এক অলৌকিক ইশারায় তারই ঘর শূন্য হয়ে যায়, এবং তখন তার নিঃশব্দ অশ্রুপাতের সঙ্গী হবার মতো কেউ থাকে না।

৪

তবে কি প্লেগ নামক একটি ভয়ংকর রোগের মহামারী রূপ ধারণ এবং আক্রমণের ফলে একটি শহরের জনজীবনে এর প্রভাব প্রতিক্রিয়া, এর বিরুদ্ধে কতিপয় মানুষের অবিশ্রান্ত সংগ্রাম এবং তাদের মহান হয়ে ওঠার সুকৌশল বর্ণনার জন্যই 'দি প্লেগ' নামক এই উপন্যাসের বিশ্বব্যাপী এত সুখ্যাতি? বলাবাহুল্য, কেবল ওই বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে এটিকে বিশ্বসাহিত্যের একটি সেরা উপন্যাস হিসেবে স্বীকার করে নিলে কেউ ভুল করবেন না, কিন্তু এ উপন্যাসে আছে এর চেয়ে বেশি কিছু। 'প্লেগ' এই উপন্যাসে কেবল একটি রোগই নয়, এটি একটি প্রতীক এবং একে প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করলে পুরো উপন্যাসের অর্থই পাল্টে যায় এবং উপন্যাসটি পৌঁছে যায় দার্শনিক উচ্চতায়। প্লেগকে প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করার ইঙ্গিত স্বয়ং ঔপন্যাসিকই দিয়ে রেখেছেন এবং কিসের প্রতীক সেটা বোঝা যাবে কতিপয় সংলাপ বিবেচনা করলে। উদাহরণ দিচ্ছি : র‍্যাঁবেয়ার যখন পালাবার চেষ্টা করে বারবার ব্যর্থ হয়ে হতাশ, তখন :

> র‍্যাঁবেয়ার : আপনি এখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি।
>
> রিও : মানে?
>
> র‍্যাঁবেয়ার : প্লেগ। প্লেগের কথা বলছি।
>
> রিও : আচ্ছা!
>
> র‍্যাঁবেয়ার : হ্যাঁ। আপনি এর চরিত্র এখনও বুঝতে পারেননি। এর অর্থ হচ্ছে, একই জিনিসের বারবার পুনরাবৃত্তি হওয়া।
>
> এরপর সে একটা রেকর্ড বাজিয়ে দিল, যেটি সে সেদিন কমপক্ষে দশবার শুনেছে।
>
> র‍্যাঁবেয়ার : কেমন বিরক্তিকর ওই রেকর্ড। তবু আজ এই নিয়ে দশবার বাজালাম।
>
> রিও : এত ভালো লাগে?
>
> র‍্যাঁবেয়ার : ভালো লাগার তো কথা নয়। কিন্তু আছে যে মাত্র একটাই।
>
> কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারিউ বলল : তাহলে ব্যাপার ওটাই। একই জিনিস বারবার ঘটে।

আবার এক হাঁপানি রোগীর, উপন্যাসে যার কোনো নামই নেই, মন্তব্য : আমি বলি কী, প্লেগ জিনিসটা আসলে জীবনেরই একটা অংশ, এর বেশি কিছু নয়।

এবং উপন্যাসের শেষে একটি দীর্ঘ প্যারায় প্লেগ সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক নিজেই বলছেন : 'দূর শহর থেকে ভেসে আসা তুমুল হর্ষধ্বনি শুনতে শুনতে রিও-র মনে হল, মানুষের এই উল্লাস হয়তো আবার একদিন বিপন্ন হবে, কারণ প্লেগের জীবাণু কখনোই পুরোপুরি ধ্বংস হয় না, হারিয়েও যায় না চিরতরে। বছরের-পর-বছর এই জীবাণু লুকিয়ে থাকে আসবাবপত্র আর কাপড়চোপড়ের মধ্যে, অপেক্ষা করে শোবার ঘরে, ভাঁড়ারে, বুকশেলফে। তারপর সেই দিনটি আসে যেদিন এই জীবাণু মানুষের সর্বনাশের জন্য আবার তার ইঁদুরগুলোকে জাগিয়ে উত্তেজিত করে মরবার জন্যে, এবং ঝাঁকে ঝাঁকে ওদেরকে পাঠিয়ে দেয় আনন্দমুখর কোনো শহরে।'

বোঝাই যাচ্ছে—মানুষের আনন্দমুখর জীবন-আয়োজনের মধ্যে অভিশাপের মতো লুকিয়ে থাকে প্লেগের জীবাণু, এবং সময়-সুযোগমতো আক্রমণ করে বসে। নিয়ে আসে আতঙ্ক, যন্ত্রণা, বেদনা, হাহাকার, বন্দিত্ব এবং দুঃসহ পৌনঃপুনিকতা।

আলবেয়ার কামু অস্তিবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। সবাই জানেন অস্তিত্ববাদ মানুষের অস্তিত্বের সংকট, অস্তিত্বের বেদনা নিয়ে কথা বলে। এবং বলাই বাহুল্য, সেই সংকট নিয়ে আলোচনা করতে গেলে জীবন সম্বন্ধে, অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইতিবাচক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন। বলা প্রয়োজন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ইউরোপসহ পশ্চিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষ যখন দাঁড়াল এক চূড়ান্ত অবক্ষয়ের সামনে, চারিদিকে ধ্বংসযজ্ঞ, মানবতার নির্মম পদদলন, মূল্যবোধ বলতে বা আশাবাদী হবার মতো কোথাও আর কিছুই নেই, বেঁচে থাকাটাই যখন এক বেদনাদায়ক, ক্লান্তিকর, গ্লানিময় অভিজ্ঞতা আর অস্তিত্ব যখন হয়ে উঠছে এক ভীষণ অর্থহীন বিষয়; তখন অস্তিত্ববাদী দর্শনের ব্যাপক বিস্তার লাভ ঘটে। আলবেয়ার কামু ১৯৪২ সালে প্রকাশিত তাঁর *মিথ অব সিসিফাস* গ্রন্থে প্রথম মানুষের জীবন যে অ্যাবসার্ডিটির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন। সাহিত্যের একটি টার্ম হিসেবে 'অ্যাবসার্ড' শব্দটি তিনিই

প্রথম ব্যবহার করেন, এবং বলেন—'মানুষের সঙ্গে তার জীবনের আর জীবনের সঙ্গে তার পরিপার্শ্বের বিচ্ছিন্নতার অনুভূতিই অ্যাবসার্ডিটি' অথবা 'মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-ভালোবাসা, চেষ্টা-চরিত্র এবং অর্থহীন পৃথিবী—যে অর্থহীনতার মধ্যে তাকে ঠেলে দেয়া হয়—এ দুয়ের ব্যবধান থেকেই অ্যাবসার্ডিটি জন্ম নেয়।' এবং এই ধারায় রচিত বিভিন্ন রচনায় একটি বিষয় পরিষ্কার উঠে এসেছে, তা হল—নিস্পৃহ, নিষ্ক্রিয়, নৈরাশ্যবাদী অথবা কর্মতৎপর, আশাবাদী—মানুষ যেমনই হোক না কেন, সবার জন্যই নির্ধারিত রয়েছে অবক্ষয় ও শূন্যতা। মানুষ মূলত নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, বিষুব্ধ ও বিপণ্ন, বিষণ্ন, নৈরাশ্যবাদী, আত্মধ্বংসকারী, দুঃস্বপ্ন ও বিভীষিকায় আক্রান্ত, যন্ত্রণাদগ্ধ, ব্যর্থ, পরাজিত; তাদের সবকিছু জুড়ে অর্থহীনতা, তাদের সব প্রয়াস তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর, এমনকি পরস্পরের সঙ্গে ইতিবাচক যোগাযোগ স্থাপনেও অক্ষম; তাদের ভাষা শুধু শূন্যগর্ভ প্লোগান, বহু ব্যবহারে জীর্ণ, ক্লিশে, পচে যাওয়া অর্থহীন শব্দাবলির সমষ্টি মাত্র; তাদের জীবনও ক্লিশে আক্রান্ত, হাস্যকর, অবান্তর, উদ্ভট; তাদের মানবিক অস্তিত্ব নিষ্ফল, লজ্জাকর, ব্যর্থ। পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেলেও তারা তীব্র বেদনার সঙ্গে আবিষ্কার করে—মৃত্যু জীবনকে নিরর্থক করে দেয়। আর অ্যাবসার্ডিটির মূল কথা এটিই। *দি প্লেগ* উপন্যাসের প্লেগ-রোগটিই যেন সেই অ্যাবসার্ডিটির জীবাণু বহন করছে।

৫

তবে এই উপন্যাসের অন্যরকম পাঠও সম্ভব, অনেক সমালোচক সেটি করেও দেখিয়েছেন। সময়কালটি যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, এবং ফরাসি দেশে যেহেতু জার্মান-আগ্রাসনের ঘটনা ঘটেছিল, অনেক সমালোচক তাই মনে করেন, প্লেগ এখানে নাৎসি বাহিনীর প্রতীক হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এবং এই প্রতীক বিবেচনায় নিলে উপন্যাসের অর্থ আবারও পাল্টে যায়। যেভাবেই পাঠ করা হোক না কেন, এটি যে একটি প্রতীকী উপন্যাস সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, এবং সেই কারণেই যে-কোনো বিশ্লেষণই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তবে একটি বিষয় সব পাঠেই সমান থাকে, সেটি হল—কামুর দার্শনিক প্রতীতির উদ্ভাসন। বলার অপেক্ষা রাখে না, যে-কোনো সফল উপন্যাসেই লেখকের কোনো-না-কোনো দর্শনের প্রকাশ ঘটে, কিন্তু সেই দর্শন যদি পাঠকের কাঁধে বোঝার মতো চেপে বসে তাহলে উপন্যাসের শিল্পমান ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। একজন সফল ঔপন্যাসিক তাই এ-বিষয়ে সচেতন থাকেন। কামু বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম সফল ঔপন্যাসিক, পাঠকরা যে তাঁর দার্শনিক প্রতীতির সঙ্গে সহমত পোষণ নাও করতে পারেন, উপন্যাস নির্মাণের সময় তিনি সেটা বিবেচনায় রাখতেন। তাঁর উপন্যাস পাঠের সময় কোনো নির্দিষ্ট দর্শন সম্বন্ধে অবগত না হয়েও তাই এর রসাস্বাদন সম্ভবপর হয়। *দি প্লেগ* পাঠ করতে করতেই পাঠকরা ঔপন্যাসিকের দার্শনিক উপলব্ধির সঙ্গে পরিচিত হবেন বটে, কিন্তু যেহেতু এসবের প্রকাশ ঘটেছে চরিত্রগুলোর ভাবনাচিন্তা-কথাবার্তা-আচারআচরণের মধ্যে দিয়ে, পাঠকরা তাই লেখকের উপস্থিতি টেরই পাবেন না। চরিত্রগুলোও এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, এবং এসব চিন্তাভাবনা তাদের চারিত্রিক কাঠামোর সঙ্গে এমন সুনিপুণভাবে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এসবের কোনোকিছুকেই বেমানান, খাপছাড়া এবং আরোপিত মনে হয় না। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে—উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রিও-র মুখে আমরা কোনো দার্শনিক বাক্য উচ্চারিত হতে দেখি না, যদিও পুরো উপন্যাসটি তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়, অন্যান্য সবার অনুভূতিগুলো প্রকাশিত হয় তারই সামনে। যেন তিনি নিছক একজন শ্রোতা, শুনে যাওয়াই তার কাজ। চরিত্রটিকে এইভাবে সৃষ্টি করার অর্থ হয়তো এই যে, একটি অনির্দিষ্ট যুদ্ধের যিনি নেতা, তাকে দার্শনিক বিতর্কে সময় ক্ষেপণ করা মানায় না। তাকে ভাবতে হয় সবার কথা, তাকে হতে হয় নিস্পৃহ, নির্মোহ, স্থিতধীসম্পন্ন—নইলে তিনি যুদ্ধ করবেন কীভাবে? রিও সে-কথা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন—'আমি সত্যিকারের সহানুভূতি অনুভব করি পরাজিত মানুষের জন্য, মহাপুরুষদের জন্য নয়। বীরত্বের কোনো মূল্য আমার হৃদয়ের কাছে নেই। আমি একজন সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ মানুষ নিয়েই আমার সকল আগ্রহ।' রিও-র এই যুদ্ধ সম্ভবপর হয়, কারণ তিনি জানেন অস্তিত্বের যাবতীয় সংকট ও নেতিবাচকতা সত্ত্বেও মানুষের জয়ের জন্য যুদ্ধ করে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। বীভৎস প্রতিকূলতার মধ্যেও রিও তাই বহন করে চলেন এক অনিঃশেষ আশাবাদ। মানুষ শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে—এই আশাবাদ।

ডিসেম্বর, ২০০৫।

আহমাদ মোস্তফা কামাল

সূচি

প্রথম পর্ব	১৭
দ্বিতীয় পর্ব	৭৯
তৃতীয় পর্ব	১৭৬
চতুর্থ পর্ব	১৯৬
পঞ্চম পর্ব	২৭৩

প্রথম পর্ব

এই পুস্তকে যেসব অসাধারণ ঘটনার বর্ণনা আছে সেগুলো ঘটেছিল ওরাঁ-এ ১৯৪...সালে। এইসব ঘটনার কিছুটা অসামান্য চরিত্রের কথা বিবেচনা করলে ওরাঁ-এর মতো শহরে সেগুলো ঘটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হয়। এতে সবাই একমত। কারণ শহরটা যে অতি সাধারণ—ওরাঁ-এ এটাই সবার চোখে পড়ে প্রথম। আলজিরিয়া উপকূলে একটা বড় ফরাসি বন্দর এবং সেইসঙ্গে জেলা শাসন-কর্তৃপক্ষের হেডকোয়ার্টার, এই হচ্ছে ওরাঁ-এর যা-কিছু পরিচয়। স্বীকার করা দরকার যে শহরটা অত্যন্ত কুৎসিত। এর সবখানেই কেমন যেন একটা নিরবচ্ছিন্ন আত্মতৃপ্তির ভাব। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও বন্দর আছে, কিন্তু তাদের থেকেও ওরাঁ-এর স্বাতন্ত্র্য যে সত্যি কোনখানে তা আবিষ্কার করতেও সময়ের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, সেখানে একটা পায়রাও নেই, বৃক্ষলতা নেই, সেখানে আপনি কখনও পাখির ডানার ঝটপটানি শুনবেন না, বৃক্ষপত্রের মর্মরধ্বনিও না। সংক্ষেপে সেটা এমন একটা স্থান যেখানে সবকিছুরই একান্ত অভাব। এমন একটা শহরের চিত্র কল্পনা করা যায় কীভাবে ছবিটির সবকিছুই নেতিবাচক। এখানে কোন্ ঋতু যে কখন আসে আর কখন যায় তা স্থির করতে হয় অনেক সময় শুধুমাত্র আকাশের চেহারা দেখে। যেমন মৃদু বাতাসের স্পর্শ অথবা শহরতলি থেকে ফেরিওয়ালাদের ঝুড়ি ভরে ভরে শহরে ফুল আমদানি করার দৃশ্য এখানে বসন্তের আগমনবার্তা বয়ে আনে। এ যেন এমন এক বসন্ত যাকে হাটে-বাজারে হেঁকে হেঁকে ফেরি করা হয়। কিন্তু গ্রীষ্মের দিনে সূর্যের প্রখর তাপে বাড়িঘর জ্বলেপুড়ে একেবারে হাড়ের মতো শুকনো হয়ে যায়, ধুলির ধূসর আস্তরণ জমে দেয়ালে দেয়ালে। তাই গ্রীষ্মের ওইসব প্রখর দিনে এখানে আপনার দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে কোনোপ্রকারে কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অপরপক্ষে, শরৎকালে আমাদের চারদিকে শুধু কাদা থিকথিক করতে থাকে। শুধুমাত্র শীতকালটাই এখানকার আবহাওয়া সত্যিই মনোরম হয়ে ওঠে।

কোনো শহরের পরিচয় পেতে হলে সম্ভবত সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে সেখানে মানুষ কীভাবে কাজকর্ম করে, কীভাবে প্রেম করে আর কীভাবে তাদের মৃত্যু হয় তা জানবার চেষ্টা করা। কিন্তু দেখেছি আমাদের এই ছোট শহরে এগুলো করা হয় অনেকটা একই নিয়মে। সবকিছু করার মধ্যে কেমন একটা তড়িঘড়ি ও নির্লিপ্ত ভাব থাকে। আসল সত্যিটা হচ্ছে, এখানে জীবন আমাদের প্রত্যেকের কাছে বড় একঘেয়ে, অবসাদময়; তাই আমরা প্রাণপণ চেষ্টায় আমাদের অভ্যাসগুলোকে নিয়েই শুধু পড়ে

থাকি। শহরের অধিবাসীরা সবাই কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু শুধুই বড়লোক হওয়ার উদ্দেশ্যে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি ওদের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ এবং ওরা নিজেরাও বলে, ওদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে 'বাণিজ্য'। স্বভাবতই প্রেমলীলা, সমুদ্রস্নান, ছবি দেখা—জীবনের এইসব সহজতর আনন্দের কোনোটাই ওদের কাছে পরিত্যাজ্য নয়। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো এসব আমোদ-প্রমোদের জন্যে ওরা সাধারণত শনিবারের বিকেল ও রবিবারটা বরাদ্দ রাখে, আর সপ্তাহের বাকি দিনগুলোয় চেষ্টা করে অর্থ উপার্জনের—যত অধিক সম্ভব। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অফিস থেকে বেরুবার পর একটা নির্দিষ্ট সময়ে, যার বড় একটা নড়চড় দেখা যায় না, সবাই কাফেতে গিয়ে বসে, অথবা বুলভার ধরে পায়চারি করে বেড়ায় অথবা বাসার ব্যালকনিতে বসে হাওয়া খায়। আর বয়স্কদের যেসব স্থলন দেখা যায় তা খেলা, সামাজিক মেলামেশা এবং প্রচুর খানাপিনা ও নিয়মিত ক্লাবে যাওয়া—এসবের প্রতি একধরনের আসক্তি অতিরিক্ত কিছু নয়। এইসব ক্লাবে তাসের পাতির ওঁনামার সঙ্গে মোটা অঙ্কের টাকা হাত-বদলাবদলি হয়।

অনেকেই নিশ্চয় বলবেন, এই অভ্যাসগুলোকে শুধুমাত্র আমাদের শহরেরই বৈশিষ্ট্য বলা যায় না। বস্তুত আমরা যারা সমকালীন মানুষ তারা সবাই প্রায় একরকম। সবখানেই মানুষ উদয়াস্ত পরিশ্রম করে আর তারপর জীবন উপভোগের যে অবকাশটুকু পায় তার অপচয় করে তাসের আড্ডায় অথবা কাফেতে অথবা তুচ্ছ সব অলস কথাবার্তায়। এছাড়া আর কোনো সাধারণ দৃশ্য এখনকার দিনে চোখে পড়ে না। তবু পৃথিবীতে এমন বহু শহর, বহু দেশ আছে যেখানে মানুষ মাঝে মাঝে কিছু একটা বৈচিত্র্যের ইঙ্গিত পায় বই কী। সাধারণভাবে, এর জন্য তাদের জীবনে-যে কোনো পরিবর্তন আসে এমন নয়। তবু তারা এই বৈচিত্র্যের খবর রাখে, এটাই হল বড় কথা এবং এটা তাদের কাছে অনেকখানি আশীর্বাদের মতো। কিন্তু ওরাও এমন একটা শহর যেখানে এই ধরনের কোনো ইঙ্গিত পাওয়াটা অসম্ভব। এককথায় ওরাও হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ আধুনিক শহর। তাই আমাদের শহরের অধিবাসীদের 'প্রেমলীলা' সম্পর্কে তেমন বিস্তারিত কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। 'প্রণয়লীলা' বলতে এখানে যা বোঝায় তা হচ্ছে এই যে, পুরুষ ও নারী পরস্পরকে দ্রুত নিঃশেষ করে ফেলে, অথবা তা সাধারণ দাম্পত্য-সম্পর্কের নিরুত্তেজ অভ্যাসমাত্রে থিতিয়ে যায়। এখানে এই দুই চরম বিপরীতের মাঝামাঝি কোনোকিছু বড় একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু এটাও যে শুধুমাত্র ওরাও শহরেরই একটা ব্যতিক্রম তা বলা যায় না। অন্য সব জায়গার মতো ওরাও-এ অবশ্য আর চিন্তাশক্তির অভাবের দরুন, প্রেমের তেমন কোনো উপলব্ধি ছাড়াই স্ত্রী-পুরুষের একে অপরকে ভালোবাসতে হয়।

বরং মৃত্যুর সময় মানুষকে মাঝে মাঝে যে কষ্ট পেতে হয় সেটাই আমাদের শহরের আরো বড় ব্যতিক্রম। সম্ভবত 'কষ্ট' শব্দটা সঠিক শব্দ নয় বরং 'অস্বস্তি' বলতে যা বোঝায় তাই সঠিক অর্থের অনেকটা কাছাকাছি।

দৈহিক অসুস্থতা অবশ্য কোনো সময়েই স্বস্তির ব্যাপার নয়, কিন্তু তবুও এমন অনেক শহর আছে, যেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে যাকে বলে পাশে এসে দাঁড়ানো, তাই করে

শহরের অধিবাসীরা, যেখানে অপরের ওপর নির্ভর করে কিছুটা অপরের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় নিজেকে। অসুস্থ অপারগ যে মানুষ সে অপরের কাছে এমন কী-বা আশা করতে পারে; সে-কাজ হয়তো কিছুটা নির্ভরশীলতা, যা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ওরাও-এ শীত এবং গ্রীষ্ম দুই-ই প্রচণ্ড; ব্যবসা-সংকট এখানে অহরহ লেগেই থাকে; এখানকার পরিবেশও অত্যন্ত নির্মম ও প্রতিকূল। এখানে রাত্রি নামে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে, এবং এখানকার আমোদ-প্রমোদের প্রকৃতিও অত্যন্ত দুরন্ত। কাজেই এখানে দৈহিক সামর্থ্য এবং সুস্থতার একান্ত প্রয়োজন। অসুস্থ অপারগ যে মানুষ সে এখানে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যেন। যদি কোথাও এমন ঘটে যে একদিকে প্রখর রোদে তাদের গা দিয়ে তাপ ঝলসাচ্ছে এমনি শত শত দেয়ালের আড়ালে আটকা পড়ে একজন মানুষ মৃত্যুর অপেক্ষায় মুহূর্তে গুনছে, আর ঠিক সেই একই সময়ে শহরের অন্য অধিবাসীরা কাফেতে কাফেতে বসে বা টেলিফোনে ঝুঁকে পড়ে বিদেশে মাল পাঠানো বা প্রেরিত মালের পাওনা রশিদ বা রপ্তানি মালের প্রাপ্য বাটা নিয়ে গভীর হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত; তাহলে সেই মুহূর্তে সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির অবস্থাটা চিন্তা করলে কী মনে হয়। কোনো শুষ্ক অঞ্চলে এইরকম একটা অবস্থার ভেতর কেউ যদি মৃত্যুর কবলে পড়ে তবেই হয়তো সে উপলব্ধি করতে পারে যে, মৃত্যুর সময়,এমনকি এই আধুনিক পৃথিবীতেও কী ভয়াংকর অস্বস্তিই না মানুষকে পোহাতে হয়।

ওপরের মন্তব্যগুলো কিছুটা অসংলগ্ন হলেও তা থেকে আমাদের শহরটা যে সত্যিই কেমন সে-সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মাবে। যাহোক সে-সম্পর্কে অতিরঞ্জন করে কিছুটা বলা অবশ্য আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা এখানে যেটুকু বোঝাতে চাই তা হচ্ছে এই যে, ওরাও শহরের বাহ্যিক পরিবেশ অত্যন্ত নগণ্য, সাধারণ এবং তেমনি সাধারণ এখানকার মানুষের জীবন। কিন্তু একবার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে জীবন এখানে মোটামুটি নিরুপদ্রবে কেটে যায়; অথচ যেহেতু এই অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য আমাদের শহরের পরিবেশ অত্যন্ত অনুকূল, সুতরাং এখানকার সবকিছুই হয়তো একটা শুভ উদ্দেশ্যে নিবেদিত। শুধুমাত্র এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এখানকার জীবনধারাকে তখন আর তেমন উদ্দীপনাময় বলে মনে হয় না। এটুকু অবশ্য স্বীকার না করে উপায় নেই। অন্তত এটুকু সত্যি যে, সামাজিক বিক্ষোভ বা অশান্তি বলতে যা বোঝায় তা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যাপার। শহরের অধিবাসীর সবাই স্পষ্টভাষী, অত্যন্ত অমায়িক ও পরিশ্রমী। বাইরের পরিদর্শক যারা এদের সংস্পর্শে আসে, সবসময় এদের সম্পর্কে একটা শুষ্কার ভাবই জাগে তাদের মনে। বৃক্ষলতাশূন্য, চাকচিক্যবর্জিত, হৃদয়হীন এই শহরটা শেষপর্যন্ত একটা শান্তিপূর্ণ স্থান বলেই মনে হয় সবার কাছে। এবং কিছুদিন এখানে কাটাবার পর যে-কেউ এখানে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ রাত্রি যাপন করতে পারে।

একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করাটা বোধ হয় অত্যন্ত সমীচীন। ওরাওকে দেখলে মনে হয়—এক অদ্ভুতদর্শন স্থলখণ্ডের ওপর শহরটাকে স্থাপন করা হয়েছে। নিখুঁত গঠন এক উপসাগরের মুখ থেকে ওপরে উঠে গেছে এক বিস্তৃত উন্মুক্ত মালভূমি, যাকে চারদিকে দিগন্তে ঘিরে আছে ঝকঝকে উজ্জ্বল পর্বতশ্রেণী। ঠিক তারই মাঝখানে

অবস্থিত এই ওরাও শহর। সারাটা দৃশ্যপটের এই বিন্যাসের ভেতর যদি কোথাও কোনো ত্রুটি থাকে যার জন্য মনের ভেতর ক্ষোভের সঞ্চার হতে পারে তা হচ্ছে সমুদ্র থেকে বিপরীতমুখী এই শহরটার অবস্থান, মনে হয় যেন শহরটা সমুদ্রের দিকে পেছন ফিরিয়ে আছে। ফলে এই শহর থেকে কোনোদিন সমুদ্র চোখে পড়ে না। সমুদ্র দেখবার জন্যে সবসময় শহরের অধিবাসীদের বাইরে যেতে হয়।

ওরাও শহরের স্বাভাবিক জীবনধারার যে-বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে তা থেকে এমন অনুমান করা সহজ যে পূর্বেই যে-বছরটার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে-বছর বসন্তকালে এখানে যেসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলো যে ঘটতে পারে এই শহরের অধিবাসীদের তেমন আশঙ্কা করার বিন্দুমাত্র কারণ ছিল না। কিন্তু এই ঘটনাগুলো, পরে যে ভয়াবহ কাহিনী বর্ণনা করা হবে, শুধু তার পূর্বাভাস মাত্র (যেটা পরে আমরা উপলব্ধি করেছিলাম)। এই ঘটনাগুলোকে কেউ কেউ ভাববেন অবিশ্বাস্য, আবার কেউ স্বাভাবিক। একটা বিষয় অবশ্য সুস্পষ্ট যে একজন কাহিনীকারের পক্ষে দৃষ্টিভঙ্গির এই তারতম্যের ওপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। তিনি নিজে যখন শিক্ষিত, জানেন যে ঘটনাগুলো সত্যি সত্যিই ঘটেছিল এবং সেগুলো শহরের অধিবাসীদের জীবনধারাকে কিছুটা প্রভাবান্বিতও করেছিল, আর তাছাড়া এইসব ঘটনার এমন হাজার হাজার প্রত্যক্ষদর্শী আছেন, যারা তার লিখিত বিবরণের সত্যতা যাচাই করে নিতে পারবেন, তখন তার একমাত্র কর্তব্য হবে বলে যাওয়া যে ঠিক এই জিনিস ঘটেছিল।

কিন্তু এটাও সত্যি যে, কাহিনীকার—যার পরিচয় যথাসময়ে প্রকাশিত হবে—যেসব ঘটনার বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করতে চান, কতকটা দৈবক্রমে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবার সুযোগ যদি তার না ঘটত এবং বিশেষ অবস্থার পরিপাকে তিনি নিজে যদি সেগুলোর সঙ্গে কিছুটা গভীরভাবে জড়িয়ে না পড়তেন, তাহলে এই দুরূহ কাজ হাতে নেবার কোনোরকম যোগ্যতা যে তার আছে সে দাবি করাটা হয়তো তার পক্ষে সম্ভব হত না। একজন ঐতিহাসিকের ভূমিকা পালনের জন্য তার পক্ষে যদি কোনো যুক্তি থাকে তা এইটুকুই মাত্র। স্বভাবতই, প্রত্যেক ঐতিহাসিকেরই—তা সে শখের ঐতিহাসিক হলেও—তাকে পথনির্দেশ করবার জন্য কতকগুলো স্বীকৃত সত্য তার হস্তগত থাকে, সেগুলো তার ব্যক্তিগত সংগ্রহও হতে পারে আবার অপরের সূত্রে পাওয়া হতে পারে। এইরকম তিনশ্রেণীর তথ্য বর্তমান কাহিনীকারের আয়ত্তে আছে : প্রথম হচ্ছে সেইসব সত্য ঘটনা যেগুলো তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন; দ্বিতীয় শ্রেণীর তথ্য হচ্ছে অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীর প্রদত্ত বিবরণ—কাহিনীকার নিজেও এইসব ঘটনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে ঘটনাগুলোর সঙ্গে অপর যারা জড়িত ছিলেন ঘটনাগুলো সম্পর্কে তাদের প্রত্যেকের ধারণা এবং অভিমত ব্যক্তিগতভাবে জানবার সুযোগ কাহিনীকারের হয়েছিল; এবং সর্বশেষ শ্রেণীর তথ্য হচ্ছে পরবর্তীকালে এই ঘটনা সম্পর্কে যে দলিলপত্র তার হস্তগত হয় তাদের সূত্রে পাওয়া। সুতরাং কাহিনীকারের প্রস্তাব হচ্ছে যে, প্রয়োজনবোধ এইসব তথ্যের আশ্রয় তিনি নেবেন এবং নিজের বিচার-বিশ্লেষণ অনুসারে সেগুলোকে তিনি ব্যবহার করবেন। তার আরও প্রস্তাব হচ্ছে...।

সম্ভবত এই ধরনের প্রারম্ভিক কথাবার্তা ও সতর্কতামূলক মন্তব্যের আর দীর্ঘ অবতারণা না করে আসল কাহিনীর সূত্রপাত করবার উপযুক্ত সময় এখন হয়েছে। তবে প্রথমদিনের ঘটনাগুলোর কিছুটা দীর্ঘ বিবরণ দেয়া প্রয়োজন।

২

১৬ এপ্রিল, সকাল।

অপারেশন রুম থেকে বের হয়ে আসবার সময় ডাক্তার রিও-র পায়ের তলায় নরম কী যেন একটা ঠেকল। পা-টা সরিয়ে নিতেই দেখলেন সিঁড়ির মাঝখানে একটা ইঁদুর পড়ে রয়েছে। নামার ঝোঁকের মাথে তিনি সেটাকে পা দিয়ে সজোরে একপাশে সরিয়ে দিলেন শুধু। তারপর আর কিছু ভাবনাচিন্তা না করে যেমন নামছিলেন তেমনি দ্রুত নিচে নেমে এলেন। একেবারে সিঁড়ির নিচে এসে রাস্তায় নামতে যাবেন এমন সময় তার খেয়াল হল মরা ইঁদুরটা সিঁড়ির উপর ওখানে এল কী করে? তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে দারোয়ানকে ডেকে তক্ষুনি সেটাকে সরিয়ে ফেলতে বললেন। তিনি যে একটা অদ্ভুত কিছু আবিষ্কার করেছেন, দারোয়ান বুড়ো মিশেলকে সংবাদটা দেয়ার পর তার হাবভাব লক্ষ্য না-করা পর্যন্ত তিনি সেটা অনুভব করেননি।

ব্যক্তিগতভাবে মরা ইঁদুরটাকে সিঁড়ির উপরে দেখে ব্যাপারটা তার কাছে খানিকটা বেখাপ্পা ঠেকেছিল এই যা; এর অধিক আরকিছুই ভাবেননি তিনি। কিন্তু বুড়ো দারোয়ানকে খবরটা জানাতেই সে এমন ভাব দেখাল যেন সত্যি ভয়ংকর একটা কিছু ঘটবার সংবাদ শুনছে সে। একটা কথা সে বেশ জোরের সঙ্গেই বলল : না, না, ইঁদুর আসবে ওখানে কোত্থেকে? তার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে ডাক্তার বলতে লাগলেন যে, সিঁড়ির উপরে তিনি একটা ইঁদুর পড়ে থাকতে দেখে এসেছেন এবং সম্ভবত ইঁদুরটা মরা, কিন্তু তাতে মিশেলের নিজের বিশ্বাস কিছুমাত্র টলল বলে মনে হল না। সে আবার তার নিজের কথারই পুনরাবৃত্তি করল : ঘরের ভেতর কোথাও কোনো ইঁদুর তো দেখিনি। তাহলে বাইরে থেকে এটাকে কেউ এনে থাকবে। কোনো বখাটে ছোকরা আমোদ করবার জন্যে দুষ্টুমি করে করেছে এ-কাজ। নিশ্চয়ই তাই হবে।

সেদিন সন্ধ্যার পরে নিজের ফ্লাটে ওঠার পথে নিচে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে চাবির জন্যে পকেট হাতড়াচ্ছিলেন। এমন সময় ডাক্তারের নজরে পড়ল বারান্দার অপরপ্রান্ত থেকে প্রকাণ্ড একটা ইঁদুর তার দিকে তেড়ে আসছে। কেমন একটা টলমলে ভাবে চলছিল ইঁদুরটা। তার সারা দেহের পশম মনে হচ্ছিল সম্পূর্ণ ভিজে। প্রাণীটা মাঝপথে থামল কিছুক্ষণ। যেন নিজের দেহটা সমলে নিল। ডাক্তারের দিকে এগিয়ে আসল কয়েক পা। আবার থামল সে। তারপর ক্ষীণ একটা কিচকিচ শব্দ করে নিজের দেহটাকে ঘোরাতে গিয়ে সেখানেই কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর। তার মুখটা একটুখানি ফাঁক হয়েছিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছিল তার মুখ থেকে। ডাক্তার মুহূর্তকয়েক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ইঁদুরটার দিকে চেয়ে হঠাৎ দ্রুতবেগে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসলেন।

ডাক্তার কিন্তু এখন আর ইঁদুরের কথা ভাবছিলেন না। নিচে ইঁদুরটার মুখ দিয়ে রক্ত ওঠার দৃশ্য দেখতেই আবার তার মনে পড়েছিল নিজের স্ত্রীর কথা। আজ সারাদিন তিনি শুধু এই একটা প্রসঙ্গ নিয়েই চিন্তা করেছেন। গত একবছর ধরে তার স্ত্রী রোগে ভুগছেন। পরের দিন তার পাহাড়ে এক স্বাস্থানিবাসে যাওয়ার কথা। ডাক্তার উপরে উঠে এসে শোবার ঘরে ঢুকলেন ও দেখলেন, স্ত্রী বিছানায় শুয়ে আছে, বিশ্রাম নিচ্ছে। কাল দীর্ঘপথ পেরিয়ে তবে তাকে পৌঁছতে হবে স্বাস্থ্যনিবাসে। তাই ডাক্তার নিজে তাকে বলেছিলেন আজকের দিনটায় বিশ্রাম নিতে। ডাক্তারকে ফিরতে দেখে স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল : জানো, আজ কত ভালো বোধ করছি। কী যে বলব তোমাকে।

স্ত্রীর মুখখানা ডাক্তারের দিকে সম্পূর্ণ ফিরানো। বিছানার পাশের বাতি উজ্জ্বল প্রভায় চিকচিক করছিল। ডাক্তার স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন সেই মুখের দিকে। তার স্ত্রীর বর্তমান বয়স তিরিশের কোঠায়। দীর্ঘদিন রোগভোগের চিহ্ন তার মুখের ওপর সুস্পষ্ট। তথাপি তার দিকে চেয়ে ডাক্তারের মনে যে চিন্তা জাগল তা হচ্ছে—তবুও ওকে দেখতে কত অল্পবয়স্কা—একেবারে কিশোরী বললেও চলে। কিন্তু এ প্রশান্ত সুন্দর মুখশ্রী হয়তো-বা শুধুই হাসির গুণ; হাসিই তার চেহরার সবটুকু মালিন্য নিঃশেষে মুছে দিয়েছিল।

'এবার একটু ঘুমুবার চেষ্টা করো তাহলে।' ডাক্তার উপদেশের সুরে বললেন। 'কাল সকাল এগারোটা নাগাদ নার্স এসে পৌঁছবে। ভোলোনি নিশ্চয় দুপরের ট্রেন ধরতে হবে তোমাদের।' ডাক্তার স্ত্রীর ভেজা-ভেজা কপালের ওপর নিজের ঠোঁটজোড়াকে শুধু মৃদু স্পর্শ করলেন একবার। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসলেন। স্ত্রীর মুখের মৃদু কোমল হাসি যেন তাকে অনুসরণ করে এসে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল।

পরের দিন। ১৭ এপ্রিল।

সকাল আটটা আন্দাজ ডাক্তার বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। দারোয়ান মিশেল এগিয়ে এসে তার কোটে একটা ফুল গুঁজে দিল। তারপর সে ডাক্তারকে জানাল দুষ্ট প্রকৃতির কতগুলো ছোকরা আবার গোটা-তিনেক মরা ইঁদুর হলঘরে ফেলে রেখে গেছে। ইঁদুরগুলোকে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় শক্ত স্প্রিংওয়ালা কলের সাহায্যে তাদের ধরা হয়েছিল। কারণ তখনও তাদের মুখ দিয়ে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। মিশেল আরও জানাল ইঁদুরগুলোকে দেখার পর তাদের ঠ্যাং ধরে নিজের হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে সে বেশ কিছুক্ষণ দরজার সামনে রাস্তার ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবং সেইসঙ্গে রাস্তা দিয়ে যারা যাতায়াত করছিল তাদের ওপরেও কড়া দৃষ্টি রেখেছিল। ভেবেছিল, এই দৃশ্য দেখলে দুষ্কৃতকারী ছোকরাদের কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই অসতর্ক মুহূর্তে হেসে ফেলবে। আর তা না হলে এমন কোনো হালকা মন্তব্য করে বসবে যাতে সে সহজেই তাদের হাতে-নাতে ধরে ফেলতে পারবে। কিন্তু কোনোই ফল হয়নি তাতে।

—তবে যাবে কোথায়, শেষপর্যন্ত পাকড়ে ফেলবই বাছাধনদের। মিশেল বেশ আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল।

ডাক্তার রিও এবার কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন যেন। স্থির করলেন শহরের

প্রাঙ্গণে যেখানে সাধারণত দরিদ্র রোগীদের বাস সেখান থেকে রোগী দেখা শুরু করবেন তিনি সেদিন। শহরের এসব অঞ্চলে নৈমন্দিন আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় সাধারণত অনেক বেলায়। ডাক্তার রিও নোংরা রাস্তা ধরে গাড়ি চালিয়ে আসের হচ্ছিলেন; আর রাস্তার দুপাশের আবর্জনা-ভর্তি যে ডাস্টবিনগুলো ছিল, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়েছিলেন তিনি। একটা রাস্তাতেই পরপর কয়েকটা ডাস্টবিনে তরকারির খোসা এবং অন্যসব আবর্জনার স্তূপের ভেতর ডজনখানেক মরা ইঁদুর তার নজরে পড়ল।

ডাক্তার সেদিন তার প্রথম রোগীর বাসায় পৌঁছে দেখলেন, রোগী বিছানায় শুয়ে আছে। লোকটা দীর্ঘদিন ধরে যক্ষ্মারোগে ভুগছিল। রাস্তার ওপরেই একটা ঘরে থাকত সে। সেটাই ছিল তার খাবার ও শোবার ঘর। একেবারে পঙ্গু এই বৃদ্ধ লোকটা—জাতিতে স্পেনীয়। তার চোখমুখের চেহারা যেমন রুক্ষ তেমনি কর্কশ। ডাক্তার প্রথম যখন ঘরে এসে ঢুকলেন, লোকটা বিছানার ওপর উঠে বসেছিল; তার ঘাড়টা পেছনদিকে ফেরানো, শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ করে আনবার চেষ্টায় সে টেনে-টেনে শ্বাস নিচ্ছিল আর ঘন ঘন হাঁচি দিচ্ছিল। তার সামনে বিছানার ওপর শুকনো মটরদানা ভর্তি দুটো পাত্র রাখা ছিল। ডাক্তার ঢোকার পরক্ষণেই লোকটার স্ত্রীও একটা পাত্রে পানি ভরে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

ডাক্তার তার দেহে ইনজেকশন দিতে শুরু করলেন, আর রোগী বলে ফেলল : শুনেছেন, ঠিকমতোই বেরিয়ে আসছে ওগুলো। লক্ষ্য করেছেন ব্যাপারটা!

—ইঁদুরের কথা বলছে। রোগীর স্ত্রী ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা। আমাদের পাশের এক ভদ্রলোক তার দরজার সামনে তিনটে মরা ইঁদুর পড়ে থাকতে দেখেছেন একসাথে।

—তাইতো দেখছি, ইঁদুরগুলো বেরিয়ে আসছে। রাস্তার এক-একটা ডাস্টবিনে ডজন ডজন মরা ইঁদুর দেখলাম। মনে হয় খিদের জ্বালায় এমনিভাবে বেরিয়ে আসছে ওরা। ডাক্তার বললেন।

ডাক্তার রিও অল্প কিছুক্ষণের ভেতর আবিষ্কার করলেন, ইঁদুর মরার ব্যাপার নিয়ে শহরের সেই অঞ্চলে রীতিমতো একটা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। সেই দিনের রোগী দেখার পাট শেষ করে তিনি তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরলেন।

—একঘণ্টা টেলিগ্রাম এসেছে, ওপরে রেখে এসেছি। মিশেল ডাক্তারকে জানাল। ডাক্তার তার কাছ থেকে জানতে চাইলেন ইতিমধ্যে সে আরও মরা ইঁদুর দেখেছে কিনা।

—না, দারোয়ান জানাল; আর দেখিনি ইঁদুর। এবার খুব কড়া নজর রেখেছি, ছোকরাগুলো আর এ-কাজ করতে সাহস করবে না। অন্তত আমি যতক্ষণ আছি এখানে।

টেলিগ্রামটা এসেছিল ডাক্তার রিওর মায়ের মাছ থেকে। তিনি জানিয়েছিলেন, পরের দিন শহরে এসে পৌঁছাবেন। বৌয়ের অনুপস্থিতিতে তিনিই ছেলের ঘর-সংসার দেখাশুনা করবেন। ডাক্তার নিজের ফ্লাটে পৌঁছে দেখলেন ইতিমধ্যে নার্স এসে পৌঁছে গেছে। স্ত্রীর দিকে ফিরতেই দেখলেন তার পরনে দরজির তৈরি নতুন পোশাক। ডাক্তার লক্ষ্য করলেন কিছু কিছু প্রসাধনও ব্যবহার করেছে সে। তিনি তার দিকে চেয়ে হাসলেন একটু।

—বাহ চমৎকার! তিনি বললেন। দ্যাখো দেখি কেমন সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে!

মিনিট কয়েক পরের ঘটনা। ডাক্তার স্ত্রীকে ট্রেনের শোবার কামরায় তুলে দিচ্ছিলেন। গাড়ির ভেতরে ঢুকে তার স্ত্রী চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন।

—এতসব খরচপত্র কি আমাদের মানায়, সত্যি তাই না? ডাক্তারের স্ত্রী বললেন।

—ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না তুমি। ডাক্তার রিও জবাবে বললেন। খরচপত্র এখন কিছু করতেই হবে।

—দ্যাখো, ইঁদুর মরার ব্যাপার নিয়ে যা সব শুনছি, সেগুলো কী বলো তো?

—ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝছি না, কিছুটা অদ্ভুত বলেই মনে হচ্ছে। তবে হয়তো তেমন কিছু নয়।

তারপর হঠাৎ ব্যস্ততার সাথে ডাক্তার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি হয়তো আরো যত্ন নেওয়া উচিত ছিল তার; কিন্তু সেসবের কিছুই করতে পারেননি তিনি। তাকে থামতে বলছে এমনিভাবে স্ত্রীকে মাথা নাড়তে দেখে তিনি সংক্ষেপে এই বলে শেষ করলেন—তুমি সুস্থ হয়ে ফিরে এসো, তারপর দেখবে নতুন জীবন শুরু হয়েছে আমাদের—একেবারে নতুন জীবন।

—হয়তো ঠিকই বলছ তুমি। স্ত্রীর চোখদুটো যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হ্যাঁ, তাই-ই। নতুনভাবে জীবন শুরু হবে আবার আমাদের।

কথাবলার মাঝে ডাক্তারের স্ত্রী হঠাৎ একসময় বাইরে প্লাটফরমের দিকে মুখ ফেরাল। তাড়াতাড়ি গাড়িতে ওঠার জন্যে যাত্রীদের ভেতর রীতিমতো ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি শুরু হয়েছিল তখন সেখানে। তিনি যেন সেই দৃশ্যের দিকেই সাগ্রহে চেয়ে রইলেন। ইঞ্জিনের একটানা হিসহিস শব্দ ভেসে আসছিল। ডাক্তার কোমল অন্তরঙ্গ সুরে স্ত্রীর প্রথম নাম ধরে ডাকলেন। স্ত্রী মুখ ফেরাতেই দেখলেন তার সারামুখ অশ্রুসিক্ত।

—এ কী কাঁদছ তুমি? না, না, ছিঃ! ডাক্তার মৃদুস্বরে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। অশ্রুর আড়ালে আবার তার মুখে হাসি ফুটে উঠল, কিন্তু আগের দিনের সেই স্নিগ্ধতা ছিল না এখন আর তার হাসিতে। এরপর শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

—তোমার যাবার সময় হয়ে এল বোধহয়,উঠি এবার। ভেবো না, দেখবে আবার সুস্থ হয়ে উঠছ, ডাক্তার দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন।

ক্ষণেকের জন্যে তিনি স্ত্রীকে দুবাহুর মাঝে জড়িয়ে ধরলেন একবার। তারপর প্লাটফরমের ওপর নেমে আসলেন। জানালার ভেতর দিয়ে স্ত্রীর হাসিটুকু শুধু এখন চোখে পড়ছিল তার।

'মনে রেখো', বাইরে থেকে আবার ডাক্তার বললেন, 'নিজের প্রতি যত্ন নিতে ভুলো না।' কিন্তু তার এই কথাগুলো বোধহয় এবার আর স্ত্রীর কানে গিয়ে পৌঁছাল না।

ডাক্তার প্লাটফরম ছেড়ে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। গেটের গোড়ায় পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট মি. অথনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটা ছোটছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ডাক্তার তার কাছ থেকে জানতে চাইলেন তিনি ট্রেনে বাইরে কোথাও যাচ্ছেন কি না।

মি. অথনের দীর্ঘাকৃতি কালো চেহারা—এককথায় বৈষয়িক মানুষ বলতে যা

বোঝায়, হাবেভাবে কতকটা তাই তিনি।

—না, যাব আর কোথায়। ম্যাডাম অথনের আসার কথা, তাই তাকে নিতে এসেছি।

ইঞ্জিনের হুইসিলের দীর্ঘ শব্দ শোনা গেল।

—শুনছি, আজকাল ইঁদুর ... মি. অথন যেন প্রসঙ্গটা উত্থাপনের ইঙ্গিত দিলেন।

ডাক্তার রিও একবার যেন ট্রেনের দিকেই যাচ্ছেন এমনি ভাব দেখালেন, কিন্তু আবার গেটের দিকেই ঘুরলেন।

—হ্যাঁ, ইঁদুরের কথা কী বলতে চাইছিলেন যেন আপনি? মি. অথনকে লক্ষ্য করে বললেন তিনি।

—না, তেমন কিছুই নয়।

কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনের ওপর প্রভাব পড়েছিল যে জিনিসটার এবং যেটাকে তিনি পরবর্তীকালেও দীর্ঘদিন অবধি স্মরণ করতে পারতেন তা হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে ডাক্তার রেলের একজন কর্মচারীকে মরা-ইঁদুর-ভর্তি একটা কাঠের বাক্স নিয়ে তাদের সামনে দিয়ে পার হয়ে যেতে দেখলেন, সেই দৃশ্যটা।

সেদিন বিকেলের গোড়ার দিকে ডাক্তার রিও যখন সবে রোগী দেখতে বসেছেন, এমন সময় এক অপরিচিত যুবক আসলেন তার সাথে দেখা করতে। ডাক্তার আগন্তুকের কাছ থেকে জানলেন তিনি একজন পেশাদার সাংবাদিক, নাম রেমন্ড র‍্যাঁবেয়ার, সেদিন সকালেও একবার এসেছিলেন ডাক্তারের খোঁজে। মোটা, বেঁটেখাটো দৈহিক গড়ন, পেশল চওড়া কাঁধ; মুখে দৃঢ়তার সুস্পষ্ট ছাপ, বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ—সব মিলিয়ে তাকে দেখে মনে হল, র‍্যাঁবেয়ার সেই জাতের মানুষ যারা কিছুতেই নিজেদের লক্ষ্য বিচ্যুত হতে চায় না। র‍্যাঁবেয়ারের পরনে ছিল খেলাধুলার পোশাকের মতো হালকা পরিচ্ছন্ন পোশাক। কোনোরকম ভূমিকা ছাড়াই তিনি সোজা ডাক্তারের কাছে তার বক্তব্য পেশ করলেন। প্যারিসের এক দৈনিকের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি এখানে এসেছেন, এখানকার আরবদের সাধারণ জীবনযাত্রার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান, বিশেষ করে তাদের ভেতর স্বাস্থ্যরক্ষার যে বিধিবিধানের ব্যবস্থা রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে। এর ওপর একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে তাকে, কাগজের তরফ থেকে ভার দেয়া হয়েছে।

ডাক্তার তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তরে জানালেন, এখানকার আরবদের সাধারণ জীবনযাত্রার অবস্থা তেমন কিছু সন্তোষজনক নয়। কিন্তু আর কিছু বলার আগেই তিনি র‍্যাঁবেয়ারের কাছ থেকে জানতে চাইলেন, সম্পূর্ণ সত্য তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতা তার আছে কি না।

—অবশ্যই, সেটুকু স্বাধীনতা নিশ্চয়ই পাব—

অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি—ডাক্তার রিও তার বক্তব্য আরও স্পষ্ট করবার প্রয়াস পেলেন, এখানে যা যা দেখবেন সেগুলোকে খোলাখুলিভাবে নিন্দা করে আপনি যা-কিছু প্রকাশ করতে চান সে-স্বাধীনতা আপনি পাবেন কি? সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে সবকিছু বলতে হবে।

—দেখুন স্বীকার করছি ততখানি স্বাধীনতা আমার নেই। তবে আমার বিশ্বাস অবস্থা নিশ্চয় এতখানি খারাপ পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

—না। ডাক্তার রিও শান্তভাবে বললেন। প্রকৃত অবস্থা এতখানি খারাপ নয়। তবে ডাক্তার রিও প্রশ্নটা তুলেছিলেন শুধুমাত্র এই কারণে, তিনি জানতে চাইছিলেন সত্যের কোনোরূপ অপলাপ না করে প্রকৃত তথ্য প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা র‍্যাঁবেয়ারের আছে কি না।—যাতে সম্পূর্ণ সত্য তথ্য না দিয়ে কিছু গোপন করা হয় এমন কোনো রিপোর্ট প্রকাশের কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।—ডাক্তার এবার মন্তব্য করলেন। আর এই কারণেই আপনি যে রিপোর্ট পাঠাতে চান তার সমর্থনে আসবে এমন কোনো তথ্য আপনাকে দিয়ে আমার আপত্তি আছে।

র‍্যাঁবেয়ার শুধু হাসলেন একটু। মুখে বললেন—আপনি দেখছি মহাপুরুষের মতো কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন।

ডাক্তার কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। আগের মতোই নিরুত্তাপ গলায় বলে গেলেন। র‍্যাঁবেয়ার যে-বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছেন সে-সম্পর্কে অবশ্য তার কিছুই জানা নেই। তবে তিনি যে-ভাষায় কথা বলছেন সে-ভাষা এমন একজন মানুষের যিনি আর পাঁচজনের মতোই এই পৃথিবীতে বাস করেন সত্য; কিন্তু এখানকার সবকিছু সম্পর্কে তার মন অত্যন্ত বিতৃষ্ণা ও অস্বস্তিতে ভরা, অবশ্য যদিও স্বজাতি মানুষদের এখনও তার চোখে বেশ ভালো লাগে। মানুষকে ভালোবাসা একধরনের এবং শুধুমাত্র এই কারণেই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, কখনও অন্যায়ের সংস্পর্শে তিনি যাবেন না বা কোনো অবস্থাতেই সত্যের অপলাপকে প্রশ্রয় দেবেন না।

র‍্যাঁবেয়ার তার কাঁধ দুখানা বেঁকিয়ে নির্বাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন—এবার আপনার মনোভাব অনুমান করতে পেরেছি।

ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে র‍্যাঁবেয়ারকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন।—ব্যাপারটা যে আপনি এইভাবে নিতে পেরেছেন তার জন্য অনেক ধন্যবাদ, ডাক্তার বললেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুঝেছি।—র‍্যাঁবেয়ার তার আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন বটে কিন্তু এবার তার গলার স্বরে সুস্পষ্ট অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল।—আপনাকে শুধু শুধু কষ্ট দিলাম, অপরাধ নেবেন না।

বিদায় দেবার সময় র‍্যাঁবেয়ারের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে ডাক্তার র‍্যাঁবেয়ারকে বললেন যে তিনি যদি কোনো বিচিত্র ঘটনা বা নতুনত্বের সন্ধানে এখানে এসে থাকেন তাহলে বর্তমানে এই শহরে যে অস্বাভাবিক সংখ্যায় মরা ইঁদুর দেখা যাচ্ছে, তারই ওপর কিছু লিখতে পারেন।

—তাই নাকি! র‍্যাঁবেয়ার যেন সত্যিই বিস্ময় বোধ করছেন এমনিভাবে বললেন।—সত্যি এমনকিছু যদি ঘটে তাতে নিশ্চয় আগ্রহ আছে।

সেইদিনই বিকেল পাঁচটা আন্দাজ আর একপাট রোগী দেখতে যাবেন বলে ডাক্তার রিও যখন তৈরি হয়ে নিচে নামছিলেন, সিঁড়ির মাঝপথে বলিষ্ঠ গঠন, কিছুটা অল্পবয়স্ক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোকের মুখের গঠন বেশ বড়সড় কিন্তু চারপাশ পুরু পুরু রেখা দ্বারা চিহ্নিত; চোখের ভ্রূজোড়া পুরু এবং কুঞ্চিত। ফ্ল্যাটের ওপরতলায় যেখানে কিছু পেনদেশীয় পুরুষ নৃত্যশিল্পী থাকেন তাদের সঙ্গে

তিনি ভদ্রলোককে পূর্বেও দেখেছেন একবার। ভঁ তারিউর মুখের সিগারেট টান দিচ্ছিলেন আর তার সামনেই সিঁড়ির চাতালের ওপর সে একটা ইঁদুর মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছিল, সেদিকে সাগ্রহে চেয়েছিলেন। ডাক্তারের সামনে যেতেই তিনি মুখ তুলে চাইলেন এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য তার ধূসর দৃষ্টি ডাক্তারের মুখের ওপর নিবদ্ধ হয়ে রইল। তারপর ডাক্তারকে শুভদিন জানিয়ে মন্তব্য করলেন—ইঁদুরগুলো যেভাবে দলে দলে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে মরছে, সেখানে কেমন অদ্ভুত লাগে।

—হ্যাঁ, তা বটে, ডাক্তার তার মন্তব্যে সায় দিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত মানের মাথা কেমন একটা বিশ্রী লাগে এই যা।

—হ্যাঁ, ডাক্তার, তা কিছুটা সত্যি অবশ্য। তা কিছুটা সত্যি। তবে এই ধরনের কোনোকিছু পূর্বে যে আমরা দেখিনি হয়তো সেটাই আসল কথা। ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে বলব ব্যাপারটা আমার কাছে কিছুটা কৌতূহলের, সত্যি বড় কৌতূহলের।

তারিউর তার কপালের ওপর থেকে চুলগুলোকে পেছনের দিকে ঠেলে দেবার জন্য এর মধ্যে আঙুল চালালেন বারকয়েক। বাববার ফিরে চাইলেন ইঁদুরটার দিকে, কিন্তু ততক্ষণ তার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে। এবার ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন একটু।

—আসলে এ নিয়ে যা-কিছু মাথাব্যথা তা দারোয়ানেরই হওয়া উচিত, তাই নয় কি?

দৈবক্রমে ঠিক এর পরেই দারোয়ানের সঙ্গেই ডাক্তারের প্রথম দেখা হল। রাস্তার সামনে দরজার পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছিল তাকে, তার স্বাভাবিক লালচে চেহারা কেমন যেন শুকনো এবং মলিন দেখাচ্ছিল।

—হ্যাঁ, সবই জানি।—ডাক্তার রিও কিছুক্ষণ আগে সিঁড়ির ওপর যে ইঁদুরটাকে মরতে দেখে আসলেন সে-কথা দারোয়ানকে জানাতেই সে মন্তব্য করল—এখনও মাঝে মাঝে দুটো-তিনটেকেও মরে থাকতে দেখছি একসাথে। কিন্তু এই রাস্তার সব বাড়িতেই এই একই অবস্থা চলছে।

দারোয়ান মিশেলকে হঠাৎ যেন বড়বেশি হতাশ এবং উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। সে কেমন একটা অন্যমনস্কভাবে নিজের গলা চুলকাচ্ছিল। ডাক্তার জানতে চাইলেন তার শরীর কেমন। মিশেল জানাল সে যে অসুস্থ তা হয়তো ঠিক নয়। তবে শরীরটা তার সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল না। তার ধারণা তার শরীরের এই অবসাদ ভাবটা হয়তো মানসিক উদ্বেগের দরুন। ইঁদুরগুলোর এই অবস্থা দেখতে দেখতে তার মনের ওপর একটা আঘাত লাগার মতো হয়েছে। তাদের একটানা গর্ত থেকে বের হয়ে আসা আর বাইরে এইভাবে মরে পড়ে থাকাটা বন্ধ হলেই তার মনের এই দুশ্চিন্তা সব কেটে যাবে।

পরের দিন—১৮ এপ্রিল। সকাল। ডাক্তার রিও মাকে সঙ্গে নিয়ে রোগী থেকে ফিরছিলেন। মিশেলের সাথে দেখা হতে মনে হল তাকে যেন আগের দিনের চেয়েও অসুস্থ এবং মনমরা দেখাচ্ছিল। বাসার সিঁড়ির নিচের ঘর থেকে শুরু করে উপরে চিলেকোঠা অবধি সবখানেই ডাক্তার দেখলেন মরা ইঁদুর ছড়িয়ে পড়ে আছে—সংখ্যায়

অন্তত ১০/১২টা হবে। রাস্তার দুপাশের ডাস্টবিনগুলোতেও দেখে এসেছেন। সবখানেই মরা ইঁদুর ভর্তি।

ডাক্তারের মা কিন্তু এসব দেখে কিছুমাত্র বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে তো এমনি অনেক কিছুই ঘটতে দেখি—কেমন একটা অস্পষ্টভাবে তিনি মন্তব্য করলেন।

ডাক্তারের মায়ের দেহ খর্ব, মাথার চুল রুপোর মতো উজ্জ্বল, সাদা, চোখের দৃষ্টি গভীর কালো এবং শান্ত।

—বার্নার্ড নাথ, কতদিন পরে আবার তোর এখানে আসলাম। সত্যি বড় ভালো লাগছে আমার—আপনা থেকেই আবার মন্তব্য করলেন—এসব দেখলেও আমার মনের সে আনন্দ সহজে নষ্ট হবে না রে।

ডাক্তার রিও মাথা নেড়ে মায়ের কথায় সায় দিলেন, আর বাস্তবিকই মাকে কাছে পেয়ে তার নিজের কাছেও সবকিছু যেন সহজ এবং স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল।

যা হোক, ডাক্তার শেষ অবধি মিউনিসিপ্যাল অফিসে টেলিফোন করলেন। কীট-পতঙ্গ ধ্বংস-সংক্রান্ত দফতরের ভার যে-কর্মচারীটার ওপর,আগে থেকেই ডাক্তারের তার সাথে পরিচয় ছিল। তিনি তার কাছ থেকে জানতে চাইলেন, প্রতিদিন এই-যে অসংখ্য ইঁদুর গর্ত থেকে বার হয়ে এসে এখানে-ওখানে মরে পড়ে থাকে সে-সম্পর্কে তিনি কিছু শুনেছেন কিনা। দেখা গেল, হ্যাঁ, মারসিউর অর্থাৎ এই কর্মচারী ভদ্রলোক আগে থেকেই এসব জানেন। আর তাছাড়া বন্দরের কাছাকাছি তার যে অফিস সেখানেও গোটা-পঞ্চাশের মতো ইঁদুর তারা নিজেরাও মরতে দেখেছেন। সত্যিকথা বলতে কী, তিনি নিজেও এ-ব্যাপারে কিছুটা বিচলিত বোধ করেছেন। ডাক্তারের কাছে তিনি পালটা জানতে চাইলেন, ব্যাপারটা তার মতে সত্যই আশঙ্কাজনক তেমন কিছু বলে মনে হচ্ছে কি না। ডাক্তার রিও পরিষ্কার কোনো মতামত দিতে পারলেন না। শুধু এইটুকু বললেন যে তার মতে বর্তমান অবস্থায় জনস্বাস্থ্য বিভাগের তরফ থেকে কিছু-না-কিছু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

মারসিউর এ-ব্যাপারে ডাক্তারের সাথে একমত হলেন, বললেন—অবশ্য আপনি যদি বাস্তবিকই সেরকম দরকার মনে করেন, কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একটা কিছু নির্দেশও জারি করিয়ে নিতে পারি।

ডাক্তার রিও বেশ খানিকটা জোর দিয়ে বললেন—নিশ্চয় সেটা অবশ্য প্রয়োজন, এক্ষুনি করিয়ে নেওয়া উচিত।

এর অল্প কিছুক্ষণ পূর্বে ডাক্তারের বাসার ঝি তাকে এসে সংবাদ দেয় যে, তার স্বামী যে-কারখানায় কাজ করে সেখানে তারা কয়েকশ'য়ের মতো ইঁদুর একসঙ্গে মরে পড়ে থাকতে দেখেছে।

ঠিক এরপর থেকে শহরের অধিবাসীদের ভেতর কেমন একটা উদ্বেগের ভাব লক্ষ্য করা গেল। কারণ ১৮ এপ্রিলের পর থেকে সমস্ত কলকারখানা এবং গুদামঘর সবখানেই দেখা যেতে লাগল অসংখ্য ইঁদুর হয় মরে পড়ে আছে নচেৎ মৃত্যুযন্ত্রণায় ধুঁকছে। কোনো-কোনো স্থানে মুমূর্ষুগুলোকে দুঃসহ মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দেবার

জন্য মেরে ফেলাও হল। শহরের দূর প্রান্তদেশ, সংলগ্ন শহরগুলো, মধ্যাঞ্চল, অপরিচিত অলিগলি বা বড় রাস্তা যেখানেই ডাক্তার রোগী দেখতে যান, সেখানেই নজরে পড়ে শুধু মরা ইঁদুর—অগণিত মরা ইঁদুর কোথাও ডাস্টবিনে স্তূপ করা, কোথাও সারি সারি নর্দমার ভিতর পড়ে আছে।

হঠাৎ সেদিনের সান্ধ্য পত্রিকাগুলোয় এই নিয়ে জোরালো আলোচনা বেরুল। তাতে প্রশ্ন করা হল নগরপিতারা এ-ব্যাপারে কোনোরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান কি না এবং ন্যাক্কারজনক উপদ্রব উপশমের জন্যে সত্যি কোনো জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা তারা ইতিমধ্যে চিন্তা করছেন কি না। সত্যি কথা বলতে কী, মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ এ-ব্যাপারে কোনোকিছু করার কথা তখনও পর্যন্ত চিন্তা করেননি। প্রকৃত পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য এবার একটা জরুরি মিটিং ডাকা হল। পরে জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রতি নির্দেশ দেয়া হল যে প্রতিদিন প্রত্যুষে মরা ইঁদুরগুলোকে শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কুড়িয়ে একটা নির্দিষ্ট স্থানে তাদের জড়ো করতে হবে। মরা ইঁদুরগুলোকে এইভাবে জড়ো করার পর দুখানা মিউনিসিপ্যাল ভ্যানে করে শহরের প্রান্তদেশে যেখানে দৈনন্দিন আবর্জনা পোড়ানো হয় সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে এবং পুড়িয়ে ফেলা হবে।

পরবর্তী কয়েকদিন অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে দেখা গেল। রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা মৃত ইঁদুরের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলল। তেমনি বেড়ে চলল মরা ইঁদুর বহনকারী ভ্যান দুখানার বোঝা। চতুর্থ দিনে দেখা গেল ইঁদুরের গোটা একটা দল একসাথে বেরিয়ে এসে বাইরে মরতে শুরু করেছে। সিঁড়ির তলার ঘর, মাটির নিচের ভাঁড়ার, ড্রেন—সব জায়গা থেকে সারিবদ্ধভাবে বাইরের আলোয় বেরিয়ে আসতে লাগল ইঁদুরগুলো। বাইরে আসার পর তাদের দেহ প্রচণ্ডভাবে দুলতে থাকে, কেমন একটা অসহায় অবস্থা যেন তখন তাদের, তারপর হঠাৎ একসময় তারা লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, কিন্তু পরক্ষণেই ঘুরে কাত হয়ে পড়ে মরে।

শহরের অধিবাসীদের বিমূঢ় সন্ত্রস্ত দৃষ্টির সামনে নিয়ত ঘটতে লাগল এমনি দৃশ্য। রাতের বেলায়ও বাড়ির প্রবেশপথ এবং পাশের অলিগলি সবখান থেকেই নিয়ত শোনা যেতে লাগল মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর ইঁদুরের কিচকিচ শব্দ। সকালে উঠে দেখা যেত অসংখ্য মৃত ইঁদুর সারা নর্দমা জুড়ে—সারি সারি পড়ে আছে, প্রত্যেকটির মুখ সরু, মুখের চারপাশে খানিকটা জায়গা জুড়ে তাজা লাল রক্তের ছাপ, দেখলে প্রথমে লাল ফুল বলে ভুল হয়। কোনো-কোনোটার দেহ ফুলে মোটা হয়ে গেছে, ইতিমধ্যে পচতে শুরু করেছে, আবার কোনো-কোনোটার দেহ সিঁটকে পড়ে আছে শক্ত হয়ে। গোঁফজোড়া তখনও খোঁচা, খাড়া রয়ে গেছে। শহরের একেবারে মাঝখানে যেখানে কর্মব্যস্ততা সবচেয়ে বেশি, সেখানেও নানা জায়গায় তাদের পড়ে থাকতে দেখা যেতে লাগল। কোথাও সিঁড়ির চাতালের ওপর, কোথাও বাড়ির পেছনদিকে ছোট ছোট গাদা রাখার মতো একত্রে পড়ে আছে মরে। আবার কোনো-কোনোটাকে দেখা যেত যেন দলছাড়া হয়ে এসে সরকারি অফিসের হলঘরে বা ছেলেদের স্কুলের খেলার মাঠে বা কাফের বারান্দার বাইরে একা একা মরে পড়ে আছে।

প্যালেস দ্য আর্মেস, বুল ভার্দে এবং স্ট্রাপন এসবের মতো কর্মচঞ্চল এলাকাগুলোতে

পর্যন্ত ক্ষুদ্র এই বীভৎস মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে শহরের অধিবাসীরা সত্যিই দৈনন্দিন
বিচলিত হয়ে উঠলেন। শুধুমাত্র সূর্য ওঠার সময়টায় যখন সাধারণত কিছুক্ষণ যেন বিরতি থাকে।
আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজ শেষ হয়ে যায়, তখন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের
তারপর থেকেই আবার ইঁদুরের বের হওয়া শুরু হয়। রাতের বেলায়ও অনেক
সংখ্যাও ক্রমেই বাড়তে থাকে। সারাদিন চলে এইভাবে। উষ্ণ-কোমল স্পর্শ অনুভব
সময় রাস্তায় পায়ের তলায় ক্ষুদ্র গোলাকার প্রাণীদেহের যেসব বিষাক্ত পদার্থ
করা যেত। মনে হত যেন গোটা জায়গাটায় মাটির তলদেশে দেবার অবিরাম চেষ্টা
জমেছিল সেগুলোকে কেউ প্রবল চাপ দিয়ে ঠেলে বের করে বিষাক্ত পুঁজরক্ত এবং
চালিয়ে যাচ্ছে। আর তারই ফলে ভেতরে জমা রাশি-রাশি যদি উত্তাপ তীব্রগতিতে
স্ফোটক সব বের হয়ে উঠে আসছে। স্বাভাবিক এবং সুস্থদেহে দাবানলের মতো
বাড়তে শুরু করে, আর তা দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা দিয়ে যেমন হয়; আমাদের
আগুনের স্রোত বয়ে চলে, তাহলে তার মানসিক অবস্থা আবির্ভাবের ফলে তারও
এতদিনের শান্ত যে শহর সেখানে আকস্মিক এই বিপর্যয়ের শিউরে উঠেছিল।
মর্মমূল অবধি যেন তেমনি এক অজানা আতঙ্কে প্রতিদিন যেখান

ক্রমেই অবস্থা এমনি চরমে পৌছাল যে শহরের র‍্যাগ্সডক ব্যুরো, সেদিন তার
থেকে বেতারে একটা প্রচারমূলক আলোচনা পরিচালনা করা হত, শহরের বিভিন্ন
আলোচনার শুরুতে ঘোষণা করল : আজ ২৫ এপ্রিল। এ ক'দিনে সেগুলোকে পুড়িয়ে
অঞ্চল থেকে অনুমান ৬২৫১টি মৃত ইঁদুর পাওয়া গেছে এবং
নিঃশেষ করে ফেলা হয়েছে।

এই বিস্ময়কর বড় সংখ্যার উল্লেখ শুনে শহরের অধিবাসীরা প্রত্যেকেই যেন
নিজের নিজের স্নায়ুকেন্দ্রে প্রচণ্ড একটা আঘাত অনুভব করলেন, কারণ প্রতিদিন তারা
চোখের সামনে যেসব জিনিস ঘটতে দেখছিলেন এখন যেন তারই একটা সম্পূর্ণ এবং
সুস্পষ্ট ছবি তাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল। এতদিন ধরে তারা দুর্বোধ্য অপ্রীতিকর
একটা উৎপাতের বিরুদ্ধে সামান্য ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছিলেন মাত্র, কিন্তু এখন
তারা যেন সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করলেন—এই যে একটা অদ্ভুত ঘটনা নিয়ত
তাদের চোখের সামনে ঘটছে—যার উৎপত্তি এবং সত্যিকারের ব্যাপকতা সবই
এখনও তাদের অজানা—তার অন্তরালে যেন একটা ত্রাসের ছায়াও অবস্থান করছে।
স্পেনদেশীয় বৃদ্ধ পঙ্গু সেই-যে হাঁপানির রোগীটা, দীর্ঘদিন ধরে ডাক্তার রিও যার
চিকিৎসা করে আসছিলেন, এই দুদিনে একমাত্র সেই এখনও ডাক্তারের সঙ্গে দেখা
হলে নিজের হাত দুখানা অবিরাম কচলাচ্ছে আর একধরনের অক্ষমের হাসি হেসে
বলেও বেড়াচ্ছে : দলে দলে বেরিয়ে আসছে এখনও ইঁদুরগুলো।

২৮ এপ্রিল র‍্যাগ্সডক ব্যুরো থেকে আবার যখন ঘোষণা করা হল যে সেদিন শহরের
বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় আট হাজারের মতো মৃত ইঁদুর পাওয়া গেছে, সেদিন সারা শহরে
একটা অজানা ত্রাসের শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল। কর্তব্যশৈথিল্যের জন্য কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে
গুরুতর অভিযোগ করা হল এবং আরো কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য দাবি জানানো
হল এবং যদিও তখন সবে বছরের শুরু, উপকূল অঞ্চলে যাদের নিজেদের গ্রীষ্মভবন ছিল,

তারা সবাই সেখানে পালাবার কথা আলোচনা করতে লাগল। কিন্তু ঠিক পরের দিনই
আবার ব্যুরোর তরফ থেকে জানানো হল হঠাৎ ইঁদুরের উপদ্রবের উপশম হয়েছে। সেদিন
জনস্বাস্থ্য বিভাগের লোকেরা মাত্র গোটাকয়েক মরা ইঁদুর দেখতে পেয়েছে। এ খবর শুনে
শহরের অধিবাসীরা আবার যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

যাহোক ঠিক সেইদিন দুপুরবেলা ডাক্তার রিও যখন নিজের ফ্ল্যাটের সামনে তার
গাড়ি রাখছিলেন হঠাৎ তার নজরে পড়ল বুড়ো দারোয়ান মিশেল রাস্তার অপরপ্রান্ত
থেকে তার দিকে এগিয়ে আসছে। কোনোরকমে নিজের দেহটাকে টানতে টানতে
এগিয়ে আসছিল সে, তার মাথাটা ঝুঁকে-পড়া, হাত-পাগুলোকে দেখাচ্ছিল ল্যাংড়া
মানুষের হাত-পায়ের মতো মোচড়ানো বা বাঁকানো, দম-দেয়া কলের পুতুলের মতো
সমস্ত দেহটায় ঝাঁকুনি দিতে দিতে এগোচ্ছিল সে। ডাক্তার লক্ষ করলেন—মিশেল
একজন ধর্মযাজকের হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে কোনোরকমে হেঁটে আসছিল।
ধর্মযাজকটিকে ডাক্তার চিনত, ফাদার প্যানালু। আগেও ডাক্তার তাকে বহুবার
দেখেছেন। ভদ্রলোক মোটামুটি শিক্ষিত কিন্তু উগ্রপন্থী জ্যাসুইট। শহরের যেসব
লোকেরা ধর্মীয় ব্যাপারে সাধারণত নিরাসক্ত তাদের ভেতরও ফাদার প্যানালুর যথেষ্ট
সুনাম এবং প্রতিপত্তি ছিল। তারা কাছে এসে না-পৌছানো পর্যন্ত ডাক্তার গাড়ির
ভেতর অপেক্ষা করে বসে রইলেন। দুজনা গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াতে ডাক্তার লক্ষ
করলেন মিশেলের চোখদুটো অত্যন্ত দৈহিক উত্তাপের জন্য সাধারণত যেমন হয়
তেমনি অস্বাভাবিকরকমের উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল এবং তার শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে নাকের
ভিতর থেকে একটা বিশ্রী শব্দ বেরিয়ে আসছিল। মিশেল বহুকষ্টে নিজের দৈহিক
অবস্থার কথা ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলল। তার চোখমুখগুলো কেমন যেন ফ্যাকাশে
দেখাতে সে হাওয়া খাওয়ার জন্য বাইরের দিকে বেরিয়েছিল, কিছুক্ষণের মধ্যে সে
তার শরীরের নানাস্থানে—ঘাড়, দুই বগলে এবং পুরুষ-অঙ্গে—অসম্ভব রকমের যন্ত্রণা
অনুভব করতে থাকে। শেষপর্যন্ত সে বাসার দিকে ফিরতে বাধ্য হয় এবং মাঝপথে
তাকে ফাদার প্যানালুর সাহায্য নিতে হয়। জায়গাগুলো ফুলেছে হয়তো সামান্য, কিন্তু
এমন ব্যথা আর যন্ত্রণা—মিশেল বলল—মনে হয় কীভাবে কঠিন মোচড় লেগেছে।

গাড়ির ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে মিশেলের ঘাড়ের ব্যথার জায়গাগুলোয় হাত
বুলিয়ে ডাক্তার দেখলেন কাঠের গিট পড়ার মতো শক্ত স্ফীত হয়ে উঠেছে কোনো-
কোনো স্থানে। 'এখুনি বাসায় গিয়ে শুয়ে পড়ো আর পারলে এখন জ্বর কতটা সেটাও
দেখে নিও একবার। বিকেলে দেখতে আসব।'

বৃদ্ধ দারোয়ান চলে যাবার পর ডাক্তার রিও ফাদার প্যানালুকে জিজ্ঞাসা করলেন,
শহরে ইঁদুর মরার যে প্রকোপ শুরু হয়েছে, সে-সম্পর্কে তার সত্যিকারের ধারণা কী।

—আচ্ছা তাই বলছেন, আমার মনে হয়, ইঁদুরের মহামারী শুরু হয়েছে—ফাদার
প্যানালু বললেন। নিকেল চশমার বড় বড় কাচের আড়ালে তার নিষ্পলক চোখজোড়া
জ্বলজ্বল করতে লাগল।

স্ত্রী স্বাস্থ্যনিবাসে পৌছে সেদিন তাকে যে টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছিল, তাকে
আরেকবার চোখ বুলাবেন বলে ডাক্তার তৈরি হয়ে বসেছিলেন, এমন সময়

টেলিফোনটা বেজে উঠল। যিনি টেলিফোন করেছিলেন, তিনি ডাক্তারের এক পুরোনো রোগী। স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল অফিসের এক কেরানি, মহাধমনির কুঞ্চন রোগে বহুদিন ধরে ভুগছেন ভদ্রলোক। লোকটার তেমন বিশেষ আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। সুতরাং ডাক্তার চিকিৎসার জন্য তার কাছ থেকে কোনো ফি নিতেন না।

—মনে রেখেছেন দেখছি, অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু এখন আপনাকে প্রয়োজন আমার নিজের জন্য নয়, আমার এক প্রতিবেশীর জন্য। ওর ওখানে হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। এক্ষুনি আপনার একটু আসার প্রয়োজন।—ভদ্রলোক একনিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলে যেন হাঁপাতে লাগলেন। ডাক্তার চট করে মনে-মনে ভেবে নিলেন, মিশেলকে দেখতে যাওয়ার ব্যাপারটা অবশ্য কিছুক্ষণ পরে হলেও তেমন কোনো ক্ষতি নেই।

মিনিট কয়েক পরে শহরের প্রান্তদেশে কুফ্যাদার্ভের একটা ছোট ফ্লাটে ডাক্তারকে উঠতে দেখা গেল। নোংরা দুর্গন্ধ-ভরা সিঁড়ি বেয়ে তিনি অর্ধেক পথ ওপরে উঠে এসেছেন, এমন সময় দেখলেন তার সেই পুরোনো রোগী অর্থাৎ যোসেফ গ্রাঁদ তাকে এগিয়ে নেবার জন্য দ্রুত নেমে আসছেন। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেখতে বেশ লম্বা, দেহটা কেমন যেন একটু ঝুঁকে-পড়া, কাঁধজোড়া সরু, তেমনি সরু লিকলিকে হাতপা-গুলো। গোঁফজোড়া দেখতে বিবর্ণ হলুদ। এখন দেখতে ওর অবস্থা কিছুটা ভালো বলে মনে হচ্ছে। যোসেফ গ্রাঁদ ডাক্তারকে বুঝিয়ে বললেন: 'কিন্তু সত্যি বলছি প্রথম যখন দেখি তখন ভয় হয়েছিল ওকে হয়তো আর ফেরাতে পারব না।' কথাগুলো শেষ করে গ্রাঁদ নিজের নাকটা কয়েকবার সজোরে ঝাড়লেন।

একেবারে ওপরের তলায় অর্থাৎ তিনতলায় পৌঁছে ডাক্তারের নজরে পড়ল বাঁদিকের একটা দরজার ওপর লাল খড়িমাটি দিয়ে লেখা রয়েছে : ভেতরে আসুন, গলায় দড়ি দিয়েছি।

ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলেন তারা দুজনে একত্রে। মাঝখানে একখানা চেয়ার পড়েছিল কাত হয়ে আর ঠিক তার ওপর ছাদ থেকে একটা দড়ি ঝুলছিল। ভেতরের ছাদের মাঝখানে যে একটা হুক-মতো ছিল তারই সঙ্গে বাঁধা ছিল দড়িটা। দড়িটা তখন শূন্যেই ঝুলছিল। খাবার টেবিলটা ঠেলে সরিয়ে রাখা হয়েছিল ঘরের এককোণে।

—আশিস সময় থাকতে ওকে নামাতে পেরেছিলাম। গ্রাঁদ আবার মন্তব্য করলেন। গ্রাঁদ নিজের মন্তব্য যথাসম্ভব সহজভাবেই প্রকাশ করছিলেন, কিন্তু তাকে কথা বলতে শুনে মনে হচ্ছিল যেন সঠিক শব্দ চয়নের জন্য সবসময় তিনি মনের ভেতর হাতড়াচ্ছেন। তিনি বলে ফেললেন—আমি তো বেরিয়েই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে কেমন একটা চাপা গোঙানির শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর সঙ্গে সঙ্গে দরজার ওপরের ঐ লেখাগুলোর ওপর যখন চোখ পড়ল, দেখলাম কিছু একটা ঠাট্টার ব্যাপার হবে বুঝি। ঠিক সেই সময় ঘরের ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত আর্তনাদের শব্দ শুনতে পেলাম, দেহের সমস্ত রক্ত ক্ষণিকের মধ্যে হিম হয়ে গেল।—এই পর্যন্ত বলে যোসেফ গ্রাঁদ নিজের মাথাটা চুলকাতে লাগলেন, তারপর আবার বলে ফেললেন—এমনভাবে একজন মানুষ মরবে, এত কষ্টের ভেতর, তাই দরজা ঠেলে ভেতরে চলে এলাম।

যোসেফ গ্রাঁদ এবার পাশের একটা দরজা ঠেলতেই ডাক্তার দেখলেন তারা

দুজনে বেশ ঝকঝকে পরিষ্কার একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ঘরটাতে আসবাবপত্র অবশ্য তেমন বিশেষ কিছুই ছিল না। একপাশে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো শুধু একটা পিতলের খাট। একটু অসুস্থ ধরনের একজন ভদ্রলোক শুয়েছিলেন তার ওপর, তিনি ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছিলেন। তাদের দেখতেই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি তাদের দিকে একবার চাইলেন, তার চোখজোড়া রক্তবর্ণ। সামনে এগিয়ে যেতে যেতে ঘরের মাঝখানে থামলেন ডাক্তার রিও। তাঁর মনে হল ভদ্রলোকের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দের ফাঁকে ফাঁকে তিনি যেন ইঁদুরের ক্ষীণ করুণ কিচকিচ শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। ঘরের কোণগুলোয় একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন, কিন্তু কোথাও কিছু নজরে পড়ল না। ভদ্রলোকের বিছানার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালেন দুজনে। ভদ্রলোক যে খুব একটা উঁচু জায়গা থেকে দড়ি ছিঁড়ে পড়েছিলেন বা হঠাৎ আছড়ে পড়েছিলেন, ভদ্রলোককে দেখে তেমন কিছুই মনে হল না ডাক্তারের। গলায় কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখলেন না। আর সত্যি গলায় দড়ি দিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই কিছুক্ষণের জন্যে হলেও শ্বাসরোধ হয়েছিল, সুতরাং একটু এক্সরে নেয়ার প্রয়োজন, ভাবলেন ডাক্তার। যাহোক তখনকার মতো তিনি শুধু গোটাদুয়েক ইনজেকশন দিলেন এবং মুখে আশ্বাস দিয়ে ভদ্রলোককে বললেন—ভয় পাবার মতো তেমন কিছু নেই, দুএকদিনের মধ্যে সেরে উঠবেন।

—অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার সাহেব। অস্পষ্ট সুরে বললেন ভদ্রলোক।

ডাক্তার রিও যখন যোসেফ গ্রাঁদকে জিজ্ঞাসা করলেন ইতিমধ্যে তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন কিনা, গ্রাঁদ মাথা নিচু করে ফেললেন, বললেন—দেখুন সত্যিকথা বলতে কী, পুলিশকে কোনো সংবাদ দেয়া হয়নি। প্রথমে যেটা আমার কর্তব্য মনে হয়েছিল...অবশ্যই ডাক্তার মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিলেন—আচ্ছা দেখি কী করা যায় এখন।

তাদের দুজনের ভেতরের এই কথাবার্তা শুনে ভদ্রলোকের চোখেমুখে একটা কঠিন আতঙ্ক এবং বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেল। সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় উঠে বসলেন তিনি। বললেন, তিনি তো মোটামুটি ভালোই বোধ করছেন। তাছাড়া অতবেশি ঝামেলা করতে যাওয়ার মতো তেমন কিছুই তো ঘটেনি।

—দেখুন এতে ভয় পাবার কিছুই নেই, ডাক্তার তাকে বুঝিয়ে বললেন—এটা শুধু একটা আইনের মামুলি প্রয়োজন, আর তাছাড়া ব্যাপারটা এখন পুলিশকে জানানো আমার একটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—ওহ! একটা অস্ফুট ক্রন্দনের শব্দ করে ভদ্রলোক আবার বিছানার ওপর ভেঙে পড়লেন। প্যান্যান করে কাঁদতে শুরু করলেন আপনমনে।

যোসেফ গ্রাঁদ এতক্ষণ নিজের গোঁফজোড়া নিয়ে অনামনস্কভাবে নাড়াচাড়া করছিলেন। এবার ভদ্রলোকের বিছানার কাছাকাছি আরও এগিয়ে গেলেন।

—দেখুন মঁসিয়ে কটার্ড, ব্যাপারটা একটু শান্তভাবে বুঝবার চেষ্টা করুন। আপনি যদি এরকম একটা কিছু করে বসেন, তাহলে লোকেরা অহেতুক ডাক্তারকেই দোষারোপ করবে এবার।

রেখেছিল, তখন হঠাৎ অন্তর্হিত হয়েছে। তাই আজকের এই দিনটা যেন আবার নতুন জীবনের আশ্বাস বয়ে এনেছিল সবার জন্যে। মিশেলকে দেখবার জন্য ডাক্তার নিচে নামছিলেন। সেই মুহূর্তে তার নিজের মনও উজ্জ্বল আশায় এবং আনন্দে ভরে উঠেছিল। সেদিনের প্রথম ডাকে পাওয়া স্ত্রীর পত্রখানাই এমন উৎফুল্ল করে তুলেছিল তাকে।

বুড়ো মিশেলের জ্বর আবার নেমে এসেছিল ৯৯ ডিগ্রিতে। দুর্বল দেখালেও হাসছিল সে।

—আমার তো মনে হচ্ছে ও আজ অনেকটা সুস্থ। আপনার কী ধারণা? মিশেলের বৌ বলল।

—তা হবে হয়তো। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কিছুই বলা সম্ভব নয়। ডাক্তার উত্তরে বললেন।

সেদিন দুপুরবেলা মিশেলের জ্বর আবার যেন হঠাৎ লাফিয়ে উঠল ১০৪ ডিগ্রিতে। আবার বিকারে আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে। আবার বমি করতে শুরু করল সে। তার গলার গ্রন্থিগুলোর অবস্থা এমনই যে, সেখানে সামান্য কিছুর ছোঁয়া লাগলেও সে অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে। ডাক্তার লক্ষ্য করলেন মিশেল সবসময় তার মাথাটাকে উঁচু করে রাখবার চেষ্টা করছিল।

বিছানায় পায়ের দিকে বসেছিল তার বৌ। রোগীর পা দুখানা আস্তে করে ধরেছিল সে। মিশেলের বৌ একবার গভীর দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চাইল, তার দৃষ্টি অনুনয়পূর্ণ।

—দ্যাখো, ডাক্তার বললেন—এক্ষুনি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। বিশেষ একধরনের চিকিৎসার দরকার ওর। এ্যাম্বুলেন্স পাঠাবার জন্য টেলিফোন করছি।

ঘণ্টাদুয়েক পরের ঘটনা। এ্যাম্বুলেন্সের ভেতর মিশেলের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার পাশে বসেছিল ডাক্তার রিও এবং মিশেলের বৌ। মিশেলের মুখটা খোলা হা-করা, দুপাশে পুরু ময়লা জমেছে। শুধু থেকে-থেকে কতকগুলো অসংলগ্ন শব্দ বেরিয়ে আসছিল মুখ থেকে। অস্পষ্টভাবে সে বারেবারে বলছিল : ইতর ইঁদুরগুলো, জাহান্নামে পাঠাব—ওরাই এই সর্বনাশটা করেছে।

যন্ত্রণায় তার সারামুখ বিবর্ণনীল হয়ে উঠেছিল; ঠোঁটজোড়া শুষ্ক রক্তহীন। দীর্ঘ সময় পর পর টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছিল সে। গ্রন্থিস্ফীতির জন্যে তার হাত-পাগুলো অসাড় নিস্তেজভাবে বিছানার ওপর পড়েছিল। বিছানার আবরণের মধ্যে সে যেন নিজেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিতে চাইছিল অথবা মাটির গভীরতম দেশ থেকে একটা কণ্ঠস্বর যেন অবিরাম ডাকছিল তাকে, একটা অদৃশ্য শক্তি তার কঠিন নিষ্পেষণে মিশেলের অসুখী আত্মার শেষ প্রতিরোধশক্তিটুকুও যেন নিঃশেষ করে দিতে চাইছিল।

মিশেলের বৌ পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে কাঁদছিল—আর কোনো আশাই নেই, ডাক্তার সাহেব?

—ও মারা গেছে।

৩

মিশেলের মৃত্যুটা ছিল যেন দুর্যোগের প্রথমপর্বের সমাপ্তি আর তার পরবর্তী পর্বের সূত্রপাতের মাঝে একটা সীমারেখা স্বরূপ। প্রথমপর্বের সময়টাতে একটার-পর-একটা

এমনই সব অদ্ভুত লক্ষণ দেখা দিতে থাকে, তার ফলে সবারই মন যেন একসঙ্গে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। কিন্তু পরবর্তী পর্বের সময়টাকে মনে হয় আরো কঠিন এবং নির্মম। এই সময়টায় পূর্বের হতবুদ্ধি ভাবটা কেটে গিয়ে ক্রমেই একটা আতঙ্কের ভাব সঞ্চারিত হতে থাকে সবার মনে। তাই পরবর্তী সময়ের আরো বিচিত্র ঘটনার অভিজ্ঞতার পর প্রথমপর্বের কথা ভাবতে গিয়ে শহরের লোকেরা নিজেরাই উপলব্ধি করে যে, পৃথিবীতে এত শহর থাকতে বেছে বেছে তাদের এই ক্ষুদ্র শহরে স্পষ্ট দিবালোকে গোটা শহরের ইঁদুরগুলো মরতে মরতে নির্মূল হয়ে যাওয়া এবং তার পরপরই আবার সম্পূর্ণ এক অজ্ঞাত এবং রহস্যজনক কারণে একজন দারোয়ানের মৃত্যু হওয়ার মতো এমন সব বিদঘুটে ব্যাপার যে ঘটতে পারে সেটাই তখন তাদের কাছে মনে হয়েছিল স্বপ্নাতীত ব্যাপার। এইরকম একটা ধারণা করাটা বোধ হয় তাদের ভুল হয়েছিল এবং স্পষ্টত এই কারণেই পরবর্তীকালে তাদের এই ধারণার সংশোধন করতে হয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘটনাগুলোর যদি এখানেই পরিসমাপ্তি হত এবং পরে অধিক ভীতিজনক আর তেমন কিছু না-ঘটত, তাহলে এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে তাদের মনের অভ্যাসটাই শেষপর্যন্ত প্রাধান্য পেয়ে যেত। কিন্তু মিশেল তো শুধু পথ দেখিয়েছে মাত্র; যাদের সবাই সাধারণ শ্রেণীর মানুষ নন বা দরিদ্র মানুষ নন, আমাদের সমাজের এমন অনেককেই পরে সেই একই পথ অনুসরণ করতে দেখা যায় এবং তারপর থেকেই সবার মনে কেমন একটা আশঙ্কা। শুধু আশঙ্কাই নয়, কেমন একটা গভীর বিষণ্ণ চিন্তা যেন জমতে থাকে।

যাহোক দ্বিতীয় পর্বের ঘটনা সম্পর্কে লেখক নিজে বিস্তারিত কিছু বলবার আগে পূর্বের যে-ঘটনা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই তিনি নিজের বক্তব্য বলে শেষ করে ফেলেছেন, তারই সম্পর্কে অপর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এখানে উপস্থাপিত করতে চান। জাঁ তারিউ, যার সঙ্গে ইতিমধ্যে কাহিনীর গোড়াতেই আমাদের পরিচয় হয়েছে, ওরাঁ-এ এসেছিলেন প্রথমপর্বের এইসব ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে এবং শহরের মাঝে একটা বড় হোটেলে উঠেছিলেন। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তার যথেষ্ট ব্যক্তিগত আর্থিক সঙ্গতি ছিল এবং ওরাঁও শহরে তিনি কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু তিনি এখানে ক্রমেই সবার সঙ্গে বেশ পরিচিত হয়ে উঠলেও তার নিজের দেশ যে কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যেই বা তিনি ওরাঁও এসেছিলেন, তা কতকটা সবার কাছে অজানাই থেকে যায়। সামাজিক মেলামেশার আসরগুলোতে দেখা যেত তাকে বিশেষ করে বসন্তের গোড়ার দিকে। তিনি প্রতিদিনই সমুদ্র-উপকূলে একটা-না-একটা সাঁতারের ঘাট ভাড়া দিতেন। স্পষ্টই বোঝা যায় যে সাঁতারের একজন উৎসাহী ভক্ত ছিলেন তিনি। কৌতুকপ্রিয়, মুখে সদা হাসির উচ্ছ্বাস, জীবনের সহজ আনন্দ-স্ফূর্তি উপভোগের একটা সহজাত আসক্তি ছিল যেন তার, তবে সে আসক্তি অবশ্য এমন গভীর কিছু নয়, যা একান্তভাবে তার মনের ওপর প্রভুত্ব করতে পারে।

বস্তুত একটা বিষয়ের প্রতিই তার সত্যিকারের অনুরক্তি ছিল। ওরাঁও-এ যে প্রচুর স্পেনদেশীয় নৃত্যশিল্পী ও কণ্ঠশিল্পী বাস করত, তাদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকতে ভালোবাসতেন তিনি।

জ্যাঁ তারিউ-র নোটবুকগুলো ছিল যেন গোড়ার দিকের এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ের একধরনের ঘটনাপঞ্জি। কিন্তু ঘটনাপঞ্জি হিসাবেও সেগুলো কিছুটা অসাধারণ। কারণ এদের লেখক যেন গোড়া থেকেই মনে-মনে স্থির করে নিয়েছিলেন তার অভিজ্ঞতার সবকিছু তিনি রেখে-ঢেকে বলবেন। তার নোটবুকগুলো পড়লে যে-কোনো পাঠকের পক্ষে প্রথমদৃষ্টিতে ধারণা করা সম্ভব যে এদের লেখক যেন উল্টোভাবে দূরবীন ধরে পারিপার্শ্বিক ঘটনা এবং চরিত্র দেখতে চেয়েছেন।

এই বিশৃঙ্খল সময়ে আমাদের শহর সম্পর্কে তিনি তার নোটবুকে এমন সব বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন, যেগুলোকে সাধারণ ঐতিহাসিকেরা উপেক্ষা করে থাকেন। তার চরিত্রের এই অদ্ভুত বৈচিত্র্যের জন্যে হয়তো কেউ কেউ দুঃখবোধ করতে পারেন বা সন্দেহ পোষণ করতে পারেন যে, সত্যিকারের অনুভূতি বলতে যা বুঝায় তা জ্যাঁ তারিউ-র হয়তো ছিল না। কিন্তু একটা জিনিস অবশ্যই অস্বীকার করবার উপায় নেই যে তার নোটবুকগুলো—যা অসংলগ্ন দিনপঞ্জি ছাড়া আর কিছুই নয়—থেকে সমকালীন ইতিহাস রচনায় উৎসাহী যে-কোনো ব্যক্তি এমন সব খুঁটিনাটি তথ্য পেতে পারেন, যা আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও এগুলোর তাৎপর্য ও মূল্য কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সত্যই অপরিসীম এবং এগুলোর এই বৈচিত্র্যের জন্যই যে-কোনো পাঠক এই অদ্ভুত ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো হঠকারী মন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করবেন না।

জ্যাঁ তারিউ-র নোটবুকগুলোর একেবারে গোড়ার দিকে যেসব ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলোতে মনে হয় তিনি যখন প্রথম ওরাও-এ এসে পৌঁছান তারই সমকালীন। স্বাভাবিকভাবেই যা এত অসুন্দর এবং নোংরা—এরকম একটা শহরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারায় তার মনের যে একটা আপাত বিরোধ আনন্দবোধ জেগেছিল, তা যেন একেবারে গোড়া থেকেই তার বিবরণের ভেতর সুস্পষ্ট। শহরের টাউন হলের উপকরণ হিসাবে স্থাপন করা দুটো ব্রোঞ্জের সিংহমূর্তি সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিবরণ তিনি যেমন লিপিবদ্ধ করেছেন, তেমন আবার শহরের বৃক্ষলতার অভাব, বাড়িঘরের কুৎসিত ও জঘন্য চেহারা এবং এমনকি শহর-পরিকল্পনার বিভিন্ন অসঙ্গতি— এগুলো সম্পর্কেও যথাযথ মন্তব্য প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। তারিউ তার নিজস্ব বিবরণের ফাঁকে ফাঁকে ট্রামে, বাসে বা রাস্তাঘাটে শোনা শহরের লোকদের কিছু কিছু কথোপকথনও লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু সাধারণত সেগুলোর সঙ্গে তিনি কখনও তার নিজের কোনো মন্তব্য যোগ করেননি। এ ব্যাপারে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায় আরও পরের দিকে গিয়ে। ক্যাস্পস নামের একজন লোক সম্পর্কে দুজন ট্রাম কন্ডাকটরের কথাবার্তার এক বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি সেখানে কিছুটা নিজের চিন্তা এবং মতামত ব্যক্ত করতে চেয়েছেন।

—ক্যাস্পসকে তুমিও চিনতে, তাই না? কন্ডাকটরদেরকে একজন প্রশ্ন করল।

—ক্যাস্পসের লম্বা চেহারা, কালো পুরু গোঁফ সেই ছোকরা?

—আচ্ছা বলো, মনে পড়েছে এবার।

—শুনেছি, সে মারা গেছে।

—তাই নাকি, কবে মারা গেছে?

—ইঁদুর মরার প্রকোপটা শেষ হবার কিছু পরেই।

—সত্যি নাকি? আহা! বেচারার কী হয়েছিল?

—সঠিক বলতে পারব না। সামান্য জ্বর হয়েছিল শুনেছি। অবশ্য শরীর তার কোনো সময় খুব-একটা ভালো ছিল না। শুনেছি বগলে নাকি ফোড়া হয়েছিল। সম্ভবত তাতেই মারা গেছে বেচারা।

—কিন্তু কই, তাকে দেখে তো অন্যদের থেকেও খুব একটা অসুস্থ বলে মনে হত না।

—তেমন যে কিছু একটা কঠিন অসুখ ছিল তা ঠিক নয়। তবে তার বুকটা একটু দুর্বল ছিল, আর তাই নিয়েই সে শহরের ব্যান্ডদলে ট্রাম্পেট বাজাত। কিন্তু জানো তো ওটা বাজাতে গেলে ফুসফুসের ওপর কীরকম চাপ পড়ে।

—হ্যাঁ, ফুসফুস খারাপ থাকলে সেটা অবশ্য অন্য কথা। অতবড় একটা যন্ত্র বাজাতে গেলে ফুসফুসের কিছু কিছু ক্ষতি যে হবে, সেটা তো সত্যি।

এই কথোপকথন লিপিবদ্ধ করার পর, জ্যাঁ তারিউ প্রশ্ন তুলছেন : তার শরীরের পক্ষে অনুচিত জেনেও ক্যাস্পস কেন ব্যান্ডদলে যোগ দিতে গিয়েছিল আর রবিবারের সকালগুলোয় শহরের রাস্তায় রাস্তায় ব্যান্ড বাজিয়ে প্যারেড করে বেরিয়ে নিজের জীবনকে এইভাবে বিপন্ন করার পেছনে কী এমন গোপন প্রেরণাই বা ছিল?

তারিউ-র নোটবুক থেকে দেখা যায়, তার জানালার সামনে রাস্তার অপরপারে এক ব্যালকনিতে প্রতিদিন যে এক অদ্ভুত দৃশ্য ঘটত তা দেখে তিনি মনে-মনে বেশ কৌতুক অনুভব করতেন। হোটেলে তার ঘরের সামনে নিচে চোখে পড়ত একটা ছোট গলিপথ। সেখানে সবসময় দেখা যেত বেশ কিছুসংখ্যক বেড়াল দেয়ালের ছায়ায় পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। প্রতিদিন দুপুরের খাওয়ার ঠিক পরেই যে-সময়টা বেশির ভাগ লোক ঘরের ভিতর একটু বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করে ঠিক তখন রাস্তার অপরপারের ব্যালকনিতে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বেরিয়ে আসতে দেখা যেত। হাবভাবে কিছুটা সৈনিকদের মতো, দেহটাকে সবসময় রাখেন তীর্যক টান টান করে, পোশাক-পরিচ্ছদও পরেন সৈনিকদের অনুকরণে, মাথার দরদরে সাদা চুলগুলোকে সম্পূর্ণভাবে আঁচড়ে পাট করে রাখেন সারাক্ষণ। প্রতিদিন বরাবর এই সময় ব্যালকনির সামনে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে তিনি ডাকতেন—পুষি, পুষি। গলার স্বর যেমনি স্নেহপূর্ণ তেমনি কঠিন। বেড়ালগুলো নিদ্রাজড়িত ম্লানচোখে মিটমিট করে তার দিকে চাইতে থাকে, কিন্তু নড়াচড়ার কোনোরকম লক্ষণ দেখা যেত না তাদের ভেতর। এইবার তিনি খানকতক টুকরো কাগজ নিয়ে সেগুলোকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ছুড়ে দিতেন নিচে রাস্তার দিকে। সাদা রঙের অসংখ্য প্রজাপতির মতো উড়তে উড়তে নিচে নামতে থাকত টুকরোগুলি আর তাই দেখে বেড়ালগুলি উৎকর্ণভাবে এগিয়ে যেত টুকরোটা মাটিতে না-পড়া অবধি। সাবধানে পায়ের থাবা উঁচিয়ে সেগুলোকে আলতোভাবে ধরবার চেষ্টা করত। ঠিক এই অবস্থার মাঝে ভদ্রলোক একমুখ থুতু নিয়ে বেশ খানিক তাক করে ছুড়ে দিতেন নিচের বেড়ালগুলোর দিকে, থুতুর ছিটে তাদের দেহে গিয়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠতেন।

সবশেষে মনে হয় ড্যাঁ তারিউ এই শহরের পুরোপুরি ব্যবসায়িক চরিত্র লক্ষ করে কেমন একেবারে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। কারণ এখানকার বাহ্যিক পরিবেশ, কাজকর্মের ধারা, আমোদ-প্রমোদ, প্রভৃতি—সবকিছুর ওপরই দেখা যায় শুধু শহরের এই-যে অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য, ঠিক এই কথাগুলো তারিউ ব্যবহার করেছেন তার নোটবুকে। একে তিনি সত্যি অন্তরের সঙ্গে অনুমোদন করেন এবং বাস্তবিকই এ সম্পর্কে তার উচ্ছ্বসিত প্রকাশ করতে গিয়ে এক মন্তব্যের শেষে মহাউল্লাসের সঙ্গে তিনি বলেছেন—সত্যিই তা হলো?

এই সময়কার বিবরণের ভেতর শুধুমাত্র এই অনুচ্ছেদগুলোতে মনে হয় কিছু কিছু তার ব্যক্তিগত চিন্তা এবং অভিমত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাদের সত্যিকারের তাৎপর্য যে কী এবং তাদের পেছনে সত্যিই লেখকের নিজের কোনো আন্তরিকতা আছে কিনা, সাধারণ পাঠের সময় তা পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রথমত তার হোটেলে প্রথম বেলিং আকস্মিক একটা মরা ইঁদুর দেখতে পাওয়া যায়, সেদিন হোটেলের ক্যাশিয়ার বিল লিখতে গিয়ে কীভাবে তাতে ভুল করে বসে, নোটবুকে তার পূর্ণ বিবরণ দেওয়ার পর, ড্যাঁ তারিউ সেখানে আরও কিছু কিছু ব্যক্তিগত বক্তব্য যোগ করেছেন :

প্রশ্ন : সময়ের অপচয় বন্ধ করার উপায় কী?

উত্তর : অনুক্ষণ সে-সম্পর্কে সচেতন থাকা। কিন্তু সচেতন থাকার উপায় কী? দাঁতের ডাক্তারের চিকিৎসালয়ে যেমন অস্বস্তিকর চেয়ার পাতা থাকে তাতে বসে অপেক্ষা করে দিন কাটিয়ে দেওয়া, রবিবারের সারাটা বিকেল নিজের ব্যালকনিতে আটকা পড়ে থাকা, যে ভাষা নিজের জানা নেই তেমন কোনো ভাষায় বক্তৃতা শোনা, সবচেয়ে অসুবিধাজনক এবং দীর্ঘ রেলপথে যাতায়াত করা এবং সমস্তটা পথ গাড়ির ভেতর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার পর শেষপর্যন্ত টিকিট না-কেনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার এইসব খামখেয়ালি চিন্তা এবং ভাষার অসংলগ্ন প্রকাশ নোটবুকে যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক তার পরেই দেখা যায় শহরের ট্রামগাড়ি সম্পর্কে নানান খুঁটিনাটি সমেত দীর্ঘ এক বর্ণনা। প্রত্যেকটা গাড়ির গঠন, তাদের অনির্দিষ্ট রং, ভেতরের পরিবর্তনহীন অপরিচ্ছন্নতা একই বেশ—কোনোটারই উল্লেখ বাদ পড়েনি। এদের দীর্ঘ আলোচনার শেষে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন : বড় অদ্ভুত। কিন্তু তার এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের দ্বারা তিনি যে কী বলতে চেয়েছেন তা অনুমান করা শক্ত। ইঁদুর মরার এই সব ব্যাপারটা নিয়ে ড্যাঁ তারিউ যা-কিছু মন্তব্য করেছেন তার কিছু কিছু পরিচয় নিচে দেওয়া হল :

"রাস্তার ওপারের ব্যালকনির বুড়ো লোকটিকে আজ কেমন নিরাশ দেখলাম। বেড়ালগুলোকে কোথাও দেখছিনে আজ আর। রাস্তার ওপর চারদিকে মরা ইঁদুর ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে ওদের শিকারি-স্বভাব চাড়া দিয়ে উঠেছে হয়তো। যাহোক আজ ওরা সব অদৃশ্য হয়েছে। আমার বিশ্বাস তারা যে মরা ইঁদুর খাবে এরকম ধারণা

মনে আসাই সম্ভব নয়। নিজের বেড়ালগুলোকেও দেখেছি, মরা ইঁদুর দেখে তারা নাকি সিঁটিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিল। তবে এমন হতে পারে আজ হয়তো তারা মাটির তলার ভাঁড়ারে ইঁদুর ধরতে ব্যস্ত। আর তাতেই বুড়ো ভদ্রলোকের আজ অমন দুরবস্থা। চুলগুলো অন্যদিনের মতো তেমন মসৃণ করে আঁচড়ানো নয়, মনটাও কেমন ঝিমিয়ে পড়া-পড়া, সৈনিকের সেই ভাব-ভঙ্গি নেই আজ আর চেহারায় কোথাও। দেখলেই অনুমান করা যায় তিনি মনে-মনে বেশ উদ্বিগ্ন। মিনিট কয়েক অপেক্ষা করেই আবার ঘরে ফিরে গেলেন। ফেরার আগে আজও রাস্তার দিকে থুথু ছুড়লেন, কিন্তু আজ তা গিয়ে পড়ল শূন্য রাস্তার মাঝে। শহরের মাঝপথে হঠাৎ আজ একখানা চলন্ত ট্রামকে থামিয়ে দিতে দেখলাম, কারণ তার ভেতর নাকি একটা মরা ইঁদুর পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন : মরা ইঁদুর ট্রামের ভিতর আসল কীভাবে?

ট্রামটা থামলেই দু-তিনজন মেয়েছেলেকে চটপট নেমে পড়তে দেখলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার ট্রামটা যথারীতি চলতে শুরু করল।

হোটেলে রাতে পাহারা দেয় যে-লোকটা, ওর বুদ্ধিশুদ্ধি দেখেছি বেশ ভালো। সে সেদিন বেশ জোর দিয়েই বলল : দলে দলে এইভাবে ইঁদুর বার হয়ে আসার অর্থ হচ্ছে নিশ্চিত কিছু একটা বিপদ ঘটতে যাচ্ছে। যখন জাহাজ থেকে এইভাবে ইঁদুর বার হতে থাকে, লোকে কী বলে শোনেননি? বললাম—জাহাজের বেলায় যা সত্যি, শহরের মাঝেও ঠিক তাই ঘটতে পারে। এমন তো এখনও দেখিনি। কিন্তু দেখলাম দারোয়ান তার নিজের মতটাকেই আঁকড়ে রইল। তাকে এবার জিজ্ঞাসা করলাম, কী ধরনের বিপদ ঘটতে পারে বলে সে আশঙ্কা করছে। উত্তরে সে বলল, তা কী করে সে বলবে। সব বড় বিপদই তো হঠাৎ করে ঘটে যায়। তবে এখন যা অবস্থা তাতে যদি মস্ত ভূমিকম্পের মতো কিছু ঘটার সম্ভাবনাও দেখা যায় তাতেও সে বিস্মিত হবে না। স্বীকার করলাম তেমন একটা কিছু ঘটাটা হয়তো অসম্ভব কিছু না। এবার সে আমাকে প্রশ্ন করল, এরকম একটা সম্ভাবনার কথা চিন্তা করলে আমার মনে আশঙ্কা জাগে কিনা। বললাম, মনে-মনে আমি তো একটা জিনিস কামনা করি, যতদূর সম্ভব মানসিক শান্তিতে থাকতে চাই। মনে হল সে অনুমান করতে পারল আমার মনের ভাবটা।

একটা পরিবারকে প্রতিদিন আমার হোটেলে খেতে আসতে দেখি। বড় অদ্ভুত লাগে ওদের আমার চোখে। পরিবারের কর্তার পাতলা দীর্ঘ দেহ, পরনে প্রতিদিনই দেখি একই কালো কোটপ্যান্ট, কড়া ইস্ত্রি দেওয়া কড়কড়ে কলার, মাথার সারা উপরিভাগটা জুড়ে তার পেছনেই এক টাক—শুধু দুপাশে ঝুরঝুরে কয়েকগাছি করে চুল। খুদে খুদে চোখ, পাতলা ছুঁচালো নাক, আর লম্বাটে দৃঢ় সংবদ্ধ মুখ—এসব মিলিয়ে ভদ্রলোককে দেখতে অনেকটা সযত্ন পালিত প্যাঁচার মতো। সবসময় তাকে প্রথম দেখি হোটেলের দরজায়, ভেতরে ঢোকার পথ ছেড়ে দেন। তারপর সামান্য একটু পাশে সরে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে প্রথম ভেতরে ঢোকার পথ ছেড়ে দেন। স্ত্রীর চেহারা অত্যন্ত ছোটখাটো, অনেকটা কালো জাতের ইঁদুরের মতো দেখতে তাকে। ভেতরে ঢোকেন তিনি প্রথম, তারপর স্বামী ভদ্রলোক, আর তাকে পায়ে-পায়ে অনুসরণ করে পরপর ঢোকে একটা বাচ্চাছেলে, আর একটা বাচ্চামেয়ে। ওদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলে মনে হবে, ঠিক যেন একজোড়া কলের পুতুল। আবার টেবিলের সামনে ভদ্রলোক

দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন। প্রথমে বসেন স্ত্রী, তারপর অনেকটা দাঁড়ে বসার মতো করে নিজের নিজের নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দুজন, আর সবার শেষে ভদ্রলোক নিজে। ভদ্রলোককে কোনোদিন পরিবারের কাউকে আদর বা স্নেহ করতে দেখিনি। স্ত্রীর সঙ্গে সাধারণত যখন কথা বলেন, দেখি গলার স্বর বেশ ভদ্র কিন্তু যেন খানিকটা রুক্ষও। বাচ্চাদের সম্পর্কে যখন যা তার মনে উদয় হয়, রূঢ়ভাবে তাদের মুখের ওপর বলে দেন।

—নিকল তোমার ব্যবহারে লজ্জা পাচ্ছি।—শাসনের সুরে একদিন তাকে বলতে শুনলাম। তিরস্কার শুনে বাচ্চামেয়েটার দুচোখ ছলছলিয়ে উঠল, সেই অবস্থায় হয়তো সেটাই স্বাভাবিক ছিল।

আজ সকালে দেখলাম ইঁদুর মরার ব্যাপার নিয়ে বাচ্চাছেলেটা কেমন যেন একটু বেশিরকম উত্তেজিত, এ-সম্পর্কে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সে।

—ফিলিপস, তোমার বোঝা উচিত খাবার টেবিলে বসে কেউ ইঁদুর-মরার কথা আলোচনা করে না। আজ নিষেধ করে দিচ্ছি ভবিষ্যতে আর কোনোদিন ওসব মুখে আনবে না। মনে থাকবে তো?

—তোমার আব্বার কথাই ঠিক। ইঁদুরসদৃশ মহিলা স্বামীর পক্ষ সমর্থন করে ছেলেকে উপদেশ দিলেন।

খুদে পুতুলসদৃশ ছেলে-মেয়েদুটো যতদূর সম্ভব তাদের খাবার প্লেটের উপর ঝুঁকে পড়ে নিজেদেরকে আড়াল করতে চাইল। আর পেঁচক সাহেব উদাসীনভাবে নিজের মাথাটাকে সামান্য নুইয়ে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন যেন।

সহজ আচরণের পরাকাষ্ঠার এমন নিদর্শন সত্ত্বেও শহরের সবাইকেই আজকাল দেখি ইঁদুর-মরা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। 'শহর প্রসঙ্গ' নামে দৈনিক পত্রিকায় নির্দিষ্ট যে একটা স্তম্ভ থাকে যাতে সাধারণত শহরের বিচ্ছিন্ন খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা থাকত, সেই পুরো স্তম্ভটা জুড়ে আজকাল বেরোয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ। আমাদের নগরপিতারা কি সচেতন যে ইঁদুরের গলিত দেহ শহরের জনস্বাস্থ্যের পক্ষে কী ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক?

হোটেলের ম্যানেজারকেও আজকাল আর বড় একটা অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুনিনে। অবশ্য তার একটা ব্যক্তিগত অনুযোগ আছে—তার তিন-তারা চিহ্নিত এতবড় এই হোটেলের লিফটে পর্যন্ত যখন মরা ইঁদুর পাওয়া গেছে তখন সবকিছু যে একটা অনিবার্য অনিশ্চিতের দিকে এগিয়ে চলেছে সেটা সুনিশ্চিত। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য একদিন বললাম—এটা নিশ্চয় আপনি অনুমান করতে পারেন যে সবার অবস্থাই এখন এক—আমরা সবাই এখন এক নৌকার যাত্রী।

—তা হয়তো ঠিক, তিনি উত্তরে বললেন, এখন আমাদের একজনের থেকে অন্যের অবস্থার আর কোনো তফাৎ নেই।

এই অদ্ভুত রোগটির কথা তিনি আমাকে প্রথম জানান, যা নিয়ে দেখছি এখন সবার মনেই বেশকিছুটা আতঙ্ক জেগেছে। হোটেলের একজন পরিচারিকাকে শুনেছি এই রোগে ধরেছে।

—কিন্তু রোগটা ছোঁয়াচে নয় বলেই আমার বিশ্বাস।—আমাকে আশ্বাস দেবার

জন্য তাড়াতাড়ি যোগ করলেন ভদ্রলোক।

—তাতে আমার নিজের তেমন কিছু যাবে আসবে না। তাকে জানালাম।

—আচ্ছা বুঝেছি, এবার তিনি বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন—আপনিও দেখছি আমার মতো অদৃষ্টে বিশ্বাস করেন।

—আমি কিন্তু এই ধরনের কিছুই বলিনি, আর তা ছাড়া সত্যই অদৃষ্টবাদী নই। যা নিয়ে তখন শহরের অধিবাসীদের রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল তাই আমি তাকে বললাম..."

এরপর থেকে তারিউর নোটবুকের যা-কিছু লেখা সেগুলো হচ্ছে এই অদ্ভুত রোগ, যা নিয়ে তখন শহরের অধিবাসীদের রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল তারই সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ। ইঁদুর সম্পূর্ণ অদৃশ্য হওয়ায় খুদে বুড়ো ভদ্রলোক তার থুতু-নিক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু বেড়ালগুলোকে আবার ফিরে পেয়েছেন এবং এখন তিনি থুতু-নিক্ষেপের কৌশলটাকে পুরোপুরি নিখুঁত করবার জন্য গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন—নোটবুকে এই মন্তব্য লেখার পরপরই তিনি যোগ করছেন—ডজন খানিক বা তারও কিছু অধিক সংখ্যক এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে এবং তাদের সবারই মৃত্যু ঘটেছে।

জাঁ তারিউ তার নোটবুকে ডাক্তার রিও-র সম্পর্কে যে-বর্ণনা দিয়েছেন তা এরপরেই যে-ঘটনা বিবৃত করা হবে তার ওপর কিছুটা আলোকসম্পাত করতে পারে, সুতরাং উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করে তা এখানে উদ্ধৃত করা হল। বয়স চোখের হিসাবে পঁয়ত্রিশ, দৈহিক উচ্চতা মাঝারি, চওড়া কাঁধ, মুখাবয়ব আয়তাকার, দৃষ্টি অচঞ্চল। চোয়ালজোড়া উঁচু, নাক হঠাৎ দেখতে একটু বড়, কিন্তু সুগঠিত, চুল কৃষ্ণবর্ণ, ছোট ছোট করে ছাঁটা; মুখ সবসময় বাঁকানো; ঠোঁটজোড়া পুরু, অস্বাভাবিক রকমের দৃঢ় সংবদ্ধ, গায়ের রং তামাটে; হাত ও বাহু ভর্তি কালো ঘন লোম; পরনে নিয়ত দেহের সাথে সুন্দরভাবে মানানো কালো পোশাক; দেখলে সিসিলির কৃষকদের কথা মনে পড়ে যায়।

হাঁটেন দ্রুতপায়েই, বড় রাস্তায় বেরুবার সময় পেভমেন্ট থেকে যখন রাস্তায় নামেন, চলার গতি পরিবর্তন হয় না। কিন্তু অপরপারে গিয়ে আবার পেভমেন্টে ওঠার সময় প্রতি তিনবারের ভেতর অন্তত বারদুয়েক দেখা যায় একটু লাফিয়ে ওঠেন। অত্যন্ত অন্যমনস্ক প্রকৃতির তিনি, যখন গাড়ি চালান, মোড় ঘোরার পরও দেখা যায় সিগন্যালের আলো জ্বলতেই থাকে। মাথায় সাধারণত কিছুই পরেন না। মোটামুটি জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলেই মনে হয়।

৪

জাঁ তারিউ মৃতের যে-সংখ্যার উল্লেখ করেছিলেন সেগুলো কিন্তু সত্যি ছিল। ঘটনাগুলো যে ভয়ংকর রকমের বিশ্রী কিছু একটা পরিণতির দিকে মোড় নিয়েছে, সে ব্যাপারে ডাক্তার রিও-র যতখানি সচেতন থাকা উচিত ছিল তা তিনি ছিলেন।

দারোয়ান মিশেলের মৃতদেহটা যাতে হাসপাতালে পৃথক ওয়ার্ডে রাখা হয় তার ব্যবস্থা করার পর তিনি ডাক্তার রিচার্ডকে টেলিফোন করেন, তার কাছে জানতে চান ইতিমধ্যে এই ধরনের যেসব রোগী তিনি দেখেছেন তা থেকে রোগটা সম্পর্কে তার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা জন্মেছে কি না।

—না, এখনও পর্যন্ত তেমন কিছুই অনুমান করে উঠতে পারিনি। ডাক্তার রিচার্ড স্বীকার করেন—ইতিমধ্যে আমার হাতে দুজন রোগী মারা গেছে, একজন আটচল্লিশ ঘন্টা আর একজন তিনদিন পর। কিন্তু দ্বিতীয় রোগীটিকে প্রথম দেখার পরের দিন যখন আবার দেখতে যাই, সবকিছু লক্ষণ দেখে পরিষ্কার ধারণা হয়েছিল, সে আরোগ্যর দিকেই যাচ্ছে।

—এই ধরনের অপর কোনো রোগী যদি হাতে পান অনুগ্রহ করে আমাকে একটু খবর দেবেন। ডাক্তার রিও বললেন।

পরে আরো দুএকজন সহকর্মীর সঙ্গেও তিনি টেলিফোনে আলাপ-আলোচনা করেন। এইসব খোঁজখবর নেবার পর মোটামুটি যা তিনি জানতে পারেন, তাতে দেখা যায়, গত কয়েক দিনে শহরে জন-বিশেকের মতো এই একই ধরনের রোগী পাওয়া গেছে এবং তাদের প্রায় সবারই মৃত্যু ঘটেছে।

ডাক্তার রিও এবার শহরের মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ডাক্তার রিচার্ডকে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, এরপর থেকে এই ধরনের কোনো রোগী পাওয়া গেলে তাদের যেন হাসপাতালে পৃথক ওয়ার্ডে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

—মাফ করবেন। ডাক্তার রিচার্ড জওয়াবে বললেন—এতে আমার করার কিছুই নেই। একমাত্র জেলা শাসন কর্তৃপক্ষেরই এই নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা আছে। আর তাছাড়া এই রোগ যে সত্যি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, সেটা আপনি অনুমান করেছেন কী দেখে?

—না, তেমন সুস্পষ্ট কোনো কারণ অবশ্য এখনও পাইনি। তবে চারদিকে লক্ষণ যা-কিছু দেখছি, তা থেকে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা সত্যি আতঙ্কজনক।

ডাক্তার রিচার্ড আবার তার পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, এই ধরনের একটা কিছু করা সম্পূর্ণ তার এখতিয়ারের বাইরে। তবে ব্যাপারটাকে তিনি হয়তো জেলা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে পারেন—এই যা।

ডাক্তাররা তখনও ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের ভেতর আলাপ-আলোচনা করছিলেন। ইতিমধ্যে শহরের আবহাওয়া যেন আরও খারাপ হয়ে পড়েছিল। বুড়ো মিশেলের যেদিন মৃত্যু হয় তার ঠিক পরের দিন গোটা আকাশ হঠাৎ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। পরপর কয়েকবার বেশ কিছুক্ষণ ধরে মুষলধারে বৃষ্টিও হল। কিন্তু প্রত্যেকবারই বৃষ্টির ঠিক পরের কয়েক ঘন্টা সময়ের আবহাওয়া মনে হল কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের গরম এবং আর্দ্র। সমুদ্রের চেহারা পর্যন্ত যেন বদলে গেল। পূর্বের স্বচ্ছ কোমল নীলের শান্ত উজ্জ্বলতা আর রইল না। এখন ঝুঁকে-পড়া মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে সমুদ্রকে দেখতে হল ইস্পাত-বাক্সের মতো তীক্ষ্ণ বা উজ্জ্বল, যার ওপর হঠাৎ চোখ পড়লে দৃষ্টি ধাঁধিয়ে যায় যেন। বসন্তের এই অস্বাভাবিক আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠল সবাই,

নির্মল উত্তপ্ত গ্রীষ্মের আবহাওয়ার জন্যে হাপিত্যেশ করতে থাকল। চারদিকে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন; এক অধিত্যকার মধ্যে অবস্থিত অনেকটা শামুকের খোঁয়ের মতো দেখতে এই শহরের সর্বত্রই কেমন একটা নিস্পৃহ ভাব, মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল দেয়াল। রাস্তার দুপাশের ধুলামলিন দোকানের সারির ভেতর দিয়ে চলবার সময় হোক বা ঠিক তেমনি ধুলামলিন হলুদ ট্রামে চেপে শহরে বেরুবার সময় হোক, এখন মনের ভেতর শুধু একটা অনুভূতিই জাগে যে শহরের আবহাওয়ার ফাঁদের ভিতর যেন আটকা পড়ে গেছে সবাই। শুধু ডাক্তার রিও-র সেই স্পেনদেশীয় রোগীর কাছে আবহাওয়ার এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ছিল অন্যরকম। সে যেন মনেপ্রাণে এমনি একটা কিছুই চাইছিল।

— মনে হয় যেন, ভেতরে ভেতরে সিদ্ধ করে ফেলছে, সে বলতে লাগল— তবে হাঁপানির রোগীদের জন্য ঠিক এমনি আবহাওয়ারই দরকার।

'সিদ্ধ করে ফেলছে' যে সেটা অবশ্যই সত্যি, তবে দেহে অতিরিক্ত জ্বর থাকলে যেমন হয় এখানে ঠিক তেমনি। বাস্তবিকই সারাটা শহরের লোক যেন জ্বরে ভুগছিল। যেদিন কটার্ডের আত্মহত্যার চেষ্টা সম্পর্কে তদন্তের কাজে পুলিশকে সাহায্য করার জন্যে ডাক্তার রিও যখন নিজের গাড়িতে রিউ ফ্যাদার্ভে দিকে যাচ্ছিলেন সেই সময়টাই অন্তত এইরকম একটা ধারণাকে তিনি যেন কিছুতেই মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারছিলেন না। তার এই ধারণাটা যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত তা তিনি বুঝতেন এবং এটাও বুঝতেন যে এর কারণ হচ্ছে তার মানসিক অবসাদ উদ্বেগ, কারণ সেই মুহূর্তের মতো বরাবর তারও দুশ্চিন্তা কমছিল না। আর সত্যি সত্যিই তখন তার যা অবস্থা তাতে তার জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল গাড়িটাকে কোথাও থামিয়ে দুদণ্ড বিশ্রাম নেওয়া, যাতে স্নায়ুগুলো একটু শান্ত হতে পারে।

রিউ ফ্যাদার্ভে পৌঁছে ডাক্তার রিও দেখলেন, পুলিশের দারোগা তখনও এসে পৌঁছাননি। উপরে উঠার পথে সিঁড়িতে গ্রাঁদের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি দেখালেন তার ঘরের সামনের দরজাটা খোলা রেখে আপাতত কিছুক্ষণ তারা ভেতরে বসে অপেক্ষা করতে পারেন। গ্রাঁদের মাত্র দুখানা ঘর। দুটোতেই প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব সহজেই চোখে পড়ে। দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এমন জিনিসের ভেতর ছিল খান দুই-তিন অভিধান-সাজানো একটা বইয়ের শেলফ এবং একটা ব্লাকবোর্ড, যার ওপর খড়ি দিয়ে লেখা প্রায়-মুছে-যাওয়া দুটো শব্দ তখনও অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছিল।

গ্রাঁদ জানালেন, কটার্ড আগের রাতটা মোটামুটি সুস্থভাবেই কাটিয়েছেন। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে মাথায় খুব যন্ত্রণা অনুভব করছেন, যার ফলে তার মনটা বেশ দমে গেছে। গ্রাঁদকে নিজেকেও দেখে মনে হচ্ছিল তিনি খুব ক্লান্ত এবং কেমন একটু উত্তেজিত। সারাক্ষণ ঘরময় পায়চারি করছিলেন আর তার টেবিলের ওপর লেখা যে পাণ্ডুলিপি ছড়িয়ে পড়েছিল তারই পাতা ভর্তি একটা থলি ও ব্যাগ বারে বারে খুলছিলেন আর বন্ধ করছিলেন।

যাহোক কথার ফাঁকে তিনি একসময় ডাক্তারকে জানালেন, সত্যি সত্যিই কটার্ডের সম্পর্কে তিনি তেমন কিছুই জানেন না। তবে তাঁর বিশ্বাস ছোটখাটো হলেও নিজেদের

মতো করে চলবার মতো আর্থিক সংস্থান কটার্ডের ছিল। আর তাছাড়া কটার্ড সত্যিই বড় অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। সিঁড়িতে হঠাৎ দেখা হলে পরস্পরের সাথে অভিবাদন বিনিময় করা, বহুদিন অবধি এই ছিল তাদের দুজনের সম্পর্ক।

আমার মাত্র দুবার কথাবার্তা হয়েছে তার সঙ্গে। দিনকয়েক আগে একটা রঙিন খড়ির বাক্স কিনে আনছিলাম। হঠাৎ সিঁড়ির চাতালের ওপর সেটা ছড়িয়ে পড়ে যায়। লাল আর নীল দুরঙের খড়ি ছিল তার ভেতর। কটার্ড এমন সময় তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সেগুলো গুছিয়ে তুলতে আমাকে সাহায্য করলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—রঙিন খড়ি দিয়ে কী করবেন?

গ্রাঁদ উত্তরে তাকে জানিয়েছিলেন ল্যাটিন ভাষাটা কিছু কিছু জানতেন একসময়। এখন আবার সেটাকে ঝালিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। ভাষাটা তিনি শিখেছিলেন স্কুলের ছাত্র থাকাকালে, কিন্তু এর ভেতর তার মনটা ভাসাভাসা হয়ে উঠেছে।

—জানেন ডাক্তার সাহেব, শুনেছি ল্যাটিন ভাষাটা কিছুটা আয়ত্ত থাকলে ফরাসি শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়।

সুতরাং গ্রাঁদ এমন প্রত্যেকটি ল্যাটিন শব্দ সাদা খড়ি দিয়ে প্রথমে বোর্ডের ওপর লেখেন, তার ধাতুরূপ এবং শব্দরূপ করার সময় শব্দের যে-অংশটুকুর পরিবর্তন হয় শুধুমাত্র সেই অংশটুকু মুছে ফেলে দিয়ে আবার তিনি কপি করেন নীল খড়ি দিয়ে; আর বাকি যে-অংশটুকুর কোনো পরিবর্তন হয় না সেটুকু পুনরায় লেখেন লাল খড়ি দিয়ে।

কটার্ড আমার এই কথাগুলো সঠিক বুঝতে পেরেছিলেন কিনা অবশ্য বলতে পারব না, তবে তিনি বেশ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং পরে আমার কাছ থেকে একটা লাল খড়ি চেয়েছিলেন তিনি। তার এই খড়ি চাওয়ার ব্যাপারটা তখন আমার কাছে কিছুটা আশ্চর্য লেগেছিল কিন্তু একটা মানুষ যখন চাচ্ছে... । অবশ্য তিনি যে সেটাকে কী কাজে ব্যবহার করতে পারেন তা আমার পক্ষে তখন অনুমান করা সম্ভব ছিল না।

ডাক্তার রিও এবার জানতে চাইলেন দ্বিতীয়বার তাদের ভেতরে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা কী বিষয়ে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একজন কেরানি সঙ্গে করে দারোগা ঘরে এসে ঢুকলেন। বললেন, তদন্তের সূত্রপাত হিসাবে প্রথমে গ্রাঁদের বক্তব্য শুনতে চান তিনি। ডাক্তার লক্ষ্য করলেন, গ্রাঁদ বলার সময় যখনই কটার্ডের প্রসঙ্গে আসছিলেন, বলছিল, "এই হতভাগ্য লোকটি," এমনকি একসময় তাকে একথা বলতে শুনলেন, "তার দুর্জয় সংকল্প"।

কটার্ডের আত্মহত্যার পেছনে সত্যিকারের উদ্দেশ্য কী থাকতে পারে তা নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছিল, গ্রাঁদ নিজের বক্তব্য বলার সময় উপযুক্ত শব্দ চয়নের জন্যে অস্বাভাবিক রকমের একটা খুঁতখুঁতে ভাব দেখাচ্ছিলেন যেন। শেষপর্যন্ত যে-কথাটা তার মনোমতো হয়েছে দেখা গেল তা হচ্ছে "কোনো গোপন বেদনা"। দারোগা সাহেব এবার তাকে প্রশ্ন করলেন, কটার্ডের সাধারণ আচরণের ভেতর এমন কোনো ইঙ্গিত কি তিনি কখনও পেয়েছেন, যা থেকে গ্রাঁদ গোপন বেদনা বলতে যা বোঝাতে চাচ্ছেন, সেই ধরনের কোনোকিছু সত্যিই যে কটার্ডের অন্তরে ছিল তা অনুমান করা যায়?

—গত রাত্রে কটার্ড আমার দরজায় টোকা দিয়ে আমাকে একবার ডাকেন। গ্রাঁদ বললেন—আমার কাছ থেকে একটা ম্যাচের কাঠি চান। ম্যাচের গোটা বাক্সটাই আমি তাকে দিয়ে দিই। তিনি বলেন, আমাকে বিরক্ত করার জন্যে সত্যি তিনি দুঃখিত। তবে যেহেতু আমরা পরস্পরের প্রতিবেশী, তাই তিনি আশা করেন আমি হয়তো এর জন্য কিছু মনে করব না। তার পর আশ্বাস দিয়ে বলেন, ম্যাচবাক্সটা আবার ফিরিয়ে দেবেন। উত্তরে তাকে জানাই বরং সেটাকে তিনি রাখলে বেশি খুশি হব।

দারোগা এবার গ্রাঁদের কাছ থেকে জানতে চাইলেন কটার্ডের আচরণ বা হাবভাবের ভেতর অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছেন কি না।

—তার আচরণের ভেতর অস্বাভাবিক বলে যেটুকু আমার কাছে মনে হয়েছে তা হচ্ছে তাকে দেখলে মনে হত তিনি যেন আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান। কিন্তু তিনিও দেখতেন নিজের কাজ নিয়ে আমি নিয়ত ব্যস্ত থাকি।

গ্রাঁদ এবার হঠাৎ ডাক্তারের দিকে ফিরে যেন কিছুটা সলজ্জভাবে বললেন—একটা ব্যক্তিগত কাজে আমি সত্যই বড় ব্যস্ত। দারোগা এবার বললেন যে তিনি অসুস্থ লোকটাকে দেখতে চান, তার কী বলার আছে শুনবেন।

ডাক্তার রিও ভাবলেন, সাক্ষাতের আগেই কটার্ড যাতে মনে-মনে প্রস্তুত হয়ে নিতে পারেন তার জন্য তাকে কিছুটা সুযোগ দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যখন তিনি তার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, দেখলেন কটার্ড খাটের উপর উঠে বসে আছেন, তার গায়ে রাতে-পরা ধূসর রঙের একটা ফ্ল্যানেলের শার্ট; চোখেমুখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছে, দরজার দিকে উৎকণ্ঠিতভাবে চেয়ে আছেন তিনি।

—পুলিশ এসেছে বোধ হয়, তাই না?

—হ্যাঁ। ডাক্তার রিও বললেন— কিন্তু তাতে কী হয়েছে, আপনি অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? মামুলি কয়েকটা ব্যাপার শেষ হলেই ওরা এক্ষুনি চলে যাবেন। আপনি নিরিবিলি থাকতে পারেন।

কটার্ড উত্তরে বললেন—তার মতে এগুলোর প্রয়োজন ছিল না, সবচেয়ে বড় কথা দারোগা-পুলিশদের তিনি বড় একটা পছন্দ করেন না।

ডাক্তার রিও এবার কিছুটা বিরক্তির ভাব দেখালেন।—আমারও নিশ্চয় তাদের জন্য তেমন কোনো দরদ নেই। যতদূর সম্ভব অল্পকথায় এবং সঠিকভাবে সামান্য কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেওয়া। এই তো যা-কিছু জবাব, তারপরই সব শেষ।

কটার্ড আর কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। ডাক্তার রিও বেরিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু তিনি সবে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, পা বাড়াননি, এমন সময় কটার্ড আবার পেছন থেকে তাকে ডাকলেন। ডাক্তার তার বিছানার কাছে এগিয়ে যেতে কটার্ড তার হাতখানা চেপে ধরলেন।

—অসুস্থ লোকের সাথে নিশ্চয় ওরা কোনোরকম দুর্ব্যবহার করে না—বিশেষ করে আমার মতো লোক যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, তাই না? আপনার কী মনে হয়?

ডাক্তার গভীর দৃষ্টিতে কটার্ডের দিকে চাইলেন কিছুক্ষণ। তারপর আশ্বাস দিয়ে

বললেন—এ ধরনের কোনো ব্যবহারের প্রশ্ন উঠতে পারে না।

আর তাছাড়া তিনি নিজে সেখানে রয়েছেন শুধুমাত্র তার রোগীর যাতে কোনোরকম অনিষ্ট না ঘটে তা দেখার জন্য। কথাগুলো শোনার পর মনে হল কটার্ড যেন সুস্থ বোধ করলেন। ডাক্তার দারোগাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বেরিয়ে আসলেন।

গ্রাঁদ সাক্ষী হিসাবে যা যা বলেছিলেন, সেগুলো তাকে পড়ে শোনাবার পর দারোগা কটার্ডের কাছে জানতে চাইলেন—তার আচরণের পেছনে সত্যিকারের উদ্দেশ্য কী ছিল। কটার্ড দারোগার দিকে না তাকিয়ে উত্তরে শুধু বললেন গ্রাঁদের 'গোপন বেদনা' এই কথাটার দ্বারা তার তখনকার যা মনের ভাব তার সবখানিই প্রকাশ পেয়েছে।

দারোগা এবার কিছুটা ধমকের সুরে তাকে বললেন, ভবিষ্যতে আবার এই ধরনের কোনোকিছু করার ইচ্ছে আছে নাকি তার?

কটার্ড আগের চেয়ে বেশ খানিকটা সহজ ভাব দেখিয়ে জবাবে বললেন—নিশ্চয়ই না। এখন আমার যা-কিছু কামনা তা হচ্ছে কোনোপ্রকারে একটু শান্তিতে থাকতে পারা।

—শুনুন, শুনুন, দারোগা তাকে থামিয়ে দিয়ে রুক্ষভাবে বললেন—আপনি কি এটুকু বোঝেন না যে আপনিই আমাদের সবার জন্যে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

ডাক্তার রিও চোখের ইশারায় দারোগাকে থামতে বললেন। দারোগাও চুপ করে গেলেন।

—দেখুন তো, মিছামিছি পুরো একটা ঘন্টা সময় নষ্ট হয়ে গেল।—কটার্ডের ঘর থেকে বাইরে আসতেই দারোগা মন্তব্য করলেন।

—বুঝতে পারছেন, শহরে সবার মুখে এখন যে-রোগের কথা শুনছেন তাই নিয়ে আমাদের নানা ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছে।

তিনি এবার ডাক্তারের কাছ থেকে শুনতে চাইলেন এই রোগ থেকে শহরে সত্যি কেমন কিছু বিপদ ঘটার আশঙ্কা আছে কি-না; কিন্তু ডাক্তার রিও তাকে জানালেন সে-সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা শক্ত। এখনকার এই আবহাওয়ার দরুনই এসব কিছু ঘটছে, দারোগা যেন এটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মনে হয়, ব্যাপারটা ঠিক তাই।

আবহাওয়াই যে সবকিছুর মূলে ছিল সে-অনুমানটা হয়তো অনেকখানি সত্যি। এখন যতই বেলা বাড়তে থাকে, যাতেই হাত দেয়া যায়, মনে হয় আঠা-আঠা ঠেকছে। ডাক্তার রিও এক-একজন রোগী দেখে বাসায় ফিরে আসেন আর তার মানসিক উদ্বেগ যেন ক্রমেই বাড়তে থাকে।

সেদিন সন্ধ্যায় শহরের প্রান্তদেশে তার পুরোনো রোগীর এক প্রতিবেশী হঠাৎ বমি করতে শুরু করল। তার দেহে দেখা গেল তখন প্রবল জ্বর; এক হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ চেপে ধরে সে অবিরাম প্রলাপ বকতে লাগল। তার দেহের প্রান্তগুলোকে মিশেলের করছিল, দেখতে দেখতে এমনিতে পাকা ফলের মতো ফেটে গেল সেটা।

ডাক্তার রিও সেদিন বাসায় ফিরে জেলার ঔষধের স্টোরের সদর অফিসে টেলিফোন করলেন। সেদিন তার ডাক্তারির ডাইরিতে এ-সম্পর্কে তিনি যে-মন্তব্য

লিখেছিলেন, তা হচ্ছে—না বলেছিল ওরা। কিন্তু ইতিমধ্যে শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেই একই ধরনের রোগী দেখার জন্যে ডাক্তারের ঘন ঘন ডাক আসতে শুরু হয়েছিল। যেখানেই যান দেখেন রোগীর দেহের গ্ল্যান্ডগুলো ফেড়ে পুঁজ বের করে অমনি পুঁজ আর রক্ত একসাথে ঠেলে বের হয়ে আসতে থাকে। তারপর যতটুকু সাধ্য হাত-পাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে রোগী বিছানায় শুয়ে থাকে। তার দেহের ক্ষতস্থানগুলো দিয়ে সারাক্ষণ রক্ত ঝরে। প্রত্যেকটা রোগীর পা এবং পেটের বিভিন্ন স্থানে কালো চাকা চাকা দাগ ফুটে উঠতে লাগল। মাঝে মাঝে হয়তো গ্ল্যান্ডগুলো থেকে ওঠা বন্ধ হয়, কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যায় আবার সেগুলো ক্ষীণ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগী বিকট শব্দে দুর্গন্ধের ভেতর মারা যেতে লাগল।

ইঁদুর মরার সময় স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোতে দেখা যেত খবরের ছড়াছড়ি। কিন্তু মানুষ মরার ব্যাপারে তাদের কিছুই বলার ছিল না। কারণ ইঁদুর মরত পথে-ঘাটে আর মানুষ মরতে লাগল বাড়ির আড়ালে আড়ালে। সংবাদপত্রের যা-কিছু মারামারি তা শুধু রাস্তাঘাটের ব্যাপার নিয়ে। তবে ইতিমধ্যে সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীরা এ ব্যাপার নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং আলাপ-আলোচনা শুরু করেছিলেন। যতদিন ডাক্তারদের প্রত্যেকের কাছে দুতিনজন করে রোগী এসেছে ততদিন প্রতিষেধক কিছু একটা ব্যবস্থা নেবার কথা চিন্তা করা কারো কাছেই তেমন দরকার বলে মনে হয়নি। কিন্তু প্রয়োজন ছিল শুধু এই সংখ্যাগুলোকে একবার যোগ করে দেখা। তাহলে সবার চোখেই ধরা পড়ত অবস্থাটা সত্যি আতঙ্কজনক।

অল্প কিছুদিনের ভেতর হঠাৎ যেন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে গেল এবং যারাই এই অদ্ভুত রোগের ব্যাপারটা একটু গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে আসছিলেন তারা এবার স্পষ্ট অনুভব করতে পারলেন, রীতিমতো একটা মহামারী শুরু হয়েছে। এমনি যখন অবস্থা, ডাক্তার রিও-র এক সহকর্মী, যিনি বয়সে তার চেয়ে অনেক বড়, ডাক্তার ক্যাসেল আসলেন ডাক্তার রিও-র বাড়িতে দেখা করতে।

—সেটা স্বাভাবিক তো বটেই। তিনি ডাক্তার রিওকে বললেন—রোগটা যে কী তা তো অনুমান করতে পারছ নিশ্চয়ই।

—আমি ওর মৃতদেহ পরীক্ষার ফল কী পাওয়া যায় সেটা দেখার জন্যে অপেক্ষা করছি।

—দ্যাখো, ফল যে কী পাওয়া যাবে তা আমার আগের থেকেই জানা। আর এই মৃতদেহ পরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমার ডাক্তারি জীবনের দীর্ঘ সময় আমি কাটিয়েছি চীনদেশে, বছর-বিশেক আগে প্যারিসেও কিছু কিছু এই একই রোগী দেখেছি। তফাৎ এই যে, সে-সময় কেউ রোগের নামটা উচ্চারণ করতে সাহস করত না। কারণটা অবশ্য সেই চিরন্তন বাধানিষেধ, সাধারণ মানুষ যাতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠতে পারে এমন কিছুই করা চলবে না, তাতে কোনো সুফল পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, আমার একজন সহকর্মী যেমন বলতেন—এ একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার, আমরা সবাই জানি এ রোগ বহুদিন আগেই পশ্চিম ইউরোপ থেকে উধাও

হয়েছে। সবার ধারণা অবশ্য তাই-ই ছিল, শুধু ব্যতিক্রম ছিল তারা, যারা এ রোগে মারা যায়। এ প্রসঙ্গ এখন থাক রিও, রোগটা আসলে যে কী তা তুমিও অনুমান করতে পারো আর আমিও।

ডাক্তার রিও গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। তার দৃষ্টি প্রসারিত ছিল অপারেশন-রুমের জানালার বাইরে উপসাগরের অর্ধবৃত্তাকারে আয়তনকে দূরদিগন্তে ঘিরেছিল যে উঁচু পর্বতশ্রেণি, তারই গায়ে। মাথার ওপর আকাশ সম্পূর্ণ নীল, কেমন একটু স্তিমিত উজ্জ্বল। আকাশের আলো ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে আসছিল। আর তারই সঙ্গে কোমল হয়ে আসছিল আকাশের এই উজ্জ্বলতা।

—দ্যাখো, ক্যাসল— ডাক্তার রিও বললেন—ব্যাপারটা এখনও মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। কিন্তু চারিদিকে লক্ষণ যা-কিছু দেখছ তা থেকে এখন প্রায় সুস্পষ্ট যে প্লেগই শুরু হয়েছে।

ডাক্তার ক্যাসল এবার উঠে দাঁড়ালেন। দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

—কিন্তু জানো, যাওয়ার পথে তিনি বললেন—সবাই কী বলবে? বলবে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল থেকে এই রোগ বহু আগেই উধাও হয়েছে।

—উধাও হয়েছে? একথার অর্থ কী?

ডাক্তার রিও নিজের ঘাড়ে ঝাঁকানি দিলেন একটু।

—হাঁ, আর শুধু তাই নয়, একথাও স্মরণ রাখা উচিত এখনও বিশ বছর পোরেনি। প্যারিসেও...

—ঠিকই তো। তবে হয়তো আমরা এটুকু আশা করতে পারি যে আগের চেয়ে খারাপ কিছু ঘটবে না এবার। দ্যাখো, তবুও ব্যাপারটা যেন বিশ্বাস্য কিছু বলে মনে হচ্ছে না।

৫

'প্লেগ' কথাটা এই প্রথম উচ্চারিত হতে শোনা গেল। কাহিনীর এই পর্যায়ে ডাক্তার রিও যখনই তার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে; কাহিনীকার নিজে—ডাক্তার রিও-র মনে বিস্ময় ও দ্বিধার দ্বন্দ্ব চলছিল—তারই সমর্থনে কিছু বলে নিতে চান। কারণ এই অবস্থায় ডাক্তার রিও-র যেমন মানসিক প্রতিক্রিয়া, সামান্য কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও শহরের অধিকাংশ অধিবাসীর মানসিক প্রতিক্রিয়া ছিল সেই একই। এটা তো সবার জানা ব্যাপার যে, পৃথিবীতে যুদ্ধ যেমন ঘটেছে বারবার তেমনি প্লেগের মহামারীও এসেছে বারবার। অথচ যুদ্ধ বা প্লেগ জাতীয় কিছু একটা দুর্যোগ আকস্মিক। আকাশ থেকে পড়ার মতো যখন আমাদের সামনে এসে দেখা দেয় তখন মানুষের মন বিস্ময় বোধ না করে পারে না। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে শহরের অন্য সব অধিবাসীর মতোই ডাক্তার রিওকেও আকস্মিক এইরকম একটা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সুতরাং তার বর্তমান মানসিক দ্বিধাকে বুঝতে হলে এই বাস্তব অবস্থার কথা খেয়াল রাখতে হবে এবং তার অন্তরে বিশ্বাস ও শঙ্কা এই দুটো পরস্পরবিরোধী অনুভূতির যে

দ্বন্দ্ব চলছিল সেটাকে বুঝতে হলেও এই একই বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

যুদ্ধ যখন আকস্মিক শুরু হয়, লোকে বলে—একটা মস্ত বোকামি; দুদিনেই সব মিটমাট হবে। যুদ্ধ যে একটা চরম নির্বুদ্ধিতা তা হয়তো পুরোপুরি সত্যি, কিন্তু শুধুমাত্র সে-কারণেই কি তা স্থায়ী হতে পারে না? তার নিজের পথে চলার নির্বুদ্ধিতারও যে একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, আমরা অনুক্ষণ আত্মনিমগ্ন না হয়ে থাকলে হয়তো সেটা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।

এ ব্যাপারে আমাদের শহরের অধিবাসীরাও ছিলেন আর সবার মতো, তাদের যা-কিছু ভাবনাচিন্তা তা ছিল তাদের নিজেদেরকে নিয়ে অর্থাৎ তারা ছিলেন মানবতাবাদী, মানুষই যাদের কাছে সব। মহামারীর মতো কিছু একটা যে ঘটতে পারে এটা ছিল তাদের কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার। মানুষের সাধারণ চিন্তাভাবনা বা হিসাববনিকাশ অনুসারে যেসব জিনিস ঘটে, মহামারী তো আর এগুলোর ভেতর পড়ে না। সুতরাং আমরা পরস্পরকে বলি—মহামারী কল্পনার সৃষ্টি, অশরীরী একটা কিছু; বলি একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। দুদিনেই আবার কেটে যাবে।

কিন্তু দুঃস্বপ্ন তো সবসময় ঠিক এমনিভাবে শেষ হয় না। এক দুঃস্বপ্নের যেই শেষ হয়, আসে আর এক দুঃস্বপ্ন। আর তারই মাঝে মানুষের জন্য মৃত্যুর ডাক আসে। প্রথম ডাক আসে মানবতাবাদীদের জন্যে, কারণ তারা সাবধান হওয়াটাকে প্রয়োজন বলেই মনে করেননি। এসব ক্ষেত্রে কাউকেই সাধারণত যেমন দোষ দেয়ার থাকে না, তেমনি আমাদের শহরের অধিবাসীদের দোষ দেবার মতো কিছুই ছিল না। মানুষকে যে বিনীত হতে হয়, সেটাই শুধু তারা হয়তো বিস্মৃত হয়েছিল। তাদের ক্ষেত্রে দোষের যদি কিছু থাকে তো এই-ই এবং তারা ভাবত এখনও বুঝি আগের মতোই সবকিছুই সম্ভব। তাদের মনে আগে থেকেই একটা নিশ্চিত বিশ্বাস জন্ম নিয়েছিল, দুর্যোগ বা মহামারীর মতো কিছু ঘটা অসম্ভব। তাই আগের মতোই চলতে লাগল তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ততা; বাইরে বেড়াতে যাবার উদ্যোগ-আয়োজন—নিজেদের ভেতর নানারকম মতবাদ সৃষ্টি। সুতরাং প্লেগের মতো একটা কিছু, যার আবির্ভাবে মানুষের সমস্ত ভবিষ্যৎটাই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে, তাদের এই বাইরে যাবার আনন্দের বিরতি ঘটতে পারে, এবং হয়তো-বা চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে তাদের এই বিভিন্ন মতবাদের দ্বন্দ্ব, তার অস্তিত্বের কথা তারা চিন্তা করবে কেমন করে? মনে-মনে তারা নিজেদেরকে কল্পনা করত সবকিছু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কিন্তু মহামারী যতদিন আছে এই পৃথিবীতে ততদিন মানুষের জন্যে সত্যিকারের মুক্তি কোথায়?

আর বাস্তবিকই ডাক্তার রিও সেদিন ডাক্তার ক্যাসেলের সামনে স্বীকার করলেন বটে শহরের এখানে-ওখানে গুটিকয়েক লোক আকস্মিক প্লেগে মারা গেছে, কিন্তু তারপরেও মহামারী সম্পর্কে যে একটা আতঙ্ক সেটা যেন অদ্ভুত রকমের অবাস্তব রয়ে গেল। তার সহজ কারণ হচ্ছে এই যে মানুষ যখন ডাক্তার হয়, দৈহিক পীড়া সম্পর্কে তার ধারণা যা হয় তা সম্পূর্ণ নিজস্ব, তার কল্পনাশক্তিও সাধারণ মানুষের চেয়ে কিছু বাড়ে। ডাক্তার রিও তখনও তার অপারেশন-রুমের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিচের

শহরের দিকে চেয়েছিলেন, বাহাত সেখানে এখনও পর্যন্ত কোনো পরিবর্তনের চিহ্ন সুস্পষ্ট নয়। সেদিকে চেয়ে তার মনের ভেতর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেমন যেন একটা অস্পষ্ট সংশয় জাগছিল—কেমন একট মানসিক অস্বস্তি। এই রোগ সম্পর্কে তিনি কোথায় কখন কী পড়েছেন সেগুলো স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন একবার।

শুধু বস্তুগুলোর সংখ্যা যেন স্মৃতির গভীরে থেকে তার মনের ওপর ভেসে এল। মনে পড়ল ইতিহাসে যাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে একরম ত্রিশটা বা তারই কাছাকাছি সংখ্যক বড় বড় মহামারীর ফলে পৃথিবীতে দশকোটি মতো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু দশকোটি মানুষের মৃত্যু তেমন কীই বা ব্যাপার! একজন মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে কিছুদিন কাটাবার পর মৃতমানুষ সম্পর্কে তার সাধারণত আর-কোনো অনুভূতিই থাকে না এবং যেহেতু যাকে মৃত অবস্থায় চোখে দেখিনি এমন কোনো মৃতব্যক্তির বাস্তব অস্তিত্ব অনুভব করা সম্ভব নয়; ইতিহাসের পাতায় দশকোটি মানুষের মৃত্যুর যে-ঘোষণা তা কল্পনার চোখে দেখা খানিকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়া আর কী?

হঠাৎ কনস্টান্টিনোপলের প্লেগের কথা মনে পড়ল ডাক্তার রিও-র, যেখানে প্রোকোপিয়াসের দেয়া বিবরণ অনুসারে একদিনেই দশহাজার লোকের মৃত্যু হয়েছিল। শুধুমাত্র জনসংখ্যা হিসাবে কল্পনা করতে চাইলে, দশহাজার মানুষ একটা বড় আকারের সিনেমাহলের সাধারণ দর্শকের সংখ্যার পাঁচগুণ, আর এই দশহাজার লোকের একত্রে মৃত্যু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে চাইলে এমনি পাঁচটি সিনেমাহলের দর্শকদের বাইরে একত্র করে কাছাকাছি কোনো একটা পার্কে নিয়ে গিয়ে তাদের একত্রে মৃত্যু ঘটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সেইক্ষেত্রে সেই নামহীন মৃতের স্তূপের ভেতর দু-একটা পরিচিত মুখ যোগ করার ব্যবস্থা করাও সম্ভব। কিন্তু এমনি একটা কিছু সত্যিই বাস্তবে ঘটানো কি সম্ভব? আর এমন লোকই বা কোথায় মিলবে যার কাছে দশহাজার মানুষের প্রত্যেকের মুখ পরিচিত। যাই হোক, প্রোকোপিয়াস এবং তার মতো পুরোনো ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে পাওয়া বিবরণের ওপর যে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না, সেটা এখন প্রায় সর্বজনস্বীকৃত ব্যাপার।

সত্তর বছর আগে ক্যান্টনে যে প্লেগ দেখা দেয় তা শহরের অধিবাসীদের ভেতর ছড়িয়ে পড়ার আগে তাতে চল্লিশ হাজার ইঁদুর মারা যায়। কিন্তু এখানেও আবার সেই সংশয়, চল্লিশ হাজার মৃত ইঁদুর সঠিকভাবে গণনা করার মতো নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা ক্যান্টনে তখন ছিল কি? যেটুকু সম্ভব ছিল তা হচ্ছে, খুব সাধারণ ধরনের আনুমানিক একটা হিসাব দেয়া। সুতরাং তাতে যে ভুলের সম্ভাবনাও থাকবে প্রচুর সেটা আর এমন বিচিত্র কী!

—আচ্ছা ধরা যাক, ডাক্তার মনে মনে বললেন—একটা ইঁদুরের দৈর্ঘ্য যদি দশ ইঞ্চি হয় তাহলে চল্লিশ হাজার মরা ইঁদুর পরপর সাজালে যে লাইনটা হবে...।

ডাক্তার হঠাৎ আবার যেন সজাগ হয়ে উঠলেন। অনর্থক নানা কিছু বিপর্যয়ের কল্পনা করছেন তিনি—আর তাও এমন একসময় যখন তা সবচেয়ে অবাঞ্ছিত। মৃত্যুর সংখ্যাও খুবই অল্প, তিনি মনে-মনে বললেন, সুতরাং এতেই তিনি মহামারীর আশঙ্কা করছেন কেন? বর্তমান অবস্থায় হয়তো কিছুটা অধিক সাবধান হওয়ার দরকার এই

যা। রোগের দৃশ্যমান লক্ষণ কী কী, প্রথমত সেগুলোই এখন তাকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে হবে : মনের কেমন একটা হতচেতন ভাব এবং অতিমাত্রায় দৈহিক অবসাদ, গ্রন্থিস্ফীতি, প্রলাপ বকা, অতিরিক্ত পিপাসা, দেহের বিভিন্ন স্থানে কালো চাকা-চাকা দাগ দেখা দেয়া, পেশির অভ্যন্তরে স্ফীত গ্রন্থিগুলো গলে যাওয়া—এখন সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত সম্পর্কে চিন্তা করতে কতকগুলো কথা যেন আকস্মিক ডাক্তারের মনে পড়ল। সঙ্গতভাবেই ডাক্তারির বইতে এই রোগের বিভিন্ন লক্ষণ বর্ণনার শেষে গিয়ে যে-কথাগুলো বলা হয়েছে সেগুলোই এখন তার মনে পড়ল : রোগীর নাড়ি অত্যন্ত দ্রুত ওঠানামা করে... মাঝে মাঝে মনে হয় সম্পূর্ণ থেমে গেছে। এই সময়টায়ই সামান্য নড়াচড়ার ফলে রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে।

ডাক্তার রিও ভাবতে লাগলেন—ঠিকই, এই সময়টাতে রোগীর জীবন থাকে যেন সূক্ষ্ম সুতার ডগায় দোদুল্যমান মস্ত ভারের মতো, তখন সামান্যতম আঘাতেই যে-কোনো বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে। কিন্তু গড়ে প্রতি চারজন লোকের ভেতর তিনজন এমন অধৈর্য হয়ে ওঠে যে এই সময়টায়-যে কোনোরকমে নিজেকে কিছুটা সংযত করে রাখবে তাও তাদের কাছ থেকে আশা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

ডাক্তার রিও-র দৃষ্টি তখনও প্রসারিত জানালার বাইরে শূন্যের মাঝে। বাইরে চারদিকে বসন্তের উত্তাপহীন শান্ত আকাশে স্নিগ্ধ প্রভা, কিন্তু ঘরের ভেতর তখনও পর্যন্ত শুধু 'প্লেগ' এই একটা মাত্র শব্দের চঞ্চল প্রতিধ্বনি নেচে নেচে বেড়াচ্ছিল। এই একটা মাত্র শব্দকে কেন্দ্র করে এই রোগ সম্পর্কে শুধু বিজ্ঞানের দেয়া বিভিন্ন বিশ্লেষণই নয়, সেই একই সঙ্গে নিচের শান্ত শহরের পারিপার্শ্বিকতার সাথে যাদের ক্ষীণতম যোগসূত্র কল্পনা করাও দুষ্কর, এমন সব নানা অবাস্তব সম্ভাবনার কথাও একটার-পর-একটা ডাক্তার রিও-র কল্পনায় যেন আপনা থেকেই উদয় হতে লাগল। জানালার নিচে শহরের চেহারা দেখাচ্ছিল পিঙ্গল ধূসর। এই সময়টাই যেমন স্বাভাবিক, একটা শান্ত কর্মতৎপরতার গুঞ্জন ভেসে আসছিল সেখান থেকে, অস্থির কর্মচঞ্চলতার উচ্চ কোলাহল নয়, কেমন একটা ভারী চাপা গুঞ্জন, একটা সুখময় পরিবেশের শান্ত স্তিমিত কলরব, অবশ্য যদি মেনে নেওয়া যায় যে, যেখানে প্রাণের সজীবতা নেই, সেখানেও গভীর সুখবোধ সম্ভব। শহরে এখানকার এই গভীর শান্ত পরিবেশ এমনই স্বাভাবিক এবং সহজ যে, অতীতের প্লেগ-আক্রান্ত কোনো শহরের প্রতিচ্ছবিকে এর পাশাপাশি কল্পনা করলে সম্পূর্ণ অলীক এবং অবাস্তব বলে মনে হয়।

অতীতের প্লেগ-আক্রান্ত শহরের যেসব বিবরণ তিনি পড়েছেন তা একে একে তার কল্পনায় প্রতিফলিত হতে লাগল। শবদেহ সমাচ্ছন্ন এথেন্স নগরী, আকাশের সীমানা অবধি পরিব্যাপ্ত পূতিগন্ধময় আবহাওয়া—কাক-পক্ষীর কাছেও পরিত্যক্ত সেই শহর; একটার-পর-একটা চীনের শহর যেখানে-সেখানে ঠাসাঠাসি করে স্তূপ-করা অসংখ্য প্লেগের রোগী। দুঃসহ মৃত্যুযন্ত্রণায় মৌন সবাই; ফ্রান্সের মার্সাই শহরে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড গর্তে কয়েদিরা গলিত মৃতদেহ নিক্ষেপ করছে, শবদেহ স্তূপাকার হয়ে দ্রুত ভরে তুলছে গর্ত; প্রভে শহর প্লেগের দ্বারা দূষিত উন্মুক্ত বায়ুর গতিপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য দ্রুত গড়ে তোলা হচ্ছে এক সর্ববৃহৎ প্রাচীর; কন্সটান্টিনোপল, কুষ্ঠ আশ্রমের

গলিত শবদেহ, যেগুলোক বিভিন্ন গৃহে
মেঝেয় শতচ্ছিন্ন খড়ের গদির ওপর অসংখ্য স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে; কৃষ্ণ মৃত্যুর
বিছানা থেকে আঁকশির সাহায্যে টেনে এনে রাস্তায় রাস্তায় নানা বর্ণের মুখোশ-পরা
করলে পতিত ইউরোপের বিভিন্ন শহর, বেরিয়েছে তারা; মিলান শহর,
ডাক্তারদের দৃশ্য দেখলে ভ্রম হয় যেন উল্লাস-অভিযানে প্রতি উদাসীন নরনারী
প্লেগের প্রকোপে সন্ত্রস্ত, নিশ্চয়তাবিহীন জীবনের ন্যায়নীতির লন্ডন শহর—শুধু
কবরস্থানেও সঙ্গমরত। দৈত্যপুরীর মতো পরিত্যক্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন—সর্বত্র দিবারাত্রি
রাস্তায় রাস্তায় শবদেহবাহী শকটের নিরন্তর গড়গড় শব্দ প্রতিধ্বনিত। কিন্তু না, এত
সারাক্ষণ শুধু দুঃসহ মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর মানুষের চিরন্তন ক্রন্দনধ্বনি প্রশান্ত পরিবেশের
কিছু বিভীষিকা চিন্তার পরও যেন সেদিনের বসন্ত অপরাহ্নের সেই
মাঝে এসময় মৃদুতম শিহরণ কল্পনা করাও অসম্ভব।
যান্ত্রিক শব্দ ভেসে

হঠাৎ জানালা দিয়ে বাইরে দ্রুত চলমান এক অদৃশ্য ট্রামের ভিতর গড়ে
এল। নিষ্ঠুরতা এবং অসহায় দুর্দশার যে চিত্র তিনি এতক্ষণ ধরে মনের সমাকীর্ণ
তুলছিলেন, এ যেন তারই বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। বর্ণবৈচিত্র্যময় বাড়িঘর উপসাগর, শুধু
শহরের পশ্চাতের পটভূমি রচনা করেছে কলস্বর মুখরিত যে ভাস্বর বহন করে
সেই যেন এই পৃথিবীর অনিত্যতা এবং তার আভ্যন্তরীণ বিপর্যয়ের দ্যোতনা লুক্রিটাস
চলেছিল। সাগরের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে দিয়েছেন তার
এথেন্সবাসীদের সমুদ্রতীরে প্লেগ-অগ্নি প্রজ্বলিত করার যে দৃশ্যের বর্ণনা আত্মীয়-পরিজনের
কথা মনে পড়ল ডাক্তার রিও-র। রাতের অন্ধকারে নিজের নিজের প্রিয়জনকে
মৃতদেহ বহন করে সমবেত হয়েছিল তারা সমুদ্রতীরে। কিন্তু প্রত্যেকের উজ্জ্বল
শুষ্ক শান্তির আশ্রয়ে সমাহিত করার স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। সবার হাতে রক্তাক্ত
শিখার মশাল, ঘোরতর সংঘর্ষ শুরু হল তাদের ভেতর, কারণ প্রত্যেকেই ভেতর
সংগ্রাম করতে প্রস্তুত তবুও প্রিয়জনের মৃতদেহকে সমুদ্রে তরঙ্গ-বিক্ষোভের প্রতিচ্ছবি;
সমর্পণ করবে না। হঠাৎ ডাক্তারের কল্পনায় ভেসে উঠল এরই এক পরিপূর্ণ সমুদ্রের
চিতার আগুনের গায়ে লাল আভার প্রতিফলন পড়েছে সমুদ্রের ওপর, থেকে
জলরাশি নীরব, গাঢ় লাল মদের ন্যায় তার বর্ণ; সংঘর্ষরত জ্বলন্ত মশাল হ্যাঁ,
আগুনের গন্ধের ধোঁয়ায় কুণ্ডলী উঠেছে সোজাসুজি মৌনদর্শী আকাশের দিকে।
এমনি একটা কিছু ঘটা সম্ভবের সীমার বাইরে নয়, তাহলে—!

কিন্তু ভবী অমঙ্গলের এই যেসব অতিরঞ্জিত আশঙ্কা, সুস্থ চিন্তাভাবনার
পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অত্যন্ত অহেতুক বলে মনে হল যেন। প্লেগের নাম উল্লেখ করাটা
যে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে তা হয়তো সত্যি এবং সম্ভবত এও সত্যি ঠিক এই মুহূর্তেও
কিছুসংখ্যক লোক এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং মৃত্যুও ঘটছে তাদের কারুর কারুর।
কিন্তু তা সত্ত্বেও এটাই বা সম্ভব নয় কেন যে এই আক্রমণ আপনা থেকেই থেমে যাবে
বা তাকে সম্পূর্ণ রোধ করা যাবে। তার জন্য হয়তো শুধু প্রয়োজন যাকে স্বীকৃতি দেয়া
উচিত তাকে দৃঢ়মনে স্বীকৃতি দেয়া, কতকগুলো অবাস্তব অলীক কল্পনাকে মনের ভিতর
প্রশ্রয় না দিয়ে যা কর্তব্য তা করে যাওয়া। তাতেই নিশ্চিত প্লেগের উপশম হবে, কারণ
এরকম একটা কিছু যে ঘটতে পারে তা সত্যিই অচিন্তনীয় ব্যাপার। অথবা হয়তো এই

কারণে যে এ-সম্পর্কে যেসব চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে তার বেশির ভাগই হচ্ছে ভুল পথ
অনুসরণ করে। যদি সত্যিই এই আক্রমণের অবসান হয়, সে-সম্ভাবনাই অবশ্য অধিক,
তাহলে নিশ্চয় আবার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসবে। আর যদি তেমন কিছু নাই
ঘটে তাহলে অন্তত এর সত্যিকারের স্বরূপটা যে কী সেটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব
হবে এবং তখন একে বাধা দেবার, এমনকি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবার জন্যে কী
ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তা স্থির করাটাও অনেক সহজ হবে।

ডাক্তার সামনের জানালাটা খুলে দিলেন। বাইরে নিচে শহরের কোলাহল যেন
আরো উচ্ছল হয়ে উঠল। পাশের কোনো এক কারখানা থেকে কলের করাতের একটা
ক্ষীণ খসখস শব্দ ভেসে আসছিল থেকে থেকে। নিজের মন থেকে অহেতুক দুশ্চিন্তার
ভার ঝেড়ে ফেললেন ডাক্তার রিও। জীবনের সত্যিকারের নিশ্চয়তা বলতে যা-কিছু
তা তো এগুলোই, এই-যে প্রাত্যহিক খুঁটিনাটি এদের বাইরের যে অস্তিত্ব সেও সূক্ষ্ম
সুতার ডগায় দোদুল্যমান ভারের মতো বিপর্যয়গ্রস্ত—তুচ্ছ, অনিশ্চিত; তার সম্পর্কে
দুশ্চিন্তা করাটা সময়ের অপচয় মাত্র। আসল কথা হচ্ছে নিজের যেটুকু করণীয়
সেটাকেই ঠিকভাবে করে যাওয়া উচিত।

৬

ডাক্তার রিও-র চিন্তাধারা যখন এমনি কতকগুলো অনিশ্চিত সম্ভাবনার মাঝে আবর্তিত
হচ্ছিল, এমন সময় খবর পেলেন গ্রাঁদ এসেছেন, তার জন্য অপেক্ষা করছেন। স্থানীয়
মিউনিসিপ্যাল অফিসের কেরানি হিসাবে গ্রাঁদের দায়িত্বের কোনো সীমা নির্দিষ্ট ছিল
না। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ... ইত্যাদির সঠিক সংখ্যা সংরক্ষণের জন্যে পরিসংখ্যান
দফতরের কাজেও মাঝে মাঝে নিয়োগ করা হত তাকে এবং কতকটা সেই সূত্রেই গত
কিছুদিন যাবৎ শহরে প্লেগে যেসব মৃত্যু ঘটেছিল, তারও একটা সঠিক সংখ্যা সংগ্রহের
দায়িত্ব পড়েছিল গ্রাঁদের ওপর। কিন্তু যেহেতু গ্রাঁদের স্বভাব হচ্ছে সবসময় মানুষকে
খুশি করা, তিনি নিজে থেকেই ডাক্তারকে বলেছিলেন, প্লেগের মৃত্যুর সর্বশেষ যে
রিপোর্ট তিনি প্রস্তুত করছেন তারই একটা কপি এনে দেবেন তাকে। গ্রাঁদের হাতে
ছিল একশিট কাগজ। তিনি সেটাকে তুলে ধরে নাড়ছিলেন। তার প্রতিবেশী কটার্ড
এসেছিলেন তার সাথে।

—মৃত্যুর সংখ্যা মনে হচ্ছে বেড়েই চলেছে, দেখুন না, গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় প্রায়
এগারোজনের মতো লোক মারা গেছে।

ডাক্তার রিও হাত বাড়িয়ে কটার্ডের একখানা হাত নিলেন নিজের মুঠোয়, তাতে
মৃদু ঝাঁকানি দিতে দিতে কটার্ডকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন বোধ করছেন তিনি
এখন। কটার্ডের কথাগুলো যেন ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলছেন এমনভাবে গ্রাঁদ বললেন,
ওর ধারণা, ওর এখন কর্তব্য একবার নিজে এসে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে যাওয়া,
অহেতুক যেসব ঝামেলার ভেতর ফেলেছিল আপনাকে তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে
নেওয়া। কিন্তু ডাক্তার ততক্ষণে গ্রাঁদের দেওয়া কাগজের শিটখানার ওপর যেসব

সংখ্যা লেখা ছিল তার ওপর দৃষ্টি বুলাতে শুরু করেছিলেন, তার চোখেমুখে ভ্রূকুটির চিহ্ন ফুটে উঠেছিল।

—না, আর দেরি করা নয়, রোগের নামটা পরিষ্কার ঘোষণা করে দেওয়া সম্পর্কে মনস্থির করে ফেলে দেয়া উচিত হবে এখন। শুধু শুধু এতদিন ধরে আমরা নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভাব দেখাচ্ছি। দেখুন, আমার এক্ষুনি একটু ল্যাবরেটরিতে যাওয়া প্রয়োজন, আসতে চান আমার সাথে?

—ঠিকই তো, ঠিকই বলছেন আপনি, গ্রাঁদ সিঁড়ি বেয়ে ডাক্তারের পেছন পেছন নামতে নামতে বললেন—আমার নিজেরও বিশ্বাস কোনো ব্যাপারেই রাখঢাকা না-করাটাই ভালো।

—সত্যিই যে রোগটা কী তা এক্ষুনি অবশ্য বলতে চাইনে। আর তাছাড়া আপনারা জানলেও এমন কিছু লাভ হবে না।

—তা হলে মনে হচ্ছে, গ্রাঁদ মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন—রোগের নাম প্রকাশে সত্যিই কিছু অসুবিধা আছে। ব্যাপারটা ঠিক অতটা সহজ নয়।

ওরা তিনজনে একত্রে প্যালেস দা আর্মাসের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। কটার্ড কিন্তু তখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। রাস্তায় রাস্তায় ইতিমধ্যেই জনসমাগম শুরু হয়েছিল। গোধূলি সময়টা এখানে বড় সংক্ষিপ্ত, সন্ধ্যার আগমন যে আসন্ন ইতিমধ্যেই তা অনুভব করা যাচ্ছিল; দূরে দিগন্তরেখা তখনও সুস্পষ্ট, কিন্তু তারই ওপরে ক্ষীণ অনুজ্জ্বল প্রাথমিক নক্ষত্রও দেখা দিচ্ছিল একটা-দুটো করে। কয়েক মুহূর্তের ভেতর রাস্তার আলোগুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। আকাশের ধূসরতা যেন কিছুটা গাঢ়তর হল, আর সেই একই সঙ্গে গভীরতর হল রাস্তায় জনসমুদ্রের কলগুঞ্জন।

—মাফ করবেন, গ্রাঁদ প্যালেস দা আর্মাসের কোণে এসে পৌঁছাতেই বলে উঠলেন—এবার আমাকে বাসায় ফেরার ট্রাম ধরতে হবে। আমার সন্ধ্যাগুলো বড় পরিবর আর তাছাড়া আমাদের অঞ্চলে যেমন একটা প্রবাদ আছে 'পরের দিনের প্রত্যাশাই...'।

তার নিজের অঞ্চলের গ্রাঁদের নিজের জন্মস্থান মনটেলিমার বিশেষ বাক্যটির উদ্ধৃতি দিচ্ছেন বলে প্রায়ই উল্লেখ করাতো যে গ্রাঁদের একটা বিশেষ অভ্যাস, ডাক্তার রিও ইতিপূর্বেই তা লক্ষ্য করেছিলেন; কিন্তু ঠিক তার পরেই গ্রাঁদের মুখ থেকে যেসব প্রবাদবাক্য শোনা যেত, সেগুলোর বেশির ভাগই হচ্ছে বহুপ্রচলিত মামুলি কতকগুলো কথা মাত্র, যেমন—ছবির মতো সুন্দর স্বপ্নে বিভোর ইত্যাদি।

—উনি যা বলেছেন তা অবশ্য সত্যি, কটার্ড এতক্ষণে মুখ খুললেন—কারণ সন্ধ্যার যাবার পর ওকে বড় একটা নড়তে দেখিনি।

ডাক্তার রিও গ্রাঁদের কাছ থেকে জানতে চাইলেন, তিনি মিউনিসিপ্যাল অফিসের অতিরিক্ত কোনো বিশেষ কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন কিনা। গ্রাঁদ উত্তরে বললেন, না, তা ঠিক নয়, নিজের কিছু কিছু কাজ নিয়ে তিনি বড় ব্যস্ত।

—তাই নাকি? ডাক্তার শুধুমাত্র কথাবার্তা চালু রাখবার জন্যেই যেন মন্তব্য করলেন— কেমন চলেছে আপনার কাজ?

—একটানা ক'বছর ধরেই তো ঐটার পেছনে লেগে রয়েছি; সুতরাং এখন যদি

বলি কিছুই এগুতে পারিনি তাহলে হয়তো আশ্চর্য শোনাবে, তবে কি, তেমন কিছুই যে করে উঠতে পারিনি সেটাও কিছুটা সত্যি।

—আমাদের জানাতে আপত্তি নেই নিশ্চয়, ডাক্তার থেমে গিয়ে বললেন—বলুন তাহলে শুনি, কী করেছেন আপনি এতদিন ধরে?

গ্রাঁদের কানজোড়া ছিল দেখতে বেমানান রকমের বড়, টুপির বাইরে বেরিয়ে থাকত সবসময়। তিনি একহাত দিয়ে মাথার টুপিটাকে টেনে নামিয়ে কানদুটোকে ঢেকে দিলেন, তারপর অস্পষ্ট স্বরে কী একটা মন্তব্য করলেন। ডাক্তার রিও অনুমানে যেটুকু ধরতে পারলেন তার অর্থ দাঁড়ায়—কাজটা হচ্ছে একটা ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্পর্কে। উত্তর দেবার পর গ্রাঁদ দ্রুত হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন, কয়েক মুহূর্তের ভেতরে দেখা গেল, দা লা মার্ন বুলভার্দের দুপাশে যে ছোট ছোট ডুমুরগাছের সারি দেখা যায়, তারই তলা দিয়ে তিনি সংক্ষিপ্ত ত্রস্তপদে এগিয়ে চলেছেন। তারা দুজনে যখন ল্যাবরেটরি গেটের গোড়ায় পৌঁছে গেছেন, কটার্ড বললেন যে ডাক্তার যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে চান। কোনো একটা ব্যাপার সম্পর্কে তার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে চান। গ্রাঁদ মৃতব্যক্তিদের সংখ্যা লেখা যে-কাগজের শিটটা তাকে দিয়েছিল, সেটা তখনও ডাক্তারের পকেটেই ছিল, অন্যমনস্কভাবে সেটাকে নাড়ছিলেন তিনি। কটার্ডকে বললেন, তিনি যদি পরের দিন বাসার রোগী দেখবার সময় এসে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করেন সেটাই হয়তো ভালো হবে। কিন্তু পরক্ষণেই কী ভেবে আবার বললেন, তিনি পরের দিন কটার্ডদের ঐ অঞ্চলে রোগী দেখতে যাবেন; বিকেলে ফেরার পথে তিনি নিজেই বরং কটার্ডের বাসা হয়ে আসবেন।

কটার্ডের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর ডাক্তার লক্ষ্য করলেন, নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি যেন সেই মুহূর্তে গ্রাঁদের কথা ভাবছিলেন, যেন কল্পনা করছিলেন হঠাৎ প্লেগের আক্রমণ শুরু হয়েছে, শহরে বর্তমানে যে আকারে প্লেগ দেখা দিয়েছে ঠিক তেমন নয়; এ থেকে সত্যিই হয়তো তেমন কোনো মারাত্মক বিপদের আশঙ্কা নেই, বরং অতীতের যেসব ভয়ংকর ভয়ংকর প্লেগের বিবরণ তিনি পড়েছেন বা শুনেছেন, তেমনি এক প্লেগের সূত্রপাত হয়েছে, আর তারই মাঝে দেখছেন গ্রাঁদকে। এর ভেতরও যারা সবসময় রোগের আক্রমণ এড়িয়ে যেতে পারে তিনিও হচ্ছেন সেই শ্রেণীর মানুষ। হঠাৎ ডাক্তার রিও-র মনে পড়ল, কোথায় যেন পড়েছেন, প্লেগ তার শিকার খোঁজে সবল ও সুস্থ দেহের মানুষের মাঝে, রুগ্ণ দুর্বল যারা তাদের প্রতি তার লক্ষ্য যায় না সহসা। এইভাবে গ্রাঁদের বিষয় চিন্তা করতে করতে শেষপর্যন্ত তার লক্ষ্য যায় না সহসা। এইভাবে গ্রাঁদের বিষয় চিন্তা করতে করতে শেষপর্যন্ত তার লক্ষ্য যায় না সহসা। এইভাবে গ্রাঁদের বিষয় চিন্তা করতে করতে শেষপর্যন্ত ডাক্তার রিও-র মনে হল, তার নিজের ক্ষুদ্র পরিবেশের ভেতর গ্রাঁদ লোকটা কেমন একধরনের রহস্যজনক চরিত্র।

এটা সত্যি যে, গ্রাঁদ যে স্থানীয় প্রশাসনের অধীনস্থ একজন নগণ্য কর্মচারী তা তার বাহ্যিক লক্ষণ এবং বিশেষ ধরনের আচার-আচরণ থেকে প্রথম দৃষ্টিতেই প্রকাশ পেয়ে যেত। গ্রাঁদ দেখতে ছিল বেশ লম্বা ও পাতলা। তার দেহ মনে হত পোশাক-পরিচ্ছদের অন্তরালে হারিয়ে গেছে। কারণ তিনি পোশাক পরতেন নিজের দেহের চেয়ে এক সাইজ বড়, যেহেতু তার একটা ধারণা ছিল যে, জামাকাপড় দেহের অনুপাতে কিছুটা

বড় হলে তা টেঁকসই হয়। গ্রাঁদের নিচের মাড়ির দাঁতগুলো অক্ষত থাকলেও উপরের মাড়িতে দাঁত ছিল না একটাও। ফলে উপরের ঠোঁট তুলে যখন হাসতেন, চোয়ালের নিচের অংশ বড় একটা নড়ত-চড়ত না, শুধু উপরের ঠোঁটটা গুটিয়ে সেখানে একটু ফাঁক হয়ে যেত। তখন গ্রাঁদের গালটাকে দেখাত যেন মুখের ওপর একটা কালো ফোকরের মতো। রাস্তায় তাকে চলতে দেখলে মনে হত যেন একজন তরুণ ধর্মযাজক, তেমনি লাজুক, দেয়ালের প্রান্ত ঘেঁষে ঘেঁষে পথ পেরিয়ে যাচ্ছেন, এই দেখা যাচ্ছে তাকে, আবার হঠাৎ একসময় দ্রুতপলায়মান ইঁদুরের মতো কোনো দরজার ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তামাক আর সিঁড়ির তলার কক্ষের একটা হালকা গন্ধ পাওয়া যেত মাঝে মাঝে তার গা থেকে। সংক্ষেপে, একজন অতিতুচ্ছ, নগণ্য ব্যক্তির যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তার সবই ছিল গ্রাঁদের। আর বাস্তবিকই একজন নিম্নশ্রেণীর অতি সাধারণ কেরানি, যার দায়িত্ব হচ্ছে সারাক্ষণ টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগের সাথে শহরের স্নানাগারের শুল্কের তালিকা সংশোধন করা, শহরের ময়লা নিষ্কাশনের ওপর নতুন কর ধার্য করা সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন—তার জন্যে তথ্য সংগ্রহের কাজে নিরন্তর ব্যস্ত থাকা। এ ছাড়া গ্রাঁদের সম্পর্কে অপর কোনো চিত্র কল্পনা করাও সত্যি দুষ্কর। তিনি কী চাকরি করেন সে-পরিচয় পাবার আগেই তাকে দেখলেই মনে-মনে যে-কেউ ভাবতে পারতেন, মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনের মিউনিসিপ্যাল অফিসের এক অস্থায়ী অ্যাসিস্ট্যান্টের পদের কিছুটা বিচক্ষণতা ও প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনের জন্যেই বুঝি তার পৃথিবীতে আসা।

প্রকৃতপক্ষে, টাউন হলে মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীদের যে রেজিস্টার রক্ষা করা হত, তাতে কোন পদে নিয়োজিত এই কলামের নিচে গ্রাঁদ মাসের-পর-মাস নিজের উপরোক্ত পরিচয় লিখে আসছিলেন। বছর বাইশেক আগে ম্যাট্রিক পাস করার পর অর্থের অভাববশত লেখাপড়ায় আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া তার ভাগ্যে ঘটেনি—যখন এই অস্থায়ী চাকরিটি নিয়েছিলেন, এইরকম একটা ভরসা তাকে দেয়া হয়েছিল অথবা নিজেই সেকথা বলতেন যে, শহরে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব সূক্ষ্ম সমস্যা উদ্ভব হয়, সেগুলো সামাল দেবার মতো কর্মকুশলতা যে তার আছে, সেটুকু শুধু প্রমাণ করতে পারলেই হল, তার চাকরি পাকা হতে আর বিলম্ব হবে না; আর চাকরিটা যদি একবার পাকা হয় তাহলে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য যেটুকু পদোন্নতির প্রয়োজন তা যে তার আয়ত্তে এসে যাবে, সেরকম আশ্বাসও নাকি তিনি পেয়েছিলেন। নিজের দায়িত্ব পালনের প্রতি তার যে স্বাভাবিক উৎসাহ, তার পেছনে কিন্তু সত্যিই গ্রাঁদের ব্যক্তিগত কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। মুখে বাঁকা হাসির রেশ ফুটিয়ে গ্রাঁদ শপথ করে বলতেন, তার যা কামনা তা হচ্ছে এমন একটা জীবনের প্রত্যাশা যে-জীবনে তিনি সততার সঙ্গে পরিশ্রম করবেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তার মোটামুটি সচ্ছল জীবিকা সংস্থানের নিশ্চয়তা থাকবে, আর থাকবে অবসর মুহূর্তগুলো নিজের খেয়ালের অনুশীলনে ব্যয় করবার স্বাধীনতা। গ্রাঁদ প্রথম যখন চাকরিটা নিয়েছিলেন তখন একটা সম্মানজনক উদ্দেশ্যই ছিল তার মনে, হয়তো-বা তিনি এখনও দাবি করতে পারতেন যে, একটা আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এবং আনুগত্যের

জন্যেই তিনি এই চাকরিতে এসেছিলেন। তারপর বছরের-পর-বছর পার হয়েছে, কিন্তু তার চাকরির সেই-যে অস্থায়ী অবস্থা তার আর কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ইতিমধ্যে জীবিকা নির্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল দ্রুত হারে।

বাঁধা নিয়মে গ্রাঁদের বেতন যে কিছু কিছু বাড়েনি তেমন নয়, তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা পূর্বের মতো যৎকিঞ্চিৎই রয়ে গিয়েছিল। হয়তো তার প্রতি বিশ্বাস ছিল বলেই একমাত্র ডাক্তার রিও-র কাছেই তিনি এসব কথা বলেছিলেন। অপর আর কেউই তার এই অবস্থার কথা জানত না। নিজের সম্পর্কে কাকেও কিছু বলার ব্যাপারে এই যে সঙ্কোচবোধ এটাই হয়তো গ্রাঁদের চরিত্রের একটা মৌলিকত্ব—অন্তত তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যেত এ থেকে। তার নিজের অধিকার সম্পর্কে না হলেও অবশ্য সত্যিই তেমন কোনো অধিকার তার ছিল কি না সে-সম্পর্কেও তার নিজের মনে একটা অনিশ্চিত ধারণা ছিল—অন্তত চাকরিতে প্রথম ঢোকার সময় তাকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সে-ব্যাপার নিশ্চয় তিনি কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে পারতেন। আনেননি যে তার কিছুটা কারণ অবশ্য ছিল। প্রথমত, ডিপার্টমেন্টের যে ভদ্রলোক প্রধান হিসাবে তাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিছুদিন হল তার মৃত্যু হয়েছিল; তাছাড়াও সঠিক কী মর্মে যে তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাও এখন আর গ্রাঁদের স্মরণ ছিল না। এবং সবশেষে—আসলে এখানেই যত গোল বাধত—কী-বলে যে নিজের বক্তব্য পেশ করবেন তা তিনি কিছুতেই স্থির করে উঠতে পারতেন না।

ডাক্তার রিও-ও লক্ষ্য করেছিলেন, গ্রাঁদের চরিত্রের এই-যে একটা বৈশিষ্ট্য, তার ব্যক্তিত্বকে অনুধাবন করতে চাইলে এটাই ছিল তার যথার্থ সূত্র। মনের ভেতর সতত সেরকম একটা ইচ্ছা পোষণ করা সত্ত্বেও, নিজের অবস্থা সম্পর্কে মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো লিখিত আবেদন পেশ করা বা এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে প্রয়োজনীয় অপর কোনো ব্যবস্থা নেয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াত—এটাই তিনি বলতেন। তিনি যেভাবে ব্যাপারটাকে বোঝাতেন, নিজের অধিকার শব্দটা উচ্চারণ করবার সময় বেশ একটু ইতস্তত করতেন যেন—অপরের কাছে গিয়ে যে কিছু বলবার, সেটাকে তিনি বিশেষভাবে অপছন্দ করতেন, কর্তৃপক্ষের দেয়া প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে যে তাদের কিছুটা সচেতন করে দেবেন সেখানেও এই একই জিনিস অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত। এসবের অর্থ দাঁড়াবে তিনি নিজের পাওনা গণ্ডা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাচ্ছেন, যেটা এমনি একটা ঔদ্ধত্য যা তার মতো পদের কর্মচারীর পক্ষে কোনোক্রমেই শোভন বা সঙ্গত নয়। অপরপক্ষে আপনার সহৃদয়তা, কৃতজ্ঞতা, ধারণা এসবের ব্যবহার মানুষের ব্যক্তিগত মর্যাদা রক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এইভাবে নিজের আবেদন পেশ করার উপযোগী যথার্থ শব্দ তিনি নিজে খুঁজে পেতেন না বলেই এত অধিক বয়স অবধি স্বল্প-বেতনের এই চাকরির দায়িত্ব পালন করে চলছিলেন। সতত ডাক্তার রিও-র কাছে তাই তিনি বলতেন—দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে তার একটা উপলব্ধি জন্মেছিল, আয় যৎকিঞ্চিৎ বা সামান্যই হোক—তার ভেতর

তিনি নিজের প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকুলান করে নিতে পারতেন। সেক্ষেত্রে হয়তো আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজের প্রয়োজনগুলোকে কিছুসংখ্যক কাটছাঁট করতে হবে—এই যা। এইভাবে দেখা যেত গ্রাঁদের এই মন্তব্যের দ্বারা আমাদের শহরের এক চিন্তাশীল ব্যবসায়ী যিনি আবার মেয়রও ছিলেন শহরের, তাঁর অভিমতের বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হত যেন। এই মেয়র প্রায়ই আবেগের সঙ্গে বলতেন, শেষপর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে—'শেষ বিশ্লেষণ' এটা যেন তার বিশেষ বাছা শব্দ এবং এর দ্বারাই তার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে, এমনি জোর দিতেন শব্দটার ওপর—দেখা যাবে অনাহারে কোনো সময় যে এই শহরের কারুর মৃত্যু হয়েছে, অবিশ্বাস করার মতো সঙ্গত কারণ পাওয়া যাচ্ছে না। সে যাই হোক, শেষ বিশ্লেষণে দেখা যেত এ ব্যাপারে উদ্বেগ বোধ না-করার পক্ষে সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা ছিল গ্রাঁদের নিজের অনাড়ম্বর আর অনাড়ম্বরই বা কেন, অসম্ভব রকমের কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবন।

গ্রাঁদ এই একইভাবে মনে-মনে শব্দ হাতড়াতে থাকতেন। এক অর্থে গ্রাঁদের জীবনকে বলা যেতে পারত সত্যিই একটা আদর্শ জীবন। তিনি ছিলেন সেইসব দুর্লভ—দুর্লভ এই শহরে নয়, সর্বত্রই—ব্যক্তিদের গোত্রভুক্ত যারা জীবনে মহত্তর কিছু উপলব্ধি করলে অনুরূপ আচরণ করার মনোবলের পরিচয় দিয়ে থাকেন। গ্রাঁদ তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সামান্য যেটুকু বলতেন তা থেকেই এমন সব সহৃদয়তা ও স্নেহবোধের পরিচয় পাওয়া যেত যা এখনকার দিনে খুব অল্পসংখ্যক লোকের ভেতর দেখা যায়। কোনোরকম সলজ্জভাব না-দেখিয়েই গ্রাঁদ সবার কাছেই স্বীকার করতেন যে, তিনি তার বোন ও ভাগ্নে-ভাগ্নীদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তার নিকট-আত্মীয়দের ভেতর একমাত্র এই বোনই বেঁচেছিলেন, যাকে তিনি প্রতি এক বছর অন্তর প্যারিসে দেখতে যেতেন। তিনি এও স্বীকার করতেন যে, তার মৃত বাবা-মা, তার অতি শৈশবে যাদের মৃত্যু হয়েছিল, তাদের কথা চিন্তা করলে এখনও মাঝে মাঝে তিনি অন্তরে কেমন একটা মোচড় অনুভব করেন। তিনি শহরের যে-অঞ্চলে বাস করতেন, তার কাছাকাছি এক গির্জায় প্রতিদিন বেলা পাঁচটায় যে ঘণ্টা বাজত, তার সুমধুর ধ্বনি যে তার বিশেষ প্রিয় ছিল তাও তিনি গোপন করতেন না। তার এইসব অনুভূতি যেগুলো অত্যন্ত সহজ ও সরল, তাদের প্রকাশ করতে গিয়ে সামান্য শব্দ খুঁজে পেলেও কী প্রাণান্ত পরিশ্রমই না করতে দেখা যেত গ্রাঁদকে। এইভাবে নিজের মনোমতো প্রত্যেকটা শব্দ খুঁজে পেতে তাকে যে বারে বারে অসুবিধায় পড়তে হত এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার জীবনে সর্বনাশের কারণ।—ডাক্তার সাহেব, আপনি যদি বুঝতেন, প্রায়ই তিনি বলতেন—নিজেকে কীভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় তা শিখবার জন্য আমার প্রাণে কী যে আকুলতা! যখনই তার ডাক্তারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হত, গ্রাঁদ এই প্রসঙ্গটা তুলতেন।

সেদিন সন্ধ্যায় দূরে বিলীয়মান গ্রাঁদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে গ্রাঁদ এতদিন কী যে তার কাছে বলতে চেয়েছেন তা যেন হঠাৎ বিদ্যুৎরেখার মতো একঝলকে ডাক্তারের মনের ভেতর স্পষ্ট হয়ে উঠল। গ্রাঁদ নিশ্চয়ই বই বা তেমন একটা কিছু লেখার কাজে ব্যস্ত। এবং আরো অদ্ভুত ব্যাপার, ল্যাবরেটরির দিকে চলতে

গ্রাঁদের সম্পর্কে এই চিন্তা যেন তার মনে কিছুটা আশ্বাস সঞ্চার করল। এটা যে অসঙ্গত তা উপলব্ধি করার ক্ষমতা তার ছিল। কিন্তু তবুও এটাও তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, গ্রাঁদের মতো লোকেরা যারা নগণ্য তুচ্ছ চাকরিজীবী হয়েও সামান্য খেয়ালের অনুশীলনে ব্যস্ত, তারা যে-শহরে বাস করে সেখানে বড় মহামারী দেখা দিতে পারে। সংক্ষেপে, কোনো প্লেগ-আক্রান্ত সমাজে যে এই ধরনের খেয়ালের অনুশীলন চলতে পারে সেটা তার পক্ষে কল্পনা করাও ছিল দুষ্কর। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যা-কিছু দেখা যাচ্ছে তার সবই প্লেগ যে শহরের অধিবাসীদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে তার বিপরীত।

৭

পরের দিন বহু সাধ্যসাধনার পর ডাক্তার রিও প্রিফেক্টর অফিসে একটা স্বাস্থ্য কমিটি ডাকার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে সম্মত করালেন। কিন্তু অনেকের ধারণা ব্যাপারটা নিয়ে এতবেশি জেদাজেদি করতে গিয়ে তিনি কিছুটা অবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন।

—শহরের লোক যে ক্রমেই খুব বেশিরকম সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে তা সত্যি বটে, ডাক্তার রিচার্ড বললেন—আর এটাও অবশ্যি অনেকখানি সত্যি যে চারিদিকে এলোমেলো গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। প্রিফেক্ট তাই আমাকে বলেছিলেন প্রয়োজন মনে করলে যে-কোনো জরুরি ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করবেন না। তবে সাবধান, মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে করবেন সবকিছু। তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ব্যাপারটা অনেকটা মিথ্যা আতঙ্কের মতো।

সেদিন প্রিফেক্টের অফিসে যাবার পথে ডাক্তার রিও ডাক্তার ক্যাসেলকে নিজের গাড়িতে তুলে নিলেন।

—শুনেছ! গাড়িতে ওঠার পর ডাক্তার ক্যাসেল বললেন—সারা জেলায় নাকি দুএক গ্রাম সিরাম নেই কোথাও।

—হ্যাঁ, জানি, আমি নিজেই ডিপোতে টেলিফোন করেছিলাম। দেখলাম ডিপোর ডাইরেক্টর বেশ খানিকটা চমকে উঠলেন যেন। এখন প্যারিস থেকে আনানোর দরকার। কিন্তু সেখানেও আবার তেমন তৎপরতা দেখালে হয়। দেখা যাক, গতকাল প্যারিসে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। ডাক্তার রিও বললেন।

প্রিফেক্ট যথেষ্ট হৃদ্যতার সঙ্গে তাদেরকে নিজের অফিসে অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু সে-সময় তাকে দেখলে যে-কেউ সহজেই অনুমান করতে পারতেন তিনি ভেতরে ভেতরে চাপা ক্রোধে জ্বলছিলেন।—আসুন, তাহলে এবার আমরা কাজ শুরু করি—উপস্থিত ডাক্তারদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন—পরিস্থিতিটা যে কী তা আর আমার ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই নিশ্চয়।

ডাক্তার রিচার্ড বললেন, তার ধারণা তার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি এবং তার সহকর্মীরা সবাই বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি জানেন। এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে বর্তমান অবস্থায় কী ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

—বরং আমাদের সামনে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে—ডাক্তার ক্যাসেল ডাক্তার রিচার্ডের কথার মাঝে বাধা দিয়ে বেশ খানিকটা অনিশ্চতভাবে বললেন—রোগটা সত্যি প্লেগ কিনা তা সঠিকভাবে জানা।

উপস্থিত ডাক্তারদের দুতিনজন ডাক্তার ক্যাসেলের এই উক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে উঠলেন। অন্যেরা সবাই কেমন যেন ইতস্তত করতে লাগলেন। প্রিফেক্ট নিজেও কেমন একটু চমকে উঠলেন। দরজার দিকে দ্রুতদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। যেন আশ্বস্ত হতে চাইছিলেন যে ডাক্তার ক্যাসেলের এই ভয়ংকর উক্তি নিঃসঙ্গ দরজার বাইরে কারুর কানে পৌছাতে পারেনি। ডাক্তার রিচার্ড বললেন তাঁর মতে এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কোনোরকম আতঙ্কের ভাব না-দেখানো। এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র একটা ব্যাপারই নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে বিশেষ একধরনের জ্বরের রোগী ডাক্তারদের হাতে আসতে শুরু করেছে। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জটিলতা কিছু কিছু আছে। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যা, ডাক্তারি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি, দ্রুত কোনো সিদ্ধান্তে পৌছবার চেষ্টা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ডাক্তার ক্যাসেল তার হলুদ রঙের ময়লা গোঁফ মুখের ভেতর পুরে দিয়ে শান্ত মনে চিবুচ্ছিলেন যেন। হঠাৎ এবার তার পাণ্ডুর উজ্জ্বল চোখ মেলে প্রথমে ডাক্তার রিও-র দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর একে একে কমিটির অপর সদস্যদের প্রতি একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলে গেলেন তার সুস্পষ্ট অভিমত—রোগটা প্লেগ এবং হয়তো এটুকু তার পক্ষে বলা নিষ্প্রয়োজন যে তিনি জানেন যে এটাকে সরকারিভাবে স্বীকার করে নিতে গেলে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এক্ষুনি কঠোর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াবে। বাস্তব অবস্থায় তার সহকর্মীরা যে কেন মুখোমুখি হতে চাইছেন না এটা অবশ্যি তারই কারণ হিসাবে তিনি বলছেন। কিন্তু তারা যদি মনে করেন যে রোগটা প্লেগ নয়—একথা বললে তাদের মনের দুশ্চিন্তা হালকা হয়, তাহলে তিনি তা বলতেও সম্মত আছেন।

প্রিফেক্টকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠেছেন। তিনি মন্তব্য করলেন সত্যিকারের অবস্থা যে কী তা অবশ্য তার জানা নেই। তবে ডাক্তার ক্যাসেলের এই যুক্তি তার কাছে সঙ্গত বলে মনে হচ্ছে না।

—দেখুন, আমার যুক্তি সত্যি সঙ্গত কিনা সেটাই বড় কথা নয়, ডাক্তার ক্যাসেল বললেন—লক্ষ করতে হবে তা আপনাকে কতটুকু ভাবিয়ে তুলতে পেরেছে।

ডাক্তার রিও এতক্ষণ পর্যন্ত কোনোরকম মতামত প্রকাশ করেননি। এবার তাঁকে তার অভিমত জানাবার অনুরোধ জানানো হল।

—এখনো পর্যন্ত যেসব রোগী আমরা হাতে পেয়েছি, ডাক্তার রিও বললেন—তাদের জ্বরের প্রকৃতি হচ্ছে অনেকটা টাইফয়েডের মতো। আর তার সঙ্গে বমি এবং গ্রন্থিস্ফীতি। স্ফোটনগুলোকে চিরে তাদের ভেতরের পুঁজ নিয়ে বিশ্লেষণ করেও দেখা হয়েছে। ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট তার ভেতর প্লেগের বীজাণু পেয়েছে বলে তার বিশ্বাস; কিন্তু সেইসঙ্গে আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বীজাণুর ভেতর এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে যেগুলো প্লেগের বীজাণুর পুরাতন বর্ণনার সঙ্গে মেলে না।

ডাক্তার রিচার্ড এবার বললেন, তাহলে এ থেকে বোঝা যায় যে এই অবস্থায় আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে—কী ঘটে না ঘটে ধৈর্যের সঙ্গে তা আরও কিছুদিন লক্ষ্য করে যাওয়া। মোটের ওপর গত কয়েকদিন যাবৎ যেসব বিশ্লেষণের কাজকর্ম চলেছে সেগুলো সম্পর্কে একটা পরিসংখ্যানমূলক রিপোর্ট না-পাওয়া অবধি সত্যিই আমাদের কিছুই করা উচিত নয়।

—কিন্তু যখন চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি, ডাক্তার রিও প্রত্যুত্তরে বললেন—রোগ আক্রমণের অল্পসময়ের মধ্যে রোগীর প্লীহা ফুলে বড় হয়ে যায়, মেসিনটেরিক গ্ল্যান্ডগুলো ফুলে হয় একেকটা কমলার মতো, সেই অবস্থায় সম্পূর্ণ হাতপা গুটিয়ে শুধুমাত্র অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যাওয়ার নীতিটা খুব সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলেও কোনো বিজ্ঞের নীতি বলে মনে হয় না। তাছাড়া সংক্রমণ তো দেখছি দিনে দিনে বেড়েই চলছে। এবং রোগ যেভাবে দ্রুত ছড়াচ্ছে তাতে মনে হয় সময়মতো বাধা দেয়ার ব্যবস্থা না করতে পারলে মাসদুয়েকের ভেতর শহরের অর্ধেক লোককে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হবে। তাই যদি সত্যিকারের অবস্থা হয়, তাহলে রোগটাকে আমরা প্লেগ না অন্য কোনো বিরল ব্যাধি বলব সে-প্রশ্নের চুলচেরা মীমাংসা এখানে গুরুত্বহীন। আমাদের সামনে সমস্যা হচ্ছে শহরের অর্ধেক লোককে কীভাবে এর মারাত্মক কবল থেকে রক্ষা করা যায়।

ডাক্তার রিচার্ড পুনরায় মন্তব্য করলেন, এ-ধরনের বিভীষিকা-চিত্র তুলে ধরাটা বোধহয় ভুল হচ্ছে। আর তাছাড়া রোগটা যে সত্যিই সংক্রামক তার সুনিশ্চিত কোনো প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। বাস্তবিকই, অনেক ক্ষেত্রে রোগীর সঙ্গে একই ঘরে বাস করা সত্ত্বেও তার আত্মীয়স্বজনকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত থাকতে দেখা গেছে।

—কিন্তু আবার এটাও ঠিক যে সেই একই অবস্থায় অনেকেই রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন, ডাক্তার রিও পাল্টা মন্তব্য করলেন—তাছাড়া এটাও তো সুস্পষ্ট যে সংক্রমণের ব্যাপারটা সবক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী কিছু নয়। তাই যদি হত তাহলে মৃত্যুর সংখ্যা গাণিতিক হারে অনিবার্যভাবে বেড়েই চলত, তার ফলে অল্পসময়ের ভেতর একটা নিদারুণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হত। এটা তাহলে এখন আর, খারাপ একটা কিছু কল্পনা করার প্রশ্ন নয়। রোগ প্রতিরোধের জন্যে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটাই ভেবে দেখা অত্যাবশ্যক এখন।

ডাক্তার রিচার্ড আবার সমগ্র পরিস্থিতিটা তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে বললেন, রোগ-সংক্রমণ যদি আপনা থেকে বন্ধ না হয় তাহলে ডাক্তারি কোডে যেসব প্রতিষেধক ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলোকে কঠিনভাবে প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু তা করতে গেলেও পূর্বাহ্নে সরকারিভাবে ঘোষণা করা দরকার যে প্লেগ দেখা দিয়েছে। কিন্তু রোগটা যে সত্যিই প্লেগ তা নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে না, সুতরাং সেরকম ক্ষেত্রে হঠকারী কোনোকিছু যাতে না করা হয় তার জন্যে সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে।

এরপরেও কিন্তু ডাক্তার রিও তাঁর নিজের মতে অবিচল রয়ে গেলেন। তিনি বললেন—দেখুন, ডাক্তারি কোডে যেসব প্রতিষেধকের বিধান রয়েছে সেগুলোর

প্রয়োগ কঠিন হবে কিনা তা নির্ধারণ করা বর্তমানে প্রশ্ন নয়, শহরের অর্ধেক লোককে একটা আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্যে সেগুলোর সত্যিই প্রয়োজন আছে কিনা সেটাই এখন বিবেচনা করার প্রয়োজন। পরের যা-কিছু তার সবই প্রশাসনিক দফতরের করণীয়। এবং এটা নিশ্চয় আর আমার আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই যে আমাদের শাসনতন্ত্রে এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলা করবার উপযুক্ত বিধান রয়েছে, এরকম পরিস্থিতিতে প্রিফেক্ট যাতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করতে পারেন সে-ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে।

—ক্ষমতা অবশ্য সত্যিই আমার আছে, প্রিফেক্ট জোরের সঙ্গে বললেন—কিন্তু সেক্ষেত্রেও পেশাদার বিশেষজ্ঞ হিসাবে ডাক্তারদের আগে ঘোষণা করতে হবে যে, মহামারীর আকারে যে-রোগটি দেখা দিয়েছে সেটা সত্যিই প্লেগ।

—কিন্তু ঘোষণার ব্যাপারে যদি আমরা সত্যিই একমত হতে না পারি, ডাক্তার রিও বললেন—তাহলে আমাদের একটা ভয়ংকর বিপজ্জনক সম্ভাবনার ঝুঁকি নিতে হবে, হয়তো দেখব শহরের অর্ধেক লোক এই রোগের ফলে আকস্মিক মৃত্যুর কবলে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ডাক্তার রিচার্ড খানিকটা অসহিষ্ণুতার সাথে তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—তাহলে এখন এটাই সত্য যে আমাদের সহকর্মীর পুরোপুরি বিশ্বাস যে রোগটা প্লেগ। বিশেষ করে সিনড্রোমের তিনি যা বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে তাই প্রমাণিত হয়।

ডাক্তার রিও প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, তিনি কোনো সিনড্রোমের বর্ণনা দেননি; বরং নিজের চোখে যা যা দেখেছেন সেগুলোই সবার সামনে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। তিনি যা যা দেখেছেন তা হচ্ছে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহের বিভিন্ন স্থানের গ্রন্থিগুলো হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের স্ফীত হয়ে ওঠে; দেহের উত্তাপ দ্রুত বাড়তে থাকে; সে অবিরাম প্রলাপ বকে এবং আটচল্লিশ ঘন্টার ভেতর সাধারণত তার মৃত্যু ঘটে। এখন ডাক্তার রিচার্ড কি তার নিজের দায়িত্বে ঘোষণা করতে প্রস্তুত আছেন যে কোনোরকম প্রতিষেধক ব্যবস্থা ছাড়াই অল্পদিনের ভেতর এই রোগ-আক্রমণের উপশম হবে?

ডাক্তার রিচার্ড কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন যেন, তারপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল ডাক্তার রিও-র ওপর। বললেন—আপনি আমার এই প্রশ্নের সত্যি জবাব দেন দেখি। আপনার কি সুনিশ্চিত বিশ্বাস রোগটা প্লেগ?

—আপনি যেভাবে সমস্যাটাকে উপস্থিত করতে চাইছেন, সেটা ভুল হচ্ছে। রোগের নাম আমি কী বলি না বলি সেটাই বড় কথা নয়, এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে সময়ের। ডাক্তার রিও উত্তরে বললেন।

—তাহলে দেখা যাচ্ছে, আপনার মত হচ্ছে এই যে, প্রিফেক্ট তাদের কথার মাঝে যোগ দিয়ে বললেন—রোগটা যদি প্লেগ নাও হয়, তাহলেও প্লেগের মহামারী দেখা দিলে আইনের নির্দিষ্ট বিধান অনুসারে যেসব প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, সেগুলো এক্ষুনি প্রয়োগ করতে হবে।

—আপনি যদি একান্তভাবে জেদ করেন যে আমাকে একটা সুনির্দিষ্ট মতামত ব্যক্ত করতেই হবে, তাহলে আপনি যেটা বলছেন সেটাকেই মোটামুটি আমার অভিমত

বলে ধরে নিতে পারেন।

ডাক্তাররা সবাই মিলে এবার নিজেদের ভেতর আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন। ডাক্তার রিচার্ড নির্বাচিত হলেন তাদের মুখপাত্র।

—তাহলে এখন মোটামুটি অবস্থা দাঁড়াচ্ছে এই রকম। আমাদের এমনিভাবে কাজ করবার দায়িত্ব নিতে হবে যেন প্লেগের মহামারী শুরু হয়েছে, তাই নয় কি?

তিনি যেভাবে ব্যাপারটাকে বোঝাতে চাইছেন সেটা উপস্থিত ডাক্তাররা সবাই অনুমোদন করলেন।

—পরিস্থিতিকে কীভাবে প্রকাশ করবেন, ডাক্তার রিও বললেন—সে-ব্যাপারে আমার তেমন কিছু বক্তব্য নেই; আমার বলার কথা হচ্ছে, শহরের অর্ধেক লোক যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে এমন কোনো সম্ভাবনাই যে নেই সেই চিন্তার বশবর্তী হয়ে আমরা যেন কিছু না করি। কারণ সেক্ষেত্রে সেটাই বাস্তবে ঘটে যেতে পারে।

নানারকম ভীতি প্রদর্শন এবং প্রতিবাদের মাঝে ডাক্তার রিও কমিটি-রুম ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে আসলেন। মিনিট কয়েক পরে তিনি শহরের বাইরের অঞ্চলের একটা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, চারদিক থেকে ভাজা মাছ আর প্রস্রাবের ঝাঁঝালো গন্ধ ভেসে আসছিল। হঠাৎ কোথা থেকে একজন স্ত্রীলোক এসে দাঁড়াল তার গাড়ির সামনে, যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল সে, তার উরু বেয়ে রক্তের ধারা নামছিল, তার দুখানা হাত সে বাড়িয়ে দিল ডাক্তারের দিকে।

৮

কমিটি মিটিং-এর পরের দিন রোগের প্রকোপ আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেল। সেদিনের দৈনিক পত্রিকাগুলোতেও রোগ সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হল, খুব সতর্ক এবং সংক্ষিপ্ত খবর বেরুল কিছু কিছু।

ঠিক তার পরের দিন ডাক্তার বাইরে বেরিয়ে লক্ষ করলেন, শহরের বিভিন্ন স্থানে নতুন ছোট ছোট সরকারি নোটিশ টাঙানো হয়েছে, কিন্তু এমন সব স্থানে যেখানে সচরাচর মানুষের দৃষ্টি যায় না। কর্তৃপক্ষ যে পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্যে সতর্কতার সঙ্গে চেষ্টা করছেন, নোটিশ থেকে তার কোনোরকম ইঙ্গিত পাওয়া দুষ্কর। তাতে যেসব বিধি-ব্যবস্থা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেগুলো তেমন কঠোর কিছু নয়, নোটিশগুলো পড়লে বরং এইরকম একটা ধারণা জন্মানোই স্বাভাবিক ছিল যে জনসাধারণের ভেতর যাতে কোনোরকম আতঙ্ক ছড়িয়ে না পড়ে, সেটাই কর্তৃপক্ষের কাছে সবচেয়ে উদ্বেগের ব্যাপার এবং সেদিকে দৃষ্টি রেখেই সবকিছু করা হয়েছে। নির্দেশগুলোর গোড়াতেই সংক্ষিপ্তভাবে বলা ছিল, সাংঘাতিক একধরনের রোগের আক্রমণের কিছু কিছু সংবাদ ওরাও শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে; রোগটা সত্যিই সংক্রামক ব্যাধি কিনা তা অবশ্য সঠিক বলা এখনও সম্ভব নয়। রোগের লক্ষণগুলো এখনও পর্যন্ত এমন কিছু স্পষ্ট নয় বা এক্ষুনি কোনো উদ্বেগের কারণ হতে পারে এবং কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন শহরের প্রত্যেক নাগরিক যে সুস্থির

দিয়ে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারবেন, সে-ব্যাপারে তাদের ওপর আস্থা রাখা যায়, তা সত্ত্বেও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সেটা সম্ভবত সবার কাছেই ভালো বিবেচিত হবে, প্রিফেক্টের তরফ থেকে কিছু কিছু সতর্কমূলক ব্যবস্থা কার্যকরী করা হয়েছে। এখন প্রত্যেক নাগরিক যদি এই বিধি-ব্যবস্থাগুলো মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করে যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করেন, তাহলে এই রোগ মহামারীর রূপ নিতে পারে বলে যে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে, তা এখন সম্ভব হবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রিফেক্টের ধারণা যে শহরের প্রত্যেক নাগরিক নিশ্চয় তার এই ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাবেন।

কর্তৃপক্ষ যেসব ব্যবস্থা কার্যকরী করবেন বলে স্থির করেছিলেন তারও একটা খসড়া দেয়া হয়েছিল নোটিশে। নালা-নর্দমায় নিয়মিত বিষাক্ত গ্যাস ঢেলে একটা সুনির্দিষ্ট উপায়ে শহর থেকে ইঁদুর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থা যাতে কোনোরকমে দূষিত না হয় সেদিকেও কঠোর দৃষ্টি রাখাকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। প্রত্যেক নাগরিক যাতে কঠোরভাবে ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিয়ম পালন করেন, সে-ব্যাপারে তাদের উপদেশ দেয়া হয়েছিল। কেউ যদি নিজের গায়ে ঘন ঘন মাছি বসতে দেখেন, তাহলে তার প্রতি নির্দেশ ছিল তিনি যেন তক্ষুনি মিউনিসিপাল হাসপাতালে গিয়ে তা জানান। প্রত্যেক পরিবারের কর্তাদের ওপর আদেশ দেয়া হয়েছিল যে পারিবারিক ডাক্তার পরিবারের কোনো ব্যক্তিকে রোগী বলে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে তা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে হবে এবং প্রয়োজন হলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালের বিশেষ ওয়ার্ডে স্থানান্তর করার ব্যাপারেও অনুমতি দিতে হবে। নোটিশে বিশেষভাবে উল্লেখ করা ছিল, রোগী যাতে আশু চিকিৎসা লাভ করে এবং তার আরোগ্যের জন্য সবরকমের নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব হয়, তারই উপযোগী কিছু ব্যবস্থা এইসব ওয়ার্ডে করা হয়েছিল। আরো কিছু কিছু অতিরিক্ত নিয়মকানুন পালনেরও আদেশ ছিল : রোগীর ঘর এবং যে-গাড়িতে রোগী চলাফেরা করবেন তা যাতে সম্পূর্ণ রোগ-বীজাণুমুক্ত থাকে তার জন্যে বাধ্যতামূলকভাবে রোগ-বীজাণুনাশক ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। বাকি যা-কিছু করণীয় সে-সম্পর্কে নির্দেশই এই উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছিলেন যে যারা রোগীর সংস্পর্শে আসতে বাধ্য হবেন, তাদের কর্তব্য হবে অবিলম্বে স্যানিটারি ইনসপেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং তিনি যা যা নির্দেশ দেন সেগুলো যথাযথ পালনের চেষ্টা করা।

ডাক্তার নোটিশ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে হঠাৎ দাঁড়ালেন এবং দ্রুত নিজের কনসালটেশন রুমের দিকে ফিরে চললেন। গ্রাঁদ, যিনি আগে থেকেই সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, ডাক্তারকে দেখতেই নাটকীয়ভাবে নিজের দুবাহু উত্তোলন করলেন।

—হ্যাঁ, জানি, ডাক্তার বললেন—মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

ঠিক আগের দিন দশজন লোকের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়। ডাক্তার গ্রাঁদকে জানালেন, সম্ভবত আজকে সন্ধ্যার সময় তাদের দেখা হবে, কারণ সেদিন সন্ধ্যায় কটার্ডের ওখানে যাবেন বলে আগেই তিনি তাকে কথা দিয়েছেন।

—আপনি যে এইভাবে চিন্তা করেছেন, সত্যিই চমৎকার, গ্রাঁদ বললেন—আপনি

গেলে সত্যিই ভদ্রলোকের উপকার হবে। আর সত্যি বলতে কী, আমি নিজেও লক্ষ্য করেছি কটার্ড যেন হঠাৎ পাল্টে গেছেন—

—কীভাবে বলে আপনার মনে হয়?

—এর আচার-আচরণ আগের চেয়ে অনেক অমায়িক বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।

—আগে কি একে তেমন অমায়িক বলে মনে হত না?

আকস্মিক এই প্রশ্নের কী জবাব দেবেন যেন খুঁজে পেলেন না গ্রাঁদ। কটার্ড যে আগে অমায়িক ছিলেন না একথা তিনি বলতে পারেন না, একথা বললে সত্যি বলা হত না, বরং কটার্ডকে তার বরাবরই মনে হয়েছে কিছুটা চুপচাপ এবং গোপন স্বভাবের মানুষ বলে। এর পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যার কথা চিন্তা করলে বন্য শূকরের কথা মনে পড়ত গ্রাঁদের। অধিকাংশ সময় নিজের বিছানায় পড়ে থাকা, সস্তা রেস্তোরাঁয় রেস্তোরাঁয় খেতে যাওয়া; অথবা মাঝে মাঝে রহস্যজনকভাবে হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে যাওয়া, আবার অন্ধকার হতে-না-হতেই তেমনি সংগোপনে ফিরে আসা—মোটামুটি এই ছিল কটার্ডের দৈনন্দিন জীবন। একজন ভ্রাম্যমাণ মদ এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য পানীয় বিক্রেতা বলে কটার্ড নিজের পরিচয় দিতেন। কখনও কখনও দু-তিনজন লোককে তার বাসায় আসা-যাওয়া করতে দেখা যেত—সম্ভবত তারাই ছিল তার ক্রেতা। সন্ধ্যায় মাঝে মাঝে তার ফ্ল্যাটের সামনে রাস্তার অপরপারের সিনেমাহলে গিয়ে ঢুকতেন কটার্ড। এ-সম্পর্কে আরো একটা জিনিস যা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তাও উল্লেখ করলেন গ্রাঁদ : মারকাটারি গোলাগুলির ঘটনা আছে যেসব ছবিতে সেগুলো দেখার প্রতিই কটার্ডের যেন খুব বেশি ঝোঁক। কিন্তু কটার্ড সম্পর্কে যে জিনিসটা তার কাছে সবচেয়ে লক্ষণীয় বলে মনে হয়েছে তা হচ্ছে তার মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলার চেষ্টা; তাছাড়া দেখামাত্রই যে-কোনো মানুষ সম্পর্কে সন্দেহপরায়ণ হয়ে ওঠার ব্যাপারটাও তো ছিলই। কিন্তু হঠাৎ কিছুদিন থেকে গ্রাঁদ বললেন, এসবেরই যেন আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

—প্রকৃত ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে আপনাকে বোঝাব জানি না, তবে এটা ঠিক যে আমার একটা ধারণা জন্মেছে যে, উনি যেন সবার সঙ্গেই কেমন একটা আন্তরিকতার ভাব গড়ে তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, যেন দ্রুত সবার সুনজরে আসতে চাইছেন। এখন প্রায়ই উনি নিজেই যেচে যেচে আমার সঙ্গে কথা বলেন, একসঙ্গে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব দেন, অনেক সময় সেগুলো প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে কঠিন হয়েই দাঁড়ায়। আর সবচেয়ে বড় কথা—দেখছি, আমার নিজেরও ওকে বেশ ভালোই লাগে; অবশ্য এটা সত্যি যে, আমি ওর জীবন রক্ষা করেছি।

কটার্ড আত্মহত্যার চেষ্টা করার পর থেকে বাইরের প্রায় কেউই আর বড় একটা তার বাসায় দেখা করতে আসত না। কিন্তু তিনি নিজে, রাস্তায় হোক, কোনো দোকানে হোক, মানুষের সামান্য সঙ্গ পেলেই যেন তার সঙ্গে আন্তরিক হবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। মুদির দোকানদারের সঙ্গে তার ব্যবহার মনে হয় অমায়িকতার চরম, তেমনি আবার তামাকের দোকানদার যেসব ব্যাপারে গল্প বলেন তাতেও তিনি এমন উৎসাহ এবং আগ্রহ দেখান যা অন্য কোনো লোকের পক্ষে দেখানো সম্ভব নয়।

—বিশেষ করে আমি যে তামাকের দোকানদারের কথা বলছি—উনি হচ্ছেন একজন মহিলা, গ্রাঁদ বুঝিয়ে বললেন—উনি তো যে-কোনো মানুষের কাছে আতঙ্কস্বরূপ। আমি একদিন কটার্ডের সামনে এই মন্তব্য করতেই উনি বললেন, ভদ্রমহিলা সম্পর্কে আমার নিশ্চয় কোনো ভুল ধারণা আছে, ভদ্রমহিলার অনেক ভালো গুণও আছে, তবে সেগুলোকে হয়তো অনেক সময় তলিয়ে বুঝতে হয়।

দু-তিনবার কটার্ড গ্রাঁদকে তার সঙ্গে শহরের বিলাসী কাফে এবং রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছেন—হালে তিনি এগুলোয় ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করেছিলেন।

—দেখুন, ওসব জায়গায় পরিবেশটা বেশ ভালো লাগে, তিনি গ্রাঁদকে বুঝিয়ে বললেন, আর তাছাড়া ওখানে গেলে সবসময় দু-চারজন ভালো সঙ্গী-সাথী পাওয়া যায়।

গ্রাঁদ লক্ষ করেছেন, কটার্ড এসব রেস্তোরাঁ বা কাফেতে গিয়ে ঢুকতেই সেখানকার কর্মচারীরা যেন শশব্যস্ত হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এগিয়ে আসে এবং এর কারণটাও অবশ্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি দেখেছেন কটার্ড উদার হাতে তাদের মধ্যে মোটামুটি বকশিশ বিতরণ করেন। এসব বদান্যতার পরিবর্তে সেখানকার কর্মচারীরা তার প্রতি যে আন্তরিকতা দেখাত তাতে কটার্ড মনে-মনে বেশ খুশি এবং গর্ববোধ করতেন। একদিন এক রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসার পথে সেখানকার প্রধান ওয়েটার নিজে এসে তাদের বাইরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায় এবং দরজার গোড়ায়ই কটার্ডকে তার ওভারকোট পরতে সাহায্য করে। সে ফিরে গেলে কটার্ড মন্তব্য করেন :

—দেখছেন লোকটা সত্যিই ভদ্র, সময়ে ভালো সাক্ষী হতে পারবে।

—হঠাৎ তার সাক্ষী হবার কথা উঠছে কেন? ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। কটার্ড উত্তর দেবার পূর্বে দু-এক মিনিট ইতস্তত করলেন যেন।

—না, তেমন কিছু নয়, তবে ধরুন সে অন্তত একটু বলতে পারবে আমি তেমন কোনো অসৎ লোক নই।

কিন্তু তার এই সদাপ্রসন্ন মনোভাবের ভয়ংকর রকমের পরিবর্তন দেখা যেত মাঝে মাঝে। একদিন রুটির দোকানদারের আচরণের ভেতর আন্তরিকতার কিছুটা অভাব চোখে পড়ে তার, ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে তক্ষুনি তিনি চলে আসেন সেখান থেকে।

—শুয়োর কোথাকার, এরই মধ্যে ওদের দলে ভিড়ে পড়েছে।

—কাদের দলের কথা বলছেন আপনি?

—উচ্ছন্নে গেছে যে রাসকেলগুলো তাদের কথা বলছি।

তামাকের দোকানে এইধরনের যে-ব্যাপারটা ঘটেছিল, গ্রাঁদ নিজেও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সবাই বেশ প্রফুল্লচিত্তে নিজেদের ভেতর কথাবার্তা বলাবলি করছিল। এমন সময় দোকানের মালিক মহিলা একটা খুনের ঘটনা সম্পর্কে তার নিজের মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করেন। এই খুনের ব্যাপারটা নিয়ে সে-সময় আলজিয়ার্সে বেশকিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের এক কর্মচারী আলজিয়ার্সের এক অধিবাসীকে এক সমুদ্রের বেলাভূমিতে খুন করেছিল।

—আমি তো বরাবরই বলি, ভদ্রমহিলা তার মন্তব্য শুরু করেন—এরা সব আবর্জনা, এদের যদি জেলে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়, তবেই না ভদ্রলোকেরা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে।

তার কথার মাঝখানে কটার্ডের অদ্ভুত আচরণ দেখে ভদ্রমহিলা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। অজুহাতস্বরূপ কোনোকিছু না বলে কটার্ড আকস্মিক যেন ছুটে দোকানঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। গ্রাঁদ এবং দোকানদার মহিলা হতবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন।

এরপরেও গ্রাঁদ কটার্ডের চরিত্রের যেসব পরিবর্তন লক্ষ করেন সেগুলোও ডাক্তার রিওকে জানান—কটার্ডকে বরাবরই দেখা যেত উদার মতামত পোষণ করতে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তার একটা প্রিয় প্রবাদবাক্য ছিল : সবখানেই তো মাৎস্যন্যায়েরই প্রাধান্য। এ থেকেই বোঝা যেত তার মতামত, কিন্তু এখন তিনি ওরাও-এর যে একটিমাত্র পত্রিকা পাঠ করা শুরু করে দিলেন তা হচ্ছে রক্ষণশীল দলের মুখপত্র। এবং এ-ব্যাপারে আরো একটা সন্দেহ জাগত যে কটার্ড যেন বেছে বেছে প্রকাশ্যস্থানে দাঁড়িয়ে পড়তেন পত্রিকাখানা। কটার্ড সেরে ওঠবার কিছু আগে গ্রাঁদকে যে একদিন একটা অনুরোধ জানান সেটাও ছিল অনেকটা এইধরনের ব্যাপার। গ্রাঁদ সেদিন কটার্ডের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় জানান যে তিনি একটু পোস্টঅফিসে যাবেন, একথা শুনতেই কটার্ড তাকে বলেন তার বোন থাকেন বাইরে দূরে, গ্রাঁদ যদি এই সুযোগে পোস্টঅফিস থেকে তার বোনের একশো টাকা মানিঅর্ডার করে আসেন, তাহলে সত্যিই বড় একটা সহৃদয়তার কাজ হবে, কারণ এই টাকাটা তিনি প্রতিমাসেই তার বোনের কাছে পাঠিয়ে থাকেন। তারপর গ্রাঁদ যখন ঘর থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছেন, কটার্ড আবার তাকে ডেকে বললেন—দেখুন, একশো নয় দুশো টাকাই পাঠাবেন। টাকা পেলে নিশ্চয় সে খুব বিস্মিত হবে, সে সবসময় অনুযোগ করে, আমি তার কথা মোটেই ভাবি না, কিন্তু সত্যি বলতে কী আমি তার ভয়ংকর অনুরক্ত।

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরে দুজনের কথাবার্তার মাঝখানে কটার্ড হঠাৎ কিছু অদ্ভুত মন্তব্য করে বসেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি-যে কিছুটা রহস্যজনক ব্যক্তিগত কাজে নিয়মিত বাসায় ব্যস্ত থাকেন তাকে তা জানাবার জন্য কটার্ড এমনই পীড়াপীড়ি করতে থাকেন যার ফলে গ্রাঁদ তাকে তা প্রায় বলেই ফেলেন।

—হ্যাঁ ব্যাপারটা ঠিকই অনুমান করেছি, কটার্ড নিজেই বলে উঠলেন—আপনি কোনোকিছু একটা লিখছেন তাই না?

—কাজটা অবশ্য কিছুটা ঐ ধরনের। তবে, আপনি যতটা সহজ মনে করছেন তা ঠিক নয়।

—সত্যিই, কটার্ড আবার আক্ষেপের সুরে বললেন—আমার যদি আপনার মতো লেখার ক্ষমতা থাকত।

গ্রাঁদ তার মন্তব্য শুনে বিস্ময় প্রকাশ করাতে কটার্ড কিছুটা বিব্রতভাব দেখিয়ে আবার বুঝিয়ে বললেন, লেখক যারা তাদের জন্য বহু কিছুই নানা উপায়ে সহজ হয়ে যাবে।

—কেন? গ্রাঁদ প্রশ্ন করলেন।

—কারণ লেখক যারা, তাদের অধিকার সাধারণ মানুষদের থেকে বহুক্ষেত্রেই বেশি, এটা তো সবাই জানে। তাদের অনেক কিছু মানুষ সহ্য করে নেয়।

আবার যেদিন সরকারি নোটিশ টাঙানো হয়েছিল সেদিন সকালে ডাক্তার রিও গ্রাঁদকে বললেন—মনে হচ্ছে এই ইঁদুর মরার ব্যাপার দেখে আর সবার মতো তার মাথাটায়ও কিছু গোলমাল হয়েছে। আমার তো ধারণা তাই-ই। আর নচেৎ এই অসুখ দেখে উনি বেশিমাত্রায় ঘাবড়ে গেছেন।

—আপনার এই অনুমান কতখানি সত্য সে-ব্যাপারে আমার কিন্তু সন্দেহ আছে। যদি আমার নিজের মত শুনতে চান তাহলে বলব...।

তিনি থামলেন কিছুক্ষণ। ইঁদুর ধ্বংস করা মিউনিসিপ্যালিটির ভ্যানটা তখন বিকট একটা ঝনঝন শব্দ করে তাদের সামনে দিয়ে পার হচ্ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত তার কথা শোনা না যায়, ততক্ষণ ডাক্তার রিও চুপ করে রইলেন, তারপর কিছুটা অনুৎসুকভাব দেখিয়ে গ্রাঁদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার ধারণা কী।

—আমার ধারণা কোনো গুরুতর ব্যাপারে উনি নিজের বিবেকের কাছে দোষী বলে মনে করছেন নিজেকে। গ্রাঁদ বেশ একটু গাম্ভীর্যের সঙ্গে কথাগুলো বললেন।

ডাক্তার রিও নিজের কাঁধজোড়াটাই শুধু একটু ঝাঁকুনি দিলেন একবার। সেদিনের দারোগার সেই কথাগুলো যেন হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল—তার সামনে এখন আরও কত কাজ কত দায়িত্ব পড়ে রয়েছে। সেদিন বিকেলে ডাক্তার রিও ডাক্তার ক্যাসলের সঙ্গে আবার একপ্রস্থ আলোচনা করলেন। তখনও পর্যন্ত সিরাম এসে পৌঁছায়নি প্যারিস থেকে।

—সে যাই হোক, ডাক্তার রিও বললেন—আমার এখনও সন্দেহ আছে সিরাম কোনো কাজে লাগবে কিনা। বীজাণুগুলোকে এখনও একটু অদ্ভুত ঠেকছে।

—দ্যাখো, ডাক্তার ক্যাসল তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—এই ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে মোটেই একমত নই। এগুলো এমনি এক অদ্ভুত জীব যে যখনই তুমি তাদের দেখবে, তোমার ধারণা হবে সম্পূর্ণ নতুন কিছু দেখছ। কিন্তু আসলে ওরা একজাতের, সবক্ষেত্রে তাই-ই হয়।

—যাহোক সেটা তোমাদের নিজের থিওরি। সত্যি যা তা স্বীকার করতে গেলে তোমাকে বলতেই হবে যে, আমরা কখনও কিছুই লিখিতভাবে জানতে পারিনি।

—বেশ মেনে নিলাম, এটা আমার থিওরি। কিন্তু সবার বেলাই তো সেই একই ব্যাপার।

সেদিন সারাদিন ডাক্তার রিও অনুভব করলেন, প্লেগের চিন্তা মনে জাগতেই তার চেতনা যে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল, সেই ভাবটা যেন ক্রমেই বাড়ছিল। শেষপর্যন্ত তিনি অনুমান করলেন ব্যাপারটা কী; তিনি ভীত হয়ে পড়েছেন। পরপর দুবার যেখানে বেশ লোকজনের ভিড় এমনি কাফেতে গিয়ে বসলেন। কটার্ডের মতো তিনিও সৌহার্দ্যপূর্ণ সাহায্যের অভাব অনুভব করছিলেন—মানুষের উষ্ণ সংস্পর্শ পেতে চাইছিলেন। একটা নির্বাক অনুভূতি। ডাক্তার নিজেকে বললেন : তবুও এ থেকেই

তিনি যে কটার্ডের ওখানে যাবেন বলে তাকে কথা দিয়েছিলেন সেটা তার মনে পড়ল।

সেদিন সন্ধ্যায় ডাক্তার রিও যখন তার বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলেন কটার্ড খাবার খোলা পড়েছিল। কিন্তু রাত্রি তখন প্রায় ঘনিয়ে এসেছিল এবং সেই ঘনায়মান অন্ধকারে একটা কিছু পড়া সত্যিই অসম্ভব ছিল। যতদূর সম্ভব কটার্ড হয়তো সেই আধা-অন্ধকারে নীরবে বসেছিলেন, হয়তো আকাশ-পাতাল নানাকিছু চিন্তা করছিলেন; এমন সময় বেল বাজানোর শব্দ শুনে উঠে গিয়েছিলেন।

ডাক্তার রিও কটার্ডকে জিজ্ঞাসা করলেন—তার শরীর কেমন, কেমন বোধ করছেন তিনি।

কটার্ড পাশের চেয়ারটাতে বসলেন, তারপর বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিলেন—'মোটামুটি ভালোই বোধ করছেন।' তারপর যেন একটু থেমে আবার বললেন, তবে লোক এসে অহরহ তাকে জ্বালাতন করবে না, এই নিশ্চয়তাটুকু যদি থাকত তাহলে বোধহয় তিনি আরো ভালো থাকতেন।

ডাক্তার রিও সংক্ষেপে মন্তব্য করলেন, কোনো মানুষই সবসময় নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না।

—হয়তো ভুল বুঝছেন, আমি কিন্তু ঠিক তা বলতে চাইনি। যারা শুধুমাত্র একজন মানুষকেই বিপদে ফেলার জন্যে তার প্রতি অযাচিত ঔৎসুক্য এবং আগ্রহ দেখায় আমি কেবল তাদের কথাই বলতে চেয়েছিলাম।

ডাক্তারকে কোনোরকম প্রত্যুত্তর করতে না-দেখে তিনি আবার বলে গেলেন—আর এটাও খেয়াল রাখবেন, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কিছু বলছিনে কিন্তু। গল্পটা এক্ষুনি এ ডিটেকটিভ বইতে পড়ছিলাম। একটা অভাগা লোকের কাহিনী। হঠাৎ একদিন সকালবেলা পুলিশ এসে লোকটাকে গ্রেপ্তার করে সম্পূর্ণ আকস্মিক। অনেকদিন থেকেই তার পেছনে লোক লেগেছিল, কিন্তু সে কিছুই খবর রাখত না—এমনকি বিভিন্ন অফিসেও তাকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলত। আপনার নিজের কী এমনকি বিভিন্ন অফিসেও তাকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলত। আপনার নিজের কী ধারণা, কারুর সম্পর্কে এটা করা কি উচিত? আপনার কী মনে হয়, জনসাধারণের কারুর প্রতি এইরকম আচরণ করবার অধিকার আছে?

—দেখুন, ডাক্তার রিও এবার বললেন, আপনার এ-প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে অনেক কিছুই বলতে হয়। অবশ্য এক অর্থে আমিও আপনার সঙ্গে একমত যে, এই ধরনের অধিকার কারুরই নেই। কিন্তু এখন এসব অবান্তর আলোচনা। আপনার উচিত মাঝে মাঝে বাইরে বেড়াতে যাওয়া। সারাক্ষণ এই-যে নিঃসঙ্গ বাসায় বসে থাকেন, এটা ভয়ংকর খারাপ।

ডাক্তারের মন্তব্য শুনে কটার্ড যেন কিছুটা বিরক্ত হলেন। বললেন, তিনি আর বাসায় থাকেন কতটুকু, বরং সবসময়ই বাইরে বাইরেই কাটাতে হয় তাকে। যদি সেরকম কিছু দাঁড়ায়, রাস্তার সাধারণ লোকদের জিজ্ঞাসা করলে তারাও তাই-ই বলবে। আর শুধু তা-ই নয়, শহরের সব অঞ্চলের অনেক লোকের সঙ্গেও তার আলাপ-পরিচয় আছে।

—স্থপতি মঁশিয়ে বিত্তকে চেনেন? উনিও তো আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু।

তখন কটার্ডের ঘরের ভেতরটা প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকার। বাইরে রাস্তায় জনকোলাহল ক্রমেই বাড়ছিল। রাস্তার আলোগুলো প্রখর হয়ে একসঙ্গে জ্বলে উঠল যেই, নিমিষে সেই মুহূর্তটাকে অভিনন্দন জানিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার মতো একটা চাপা গুঞ্জন উঠল চারদিক থেকে।

ডাক্তার রিও বাইরে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন, কটার্ডও গেলেন তাকে অনুসরণ করে। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার এই সময়টায় শহরে যেমন ঘটে, স্নিগ্ধ বায়ুভরে দূর শহরতলি থেকে বজ্রকণ্ঠের স্তিমিত কোলাহল ভেসে আসছিল, আর তারই সঙ্গে ঝলসানো মাংসের লোভনীয় সুগন্ধ। অফিস এবং দোকানপাট থেকে সদ্যমুক্ত যুবকদের শান্ত কলরবে যতই ভরে উঠছিল শহরতলির রাস্তা, ততই মনে হচ্ছিল যেন একটা সুগন্ধভরা উচ্ছল আনন্দের তরঙ্গ দুলে দুলে এগিয়ে আসছে শান্ত গতিবেগে।

রাত্রির আগমন আর তার সঙ্গে ভেসে আসা অদৃশ্য জাহাজের দূরাগত ভরাট হুঙ্কার, নিয়ত উত্থিত সমুদ্রের শান্ত মধুর গর্জন এবং আনন্দমুখর জনকোলাহল এই সবকিছুকে মিলিয়ে রাত্রির প্রথম আবির্ভাবের এই সময়টা অতীতে বরাবরই বিশেষ একটা মাধুর্যময় আকর্ষণ ছিল তার কাছে, কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে তিনি যেসব জিনিস জেনেছেন, তাতে আজকের এই মুহূর্তে চারপাশে ক্রমেই ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের ভেতর ডাক্তার রিও যেন একটা নিদারুণ বিভীষিকার দ্যোতনা অনুভব করছিলেন।

—আলোগুলো এবার জ্বেলে দিই, তাই না? ব্যালকনি থেকে ঘরে আসতেই ডাক্তার বললেন।

আলো জ্বেলে দেওয়ার পর কটার্ড বেশ কিছুক্ষণ ডাক্তারের মুখের দিকে একভাবে চেয়ে রইলেন, তার চোখজোড়া মিটমিট করতে লাগল।

—ডাক্তার, বলুন দেখি, হঠাৎ আমি যদি কোনো অসুখে পড়ে যাই, হাসপাতালে আপনার ওয়ার্ডে আমাকে ভর্তি করবেন তো?

—অবশ্যই! তা না করার কী আছে?

কটার্ড এবার ডাক্তারের কাছে জানতে চাইলেন, কোনো ব্যক্তি হাসপাতালে নার্সিং হোমে অসুখ থাকা অবস্থায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে এরকম কোনো ঘটনা কখনও ঘটেছে কিনা। ডাক্তার রিও উত্তরে জানালেন, এরকম ব্যাপার ঘটেছে বলে তো শোনা যায়, তবে সবকিছু নির্ভর করে অসুস্থ ব্যক্তির তখনকার অবস্থার ওপর।

—আপনি তো নিশ্চয় দেখেছেন, কটার্ড আবার বললেন—আপনার ওপর আমার কত গভীর বিশ্বাস। তারপর ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি যখন শহরের দিকেই যাচ্ছেন তখন তাকে সঙ্গে নিয়ে একটু শহরে পৌছে দেবেন কিনা।

তারা যখন শহরের মাঝে এসে পৌছালেন রাস্তায় জনসমাগম অনেক পাতলা হয়ে এসেছে, বাইরে আলোরও আর তেমন সমারোহ নেই। বাড়ির দরজার সামনে সামনে বাচ্চাছেলেরা ভিড় জমিয়ে খেলছিল। কটার্ডের অনুরোধমতো ডাক্তার গাড়িখানা ক্রীড়ারত একদল বাচ্চাদের পাশে এনে থামালেন। পাথর ঠেলাঠেলি খেলছিল তারা। বিরাট হৈচৈ জমেছিল তাদের ভেতর। ভিড়ের থেকে একটা ছেলে, যার মাথার চুলগুলো সুন্দর পাট করে আঁচড়ানো, মুখে ময়লার দাগ, উজ্জ্বল সাহসভরা দৃষ্টিতে কটমট করে

ডাক্তারের দিকে চাইতে লাগল। ডাক্তার নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। পেভমেন্টের ওপর দাঁড়িয়ে কটার্ড কেমন অনিশ্চিতভাবে নিজের মাথাটা নাড়ছিলেন। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে পেছনদিকে চকিত চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে, স্বর বেরুতে চাইছিল না এমনি গলায়, ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন—সবাইকে তো দেখছি মহামারী নিয়ে আতঙ্ক প্রকাশ করছে, আপনার কী ধারণা, সত্যই তেমন কোনো বিপদের আশঙ্কা আছে?

—মানুষ সবসময়ই এইরকম একটা-না-একটা কিছু বলবেই, ডাক্তার বললেন—আর সেটাই তো স্বাভাবিক।

—হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিকই বলেছেন, আর যদি দেখল, আকস্মিক কোথাও দশজন লোকের মৃত্যু হয়েছে, অমনি ভাবতে শুরু করে, এই বুঝি পৃথিবীর অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে। তবে ঠিক এইরকম একটা কিছু ঘটার সময় নয় এখন।

গাড়ির ইঞ্জিনটা তখনও পর্যন্ত একটানা ধুঁকছিল। ডাক্তার রিও-র বাঁ-হাতখানা ছিল গিয়ার লিভারের ওপর। তিনি আবার ভিড়ের ভেতরের সেই ছেলেটার দিকে তাকাতে শুরু করেছিলেন যে তখনও কেমন একটা অদ্ভুত গাম্ভীর্যভরা মুখের ভাব নিয়ে যেন নিরীক্ষণ করছিল তাকে। হঠাৎ একসময়, অপ্রত্যাশিতভাবে ছেলেটা তার দিকে চেয়ে হেসে ফেলল, তার সবগুলো দাঁত বেরিয়ে এল হাসার সময়। প্রত্যুত্তরে ডাক্তার রিও নিজেও হেসে ফেললেন এবং কটার্ডকে জিজ্ঞাসা করলেন—তাই নাকি? তাহলে আমাদের এখানে কী ঘটা উচিত বলে আপনার ধারণা?

কেমন একটা আচমকা কটার্ড গাড়ির দরজাটা একবার চেপে ধরলেন। তারপর চলে যাচ্ছিলেন বোধ হয়, কিন্তু হঠাৎ রাগ ও আবেগময় কণ্ঠে প্রায় চিৎকারের মতো করে বললেন—ভূমিকম্প। খুব বড় রকমের ভূমিকম্প, যাতে সবকিছু একসঙ্গে রসাতলে যাবে।

ভূমিকম্পের কোনো চিহ্নই অবশ্য দেখা গেল না। কিন্তু পরের দিন প্রায় সারাক্ষণই ডাক্তার রিও-র কাটল গাড়ি নিয়ে শহরের এই প্রান্ত সেই প্রান্ত করে, অসুস্থ ব্যক্তিদের কাছে তাদের অসংখ্য রকমের অসোয়াস্তির কারণ ব্যাখ্যা করে, আর তাদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে নানারূপ আলাপ-আলোচনায় নিজের পেশাটা আগে আর কোনোদিনই তার কাছে এমন একটা কঠিন বোঝা বলে মনে হয়নি। ডাক্তার রিও বরাবরই দেখে এসেছেন রোগীরা নিজেরাই তার দায়িত্ব অনেকখানি সহজ করে দেয়। স্বেচ্ছায় তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ তার হাতে ছেড়ে দেয়। এই প্রথম কিছুদিন থেকে তিনি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন, রোগী তার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে চায় যেন তার রোগটাকে আড়ালের মতো ব্যবহার করে তারই পেছনে আত্মগোপন করতে চায় প্রত্যেকেই। মানুষ নিজে হঠাৎ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লে অনেক সময় যেমন অন্যের প্রতি এক অহেতুক বিদ্বেষের ভাব জন্মায় তার মনে, তেমনি একটি আক্রোশের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তারা যেন এখন ডাক্তারের দিকে। নিয়তই এমনি সংগ্রাম করতে হয় যেখানে সেইরকম জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেননি ডাক্তার রিও তখনও। সেদিন রাত দশটা আন্দাজ যখন তিনি তার পুরোনো হাঁপানির রোগীর বাসার সামনে এসে গাড়ি থামালেন, সেদিনের সেটাই তার শেষ রোগী দেখা।

গাড়ির সিট থেকে ক্লান্ত দেহটাকে ছিনিয়ে আনার জন্যে রীতিমতো খানিকটা পরিশ্রম করতে হল যেন তাকে। সিট ছেড়ে ওঠার আগে বেশ কয়েক মুহূর্ত তিনি ইতস্তত করলেন। শূন্যদৃষ্টি মেলে সামনে অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মাথার ওপরে অন্ধকার আকাশের গভীরে যে একটা-দুটো করে তারা ফুটছিল আর নিভছিল সেদিকেও চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ ধরে। ডাক্তার রিও যখন তার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, বৃদ্ধ হাঁপানির রোগী তার বিছানায় উঠে বসেছিল। নিজের পুরোনো অভ্যস্ত কাজে গভীরভাবে ব্যস্ত তখন সে। শুকনো কতগুলো মটরদানা একটা পাত্র থেকে তুলে গুনে গুনে অপর একটা পাত্রে রাখছিল। ডাক্তারকে হঠাৎ ঘরে ঢুকতে দেখে সে চোখ তুলে চাইল, আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ।

—আসুন ডাক্তার সাহেব, চারদিকে কলেরা শুরু হয়েছে, তাই না?

—আপনার মাথায় হঠাৎ এসব চিন্তা কে ঢুকাল আবার?

—কেন, কাগজে দেখলাম। আর তাছাড়া আজ রেডিও থেকেও বলতে শুনেছি।

—না, আমি বলছি এটা কলেরা নয়। বুড়ো ভদ্রলোকের চোখেমুখে কেমন একটা চাপা উত্তেজনা প্রকাশ পেল। স্মিত হেসে বললেন—যাই হোক, বড়কর্তারা দেখছি অনেক কিছু ফলাও করে বলেছেন। বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন তারা মনে হচ্ছে, তাই না?

—এগুলো একবর্ণও বিশ্বাস করবেন না। ডাক্তার বললেন।

বুড়োকে পরীক্ষা করার কাজ ইতিমধ্যে সেরে ফেলেছিলেন ডাক্তার। পরিষ্কার ছোট ঘরখানার মাঝখানে একটা চেয়ারে বসেছিলেন তিনি। মুখে আশ্বাসের কথা শোনালেও তার নিজের মনে যে একেবারেই কোনোরকম আশঙ্কা ছিল না এমন নয়। কারণ তিনি জানতেন, সেই অঞ্চলেই অন্তত আট-দশজন অসুস্থ লোক গ্রন্থিস্ফীতির ফলে অজানা আশঙ্কা এবং দুঃসহ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে আছে। কাল সকালে প্রত্যেকেই তার আসার পথ চেয়ে থাকবে। গ্রন্থিস্ফীতিগুলো ছুরি দিয়ে ফেড়ে দেয়ার পর তাদের ভেতর মাত্র দু-তিনজনের অবস্থার হয়তো কিছুটা উন্নতি হয়েছে। আর বেশিরভাগ রোগীকেই তো হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। কিন্তু দরিদ্র লোকদের হাসপাতাল সম্পর্কে ধারণা যে কী তা তো তিনি জানেন। এই সেদিনও তার এক রোগীর স্ত্রীকে বলতে শুনেছেন : দেখুন, তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ডাক্তাররা তার ওপর নানারকম পরীক্ষা চালাতে থাকবে সেটা আমরা হতে দেব না বলে রাখছি। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আর পরীক্ষা করবার অবকাশটুকুও মেলে না, রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে-না-যেতেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার মৃত্যু হয় এবং তার পরেই সবকিছুর শেষ। হাসপাতালে যেসব নিয়মকানুন বলবৎ করা হয়েছে সেগুলো যে বর্তমান পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে যথেষ্ট নয় তা এখন প্রায় সবার কাছেই বড় বেদনাদায়কভাবে সুস্পষ্ট। আর এই বিশেষভাবে সজ্জিত ওয়ার্ডগুলো যে কী তাও তা তিনি নিজে জানেন। সেখানকার রোগীদের তাড়াহুড়ো করে অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে শুধু বাইরের দুখানা ঘর খালি করে নেওয়া হয়েছে।

ঘরের ভেতর যাতে বাতাস যাতায়াত করতে না পারে, তার জন্য সমস্ত পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, আর তাদের চারপাশে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিধিনিষেধ

যাতে ঠিকভাবে পালন করা হয় তারই উপযোগী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আশঙ্কিত হবার পক্ষে শুধু এইটুকুই বলা যায় যে, হয়তো স্বাভাবিকভাবেই এই মহামারীর উপশম হবে একদিন; কিন্তু কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আজ পর্যন্ত যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তাতে যে রোগের প্রকোপ কিছুমাত্র কমবে না সেটা একরকম নিশ্চিত বলেই ধরে নেয়া যায়।

এমনি অবস্থা সত্ত্বেও সেদিন রাতে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যে ইস্তেহার বার করা হল তাতে যথেষ্ট আশাবাদই প্রকাশ পেয়েছে দেখা গেল। পরের দিন র‍্যান্সডক ব্যুরো থেকে ঘোষণা করা হল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যেসব বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করা হয়েছে জনসাধারণ সেগুলোকে সাগ্রহে অনুমোদন জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই ত্রিশজন রোগী তাদের অসুখের সংবাদ কর্তৃপক্ষের গোচরে এনেছেন। ডাক্তার ক্যাসল ডাক্তার রিওকে টেলিফোন করলেন :

—আচ্ছা বলো তো স্পেশাল ওয়ার্ডে কতগুলো বেডের ব্যবস্থা হয়েছে?

—মোট আশিটা হবে।

—কিন্তু আমার ধারণা বর্তমানে শহরে রোগীর সংখ্যা ত্রিশের অনেক বেশি।

—এ ব্যাপারে কিন্তু একটা জিনিস তোমাকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। রোগীদের ভেতর দুটো শ্রেণীভাগ আছে। প্রথম দলের যারা তাদের সম্পর্কে ধরে নিতে পারো তাদের ভেতর রোগের আশঙ্কাটাই আসল, আর বাকি যারা অবশ্য তারাই সংখ্যায় অধিক। তাদের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন, এই ভয় পাবার অবকাশ পায় না তারা।

—ব্যাপারটা বুঝলাম। কিন্তু কবরখানা তদারক করবার কোনো ব্যবস্থা আছে?

—সম্ভবত না। সেদিন ডাক্তার রিচার্ডকে টেলিফোনে বলেছিলাম, মনে রাখবেন, শুধুমাত্র কথায় কোনো কাজ হবে না। সত্যিকারের কার্যকরী কিছু কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা করা দরকার। আর তা না হলে কিছু না-করাই বরং ভালো।

—তা তো অবশ্যই সত্যি, কিন্তু উনি কী বললেন?

—তার পক্ষে করার কিছু নেই; তার কোনো ক্ষমতাই নেই—এই ধরনের সব অজুহাত। কিন্তু আমার নিজের ধারণা অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে।

প্রকৃত ব্যাপারটা দাঁড়ালও তাই। তিনদিনের ভেতর স্পেশাল ওয়ার্ডের দুটো ঘরই রোগীতে সম্পূর্ণ ভরে গেল। ডাক্তার রিচার্ডের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল যে স্থানীয় একটা স্কুল দখল নেয়া এবং সেখানে একটা অকজিলিয়ারি হাসপাতাল খোলার ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে।

সুতরাং এখন থেকে ডাক্তার রিও-র কাজ দাঁড়াল আগের মতো প্রতিদিন বাসায় গিয়ে রোগী দেখে বেড়ানো, প্রত্যেক রোগীর দেহে স্ফীত গ্রন্থিগুলোকে কোনোরকমে ছুরি দিয়ে ফেড়ে দেয়া; আর প্যারিস থেকে কবে রোগের বীজাণুনাশক সিরাম এসে পৌঁছবে তার জন্য অপেক্ষা করা। ডাক্তার ক্যাসল আবার তার পুরোনো বইপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলেন, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা সময় তিনি কাটিয়ে দিতে লাগলেন পাবলিক লাইব্রেরিতে। ইঁদুরগুলি প্লেগে মারা গেছে—এটাই হল তার সিদ্ধান্ত অথবা তারই খুব কাছাকাছি

কোনো রোগ এবং তার ফলে লক্ষ লক্ষ মাছির জন্ম হয়েছে শহরে—যেগুলোকে সময়মতো ধ্বংস করতে না পারলে জ্যামিতিক হারে প্লেগের বীজাণু ছড়াতে থাকবে।

ডাক্তার রিও কোনোরকম মন্তব্য করলেন না। ঠিক এইসময় বরাবর শহরের আবহাওয়া হঠাৎ আবার বেশ মনোরম মনে হল। কিছুদিন আগের বর্ষায় পথে ঘাটে কিছু কিছু পানি বা কাদা জমেছিল, সেগুলোও রোদে শুকিয়ে আবার পরিষ্কার ঝরঝরে হয়ে উঠল। এখন প্রতিদিন মাথার ওপর দেখা যায় স্বচ্ছ কোমল নীল আকাশ, সোনালি আলোর অবিরাম প্রবাহে ঝলমল করছে। যত বেলা বাড়ে রোদের ঝাঁজও বাড়তে থাকে এবং মাঝে মাঝে আকাশের দূরদেশ থেকে উড়োজাহাজের স্তিমিত ভোঁতা গর্জন ভেসে আসে। মনে হয় পৃথিবীটা যেন একটা কল্যাণময় শান্তির পরিবেশ। কিন্তু এই শান্তির পরিবেশের ভেতরও পর পর চারদিন রোগের প্রকোপ অসম্ভব দ্রুতগতিতে বেড়ে চলল, যেন প্রথমদিন মৃত্যুর সংখ্যা দেখা গেল ষোলো জন, দ্বিতীয় দিন চব্বিশ, তৃতীয় দিন আটাশ এবং চতুর্থ দিনে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল বত্রিশে। চতুর্থ দিন শিশুদের এই স্কুলপ্রাঙ্গণে একটা অকজিলিয়ারি হাসপাতাল খোলার কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল। এতদিন শহরের লোকেরা নানারকম হাসিঠাট্টা করে নিজেদের মনের উদ্বেগ এবং আকাঙ্ক্ষাকে ঢাকবার চেষ্টা করত; কিন্তু এখন মনে হল যেন হঠাৎ তাদের মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না। তাই নীরবে বিপন্ন গম্ভীর মুখে নিজের নিজের কাজ করে চলেছে সবাই। ডাক্তার রিও সেদিন প্রিফেক্টকে টেলিফোন করবেন বলে স্থির করলেন।

— দেখুন, চারদিকে অবস্থা যা দেখছি তাতে যেসব বিধি-ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে, তাতে কোনো ফল হচ্ছে বলে তো মনে হয় না।

—হ্যাঁ, সত্যি বটে, প্রিফেক্ট জবাবে বললেন—মৃত ব্যক্তিদের যে হিসাব বের হয়েছে তা আমিও দেখেছি এবং আপনি যা বলছেন, অবস্থা ভয়ঙ্কর উদ্বেগজনক বলেই মনে হচ্ছে।

—শুধু অবস্থা উদ্বেগজনক বলছেন কেন? রোগটা যে কী সে-ব্যাপারেও তো সন্দেহ প্রকাশ করবার আর কোনো অবকাশ নেই।

—দেখি, এবার কর্তৃপক্ষকে কিছু একটা নির্দেশ জারি করাবার জন্যে অনুরোধ জানাব ভাবছি।

এর পরে আবার যখন ডাক্তার ক্যাসলের সঙ্গে তার দেখা হল, প্রিফেক্টের এই উদাসীন মন্তব্যটা তখনও ডাক্তার রিও-র অন্তরে একটা নির্মম যন্ত্রণা হয়ে বিঁধছিল—এখনও বলছেন 'নির্দেশ জারি করাবেন', তিনি রূঢ় ব্যঙ্গের স্বরে কথাগুলোর পুনরুক্তি করলেন—অথচ এখন যা সবচেয়ে প্রয়োজন তা হচ্ছে নিজের কল্পনাকে কাজে লাগানো। সিরাম পাঠানোর কিছু খোঁজখবর পেলে?

—হ্যাঁ, এই সপ্তাহেই এসে পৌঁছাবে বলে জানা গেছে।

এর পরই বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা বিবরণী প্রস্তুত করে দেবার জন্য প্রিফেক্ট ডাক্তার রিচার্ডের মারফত ডাক্তার রিওকে অনুরোধ করে পাঠালেন। সেটাকে তিনি পাঠাবেন কলোনির কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দেশের জন্য। ডাক্তার

রিও যে-বিবরণ প্রস্তুত করলেন তাতে রোগের বিভিন্ন উপসর্গের বর্ণনা এবং মৃত লোকদের একটা পরিসংখ্যান জুড়ে দিলেন। সেদিন শুধু একদিনেই চল্লিশজন লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া যায়।

প্রিফেক্ট জানালেন, যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে সেগুলো যাতে কঠোরভাবে পালন করা হয়, এখন থেকে নিজেই তা তদারক করার দায়িত্ব নেবেন। প্রত্যেকটা রোগ-আক্রমণের সংবাদ বাধ্যতামূলকভাবে কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা, রোগীকে পৃথক করে রাখার এই বিধান যাতে কঠোরভাবে পালন করা হয় সেদিকেও নজর দেয়া হবে। যেসব বাসায় রোগী আছে সেখানে যাতায়াত যাতে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে এবং সেগুলো যাতে রোগ-সংক্রামক বীজাণুমুক্ত থাকে তারও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে এখন থেকে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আত্মীয়কে স্বাভাবিক সামাজিক মেলামেশা থেকে বিরত থাকবার নির্দেশ দেয়া হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিয়মিত কবর দেয়ার ব্যাপারে তদারক করবেন, অবশ্য কী ধরনের তদারক করা হবে তার বিবরণ পরে জানানো হবে।

পরের দিনই প্লেনে প্যারিস থেকে রোগ-বীজাণুনাশক সিরাম এসে পৌঁছায়। সিরাম যেটুকু পাঠানো হয়েছিল বর্তমান প্রয়োজন মেটানোর জন্য তা হয়তো যথেষ্ট, কিন্তু মহামারীর প্রকোপ হঠাৎ বেড়ে গেলে তা দিয়ে আর প্রয়োজনের সঙ্কুলান হত না। ডাক্তার রিও আবার প্যারিসে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। তার উত্তর এল যে জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য যে স্টক ছিল তার সবটাই নিঃশেষ হয়ে গেছে, এরই ভেতর আশেপাশের শহরতলি থেকে বসন্ত এগিয়ে আসতে শুরু করেছিল শহরে।

এখন রাস্তার দুধারে এবং বাজারে বাজারে পুষ্পবিক্রেতাদের চুপড়িতে দেখা যায় শুধু ম্লান গোলাপের স্তূপ, বাতাস পর্যন্ত ভারী হয়ে ওঠে তাদের গন্ধের প্রাচুর্যে। শুধুমাত্র বাইরে থেকে দেখলে অন্যবারের থেকে এবারের বসন্তঋতুকে তফাৎ করবার মতো তেমন কিছুই ছিল না। শুধুমাত্র যে-সময়গুলোয় শহরে সাধারণত লোকজন চলাচলের খুব ভিড়, তখন ঠাসাঠাসি ভর্তি ট্রামগুলো একটার-পর-একটা ছুটতে থাকে, দিনের বাকি সময় তাদেরকে দেখা যায় শূন্য। ভেতরটা অপরিষ্কার নোংরা। জো তারিউ, ডাক্তার ও আগের মতোই দুপুরবেলা সামনের ব্যালকনির সেই খুদে লোকটার গতিবিধি লক্ষ্য করেন। আর সেও তার পুরোনো অভ্যাসমতো নিচে রাস্তার ওপরের বেড়ালগুলোর দিকে লক্ষ্য করে থুতু ছোড়ে। গ্রীষ্ম প্রতি সন্ধ্যায় দ্রুত বাসায় ফিরে এসে তার সেই রহস্যজনক সাহিত্য নিয়ে শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কটার্ডের পূর্বের সেই বিশৃঙ্খল জীবনের তেমন কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় না। পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট এখন সাহেব তাঁর পোষা জীবজন্তুগুলোকে সেই একইভাবে নিয়মিত বাইরে বের করে আনেন। স্পেনদেশের সেই বৃদ্ধ হাঁপানির রোগীটাকেও দেখা যায় পুরোনো দিনের অভ্যাসমতো কতগুলো মটরদানা একপাত্র থেকে তুলে গুনে গুনে অপর একটা পাত্রে রাখছে।

সাংবাদিক র‍্যাঁবোরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় মাঝে মাঝে, আগের মতোই যখন যা দেখেন সেদিকেই ঝুঁকে পড়েন বিপুল আগ্রহ নিয়ে। সঙ্কের সময় আগের মতোই রাস্তায় রাস্তায় মানুষের ভিড় জমে, সিনেমাহলের সামনে টিকেটের জন্যে মানুষের দীর্ঘ লাইন হয়। এমনকি মহামারীর প্রকোপটাও যেন এখন আর আগের মতো নেই,

কোনো কোনো দিন মৃত্যুর সংখ্যা দেখা যায় মাত্র দশজন। তারপর হঠাৎ একদিন আবার মৃত্যুর সংখ্যা যেন একলাফে উপরের দিকে অনেকখানি উঠে গেল। মৃত্যুর সংখ্যা যেদিন আবার ত্রিশের কোঠায় গিয়ে উঠল, সেদিন ডাক্তার রিওকে প্রিফেক্ট একখানা সরকারি টেলিগ্রাম পড়তে দিলেন। টেলিগ্রামখানা তার হাতে দিয়ে প্রিফেক্ট মন্তব্য করলেন, এতদিনে মনে হচ্ছে ওপরওয়ালারা সত্যিই ভয় পেয়েছেন।

কিন্তু এত দেরিতে!

টেলিগ্রামে নির্দেশ ছিল : 'শহরে প্লেগের মহামারী দেখা দিয়েছে বলে ঘোষণা করো, বাইরের লোকের শহরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করো।'

দ্বিতীয় পর্ব

এটা থেকে অবশ্যই বলা যায় যে এখন থেকে প্লেগের ব্যাপারটা আমাদের সবার কাছেই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল। এতদিন অবধি শহরের অধিবাসীরা চারপাশে এসব বিচিত্র ঘটনা ঘটতে দেখে বিস্ময়বোধ করলেও তারই ভেতর যতদূর সম্ভব হয়তো এমনিভাবেই বরাবর চলত তাদের জীবন। কিন্তু যেদিন থেকে শহরের গেট বন্ধ করে দেয়া হল, সেদিন প্রত্যেকেই এবং কাহিনীকার নিজেও অনুভব করল এখন থেকে তাদের অবস্থা বলতে গেলে অনেকটা এক-নৌকার যাত্রীদের মতো। যেভাবেই হোক তাদেরকে জীবনের এই নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। প্রকৃত প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-ব্যথা, যা স্বাভাবিক অবস্থায় একটি একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি, তাও এখন এমন একটা বেদনার অনুভূতি হয়ে উঠল সবাই যার সমান শরিক, সবাই তাতে সমভাবে ব্যথিত। এবং সামনে যদি দীর্ঘ সময় শহরের অধিবাসীদের নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হয়, তখন এই প্রিয়জনদের বিচ্ছেদবেদনা এবং তারই সঙ্গে একটা অনিশ্চিত শঙ্কা তাদের জন্যে মানসিক প্লেগের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শহরের গেট বন্ধ করে দেয়ার পরবর্তী ফল হিসাবে লক্ষ করবার মতো যেসব জিনিস ঘটতে থাকে, তাদের অন্যতম হচ্ছে কিছু বঞ্চনা, যার জন্যে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। আকস্মিক এমনি কতগুলো বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হল শহরের অধিবাসীদের। মা এবং ছেলেমেয়ের দল, প্রেমিক-প্রেমিকা এবং স্বামী-স্ত্রীর দল, যারা মাত্র কয়েকদিন আগেও পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সহজভাবে ধরে নিয়েছিল তাদের এই ছাড়াছাড়ি অল্পসময়ের জন্য। স্টেশনে প্লাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে তারা সেদিন সামান্য দু-একটা মামুলি কথাবার্তা বলাবলি করে বা সামান্য একটু চুমু খাওয়াখাওয়ি করে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল, কারণ তাদের তখন বিশ্বাস ছিল যে কয়েকদিন পরেই—খুব দীর্ঘ সময় হলেও কয়েক সপ্তাহ পরেই—আবার তাদের সাক্ষাৎ এবং মিলন হবে। কাছের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষের যে একটা অন্ধবিশ্বাস থাকে সেই বিশ্বাসের প্রতারণায় পড়েছিল বলেই হয়তো এমনি করেছিল তখন তারা। এমনকি তারা এই বিদায় দিতে এসে নিজেদের দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্মের পর্যন্ত এটুকু ব্যাঘাত ঘটতে দেয়নি, আর এখন কোথাও কোনোরকমের সতর্কতা নেই, তাতেই হঠাৎ দেখল, বড় অসহায়ভাবে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এবং পরস্পরের সঙ্গে যে আবার দেখা হবে বা সাধারণ যোগাযোগ করবে সে-পথেও প্রচুর বাধা। কারণ প্রকৃতপক্ষে এ-সম্পর্কে সরকারি নির্দেশটা সাধারণের গোচরে আনার বেশ কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই শহরের গেট বন্ধ করে দেয়া হয়। কাজেই কারো ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করার কোনো অবকাশই ছিল না তখন আর। বস্তুত এমনও বলা যায়

যে এই নিষ্ঠুর বিপর্যয় উপস্থিত হওয়ার প্রথম যে ফল তা হচ্ছে, শহরের অধিবাসীরা প্রত্যেকেই এখন থেকে এমন একধরনের আচরণ করতে বাধ্য হল যেন ব্যক্তিগত অনুভূতি বলে কোনোকিছু ছিল না তাদের।

শহর ত্যাগ নিষিদ্ধ করার আদেশটা বলবৎ করা হল যেদিন থেকে, সেদিন প্রথমভাগে শহর ছেড়ে চলে যেতে চায় যারা এমনি এক জনতা আবেদনপত্র নিয়ে এসে প্রিফেক্টের অফিস ঘেরাও করে ফেলে। প্রত্যেকের আবেদনপত্রে যেসব অজুহাত তারা দেখিয়েছিল তার কোনোটাই কোনোটার থেকে কম জোরালো নয়, কিন্তু অনুমতি দেয়ার কথা বিবেচনা করতে গিয়ে দেখা গেল প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই তা সমান অসম্ভব। সত্যি কথা বলতে কী, আমরা সবাই যে কোণঠাসা হয়ে পড়েছি। বিশেষ ব্যবস্থা, আনুকূল্য, অগ্রাধিকার এসব কথাগুলোর যে আর কোনো কার্যকরী তাৎপর্য নেই সেটা উপলব্ধি করতে আমাদের বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল। এমনকি সাধারণ চিঠিপত্র লেখালেখির যে সামান্য আনন্দ তা থেকেও বঞ্চিত হতে হল সবাইকে। ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াল এইরকম : সাধারণ, যোগাযোগব্যবস্থার মাধ্যমে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করা যে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল শুধু তাই নয়, পরে দ্বিতীয় আর এক দফা যে নির্দেশ জারি করা হল, তাতে চিঠিপত্র বাইরে পাঠাবার সময় রোগের বীজাণু যাতে শহরের বাইরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সে-ব্যাপারেও সাবধানতা নেয়ার জন্যে চিঠিপত্র লেখালেখিই একেবারে নিষিদ্ধ করে দেয়া হল। প্রথম প্রথম কিছুদিন অবশ্য অনুগ্রহপ্রাপ্ত কেউ কেউ গেটের দারোয়ানদের বুঝিয়ে নিজেদের কিছু কিছু সংবাদ বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু সেগুলোও সম্ভব হয়েছিল বড় আকারে মহামারী শুরু হবার গোড়ার দিকে, যখন পর্যন্ত গেটের দারোয়ানরা সাধারণত মানবতাবোধের অনুশাসন মেনে চলাকে স্বাভাবিক কর্তব্য বলে মনে করত। কিন্তু আরো কিছুদিন কাটবার পর বর্তমান পরিস্থিতির বিপদময় সম্ভাবনা সম্পর্কে যখন তাদেরকে বারবার সচেতন করে দেয়া হয় তখন তারা এসব কাজের দায়িত্ব নিতে সোজাসুজি অস্বীকার করে বসল। কারণ, এসবের ভবিষ্যৎ ফলাফল কী দাঁড়াবে তা অনুমান করাও আর তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

প্রথমদিকে অন্যান্য শহরের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করার ব্যাপারে কোনো বাধানিষেধ ছিল না। কিন্তু তার ফলে যখন টেলিফোন-কেন্দ্রগুলোয় অসম্ভব রকমের ভিড় জমতে লাগল এবং লাইন পেতেও বেশ বিলম্ব হতে লাগল, তখন এই টেলিফোনে যোগাযোগ করাও কয়েকদিনের জন্যে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হল। পরে আবার টেলিফোন ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হল বটে কিন্তু তা শুধু জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাকার জরুরি বলতে যা বোঝায় সেইসব কাজের জন্যে। কাজেই তখন বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্যে আমাদের একমাত্র নির্ভর হয়ে দাঁড়াল টেলিগ্রাম। গভীর সখ্যসূত্রে, স্নেহের সূত্রে, এমনকি দৈহিক প্রেমের সূত্রে, পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ যেসব মানুষ, তারা হঠাৎ দেখল তাদের পুরোনো সম্পর্কের নিদর্শন হাতড়াতে হচ্ছে তাদেরকে দশ অক্ষরের টেলিগ্রামের ক্ষুদ্র পরিসরের ভেতর। কিন্তু যেহেতু টেলিগ্রামে ব্যবহার করা যায় যেসব শব্দ, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাদের নিঃশেষ হতে তেমন সময়ের প্রয়োজন হয় না; সুতরাং

অল্প কিছুদিনের ভেতর দেখা গেল, দীর্ঘজীবন কেটে চলেছে পরস্পর, কিন্তু তাদের ভেতরের সংযোগ বা তাদের হৃদয়ের গভীর অর্থপূর্ণ প্রকাশ কীভাবে হয়ে গেছে অতিপ্রচলিত ধরাবাঁধা কতগুলো শব্দ, যেমন 'তোমার শরীর ভালো', সব সময় তোমার কথা মনে পড়ে প্রিয়', ইত্যাদির বিনিময়ের ভেতর।

কিন্তু আমাদের ভেতর অল্প কিছুসংখ্যক লোক ছিল, যারা চিঠিপত্র লেখার কাজ অব্যাহত রেখে চলল এবং এই অবস্থার ভেতরও কীভাবে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে সংযোগ রক্ষা করা যায় তাই নিয়ে নানা কলাকৌশল আঁটতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে লাগল। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই এসব চেষ্টার কোনো ফল হত না এবং কদাচিৎ কোনো ক্ষেত্রে তা সফল হলেও তা জানবার উপায় ছিল না; কারণ—কোনো চিঠির আর উত্তর পাওয়া যেত না কখনও। সুতরাং একই চিঠি বারবার করে আরম্ভ করা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একই সংবাদ বা একই ব্যক্তিগত অনুনয় বারবার করে কপি করা, এই চলত সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ ধরে। ফলে জীবনময় যেসব শব্দ, বলতে গেলে ঠোঁটায় হৃদয়ের রক্ত সঞ্চারিত করা যাদের ভেতর, অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাদের অর্থের সঞ্চয় যেন সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল। তারপরেও এই শব্দগুলোকে আমরা যান্ত্রিকভাবে কপি করে চললাম, এই মৃত শব্দগুলোকেই ব্যবহার করে আমাদের ভেতর তখন যে অগ্নিপরীক্ষা চলছিল তারই কিছুটা ধারণা বাইরের পৃথিবীতে পৌঁছে দেবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলাম। এবং শেষ অবধি অকারণ বারবার এই স্বগতোক্তির চেয়ে শূন্য দেয়ালের সঙ্গে নিষ্ফল একক ভাষণের চেয়ে, দীর্ঘদিনের প্রচলনে জীর্ণ টেলিগ্রামের ধরাবাঁধা গৎই আমাদের কাছে অনেক শ্রেয় বলে মনে হতে লাগল এবং আরো কিছুদিন কাটবার পর যখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে কারুরই আর শহর ছেড়ে বাইরে যাবার বিন্দুমাত্র আশা নেই, তখন প্রশ্ন উঠল যে প্লেগ শুরু হবার আগেই যারা বাইরে গেছে তাদের ফিরে আসবার অনুমতি দেয়া হবে কি?

ব্যাপারটা নিয়ে কিছুদিন আলাপ-আলোচনার পর কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিলেন যে, এই অনুমতি দিতে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও জানিয়ে দিলেন যে, একবার যারা ফিরে আসবে কোনো অবস্থাতেই আর তাদেরকে শহর ছেড়ে যেতে দেয়া হবে না, তা সে যাই ঘটুক না কেন। শহরে এসে ঢোকার অর্থ হবে বরাবর এখানেই থেকে যাওয়া। গোটাকতক পরিবার—প্রকৃতপক্ষে তাদের সংখ্যা ছিল খুব নগণ্যই—এই অবস্থার যেন তেমন গুরুত্ব দিতে চাইল না; পরিবারের যারা বাইরে ছিল, তাদেরকে ফিরে পাবার আগ্রহ-আতিশয্যে পরিণামের চিন্তাকে যেন তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দিতে চাইল তারা এবং এই সুযোগে যেন ফিরে আসে, এই বলে বাইরে যারা ছিল তাদের কাছে টেলিগ্রাম করে পাঠাল। কিন্তু ইতিমধ্যেই যারা প্লেগের যন্ত্রণা পড়ছিল, অল্প কিছুদিনের ভেতর তারা উপলব্ধি করল, এই ব্যবস্থার ফলে পরিবারের এইসব লোকদের অকারণ ভয়ংকর বিপদের মধ্যে এনে ফেলা হবে, অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও, তাদের অনুপস্থিতিকেই শেষপর্যন্ত মেনে নিল তারা।

প্লেগের মহামারীর যখন চরম অবস্থা, সেই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটে যেখানে স্বাভাবিক হৃদয়ের টান মৃত্যুভয়কেও পরাভূত করে এবং ব্যাপারটা একটা অত্যন্ত করুণ

রূপ নেয়। সবার পক্ষে যেটা অনুমান করা স্বাভাবিক, ব্যাপারটা কিন্তু তেমনি দুজন অল্পবয়স্ক তরুণ-তরুণীকে নিয়ে ঘটেনি—যাতে করে সহজেই ধরে নেয়া যেতে পারত যে দুর্বার হৃদয়াবেগ যে-কোনো কষ্টের মূল্যে পরস্পরের সান্নিধ্য লাভের জন্য তাদেরকে আকুল করে তুলেছিল। যে দুজনকে নিয়ে এই ঘটনা, তাঁরা হচ্ছেন বৃদ্ধ ডাক্তার ক্যাসল এবং তাঁর স্ত্রী। তাঁদের বিবাহিত জীবনও ছিল বেশ দীর্ঘদিনের পুরোনো। প্লেগ শুরু হবার মাত্র কিছুদিন পূর্বে ম্যাদাম ক্যাসল গিয়েছিলেন কাছাকাছি এক শহরে বেড়াতে। 'ডার্বি ও জোয়ান ছকের' কোনো আদর্শ বিবাহিত জীবন তাদের ছিল না, কাহিনীকারের বলবার যথেষ্ট কারণ আছে যে বিবাহিত জীবনে তারা পরস্পরের কাছ থেকে যা যা আশা করতে পারতেন, তার সবকিছুই যে পেয়েছিলেন, এমন নিশ্চিত বিশ্বাস সম্ভবত তাদের দুজনের কারুরই ছিল না। কিন্তু এই দীর্ঘ নির্মম বিচ্ছেদ একটা উপলব্ধিই তাদের এনে দিয়েছিল : আর যাই হোক একে অন্যকে ছেড়ে বেঁচে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং এই আকস্মিক আবিষ্কারের আবেগই সম্ভবত প্লেগের যে-কোনো বিপদকে তাদের কাছে তুচ্ছ করে তুলেছিল। কিন্তু তাদের এই ব্যাপারটা ছিল একটা অনন্য ব্যতিক্রম। কারণ বেশির ভাগ লোকের কাছেই একটা জিনিস ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, যতদিন প্লেগের উপশম না হবে ততদিন প্রিয়জনের ছুটি থাকতেই হবে প্রত্যেককে এবং প্রায় লোকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এতদিন যে হৃদয়াবেগের অনুশাসনে বাঁধা ছিল তার সব এবং নিজের যে হৃদয়াবেগকে সে আদ্যোপান্ত ভালোভাবেই চিনত বলে তার ধারণা ছিল, তা এখন হঠাৎ নতুন রূপ নিয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে ওরাও-এর লোকদের হৃদয়াবেগের ভেতর জটিল বলে তেমন কিছু ছিল না। যেসব স্বামী বরাবর স্ত্রীর ওপর নিটোল বিশ্বাস রেখে এসেছেন তারা নিজেরাই হঠাৎ দেখে অবাক হলেন যে নিজের নিজের স্ত্রী সম্পর্কে তারা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠতে শুরু করেছেন। প্রেমিকদের ক্ষেত্রেও দেখা গেল সেই একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটতে। কিন্তু নিজেদেরকে এক-একজন ভালো 'জোয়ান' হিসাবে কল্পনা করত যারা তারাই হয়ে উঠল এখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার আদর্শস্থানীয়। কতশত ছেলেমেয়ে, যারা মায়ের চোখের সামনেই বেড়ে উঠেছে অথচ হয়তো মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখেনি কোনোদিন, তারাই এখন স্মৃতির পর্দায় ভেসে-ওঠা অনুপস্থিত মাতৃমুখের প্রতিটা কুঞ্চনের কথা চিন্তা করতে গিয়ে গভীর অনুশোচনায় কাতর হয়ে উঠতে লাগল যেন। এই কঠোর এবং সুস্পষ্ট বঞ্চনা ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা সবাইকে এমনি হতচকিত করে ফেলেছিল যে আমাদের পেছন পেছন অনুক্ষণ ঘুরত যেসব অশরীরী অস্তিত্ব, যারা কাছে থাকতেও মনে হত ইতিমধ্যেই অনেক দূরে, তাদের মূক আবেদনের বিরুদ্ধে যে কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দেখাব সে পারঙ্গমতাও বোধহয় এখন আর আমাদের ছিল না। বস্তুত দুরকমের দুঃখ-কষ্ট সইতে হচ্ছিল আমাদেরকে। প্রথমত আমাদের নিজেদের যে দুঃখ-কষ্ট সেগুলো তো ছিলই; উপরন্তু বাইরে ছিল যারা— পুত্র, মা, স্ত্রী, রক্ষিতা—এদের দুঃখ-কষ্টের কথা ভাবতে গেলে সেগুলোও হয়ে উঠত আমাদেরই আর-একধরনের দুঃখ-কষ্ট।

ভিন্নতর অবস্থায় হয়তো শহরের অধিবাসীরা নিজেদেরকে কিছুটা অধিক কর্মব্যস্ততা বা কিছুটা অধিক সামাজিক মেলামেশার ভেতর ডুবিয়ে দিয়ে এ থেকে নিষ্কৃতি লাভের একটা পথ পেত। কিন্তু এই বিপর্যয় তাদেরকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছিল, শহরের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতর প্রাণহীন রুটিন মেনে চলার মতো একই রাস্তায় চলে ফিরে বেড়ানো এবং দিনের-পর-দিন একই অতীত স্মৃতির রোমন্থন করে মিথ্যা সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করা এরই ভেতর সীমিত হয়ে উঠেছিল তাদের জীবন। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে একই সব রাস্তায় ফিরে ফিরে আসতে হত বারে বারে এবং শহরটা অত্যন্ত ছোট বলে যখন সময় ভালো ছিল তখনও এইসব রাস্তাতেই ঘুরত ফিরত তারা। তবে তখন যাদেরকে সঙ্গী হিসাবে পেত এখন আর তাদেরকে কাছে পাবার উপায় ছিল না।

সুতরাং প্লেগ যে জিনিসটা আমাদের জন্যে নিয়ে আসে তা হচ্ছে এই নির্বাসিত জীবন। কাহিনীকারের দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্যক্তিগত উপলব্ধি তার হয়েছিল এবং যে উপলব্ধি তার বন্ধুদেরও অনেকের হয়েছিল বলে তারা তার কাছ স্বীকার করেছিল, সেটাকে তিনি সাধারণভাবে সেই সময়কার শহরের সবার উপলব্ধি বলে লিপিবদ্ধ করতে পারেন। নিঃসন্দেহে সেই অনুভূতি ছিল নির্বাসনের—নিয়ত অন্তরের ভেতর একটা সীমাহীন শূন্যতাবোধের, বারে বারে অতীতের পানে ফিরে তাকাবার অথবা সময়ের গতিকে ত্বরান্বিত করবার একটা অযৌক্তিক ইচ্ছার এবং স্মৃতির তীক্ষ্ণ খোঁচা আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো অনুক্ষণ দংশন করত না। কখনও কখনও সুখময় কল্পনা নিয়ে মনের ভেতর নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসত কেউ কেউ। দূরে শহরের বাইরে ছিল যে প্রিয়জন সে যেন ফিরে এসেছে। এখনই সে বাইরের দরজায় বেল বাজাবে অথবা ক্ষণেকের ভেতর সিঁড়িতে তার পায়ের পরিচিত শব্দ শোনা যাবে এবং এমনিভাবে উৎকর্ণ করে রাখত নিজেদেরকে, কিন্তু বাইরে থেকে যে আসবে, সন্ধ্যার ট্রেনে আসলে সচরাচর যে-সময়টাই তার বাসায় পৌঁছবার কথা, সে-সময়টাই যদি ট্রেনে আসলে সচরাচর যে-সময়টাই তার বাসায় পৌঁছবার কথা, সে-সময়টাই যদি ইচ্ছা করে কেউ বাসায় থেকেও যেত বা ট্রেন-চলাচল যে আর নেই সেটা যদি বিভিন্ন অজুহাতে ভুলে থাকবার চেষ্টাও করত তবুও অত্যন্ত সুস্পষ্ট কারণে এই বিশ্বাস-বিশ্বাস খেলা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে চাইত না। সবসময় ঘুরেফিরে সেই মুহূর্তটা আসত যখন বাইরে থেকে ট্রেন যে আর আসে না, এই বাস্তব সত্যটার মুখোমুখি হতে হত সবাইকে। আর ঠিক সেই সময়গুলোই সবাই অনুভব করত প্রিয়জনদের এই-যে কাছে না-পাওয়া এ হয়তো দীর্ঘদিন ধরেই চলবে, অনুভব করত সামনে বিস্তৃত যে অনিশ্চিত সম্ভাবনাময় দিন তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় না-আসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সংক্ষেপে, আবার সেই বন্দি অবস্থার ভেতর ফিরে আসতে হত সবাইকে এবং তখন শুধু একটা অতীত ছাড়া চাইবার মতো আর কারুর কিছু থাকত না; আর যদি কেউ ভবিষ্যতের আশা নিয়ে বাঁচবার লোভ করত, অচিরেই সে লোভ ত্যাগ করতে হত তাদের, যারা কল্পনার কাছে সহজেই নিজেদেরকে সমর্পণ করে বসে তাদের ওপর অনিবার্যভাবে যে আঘাত আসে তা আসতে যেটুকু বিলম্ব।

এখানে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো ছিল। যে অভ্যাসটা তাদের

ভেতর গড়ে উঠবে বলে সহজেই আশা করা যেতে পারত, শহরের অধিবাসীরা কিন্তু খুব অল্পসময়ের ভেতর, এমনকি সাধারণভাবে মেলামেশার সময়ও, নিজেদেরকে তা থেকে সংযত করে রাখতে পেরেছিল। এই অভ্যাসটা হচ্ছে নির্বাসিত অবস্থা, কতদিন ধরে চলতে পারে তা অনুমান করবার চেষ্টা করা। তার কারণটা ছিল অবশ্য অনেকটা এইরকম : যারা একেবারেই নৈরাশ্যবাদী, তারা যখন আগেভাগেই মনের মধ্যে নিশ্চিত স্থির করে নিয়েছে যে মোটামুটি ছ-মাসের আগে আর এই বিপর্যয়ের উপশম হবে না এবং এই ছ-মাস দুঃসময়ের ভেতর চরম দুঃখ-কষ্ট যতকিছু ঘটতে পারে তাও আঁচ করে নিয়ে আগে থাকতেই কল্পনায় সয়ে নিয়েছে, বহু কষ্ট সাধনের পর নিজের নিজের মনোবলকে এমন একটা বিন্দুতে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছে যেখানে তা অনড় এবং দেহের ও মনের অবশিষ্ট সমস্ত শক্তিকে একত্র করেছে সামনে সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ, দিনের-পর-দিন যে কঠোর পরীক্ষা চলবে ধৈর্য এবং সাহসের সঙ্গে তার সঙ্গে যুঝবে বলে।

যখন সাধ্যমতো সবরকম প্রস্তুতি নেয়া তাদের সারা, তখন হয়তো হঠাৎ কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে সে ইঙ্গিত করল বা কাগজে একটা প্রবন্ধ পড়তে পড়তে তা থেকে পেল ইঙ্গিতটা অথবা নিজেদের মনে হয়তো এরকম একটা অনিশ্চিত সন্দেহই জাগল অথবা দূরদৃষ্টির ক্ষণিক প্রভায় আপনাতেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল ব্যাপারটা; বিপর্যয়ের যে ছ-মাসের মধ্যেই উপশম হবে তা বিশ্বাস করবার মতো সঙ্গত কারণ তো কিছুই নেই—এক বছর বা তার চেয়েও অধিক সময় ধরেও তা চলতে পারে।

এই মুহূর্তগুলোয় শহরের অধিবাসীদের সাহস, ইচ্ছাশক্তি এবং ধৈর্যের ক্ষমতা আকস্মিক ভেঙে পড়ত যে তখন তাদের মনে হত, হতাশার যে অতলে তারা ডুবেছে তা থেকে নিজেদেরকে কোনোদিন টেনে তুলতে পারবে সে-সম্ভাবনা বোধহয় আর নেই। সুতরাং এ থেকে নিষ্কৃতি লাভের অনিশ্চিত দিনটা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা যতদূর সম্ভব মন থেকে দূরে রাখত সবাই। ভবিষ্যতের পানে তাকানোর অভ্যাসটাও ছাড়তে বাধ্য করেছিল তারা নিজেদেরকে এবং দৃষ্টিকে, যাকে বলে পায়ের গোড়ার মাটি, তারই উপর যেন নিবদ্ধ রাখত সবসময়। কিন্তু স্বভাবতই এই-যে পরিণামদর্শিতা, এইরকম একটা সঙ্কট-অবস্থাকে পরিষ্কার দেখেও না-দেখার ভান করা এবং তার সাথে যুঝবার চেষ্টা না-করা, এর জন্যে যে তাদের সমপরিমাণ লাভ হত তা ঠিক নয়। কারণ তাদের মনের ভেতর যে বিতৃষ্ণা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল তখন তাকে প্রাণপণে এড়াতে গিয়ে এই অবস্থার ভেতরেও যে-মুহূর্তগুলো হয়তো পরিস্থিতিকে তাদের জন্য কিছুটা লাঘব করে আনতে পারত, যখন মনে-মনে কোনো প্রিয়জনের সঙ্গে পুনর্মিলনের চিত্র কল্পনা করে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও হয়তো প্লেগের কথা ভুলে থাকতে পারত, এমন মুহূর্তগুলো থেকেও তারা নিজেদেরকে বঞ্চিত করত। কিন্তু সবকিছু হিসাব করে দেখলে অনুমান করা কঠিন নয় যে এমন মুহূর্তের সংখ্যাও খুব কম ছিল না। সুতরাং নিরন্তর উত্থান আর পতনের মধ্যপথে তাদের জীবনের এই-যে গতি, এ যেন ছিল শুধু জীবনের স্রোতে ভেসে চলা, সত্যিকারের বাঁচা নয়; উদ্দেশ্যহীনভাবে দিন কাটানো এবং নিষ্ফল স্মৃতিচারণ করা—এই দুয়ের অসহায় শিকার হিসাবে তখন যে নির্মম সংকটের ভেতর তারা বাস করেছিল, তার কঠিন

অস্তিত্বকে মেনে নিয়েই কেবল তারা নিজেদের দৈহিক সারবত্তার দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারত, অন্যথায় তারা ছিল যেন কতকগুলো অশরীরী চলমান ছায়ামাত্র।

যার কোনো উপশমই নেই এমন যে ব্যথা যা প্রত্যেক কয়েদির এবং নির্বাসিতের ভাগ্যলিপি তারই সাথে এমনিভাবে পরিচয় হল আমাদের শহরবাসীদের। এই ব্যথা হচ্ছে যে স্মৃতির আর কোনো মূল্যই নেই এমনি অতীত স্মৃতিকে সম্বল করে বেঁচে থাকতে বাধ্য হওয়া। এমনকি তাদের যে পেছনের জীবন, যার সম্পর্কে অনুক্ষণ ভাবনাচিন্তা করত তারা, তাও যেন এখন এনে দিত অনুশোচনার স্বাদ। কারণ যে স্ত্রীরা পুরুষের ফেরার প্রতীক্ষায় এখন দিন গুনত, তারা প্রত্যেকে, অতীতে তার সাহচর্যে যেসব জিনিস তখন করতে পারত অথচ তা করার চেষ্টা করেনি বলে এখন মনে-মনে অনুশোচনা বোধ করত। এখন আবার সেই প্রত্যেকটা অপূর্ণতাকে পূর্ণতা হিসাবে সংযুক্ত করে দেখতে চাইত অতীতজীবনের সঙ্গে, যেমন এমন নিষ্ফল চেষ্টা করত বর্তমানের এই বন্দিজীবনের প্রত্যেকটা কাজকর্মের মধ্যে, তা সে অত্যন্ত সুখের হলেও অনুপস্থিত প্রিয়জনকে পাবার। এইভাবে তাঁদের জীবনে সবসময় কোনো-না-কোনোকিছুর অভাব থেকেই যেত যেন। অতীতের প্রতি বৈরী মনোভাব, বর্তমান জীবনের প্রতি অসহিষ্ণু এবং ভবিষ্যৎ জীবন থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল এখন সেইসব ব্যক্তিদের মতো, মানুষের ন্যায়বিচার বা ঘৃণা যাদেরকে কারার অন্তরালে বাস করতে বাধ্য করে। সুতরাং এই নিরবচ্ছিন্ন অবসরের দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার আমাদের একমাত্র উপায় ছিল তখন মনে-মনে কল্পনা করা যে আবার ট্রেন-চলাচল শুরু হয়েছে, কল্পনা করা যে চারদিকের নিঃশব্দ দরজা বেল বাজার শব্দে ভরে উঠেছে। যদিচ কার্যত দরজার বেল তার একগুঁয়ে নীরবতা ভেঙে আর বাজত না কোনোদিনই।

তথাপি এই অবস্থাকে যদি নির্বাসন বলতে হয় তাহলে আমাদের অধিকাংশের জন্যে এ ছিল নিজের নিজের গৃহে নির্বাসন ভোগের মতো এবং কাহিনীকারের যদিও এই সাধারণ ধরনের নির্বাসনের অভিজ্ঞতাই হয়েছিল, কিন্তু তিনি সাংবাদিক র‍্যাঁবেয়ার এবং তারই অনুরূপ অবস্থার আরো কিছুসংখ্যক লোক যাদেরকে অধিকতর কঠিন বঞ্চনা সইতে হয়েছিল তাদের কথাও ভুলতে পারবেন না। কারণ তারা এখানে এসেছিলেন শুধুমাত্র বেড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং হঠাৎ প্লেগের বিপ্লবে পড়ে গিয়ে যে যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন; কাজেই তারা একদিকে যেমন যে-প্রিয়জনের সাহচর্য পেতে চাইতেন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তেমনি বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে পড়ে গিয়েছিলেন নিজের নিজের গৃহ থেকে। এই সাধারণ নির্বাসনের ভেতরও তাদের নির্বাসনই ছিল চরম, কারণ সময় তার মতো যেসব দুঃখ-কষ্ট বয়ে আনত তা আমাদের জন্যে যা তাদের জন্যেও ছিল তাই-ই, কিন্তু তাদের দুঃখ-কষ্টের অন্য একটা কারণ ছিল দেশের ব্যবধান। দূরদেশে আটকা পড়ে যাওয়ার এই চিন্তা একটা বদ্ধ সংস্কারের মতো তাদের মনকে সবসময় আচ্ছন্ন করে রাখত। এই শহরটা যেন তাদের কাছে হয়ে উঠেছিল বেদনাপীড়িত মানুষের প্রকাণ্ড একটা পুরী যা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং যার দেয়ালের অন্তরালে আটকা পড়ে গিয়ে তারা গৃহহারা, নিজের

নিজের বাসভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই এর দেয়ালে দেয়ালে প্রতিমুহূর্তে যেন মাথা ঠুকত তারা এবং নিঃসন্দেহে এরাই ছিল সেইসব লোক যাদেরকে দিনের বেলায় সর্বক্ষণ, এই ধূলামলিন শহরে অসহায় অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। যেন নিঃশব্দ প্রার্থনায় তারা রাত্রির আগমন কামনা করত, যে রাত্রিকে চিনত শুধু তারাই, আর কামনা করত নিজের নিজের বাসভূমিতে যে প্রত্যুষ দেখে এসেছে তার। ক্ষণিকের সামান্য একটু শুভ ইচ্ছিত বা সুসংবাদ দিয়ে যেন নিজেদের অন্তরের গভীর নৈরাশ্যকে পূরণ করতে চাইত তারা, কিন্তু হঠাৎ পলায়মান একঝাঁক দোয়েল বা সূর্যাস্তকালীন ক্ষণিক শিশিরপাত অথবা জনহীন বনপথের ওপর সূর্যকিরণের বিচিত্র আলপনা দেখলে যেমন মনের ভেতর একটা অপ্রতিভ ভাবের উদয় হয় এও তাদের কাছে মনে হত অনেকটা তেমনি। বাইরের যে-জগৎ অনুক্ষণ সবকিছু থেকে মুক্তি এনে দিতে পারে তা থেকে যেন দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখত তারা, কারণ তাদের একমাত্র চেষ্টা ছিল তখন নিজেদের কল্পনার সৃষ্টি কতকগুলো অপদার্থকে বাস্তব ভেবে নিয়ে মনের ভেতর অনুক্ষণ লালন করা! কল্পনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মনের ভেতর এমন একটা দেশের চিত্র গড়ে তোলা যেখানকার সূর্যালোকের বিশেষ লীলাবৈচিত্র্য বা গোটা দুই-তিন পাহাড় অতিপরিচিত বা একটা বৃক্ষ অথবা কোনো নারীর হাসির বিশেষ একটা ভঙ্গিমা তাদের সামনে এমন একটা জগৎ সৃষ্টি করত, অন্য কোনোকিছু দিয়ে যার পূরণ সম্ভব ছিল না।

সবশেষে এবং আরো বিশেষ করে এবার পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রসঙ্গে আসা যাক। কারণ, তাদের কথায় সবচেয়ে অধিক আগ্রহ থাকাটা স্বাভাবিক এবং হয়তো কাহিনীকারের নিজেরও তাদের সম্পর্কে বলবারই অধিকতর যোগ্যতা আছে। তাদের মন সহজেই একটা-না-একটা অনুভূতির শিকার হয়ে পড়ত, বিশেষ করে অনুশোচনার। কারণ তারা বর্তমানে যে-অবস্থার মধ্যে ছিল তাতে তাদের পক্ষে নিজের মনের প্রত্যেকটা অনুভূতি বা হৃদয়াবেগকে একধরনের উত্তেজনাময় নিরাসক্তির সাথে বিচার-বিশ্লেষণ করাটা সহজ হত যেন এবং সেই অবস্থায় নিজেদের দোষত্রুটি যখন নিজেদের চোখে ধরা পড়ত না—এমন বড় একটা ঘটতে দেখা যেত না। যে প্রিয়জন অনুপস্থিত সে তখন কী করতে পারে—মনে-মনে তারই একটা সুস্পষ্ট চিত্র কল্পনা করতে গিয়ে যখন অসুবিধায় পড়তে হত, তা থেকেই প্রথম নিজেদের দোষত্রুটি সম্পর্কে সচেতনতার উপলব্ধি আসত তাদের। যখন প্রত্যেকে দেখত অনুপস্থিত প্রেমিক বা প্রেমিকা, অতীতে কীভাবে তার জীবন যাপন করত তার সবকিছুই তার অজানা রয়ে গেছে, তখন মনে-মনে অনুশোচনা জাগত এবং অতীতে কেন যে এই ব্যাপার নিয়ে একটুও মাথা ঘামায়নি তার জন্যে প্রত্যেকে নিজেকে দোষারোপ করত, যেমন দোষারোপ করত, যে যাকে ভালোবাসে তার কাছ থেকে দূরে থাকাকালে তার কোনো ব্যাপারেই যে সে আর আগ্রহ দেখাবে না বা তা তখন যে তার কাছে আর তেমন কোনো আনন্দের ব্যাপার বলেও মনে হবে না এইরকম একটা মনোভাব দেখানোর জন্যে। এইরকম অনুভূতি এররকম জাগার পর অতীতে কীভাবে তাদের ভালোবাসার জীবন গড়ে উঠেছিল, তা আবার আদ্যোপান্ত মনে-মনে খতিয়ে দেখত প্রত্যেকে এবং তখন তার কোথায় কী দোষত্রুটি ছিল তা ধরা পড়ত

তাদের চোখে। স্বাভাবিক সময়ে সচেতনভাবেই হোক বা অন্য যে-কোনোভাবেই, আমরা সবাই অনুভব করি যে এমন কোনো হৃদয়ের সম্পর্ক নেই যাকে অধিকতর মহিমান্বিত করা সম্ভব নয়। অথচ প্রায় ক্ষেত্রেই আমাদের ভালোবাসা যে আর পাঁচজনের প্রেমের সম্পর্কেরই অনুরূপ এটা সুস্পষ্ট জেনেও সেই অবস্থাকে মেনে নিতে আমাদের মোটেই বাধে না। কিন্তু স্মৃতি কোনোকিছুকেই এত সহজে মেনে নিতে চায় না। এবং হঠাৎ বাইরে থেকে এই যে একটা দুর্বিপাক গোটা শহরটার ওপর নেমে এল এবং একটা সুনির্দিষ্ট উপায়ে আমাদের ওপর অন্যায় কতকগুলো দুঃখ-দুর্দশা চাপিয়ে দিতে থাকল, আমরা নিশ্চয় তার জন্যে ঘৃণা বা ক্রোধ প্রকাশ করতে পারতাম। তার ওপর এই দুর্বিপাক এমনভাবে আমাদের উত্তেজিত করতে থাকল যাতে আমরা নিজেরাই নিজেদের জন্যে দুঃখ-কষ্ট সৃষ্টি করে এবং এইভাবে নৈরাশ্যকেই জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা বলে মেনে নিই এবং আমাদের মনোযোগ যাতে অন্যদিকে আকৃষ্ট হয়। শুধুমাত্র আজকের জন্যই জীবন—এই বোধ আকাশের অন্তহীন নির্বিকার উপস্থিতির সামনে আমাদের প্রত্যেকের জীবন হয়ে উঠল নিঃসঙ্গ এবং তাতেই খুশি হতে হল আমাদেরকে। সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থার এই-যে একটা উপলব্ধি, এ থেকে কালক্রমে প্রত্যেকের চরিত্রে হয়তো সূক্ষ্মতর ধৈর্য এবং প্রতিরোধশক্তি গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু কার্যত এর ফলে প্রত্যেকের চরিত্র দুর্বল হতে হতে এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছাল যখন সবকিছুই আমাদের কাছে মনে হতে লাগল নিরর্থক। প্রসঙ্গত, শহরের অধিবাসীদের অনেকেই এমন এক অদ্ভুত দাসত্ব স্বীকার করে নিল যার জন্যে তাদের জীবন হয়ে উঠল রোদ এবং বৃষ্টির সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী। তাদের দিকে তখন লক্ষ্য করলে এরকম একটা ধারণা হত যে জীবনে এই প্রথম তারা যেন যাকে বলে আবহাওয়া-সচেতন তাই এখন হতে শুরু করেছে। সামান্য একঝলক রোদ যেন ওদের কাছে পৃথিবীটাকে করে তুলত মহাখুশির স্বর্গ কিন্তু আবার সেই বর্ষার দিন ওদের কাছে পৃথিবীটাকে করে তুলত মহাখুশির স্বর্গ কিন্তু আবার সেই বর্ষার দিন আসত ওদের মুখের চেহারা দেখা যেত মলিন, মন বিষণ্ন; অথচ সপ্তাহখানেক আগে পর্যন্ত শুধুমাত্র আবহাওয়ার কাছে তাদের মনের এই পরিহাসকর অধীনতা ছিল না। কারণ এখানকার মতো এমন নিঃসঙ্গভাবে জীবনের মুখোমুখি হতে হত না তখন তাদেরকে, তখন জীবনে যে যার সঙ্গী, সেই জুড়ে থাকত আপনজনের ক্ষুদ্র পৃথিবীর সামনের পরিসরের অনেকখানি। কিন্তু এখন থেকে সবকিছুই দেখা যেতে লাগল অন্যরকম : এখন যেন সম্পূর্ণ আকাশের খেয়ালখুশি ও পরনির্ভরশীল হয়ে উঠল তাদের জীবন অর্থাৎ এখন তারা যদি কোনো দুঃখ-কষ্ট ভোগ করত বা মনে-মনে আশান্বিত বোধ করত তার পেছনে কোনো সঙ্গত কারণ থাকত না।

তারপর জীবন প্রত্যেকের জন্যে চরম নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠায় কারো পক্ষেই আর প্রতিবেশীর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাবার ভরসা করা সম্ভব ছিল না। যার যার বিপদ-আপদের বোঝা এখন প্রত্যেককেই নিজেকে বহন করতে হত।

যদি দৈবক্রমে কেউ কারো কাছে নিজের হৃদয়ের ভার লাঘব করবার চেষ্টা করত বা নিজের হৃদয়ের কোনো অনুভূতির কথা অপরকে জানাতে চাইত, তাতে যে সাড়া সে পেত তা সে যাই হোক না, সাধারণত ব্যথাই পেতে হত তাতে তাকে। এবং সে

উপলব্ধি করতে পারত যে তার এবং তার সঙ্গীর কথাবলার বিষয়বস্তু সম্ভবত এক নয়, কারণ সে নিজে যা বলতে চাইত তা তার নিজের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে দীর্ঘদিন চিন্তাভাবনার গভীর থেকে উৎসারিত যে-চিত্র সে কথার মাথামমে ফুটিয়ে তুলতে চাইত, তা তার নিজের মনের ভেতর দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা, তারই হৃদয়াবেগ এবং অনুতাপের দহনে দগ্ধীভূত হয়ে যাওয়া, কিন্তু দেখত তার শ্রোতার কাছে এসবের কোনো মূল্যই নেই, তার চোখে এসবের যে-চিত্র ধরা পড়ত তা হচ্ছে সাধারণ দুঃখ-বেদনাবোধের; যা প্রচুর সংখ্যায় উৎপাদিত বাজারের সাধারণ পণ্যের মতো। সুতরাং উত্তরের ভেতর আন্তরিকতাই থাক আর বৈরীভাবই থাক, সবসময় তার লক্ষ্য ব্যর্থ হত। ফলে হতাশ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মানসিক আদানপ্রদানের চেষ্টাই ছেড়ে দিতে হত সবাইকে। সম্পূর্ণ মৌন হয়ে থাকাটা যাদের কাছে অসহনীয় বলে মনে হয় তাদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে সত্যি। অন্যথায় তারা যখন নিজেদের মনের ভাব যথাযথভাবে প্রকাশের উপযোগী শব্দ খুঁজে পেতে অসুবিধা বোধ করত তখন সমকালীন যেসব শব্দের প্রচলন গড়ে উঠেছিল বা দৈনন্দিন সংবাদপত্রে বা সাধারণ উপাখ্যানে বা বর্ণনায় ব্যবহৃত হত যেসব শব্দ—সেগুলোকে দিয়েই কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য হত। সুতরাং এসব ক্ষেত্রেও একান্ত ব্যক্তিগত কোনো ব্যথার অনুভূতিকে প্রকাশ করতে চাইলে সাধারণ কথাবার্তায় গৎবাঁধা ভাষা ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকত না, এবং এসব মেনে নিলে তবেই প্লেগের বন্দিরা গেটের দারোয়ানদের সহানুভূতি লাভ করতে পারত বা শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত।

কিন্তু এ সত্ত্বেও এবং এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ—তাদের দুঃখ-দুর্দশা যত কঠিনই হোক, তাদের হৃদয় যতই ভারাক্রান্ত থাক, যদিও তা অন্তঃসারশূন্য একটা জিনিস, নিঃসন্দেহে সত্যি যে, প্লেগের গোড়ার দিকে শহরের অধিবাসীরা নিজেদের কিছুটা অধিক সুযোগ-সুবিধার অধিকারী বলে ভাবতে পারত। কারণ, যখন থেকে শহরের অধিবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে শুরু করল, তখন থেকে তাদের ভাবনাচিন্তার একমাত্র বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় সেসব মানুষ, যাদের সাহচর্য ফিরে পাবার জন্যে তারা মনে-মনে কামনা করত। এবং প্রেমের এই অহমিকা তাদেরকে সাধারণ দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন করে তুলত যেন। কারণ এখন থেকে প্লেগের কথা তারা কেবল তখনই চিন্তা করত, যখন মনে শঙ্কা জাগত যে প্রিয়জনের সাথে এই বিচ্ছেদ হয়তো অনন্তকাল ধরেই চলবে। এইভাবে প্লেগের মহামারীর সম্পূর্ণ ভেতরে থেকেও তারা এমন একধরনের নিরাসক্তির ভাব দেখাত, যাকে অনেক সময় স্থিরচিত্ততার লক্ষণ বলে ভ্রম হত। আসলে তাদের হৃদয়কে আকর্ষণ করে রেখেছিল যে নৈরাশ্য, তাই তাদেরকে রক্ষা করত আতঙ্কের কবল থেকে। যার ফলে মনে হত এই দুর্বিপাকের একটা শুভদিকও হয়তো আছে। প্রসঙ্গত, রোগের আক্রমণে তাদের ভেতর কারো মৃত্যু ঘটলেও তা এমনিভাবে ঘটত যে তা অনুভব করার অবকাশ পর্যন্ত পেত না সে। এ যেন স্মৃতির প্রেতাত্মার সঙ্গে গভীর এবং দীর্ঘ নীরব আলাপে নিমগ্ন যে ব্যক্তি, তাদের হঠাৎ সেখান থেকে ছিনিয়ে এনে গভীরতম শান্তির যে জীবন তার মধ্যে সোজাসুজি নিমজ্জিত করা। এর ফাঁকে অপর কোনোকিছুরই অবকাশ থাকত না তার জন্যে।

শহরের অধিবাসীরা যখন নিজেদের এই আকস্মিক বিচ্ছিন্ন অবস্থার সঙ্গে বুঝাপড়া নিয়ে ব্যস্ত, প্লেগ শহরের গেটে গেটে পাহারা বসিয়ে দিতে থাকল যেন। ওরাও-এ প্রতিদিন। শহরের গেট বন্ধ করে দেয়ার পরের দিন থেকে আর-কোনো মানবদেহই ভেতরে ঢুকতে পারত না। সুতরাং তখন থেকে মনে হত শহরের সব গাড়ি যেন একটানা একটা বৃত্তাকার পথে কেবল ঘুরছে। বুলভার্দের চূড়া থেকে নিচে বন্দরের দিকে তাকালেও দৃশ্যটা যেন কেমন অদ্ভুত ঠেকত। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের যেসব কর্মতৎপরতার জন্যে এতদিন ধরে ওরাও-এর এই অঞ্চল শ্রেষ্ঠ বন্দর বলে খ্যাতি, তার সবকিছুই আকস্মিক নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। রোগের সংক্রমণ যাতে বাইরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, তার জন্য যে কয়েকখানা জাহাজ আটক করে রাখা হয়েছিল, শুধু সেগুলোই চোখে পড়ত সাগরের মাঝে নোঙর-করা। কিন্তু জেটির ওপর নিষ্ফল দাঁড়িয়ে থাকা হাড়-সর্বস্ব বিরাট বিকট চেহারার ক্রেন, এখানে-ওখানে কাত্ হয়ে পড়ে থাকা ছোটবড় ওয়াগন এবং চারপাশে অবহেলাভরে পরিত্যক্ত বস্তা ব্যারেলের স্তূপ। এসব-কিছু থেকে একটা জিনিসই প্রমাণ হত যে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যেন আকস্মিক প্লেগের আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে।

চারপাশে এসব অসাধারণ দৃশ্য দেখতে থাকলেও তাতে তাদের নিজেদের যে কী ঘটছিল শহরের অধিবাসীরা তখনই তা সহজে অনুভব করতে পারত না। কিছু কিছু অনুভূতি অবশ্যি ছিল, যেমন ভয়, প্রিয়জনের বিচ্ছেদবেদনা, যাতে তারা সবাই শরিক হতে পারত। কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপারে সেসব ঘটনাগুলো এখনও পর্যন্ত তাদের চিন্তাভাবনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল। এই রোগের অর্থ যে কী, তা যে নিজের কাছে স্বীকার করবে, তাও প্রকৃতপক্ষে তখনও পর্যন্ত করতে চাইত না কেউ। প্রচলিত জীবনধারার মধ্যে কোথায় কী বিশৃঙ্খলা ঘটছে বা কোথায় তাদের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটছে, সব ব্যাপারেই প্রধানত সচেতন দেখা যেত বেশির ভাগ লোককেই। বর্তমান অবস্থায় শহরের অধিবাসীরা উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে উঠছিল সত্যি; কিন্তু এগুলো তো আর এমন কোনো অনুভূতি নয়, যা সম্বল করে তারা এই বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে পারত। উদাহরণস্বরূপ, তাদের ভেতর প্রথম যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তা হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে দোষারোপ করা। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের যে সমালোচনা—নিয়মকানুনগুলোর কিছুটা সংশোধন করা এবং তাদের কঠোরতা হ্রাস করা কি সত্যিই সম্ভব নয়? যা স্থানীয় পত্রপত্রিকাগুলোতেও ধ্বনিত হয়; তার জওয়াবে প্রিফেক্টের তরফ থেকে যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয় সেগুলো কিছুটা অপ্রত্যাশিত। মহামারীতে কত লোকের মৃত্যু হচ্ছে, এতদিন অবধি সে-সম্পর্কে কোনো পরিসংখ্যানই, না র‍্যান্ডক ব্যুরো না সংবাদপত্রে, সরকারিভাবে সরবরাহ করা হত। কিন্তু এখন হঠাৎ প্রতিদিন তা ব্যুরোতে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল এবং সেইসঙ্গে আবার ব্যুরোকে অনুরোধ জানানো হল যে সপ্তাহে একদিন করে অন্তত যেন সেগুলো ব্যুরো থেকে ঘোষণা করা হয়।

এ ব্যাপারেও কিন্তু জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যখন আশা করা যেতে

পারত তার চেয়ে অনেক বিলম্বে। কারণ ব্যুরো থেকে যেদিন শুরু এক ঘোষণা বেরুল, প্লেগের আবির্ভাবের তৃতীয় সপ্তাহে শহরে তিনশো দুজন লোকের মৃত্যু হয়েছে, তা জনসাধারণের কল্পনায় দাগ কাটতেই পারল না। প্রথমত, তিনশো দুজন লোকের সবারই মৃত্যু শুধুমাত্র প্লেগের জন্যেই নাও ঘটে থাকতে পারে। তার ওপর সাধারণ সময়েও শহরে সাপ্তাহিক মৃত্যুর হার যে কী ছিল, সে-সম্পর্কেও কারো কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। শহরের জনসংখ্যা তখন দু-লক্ষের কাছাকাছি। বর্তমান মৃত্যুর হার যে বাস্তবিকই অস্বাভাবিক, তাই বা অনুমান করবে মানুষ কীভাবে? প্রকৃতপক্ষে এগুলো হচ্ছে এমন একধরনের হিসাব-নিকাশ, যা নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামায় না, যদিও কারো অজানা নয় যে এগুলো নিজেদের স্বার্থের ব্যাপার। সংক্ষেপে মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে যে কোনোরকম তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করবে কেউ, তার উপযুক্ত নিরিখ পাওয়া যেত না। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, যতই দিন যাচ্ছে, মৃত্যুর সংখ্যা নিয়মিতভাবে এমনি বেড়ে চলেছে যে, তাকে গ্রাহ্য না করে আর উপায় নেই, তখন কী ঘটছে সে-ব্যাপার নিয়ে সবাই সচেতন হয়ে উঠল। কারণ পাঁচ সপ্তাহ পরে মৃত্যুর সংখ্যা দেখা গেল তিনশো একুশ এবং ছসপ্তাহ পরে তা গিয়ে উঠল তিনশো পঞ্চান্নয় এবং এসবের অর্থ যে কী তা সবার কাছেই সুস্পষ্ট। কিন্তু তবুও মৃত্যুর সংখ্যা এমন কিছু চাঞ্চল্যকর ছিল না, যাতে করে শহরের অধিবাসীরা এক্ষুনি নিজেরা যেসব জিনিস চিন্তা করত সেগুলো ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। কারণ তারা এসব দেখে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল সত্যি, কিন্তু তবুও তখনও ভাবত যে আশেপাশে যা-কিছু ঘটতে দেখছে তা শুধু একধরনের আকস্মিক ঘটনা মাত্র এবং কিছুটা অপ্রীতিকর মনে হলেও তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হবার মতো এমন কিছু নয়। সুতরাং আগের মতোই তারা শহরের এখানে-ওখানে ঘোরাফেরা করে বেড়াত। বিভিন্ন কাফের চাতালে টেবিলে টেবিলে ভিড় জমিয়ে তুলত। সাধারণভাবে বলতে গেলে একটা জিনিস অবশ্যই সত্য যে তাদের ভেতর সাহসের কোনোরকম অভাব ছিল না। তারা নিজেদের ভেতর দুঃখ-অনুতাপ করত যতটুকু, তার চেয়ে হাসিঠাট্টা করত অনেক বেশি এবং যেসব অপ্রীতিকর ব্যাপার—সেগুলোকে তাদের দৃষ্টিতে মনে হত অত্যন্ত সাময়িক; সেগুলোকে যে তারা ব্যতিক্রম কোনোকিছু সহজ আনন্দ-ফূর্তির মধ্য দিয়েই গ্রহণ করতে পেরেছে এমন একটা ভাবও দেখাত। সংক্ষেপে বাইরের হাবভাবটা তারা ঠিকমতো বজায় রেখে চলত।

যাহোক মাসের শেষের দিকে, প্রার্থনা সপ্তাহ, যার সম্পর্কে পরে আরো বর্ণনা দেয়া হবে, শুরু হবার কাছাকাছি সময় বরাবর আরো কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটল, যার ফলে শহরের সমস্ত চেহারাই যেন বদলে গেল। প্রথমত, যানবাহন চলাচল এবং খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রিফেক্ট কিছু কিছু ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। পেট্রলকে রেশনিং ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হল, এবং খাদ্যবস্তুর বিক্রয়ের ওপরও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হল। তেমনি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হল বিদ্যুতের ব্যবহারের ওপর। শুধুমাত্র দৈনিক প্রয়োজনের সামগ্রী হাঁটাপথে বা বিমানযোগে ওরাও-এ আমদানির অনুমতি দেয়া হল। এইভাবে শহরের যানবাহন চলাচল বর্ধিত হারে পাতলা হতে

হতে এমন একপর্যায়ে এসে পৌছাল, যখন শহরের রাস্তায় প্রাইভেট গাড়ি বলতে চোখে পড়ত না আর। বিলাসের সামগ্রী বিক্রি হত যেসব দোকানে সেগুলোও রাতারাতি বন্ধ হয়ে গেল এবং অন্যান্য দোকানে ওসব বিক্রি হয়ে গেছে এই নোটিশ ঝুলিয়ে দিতে শুরু করল, যদিও সেসব দোকানের সামনে খরিদ্দারদের ভিড় জমে থাকতে দেখা যেত তখনও।

এইভাবে শহরের চেহারায় একটা অভিনবত্ব এসে গেল যেন। রাস্তাঘাটে পথচারীদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। এবং যে-সময়গুলোয় কাজকর্মের চাপ সাধারণত কম, সেই সময়গুলোয় রাস্তাঘাটে এবং কাফেতে কাফেতে প্রচুর লোকের ভিড় জমতে লাগল; কারণ দোকানপাট এবং বেশকিছু সংখ্যক সরকারি অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেককেই নিষ্ক্রিয়ভাবে সময় কাটাতে হত। কিন্তু তক্ষুনি তারা যে সবাই কর্মচ্যুত হয়ে পড়েছিল তা নয়, দীর্ঘ ছুটি ভোগ করছিল তারা। সুতরাং এখন এমন অবস্থা দাঁড়াল যে ঝরঝরে কোনোদিনে বিকেল তিনটায় ওরাও-এর দিকে চাইলে এমন এক শহরের চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠত, যেখানে জনসাধারণের মধ্যে জমাট আনন্দ-ফুর্তি চলছে, চারদিকে দোকানপাট সব বন্ধ এবং উল্লাসমত্ত জনসাধারণ যাতে অবাধভাবে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারে তার জন্যে শহরে যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

স্বভাবতই এই অবস্থায় ছবিঘরের মালিক যারা তারাই সবচেয়ে লাভবান হল, প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জনের সুযোগ জুটে গেল তাদের জন্যে। অবশ্য একটা অসুবিধা তাদের ছিল—এই অঞ্চলে নতুন ছবির চলাচল সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় ছবির প্রোগ্রাম যে তারা নিয়মিত বদল করবে তার উপায় ছিল না। সপ্তাহদুয়েক পরে বিভিন্ন ছবিঘরের মালিক নিজেদের ভেতর চিত্র-বিনিময়ের একটা ব্যবস্থা করে নিলেন সত্য, কিন্তু আরো কিছুদিন পর সেটাও বন্ধ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ছবিঘরে একই প্রোগ্রাম চলতে থাকল দিনের-পর-দিন ধরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দর্শকদের ভিড় কমতে দেখা গেল না কোথাও। এবং যেহেতু ওরাও এমন একটা শহর যেখানে গল্প করার মতো বড় ব্যবসা বলতে বোঝাত মদ এবং এই জাতীয় পানীয়ের ব্যবস্থা এবং সেই কারণেই এসব দ্রব্যের সঞ্চয়ও ছিল যথেষ্ট, সুতরাং ছবিঘরের মালিকদের মতোই কাফের মালিকদেরও খরিদ্দারদের চাহিদা মেটাবার জন্যে কোনোরকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত না। এবং সত্যি কথা বলতে কী, এই সময় মদ্যপানের পরিমাণটা বেশকিছু বেড়েই গিয়েছিল। এমনকি এক কাফের মালিকের মাথায় চমৎকার এক বুদ্ধি জুগিয়ে গেল। সে দোকানের সামনে এক স্লোগান টাঙিয়ে দিল : রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে চাইলে সবচেয়ে বড় এক বোতল মদের প্রয়োজন। যে-কোনো সংক্রামক ব্যাধির সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক যে মদজাতীয় পানীয় দ্রব্য, সাধারণের মধ্যে এইরকম যে একটা ধারণা আগে থাকতেই প্রচলিত ছিল, এ যেন হয়ে দাঁড়াল তারই সমর্থন জোগানোর মতো। এখন প্রতিদিনই রাত দুটোর দিকে দেখা যেত, বেশকিছু সংখ্যক মাতাল, বিভিন্ন কাফে থেকে যাদেরকে হাঁকিয়ে বার করে দেয়া হয়েছে, টলতে টলতে বাড়ির দিকে চলেছে এবং জীবন সম্পর্কে আশাবাদ প্রচারে উচ্চকণ্ঠ তারা সবাই।

তথাপি, এক অর্থে এই পরিবর্তনগুলো ছিল এমনই বিচিত্র ধরনের এবং এই পরিবর্তন আনাও হয়েছিল এমনি দ্রুত যে তাতে এগুলো স্থায়ী হবার-যে কোনো সম্ভাবনা আছে তেমন ভাবটা সহজ ছিল না। এর ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, আগের মতোই আমাদের সবখানে মনোযোগ থাকত ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রতি।

শহরের গেট বন্ধ করে দেবার দুদিন পরে ডাক্তার রিও যখন হাসপাতাল থেকে ফিরছিলেন, পথে কটার্ডের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। ছোট্টখাট্ট মানুষ কটার্ডের চেহারা থেকে খুশি উপচে পড়ছিল যেন। তার স্বাস্থ্য এবং চেহারার এই উন্নতি দেখে ডাক্তার তাকে অভিনন্দন জানালেন।

—হ্যাঁ সত্যিই, কটার্ড বললেন—শরীরটা এখন আমার বেশ সুস্থ। কোনোদিন এর চেয়ে সুস্থ ছিলাম বলে মনে হয় না যেন। কিন্তু আপনার কী ধারণা ডাক্তার সাহেব? এই যে অভিশপ্ত মহামারী, এর সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়? যতই দিন যাচ্ছে, একটা ভয়ঙ্কর কিছু বলে মনে হচ্ছে, তাই না?

ডাক্তারকে সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নাড়তে দেখে তিনি যেন আরো উৎসাহের সঙ্গে বলে চললেন—আর এক্ষুনি যে এর উপশম হবে তেমনও মনে হচ্ছে না। চারপাশে যা-কিছু দেখছি, মনে হচ্ছে শহরে নিশ্চিত অমঙ্গল কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

এবার দুজনে একত্রে কিছু পথ হাঁটলেন তাঁরা। চলতে চলতে কটার্ড তাঁর নিজের বাসা যে-রাস্তার ওপর, সেখানকার এক মুদির গল্প বললেন। পরে বেশি মুনাফায় বিক্রি করবে বলে প্রচুর টিনের খাদ্যসামগ্রী মজুদ করে রেখেছিল ভদ্রলোক। এমনকি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে যেদিন এ্যাম্বুলেন্স আসে, তখনও তার বিছানার তলায় দেখা যায় কয়েক ডজন দুধের টিন লুকানো রয়েছে। হাসপাতালেই লোকটার মৃত্যু হয়। প্লেগের এই সুযোগ নিয়ে কেউ যে কিছু অর্থ কামিয়ে নেবে তারও কোনো সুযোগ নেই। নিশ্চিত জানবেন, প্লেগের সম্পর্কে সত্যমিথ্যা এইরকম অফুরন্ত গল্পের ডাক্তার ছিলেন যেন কটার্ড। পরে আরো এমনি একটা গল্প বললেন তিনি, অপর একজন লোকের। লোকটার শরীরে তখন এই রোগের সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। দেহে প্রবল জ্বর। সেই অবস্থায় সে ঘর থেকে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে আসে এবং সেখানে সামনে প্রথমেই যে-স্ত্রীলোকটাকে দেখতে পায়, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করতে থাকে, 'আমাকেও ধরেছে এবার।'

'এটা তার জন্যে ভালো'—শেষে গিয়ে কটার্ড এই মন্তব্য করলেন। কিন্তু এর ঠিক পরেই আবার যা বললেন, তাতে আগে যে একটা ফূর্তির ভাব দেখিয়েছিলেন সেটা সত্যি নয় বলে মনে হল—'আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, তাহলে দেখবেন শীঘ্রই আমাদের সবার অবস্থা এমনি হবে।'

সেইদিনই বিকেলে গ্রাঁদ যেন তাঁর অন্তরের সমস্ত বেদনা প্রকাশ করে ফেললেন। ডাক্তারের টেবিলের উপর তার স্ত্রীর একখানা ছবি দেখে তিনি জিজ্ঞাসু-চোখে ডাক্তারের দিকে চাইলেন। ডাক্তার তাকে জানালেন শহর থেকে কিছু দূরে কোনো এক স্বাস্থ্যনিবাসে তার স্ত্রীর চিকিৎসা চলছে।

—একদিন থেকে, গ্রাঁদ বললেন—আপনি কিছুটা ভাগ্যবান। ডাক্তার নিজেও স্বীকার করলেন যে তিনি একদিক থেকে ভাগ্যবান, কিন্তু পরে কথার রেশ টেনে বললেন—সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তার স্ত্রীর সেরে ওঠা, তার ওপর নির্ভর করছে সবকিছু।

—হ্যাঁ, গ্রাঁদ বললেন—সেটা অবশ্যই সত্যি।

এবং তার পরেই তাদের পরিচয়ের শুরু থেকে এই প্রথম গ্রাঁদ যেন ডাক্তারের সামনে বেশকিছুটা প্রগলভ হয়ে উঠলেন। শব্দচয়নের ব্যাপারে তার যে বরাবরের অসুবিধা তা অবশ্য এখনও ছিল, কিন্তু এখন প্রয়োজনমতো শব্দ যেন আপনা থেকেই তার মুখে এসে জুগিয়ে যাচ্ছিল। বাস্তবিক মনে হচ্ছিল, তিনি যা বলছেন, সেগুলো নিয়ে যেন বছরের-পর-বছর ধরে অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন। একেবারে সম্পূর্ণ নাবালক বয়স বলতে গেলে তখন তাঁর। তিনি তাদের প্রতিবেশী এক দরিদ্র-পরিবারের খুব অল্পবয়স্ক এক মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। বস্তুত এই বিয়ে করবার জন্যেই তিনি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এখনকার তার যা চাকরি, সেটা তখনি নিয়েছিলেন। জেনি বা তিনি, তাদের কেউই, শহরের যে-অঞ্চলে তাদের বাস, তার বাইরে কোথাও যাননি কোনোদিন। পূর্ববাগের পালা চলছিল তখনও তাদের। তিনি প্রতিদিন জেনিকে দেখতে যেতেন তাদের বাসায় এবং জেনির লাজুক মুখচোরা এই স্তাবককে নিয়ে হাসিঠাট্টা করত পরিবারের সবাই। জেনির বাপ ছিলেন রেলের একজন কর্মচারী। অফিসের দায়িত্ব সারা হয়ে গেলে যখন অবসর মিলত, প্রায় সারাক্ষণ তিনি এককোণে জানালার ধারে বাইরে পথচারীদের দিকে চেয়ে শ্যান্ত হয়ে বসে থাকতেন। তাঁর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুখানা হাত উরুর ওপর কাতভাবে রাখা থাকত। আর তার স্ত্রী নিয়ত ব্যস্ত থাকতেন ঘর-সংসারের কাজ নিয়ে। জেনিকেও মাঝে মাঝে সাহায্য করতে হত সংসারের কাজে। জেনি দেখতে এমন এক রক্তি ছোট মেয়ে ছিল যে তাকে কোনো সময় রাস্তা পার হতে দেখলে গ্রাঁদের বুক দুরু দুরু করত; রাস্তার ওপর তার দিকে যেসব গাড়ি ছুটে আসত, সেগুলো দেখাত কী বিরাট দৈত্যাকার। মনে হত যে-কোনো মুহূর্তে জেনিকে পিষে ফেলবে। ক্রিস্টমাসের অল্প কিছুদিন আগে একদিন তারা দুজনে সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। রাস্তার ধারে এক দোকানের সামনে কাচের আবরণের ভেতর চমৎকার সাজানো-গোছানো অনেক জিনিসপত্র চোখে পড়তে, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে দেখছিলেন তারা। একেবারে মুগ্ধ গদগদ দৃষ্টিতে তাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর জেনি হঠাৎ তার দিকে ফিরে বলে উঠেছিল—দেখছ, জিনিসগুলো কী চমৎকার! গ্রাঁদ সেই মুহূর্তে জেনির হাতের কব্জিতে আস্তে করে একটু চাপ দিয়েছিলেন। এমনিভাবেই তাদের দুজনের বিয়ে হয়। কটার্ডের ধারণা এরপরে তাদের জীবনের যা কাহিনী তা অত্যন্ত সরল। সব স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যা ঘটে তাদের ভাগ্যেও তাই ঘটেছিল। সবার ক্ষেত্রেই সেই একই ব্যাপার—একদিন দুজনের বিয়ে হয়, বিয়ের পরও কিছুদিন দুজন পরস্পরকে ভালোবাসে এবং সেই একই সঙ্গে নিয়মিত কাজকর্ম চলতে থাকে। তারপর কাজের চাপ দিন দিন এমনই বাড়তে থাকে যে তখন ভালোবাসার অনুভূতি ক্রমেই মনের ভিতর তলিয়ে যায় এবং যেহেতু গ্রাঁদের অফিসের বড়কর্তা তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেননি, তাই জেনিকেও বাইরে চাকরি নিতে হয়।

এবার গ্রীদ যে-জিনিসটা ব্যক্ত করতে চাইছিলেন, সেটা অনুভব করার জন্য কিছুটা কল্পনার সাহায্যের প্রয়োজন। অফিসে সারাদিন পরিশ্রমের অবসাদের ফলে তার নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর তার যে একটা নিয়ন্ত্রণ ছিল, সেটা ক্রমেই হারিয়ে ফেলছিলেন তিনি। স্ত্রীকে শোনাবার মতো কথাও যেন তার ক্রমেই শেষ হয়ে এসেছিল এবং জেনির প্রতি তার ভালোবাসা যে তখনও সম-অক্ষুণ্ন ছিল সেই অনুভূতিটুকুকেও তিনি জেনির অন্তরে ছিইয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সারাদিনের পরিশ্রমের পর শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় গৃহে ফিরে আসা, কঠিন দারিদ্য, ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল স্বপ্ন ক্রমেই চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাওয়া, প্রতিদিন সন্ধ্যা একঘেয়েভাবে বাসায় বসে থেকে কাটানো—এমন কার হৃদয় আছে যে এই পৃথিবীতে এই অবস্থার ভেতরও তার উত্তাপ অক্ষুণ্ন রাখবে? দুঃখের বস্তুনার অনেক বেদনাই হয়তো জমে উঠেছিল জেনির অন্তরে। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও সে থেকে যেত; অবশ্য অনেক সময় এমনও ঘটে যে, কোনো মানুষ হয়তো দীর্ঘদিন ধরে অনেক দুঃখ-কষ্ট সয়ে যাচ্ছে, অথচ সে নিজে তার খবরই রাখে না। এমনিভাবে পর পর কয়েক বছরই কেটে যায় দুজনের। তারপর হঠাৎ জেনি একদিন তাকে ত্যাগ করে যায়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক, জেনি একা যায়নি : সত্যই একদিন গভীরভাবে ভালোবাসতাম তোমাকে, কিন্তু এখন নিজেকে বড় ক্লান্ত বলে মনে হয়। তাই তোমাকে ছেড়ে যাওয়াটা আমার কাছে খুব সুখের নয়। কিন্তু জীবন যখন আমাকে আবার নতুন করেই আরম্ভ করতে হবে, তখন আর সুখের প্রয়োজনের কথা নাই ভাবলাম।—জেনি যাবার সময় তাকে যে চিঠি লিখে গিয়েছিল, তাতে মোটামুটি এসব কথাই বলেছিল সে।

গ্রীদ নিজেও তো অনেক দুঃখ-কষ্ট সয়েছেন, ডাক্তার রিও তাকে বুঝিয়ে বললেন—তিনি নিজেও আবার নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করতে পারেন। কিন্তু না, তার আর কোনো উপায় নেই, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন নিজের ওপর। কিন্তু জেনিকে কখনও ভুলতে পারবেন না তিনি। জেনির কথা সবসময় তার মনে জাগে। এখন তার মনে শুধু একটাই আকাঙ্ক্ষা আছে। জেনিকে একটা চিঠি লিখে তার নিজের অবস্থাটা তাকে বুঝিয়ে বলতে চান।

—কিন্তু কাজ ঠিক সহজ নয়, গ্রীদ ডাক্তারকে বললেন—কয়েক বছর ধরে এটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছি। যখন আমাদের ভেতর ভালোবাসা ছিল তখন একজনের মনের ভাব আর একজনকে বোঝাবার জন্য কথা বলার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু কারো ভালোবাসা তো আর চিরদিনের নয়। সুতরাং আমাদের জীবনে এমন এক সময় এসেছিল, যখন জেনিকে নিজের করে রাখতে গেলে আমার কথা বলা প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কথা সেদিন আমার মুখে জোগায়নি।—গ্রীদ তার পকেট থেকে তোয়ালের মতো কী একটা বার করে বেশ শব্দ করে তাতে নাক ঝাড়লেন। গোঁফজোড়াও মুছে ঠিক করে নিলেন। ডাক্তার নীরবে শুধু একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইলেন।

—মাফ করবেন ডাক্তার সাহেব, গ্রীদ হঠাৎ আবার বললেন—ঠিক কীভাবে যে বোঝাব আপনাকে, শুধু এইটুকু বুঝিয়ে আপনার উপর আমি পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারি। আর শুধুমাত্র এই কারণেই এসব ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ-

আলোচনা করি। কিন্তু আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন এসব প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে গেলে আমি কেমন যেন অনুভূত হয়ে পড়ি।

একটা জিনিস অবশ্য এখানে সুস্পষ্ট যে গ্রীদের যেসব চিন্তাভাবনা, তাদের সঙ্গে গ্লেগের কোনোরকম সম্পর্কই ছিল না। সেদিন সন্ধ্যায় ডাক্তার রিও তার স্ত্রীর কাছে একখানা টেলিগ্রাম পাঠালেন। তাকে জানালেন—শহরের গেট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তিনি যেন সবসময় নিজের প্রতি যত্ন নেন এবং ডাক্তার সবসময় তার কথা স্মরণ করেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা যখন তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, গেট বন্ধ করে দেয়ার সপ্তাহতিনেক পরের ব্যাপার সেটা, ডাক্তার রিও লক্ষ্য করলেন একজন যুবক যেন রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করলেন।

—আমার কথা মনে পড়ছে তো?

ডাক্তার রিও-র মনে হল তিনি যেন কোথাও দেখেছেন তাকে। কিন্তু ঠিক চিনতে পারছেন না।

—এই মহামারী শুরু হবার ঠিক আগে একদিন অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, যুবকটি বললেন—আরবদের জীবন যাপনের অবস্থা সম্পর্কে তাদের অভিমত জানতে গিয়েছিলাম। আমার নাম র‍্যাঁবেয়ার।

—ও হ্যাঁ, অবশ্যই মনে পড়ছে, বেশ তো! আপনার কাগজে গল্প পাঠাবার মতো অনেক উপকরণই তো এখন পেতে পারেন।

র‍্যাঁবেয়ারের সাথে প্রথমবার সাক্ষাতের সময় তার ভেতর যতখানি নিশ্চিত আত্মবিশ্বাসের ভাব দেখা গিয়েছিল এখন আর তা ছিল না তার হাবভাবে। বললেন যে, না, ঠিক সে-ব্যাপারে তিনি ডাক্তারের কাছে আসেননি। তিনি এসেছেন ডাক্তার অনুগ্রহ করে তাকে কিছুটা সাহায্য করবেন কি না তা জানতে।

—আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে তার জন্যে দুঃখিত, র‍্যাঁবেয়ার বললেন—কিন্তু বাস্তবিকই এখানকার একটা লোকও আমার পরিচিত নয়। আর যিনি আমাদের কাগজের স্থানীয় প্রতিনিধি, সে ভদ্রলোক, একটা আস্ত অপদার্থ।

ডাক্তার বললেন, শহরের মাঝে এক ডিসপেনসারিতে তাঁর একটু যাওয়ার প্রয়োজন। সুতরাং তারা যদি হাঁটতে হাঁটতে সামনের দিকে এগিয়ে যান, তাহলে মন্দ হয় না। নিগ্রো অঞ্চলের ভেতর দিয়ে সরু রাস্তা ধরে ছিল তাদের যাবার পথ।

সন্ধ্যা নামছিল চারদিকে এবং এই সময় শহরটা সাধারণত বরাবর কোলাহল-মুখর থাকে। কিন্তু আজ যেন অদ্ভুত রকমের শান্ত বলে মনে হচ্ছিল। শব্দের মধ্যে ছিল শুধু দূরাগত বিউগলের ডাক, পড়ন্ত সূর্যের সোনা-মাখানো বাতাসে ভেসে আসছিল সেই ডাক। সেনাবাহিনী যে তাদের কাজকর্ম নিয়মিত করে যাচ্ছে, এইরকম একটা ভাব বাইরে বজায় রাখার চেষ্টা এখনও অব্যাহত ছিল। চারপাশে গোলাপি, ফিকে লাল এবং পীতবর্ণের দেয়াল, আর তারই ভেতর দিয়ে সোজা সরু রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছিলেন তাঁরা দুজনে।

র‍্যাঁবেয়ার অবিরাম কথা বলছিলেন। মনে হয়েছিল তার দেহে সমস্ত স্নায়ু যেন

তিনি তার স্ত্রীকে ফেলে এসেছেন
উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। র‍্যাঁবেয়ার জানালেন—তিনি তার স্ত্রীকে ফেলে এসেছেন প্যারিসে। অবশ্য মহিলা যদিও তার বিবাহিত স্ত্রী নন, তবুও তাদের দুজনের সম্পর্ক অনেকটা স্বামী-স্ত্রীর মতো। যেদিন থেকে বাইরের সাথে এই শহরের সুযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, সেদিনই তাকে তিনি এক তার পাঠিয়েছিলেন। তখন তার ধারণা হয়েছিল শহরের এই অবস্থা খুবই সাময়িক। সুতরাং তিনি চেষ্টা করেছিলেন স্ত্রীর কাছে কোনোরকম একখানা চিঠি পৌঁছে দেয়ার। কিন্তু পোস্টঅফিসের লোকদের কাছে একথা জানাতে তারা সম্পূর্ণ 'না' করে দিয়েছিল। স্থানীয় সংবাদপত্র অফিসে তার যেসব বন্ধু-বান্ধব আছেন, তারাও জানিয়ে দিয়েছিলেন—এ-ব্যাপারে কোনোরকম সাহায্য করতে তারা অক্ষম। তার প্রিফেক্টের অফিসের একজন কেরানি তো তার কথা শুনে তার মুখের ওপর হেসে উঠেছিল। শেষপর্যন্ত পোস্টঅফিসের বাইরে লোকজনের এক লাইনে বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ছোট একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন : সবকিছু মোটামুটি ভালোই চলছে, শিগগিরই দেখা হবে। কিন্তু তার পরের দিনই ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তার মনে হয়েছিল যে, এই বিপর্যয়ের অবস্থা যে কতদিন ধরে চলবে তারও কোনোরকম নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং তক্ষুনি তিনি এই শহর ছেড়ে যাবেন বলে স্থির করে ফেলেন। তাঁর পেশাগত মর্যাদার গুণে ওপরের তলায় এখানে-ওখানে নাড়া দিতে সক্ষম হওয়ায় প্রিফেক্টের অফিসের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার লাভ করতে সক্ষম হন। সেখানে র‍্যাঁবেয়ার ভদ্রলোককে বুঝিয়ে বলেন যে ওরাঁও-এ তার উপস্থিতি একটা সম্পূর্ণ আকস্মিক ব্যাপার। আসলে এই শহরের সঙ্গে কোনো ব্যাপারেই তার কোনো যোগসূত্র নেই। এমতাবস্থায় তাকে যে এখানে থেকে যেতেই হবে, তারও কোনো সঙ্গত কারণ নেই। সুতরাং এই যখন অবস্থা তখন নিশ্চয়ই তিনি শহর ছেড়ে যাবার অনুমতি পাবার আশা করতে পারেন। তবে হয়তো শহর ছেড়ে যাবার পরও কিছুদিন তাকে সাধারণের সাথে যোগাযোগ থেকে দূরে থাকতে হবে।

কর্মচারী ভদ্রলোক উত্তরে র‍্যাঁবেয়ারকে জানান যে, যদিও তিনি র‍্যাঁবেয়ারের অবস্থা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছেন এবং তাঁর জন্যে যথেষ্ট সহানুভূতি বোধ করেন; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্যে যে আইনের কোনোরকম ব্যতিক্রম করবেন তার কোনো উপায় নেই তাঁর হাতে। তবে তিনি কিছু করতে পারেন কিনা সেটা চেষ্টা করে দেখবেন অবশ্য। এর দ্বারা তিনি কোনো নিশ্চিত আশ্বাস দিচ্ছেন না যে শিগগির তাকে কোনো সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে পারবেন; কারণ কর্তৃপক্ষ সমগ্র পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ করছেন।

—কিন্তু ভুলে যাবেন না, র‍্যাঁবেয়ার চিৎকার করে উঠলেন—আমি তো আর এই শহরের অধিবাসী নই।

—অবশ্যই আপনি যা বলছেন তা নিশ্চয়ই সত্যি...তবে আশা করা যায় শিগগিরই এই বিপর্যয়ের উপশম হবে। শেষ অবধি তিনি র‍্যাঁবেয়ারকে এই বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন যে, যেহেতু তিনি একজন সাংবাদিক, তাঁর লেখার উপযোগী চমৎকার উপকরণ তিনি এখন ওরাঁও-এ পেতে পারেন। আর বাস্তবিকই যদি কেউ একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেন, তাহলে সহজে উপলব্ধি করতে পারবেন যে, পৃথিবীতে

এমন কিছুই কখনও ঘটে না, যার কোনো শুভ দিক নেই। তবে হয়তো তার বহু অবাঞ্ছিত দিকও সম্ভব।

এসব শোনার পর র‍্যাঁবেয়ার অশিষ্টভাবে নিজের ঘাড় দুখানায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে কঠিন রাগ দেখিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসেন।

ইতিমধ্যে তাঁরা দুজনে শহরের মধ্যস্থলে এসে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

—ভেবে দেখুন তো, ডাক্তার সাহেব, কীরকম মূর্খের মতো কথাবার্তা বলে এরা সব। এই সত্যিটা ওরা কিছুতেই উপলব্ধি করতে চায় না যে, শুধুমাত্র সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখার জন্য পৃথিবীতে আমার জন্ম হয়নি। বরং এটাই সম্ভব যে একজন নারীকে ভালোবাসব এবং তার সঙ্গে একত্রে বাস করব তারই জন্য আমি জন্মেছি। সেটাই তো সংগত, তাই নয় কি?

ডাক্তার রিও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে জবাব দিলেন যে র‍্যাঁবেয়ার যেসব কথা বলছেন তার মধ্যে ভেবে দেখবার মতো কিছু থাকতে পারে নিশ্চয়।

শহরের প্রধান বুলভার্দে সবসময় যেমন জনসমাগম দেখা যায়, আজ আর সেখানে এমন লোকজন ছিল না। এদিক-ওদিক দূরে-কাছে যে দুই-একজন চোখে পড়ছিল তারাও যেন দ্রুত ঘরে ফেরার জন্যে উদ্বিগ্ন, কারো মুখে হাসি নেই। ডাক্তার রিও অনুমান করলেন র‍্যান্সডক ব্যুরো থেকে সর্বশেষ যে-ঘোষণাটি করা হয়েছে এসব তারই ফল। হয়তো ২৪ ঘণ্টা সময় পার হয়ে যাবার পর শহরের অধিবাসীরা আবার সহজ এবং আশান্বিত বোধ করতে শুরু করবে। কিন্তু ঠিক ঘোষণার দিনটাতেই মৃত্যুর সংখ্যা তখনও তাদের সুস্পষ্ট স্মরণ থাকায় সবাই কিছুটা সন্ত্রস্তবোধ করতে থাকে।

—সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের পরিচয় খুব অল্পদিনের, র‍্যাঁবেয়ার আবার হঠাৎ আরম্ভ করলেন—কিন্তু আমাদের পরস্পরকে অত্যন্ত ভালো লাগে।

ডাক্তার রিও উত্তরে কোনো বাক্যব্যয় করলেন না দেখে তিনি তেমনি বলে চললেন—বুঝেছি, আপনি খুব বিরক্তি বোধ করছেন। সত্যিই, বড় দুঃখিত তার জন্যে। আমি শুধু জানতে এসেছিলাম, এই অভিশপ্ত রোগ আমার দেহে সংক্রামিত হয়নি—এই বলে আপনি আমাকে একখানি সার্টিফিকেট দিতে পারেন কি না। তাতে আমার নিজের ব্যাপারটা কিছু সহজ হবে।

ডাক্তার রিও মাথা নাড়লেন। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বাচ্চাছেলে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে তাঁর পায়ে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ডাক্তার হেঁট হয়ে তাকে তুলে আবার রাস্তার ওপর দৌড় করিয়ে দিলেন। হাঁটতে হাঁটতে তারা প্যালেস দ আর্মেস-এর কাছে পৌঁছালেন। ধুলার রুক্ষ আবরণে ধূসর চেহারার টাইলস এবং ডুমুরগাছের সারি যেন শাখা-প্রশাখা এগিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিপাবলিকের চারপাশে হতাশভাবে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিমূর্তিটির দেহেও ধুলা এবং অন্যান্য ময়লার পুরু আবরণ জমেছিল। তার সামনে এসে তারা দুজনে থামলেন। পাশের পাথর-বাঁধানো রাস্তার ওপর ডাক্তার রিও নিজের দু পা দিয়ে আঘাত করলেন, তার জুতোর ওপর ধুলার যে একটা ধূসর আস্তরণ জমেছিল সেটা ঝেড়ে ফেললেন। তার মাথার টুপিটা পেছনের দিকে সামান্য একটু ঠেলে দেওয়া, টাইয়ের বাঁধনটা ঢিলে করে দেওয়া, যার

ফলে জামার কলারটা গলার কাছেই নুয়ে ছিল, দুগালের চিবুকে খোঁচা দাড়ি, গভীর কোনো আঘাত পেলে মানুষের চেহারা যেমন হয়, র‍্যাঁবেয়ারের চেহারার মধ্যেও তেমনি একটা অপ্রসন্ন এবং কঠিন একগুঁয়ে ভাব ফুটে উঠেছিল।

—আমি যে আপনার অবস্থা বুঝিনি এমন সন্দেহ করবেন না, ডাক্তার রিও এবার বললেন—তবে এটাও ঠিক যে আপনি যেসব যুক্তি দেখাতে চাচ্ছেন সেগুলো শেষপর্যন্ত টেকানো শক্ত। আপনাকে সার্টিফিকেট দিতে পারছি না এই কারণে যে, সত্যিই আপনার দেহে রোগ সংক্রামিত হয়েছে কিনা সেটা তো আমি আর জানি না; আর তাছাড়া ধরুন যদি তা জানতামই তাহলেও যে-মুহূর্তে আমি আপনাকে সার্টিফিকেট দেব এবং তারপর আপনি যেমন প্রিফেক্টের অফিসে গিয়ে পৌছাবেন—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে আপনার দেহে যে রোগের বীজাণু ঢুকবে না, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হব কীভাবে? ধরুন সে-ব্যাপারেও যদি নিশ্চিত হলাম কিন্তু...

—যদি নিশ্চিত হলেন তখন আবার কী?

—আমি যদি আপনাকে সার্টিফিকেট দিই, তাতেও আপনার কোনো সাহায্য হবে না।

—কেন?

—কারণ, এই শহরে আরো হাজার হাজার লোক রয়েছে, যাদের অবস্থা আপনার মতো, কিন্তু তাদের সবাইকে তো আর শহর ছেড়ে যাবার অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়।

—তাদের দেহে প্লেগের বীজাণু সংক্রামিত হয়নি, তা জানা সত্ত্বেও তাদেরকে শহর ছেড়ে যাবার অনুমতি দেওয়া সম্ভব হবে না বলে আপনি মনে করেন?

—রোগ সংক্রামিত হয়নি, এটা জানাই তো তাদের শহর ছেড়ে যাবার অনুমতি দেবার পক্ষে সবখানি কারণ নয়। দেখুন, আমি নিজেও জানি সমস্ত পরিস্থিতিটাই অযৌক্তিক; কিন্তু করবেন কী আপনি? সেইভাবেই গ্রহণ করতে হবে তাকে, কারণ আমরা সবাই তার ভেতর জড়িয়ে পড়েছি।

—কিন্তু আমি এই যে শহরের অধিবাসী নই।

—বড়ই দুঃখের বিষয়, এখন থেকে আর সবার মতোই আপনার নিজেকেও এই শহরেই একজন বলে মনে করতে হবে।

র‍্যাঁবেয়ার এবার তার গলার স্বর একটু চড়িয়ে দিলেন।

—গোল্লায় যাক; কিন্তু ডাক্তার, আপনি কি বোঝেন না যে এটা মানুষের সাধারণ অনুভূতির ব্যাপার? না, যারা পরস্পরকে ভালোবাসে এবং কাছে পেতে চায়, এই বিচ্ছেদ যে কী তাদের কাছে, সেটাও অনুভব করেন না?

ডাক্তার রিও বেশ কয়েক মুহূর্ত কোনো জবাব দিলেন না। তারপর বললেন, তিনি সবই পরিষ্কার বোঝেন। র‍্যাঁবেয়ার তার মার কাছে ফিরে যাবার অনুমতি পাক এবং অপর যারা পরিবারকে ভালোবেসে অথচ হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তারাও আবার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পাক, এসবই তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেন। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও ভাবতে হবে যে আইন আইনই। শহরে প্লেগ দেখা দিয়েছে সুতরাং সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী তাঁর যা কর্তব্য সেটা তাকে করতেই হবে।

—না, আমার মনে হচ্ছে, আপনি কিছুই বোঝেন না, র‍্যাঁবেয়ার বেশ কিছুটা

তিক্ততার সঙ্গে বলে উঠলেন—কারণ আপনি যেসব কথা বলছেন সেগুলো যুক্তির কথা, বুদ্ধি-বিবেচনার কথা, মানুষের হৃদয়ের কথা নয়; আপনি বাস করেন বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এক কল্পনার রাজ্যে।

ডাক্তার রিও চোখ তুলে শুধু স্ট্যাচু অব রিপাবলিকের দিকে চাইলেন একবার। তারপর বললেন—তিনি বিচারবুদ্ধির কথা বলছেন কিনা তা অবশ্য তিনি জানেন না, তবে এটা ঠিক যে তিনি এমনই বাস্তবের ভাষায় কথা বলছেন যা সবার চোখেই সুস্পষ্ট। তবে এ দুটো ভাষাই এক কিনা তা তার জানা নেই।

সাংবাদিক তাঁর টাইটাকে সোজা করার জন্যে সেটাকে ধরে টান দিলেন —সুতরাং ধরে নিতে পারি যে, আপনার কাছ থেকে কোনোরকম সাহায্যের জন্যে তরুণ করাটা আমার পক্ষে উচিত হবে না। বেশ উত্তম। কিন্তু এটাও জেনে রাখুন—এবার র‍্যাঁবেয়ারের স্বর হয়ে উঠল চ্যালেঞ্জের মতো—এ শহর আমি ছেড়ে যাবই।

ডাক্তার আবার তার নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। সবকিছুই তিনি জানেন এবং বুঝেন, কিন্তু তার নিজের করার মতো কিছুই নেই।

—মাফ করবেন, আমি যতদূর শুনেছি এটা আপনারই কাজ, র‍্যাঁবেয়ারের গলার স্বর আবার চড়ল—আপনার কাছে এসেছি তার কারণ, শুনেছি যে নির্দেশ জারি করা হয়েছে তার খসড়া আপনারই দেওয়া। কাজেই ভেবেছিলাম, যে আইন আপনি তৈরি করতে সাহায্য করেছেন, অন্তত একটা বিশেষ ক্ষেত্রে তা ভঙ্গ করার ব্যাপারেও হয়তো কিছুটা সাহায্য আপনার কাছ থেকে পাব। কিন্তু তার কোনো গুরুত্বই দিলেন না আপনি, শুনলেনই না আমার কথা। আপনি কোনোদিন কারুর কথা চিন্তাই করেন না। সাধারণ হৃদয়াবেগ সূত্রে আবদ্ধ যারা, তাদের কাছে বিচ্ছেদের বেদনা যে কী তা কোনোদিন অনুভব করার চেষ্টাই করেননি আপনি।

ডাক্তার রিও স্বীকার করলেন যে, র‍্যাঁবেয়ারের অভিযোগ কিছুটা সত্য। কারণ এসব লোকের কথা চিন্তা না-করাটাই বরং তিনি ভালো মনে করেন।

—দেখুন তাহলে, র‍্যাঁবেয়ার আবার উচ্চস্বরে বলে উঠলেন—এরপরই নিশ্চয়ই জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থের দৃষ্টান্ত দেখাবেন। কিন্তু জনসাধারণের কল্যাণও আমাদের সবার কল্যাণেরই সমষ্টি। আমাদের নিয়েই জনসাধারণ।

ডাক্তার রিও এতক্ষণ পরে যেন হঠাৎ একটা স্বপ্নের ভেতর থেকে জেগে উঠলেন।

—বেশ, বেশ, হাঁটুন দেখি, তিনি বললেন—কথাটা ঠিকই, কিন্তু তারই সঙ্গে আরও অনেক কিছু ভাববার আছে। এত তাড়াতাড়ি কিছু একটা সিদ্ধান্ত নেয়াটা ঠিক নয়, তা জানেন তো। কিন্তু আপনার এত রাগ করবার কারণটা কী? একটা জিনিস নিশ্চয় জেনে রাখবেন যে আপনি যদি কোনোপ্রকারে এর ভেতর থেকে মুক্তি পান, তাতে আমি অত্যন্ত খুশি হব। তবে এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলো সরকারি দায়িত্বের খাতিরে আমি করে উঠতে পারিনে।

র‍্যাঁবেয়ার খুব বিরক্তির সঙ্গে মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিলেন—হ্যাঁ, ঠিকই, অতখানি বিরক্তি দেখানোটা আমার ভুল হয়েছে। যাহোক, আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম, কিছু মনে করবেন না নিশ্চয়।

ডাক্তার রিও র‍্যাঁবেয়ারের কাছ থেকে জানতে চাইলেন তাঁর নিজের পরিকল্পনার কাজ কেমন চলছে। তাঁকে অনুরোধ করলেন—তিনি সাহায্য করতে পারলেন না বলে র‍্যাঁবেয়ার যেন কিছু মনে না করেন। তবে তাঁর বিশ্বাস এমন কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে সেখানে তাঁরা দুজনে মিলতে পারেন হয়তো।

র‍্যাঁবেয়ার হঠাৎ কেমন অপ্রতিভ হয়ে গেলেন যেন। অল্প কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন—হ্যাঁ, আমার নিজেরও কতকটা সেইরকম মনে হয়। আমি যাই ভাবি না কেন এবং আপনি এতক্ষণ যাই বলে থাকুন না কেন, এসব সত্ত্বেও, আমাদের দুজনের মিলবার কিছু কিছু ক্ষেত্র যেন আছে—কিন্তু সব ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একমত হতে পারব না।

র‍্যাঁবেয়ার তার মাথার টুপিটা টেনে চোখের ওপর নামিয়ে দিলেন। তারপর ডাক্তারের সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে দ্রুত অন্যদিকে হেঁটে চলে গেলেন। ডাক্তার লক্ষ্য করে দেখলেন, জ্যাঁ তারিউ থাকেন যে হোটেলে সেখানে গিয়ে ঢুকলেন র‍্যাঁবেয়ার।

মুহূর্ত পরে ডাক্তার রিও নিজের মাথাটা সামান্য একটু নাড়লেন। সেই মুহূর্তে তাঁর মনের ভেতর যে-চিন্তাটা উদয় হয়েছিল সেটাকেই তিনি অনুমোদন করলেন যেন। নিজের সুখভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে অস্বীকার করে সাংবাদিক ঠিকই করেছেন; কিন্তু তিনি যে তাঁকে, ডাক্তারকে, অবাস্তব চিন্তার রাজ্যের মানুষ বলে দোষারোপ করছিলেন, তাও কি তার পক্ষে সঙ্গত হয়েছে? শহরে প্লেগ যখন নিয়মিত তার উদরপূর্তি করে স্ফীত হচ্ছে; তার শিকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সপ্তাহে পাঁচশো; আর তাকে দিনের-পর-দিন এইভাবে হাসপাতালে কাটাতে হচ্ছে, এগুলোও কি সবই তাহলে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য? তাই বলা যায় কী এগুলোকে? কিন্তু হ্যাঁ, এই ধরনের বিপর্যয়ের ভেতর সবসময় এমন কিছু কিছু উপকরণ ঢুকে যায়, সেগুলোকে মনে হবে বিমূর্ত চিন্তার শামিল। সেগুলো বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন বটে; কিন্তু যখন দেখা যায় যে, এসব অবাস্তব চিন্তাই তোমার মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে যাচ্ছে, তখন তার মোকাবিলা করার জন্যে তোমার নিজেকেও তৎপর হয়ে উঠতে হবে বৈকি। এবং এটুকুও তিনি জানতেন যে এই মোকাবিলাটাও সবচেয়ে সহজ পথে নয়। উদাহরণস্বরূপ, এই যে আপৎকালীন হাসপাতাল পরিচালনা করা, যার সমস্ত দায়িত্ব ডাক্তারের নিজের এবং এরকম তিনটে হাসপাতাল তার তত্ত্বাবধানে; এটা একটা খুব সহজ দায়িত্ব নয়।

রোগী হাসপাতালে এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে যাতে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, তারই জন্য হাসপাতালের অস্ত্রোপচার-কক্ষে ঢোকার পথে একটা ঘর উপযুক্তভাবে যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজিয়ে ডাক্তার রিওকে দেয়া হয়েছিল। ঘরের মেঝেটা সম্পূর্ণ খুঁড়ে সে-জায়গায় অল্প পানি এবং ক্রিসোলিক অ্যাসিডের ক্ষুদ্রাকার একটা হ্রদের মতো বানানো হয়েছিল। এই হ্রদের মাঝখানে ছিল সাজানো ইটের ছোট একটা দ্বীপের মতো স্থান। রোগী হাসপাতালে এসে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তাকে এই দ্বীপের ওপর দিয়ে নিয়ে তোলা হত। তার পরনের কাপড়চোপড় দ্রুতহাতে খুলিয়ে নিয়ে জলাশয়ের রোগজীবাণুনাশক পানির মধ্যে ডুবিয়ে দেয়া হত। তারপর রোগীর দেহ পরিষ্কার করে ধুয়ে, শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে, তাকে হাসপাতালের পোশাক পরিয়ে

নিয়ে যাওয়া হত ডাক্তার রিও-র কাছে পরীক্ষার জন্যে এবং সেখান থেকে তাকে আবার পৌঁছে দেয়া হত তার নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে। সাময়িকভাবে হুকুম-দখল করা এক স্কুলগৃহে অবস্থিত এই হাসপাতালের বেডসংখ্যা ছিল মোট পাঁচশো। কিন্তু তার একটাও শূন্য ছিল না। রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেবার পর সে-কাজও ডাক্তার নিজে তদারক করতেন—তিনি তার দেহে নিজে ইনজেকশন দিতেন, তার দেহের স্ফীতিগুলো চিরে চিরে তা থেকে পুঁজ বের করে দিতেন, রোগীর সংখ্যা গুনে মিলিয়ে নিতেন এবং আবার বিকেলে আসতেন তাদের অবস্থা কেমন তা দেখার জন্যে। রাত শুরু হবার পর তিনি বেরিয়ে যেতেন বাসায় বাসায় রোগী দেখতে। প্রতিদিনই তাঁর নিজের বাসায় ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত। আগের দিন রাতে তাঁর মা ডাক্তারের হাতে তাঁর স্ত্রীর একখানা টেলিগ্রাম দেবার সময় ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর হাত কাঁপছে কেন।

—হ্যাঁ, তা হবে, তিনি উত্তরে বলেছিলেন—হাত দুখানাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দেয়া দরকার। স্নায়ুগুলো শান্ত হয়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডাক্তারের দেহে শক্তি-সামর্থ্য ছিল প্রচুর। সুতরাং তখনি তিনি যথেষ্টরকম ক্লান্ত বা অবসন্ন হয়ে পড়েননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা সত্যি যে, ঘন ঘন রোগী দেখতে দেখতে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তাতে ধৈর্য রক্ষা করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল। রোগীকে পরীক্ষার পর যদি দেখা যেত যে, তার দেহে রোগ সংক্রমিত হয়েছে, তাহলে তখনি তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হত। তারপরই বাস্তবিক শুরু হত বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বিমূর্ত চিন্তাভাবনা ও রোগীর পরিবারের সঙ্গে মতবিরোধের পালা। কারণ তারা সবাই পরিষ্কার জানত যে, রোগীকে একবার হাসপাতালে নিয়ে গেলে পুনরায় সে আরোগ্য লাভ না-করা বা তার মৃত্যু না-হওয়া পর্যন্ত তার আর মুখ দেখতে পারবে না।

—কিছুটা দয়ামায়াও তো আশা করতে পারি আপনার কাছ থেকে, ডাক্তার সাহেব—তারা যে হোটেলে থাকতেন সেখানে পরিচারিকার কাজ করত যে মেয়েটি তার মা ম্যাদাম লরেট ডাক্তারের কাছে এই বলে অনুনয় করেছিল। তবে এই অনুনয়ের হয়তো প্রয়োজন ছিল না, কারণ করুণাবোধ অবশ্যই তাঁর ছিল। কিন্তু তা কি কোনো কাজে আসত? হাসপাতালে টেলিফোন না করে তো তার উপায় ছিল না। এবং তার পরেই রাস্তায় শব্দ শোনা যেত অ্যাম্বুলেন্সের।

প্রথম প্রথম অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ পেলে প্রতিবেশীরা জানলা খুলে দেখে দেখে দেখত, কিন্তু পরের দিকে এই শব্দ শুনতে পেলেই সবাই দ্রুত জানলা বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করত। কিন্তু এইবার শুরু হত রোগীকে নিয়ে বিরোধের দ্বিতীয় পর্যায়—অশ্রুবর্ষণ এবং অনুনয়-বিনয়ের পালা অর্থাৎ আবার সেই বিমূর্ত চিন্তাভাবনা। তখন রোগে উত্তপ্ত বিপর্যস্ত-প্রায় রোগীর গৃহে চলতে থাকত উত্তেজনার বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের অবতারণা। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই ফলত সেই ফলই দাঁড়াত, রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হত এবং তারপর ডাক্তার রিও সেখান থেকে বিদায় নেবার সুযোগ পেতেন। হাসপাতালে টেলিফোন করে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য গোড়ার দিকে তিনি শুধুমাত্র

দিয়েই অন্য রোগী দেখার জন্য বেরিয়ে যেতেন, এ্যাম্বুলেন্স না-পৌঁছানো অবধি অপেক্ষা করে এক জায়গায় বসে থাকতেন না। কিন্তু তাতে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, তিনি সেখান থেকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর আত্মীয়স্বজন অপর কেউ যাতে বাসায় ঢুকতে না পারে তার জন্যে তালা লাগিয়ে পথ বন্ধ করে দিত। রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে না দিলে নিজেদের ভেতর রোগ সংক্রামিত হওয়ার ভয় থাকে; তবুও সেটাকেই তারা অনেকে শ্রেয় বলে ভাবত। কারণ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেয়ার অর্থ যে কী তাও তারা জানত। এবং তারপরই শুরু হত তিরস্কার, দরজার ওপর প্রবল করাঘাত, কান্নাকাটি, পুলিশের আগমন এবং শেষ অবধি সৈনিকদের আবির্ভাব—সবরকমের বাধা পরাভূত করে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হত রোগীকে।

এইভাবে প্রথম কয়েক সপ্তাহ ডাক্তার রিওকে বাধ্য হয়েই এ্যাম্বুলেন্স না-আসা পর্যন্ত রোগীর বাসায় অপেক্ষা করতে হত। কিন্তু পরে যখন থেকে প্রত্যেকটি ডাক্তারের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে একজন করে পুলিশ অফিসারও রোগীর বাসায় যাওয়া শুরু করে, তখন থেকে ডাক্তার রিও-র প্রত্যেকটি রোগীর বাসায় এ্যাম্বুলেন্স না-আসা অবধি অপেক্ষা করে বসে থাকার প্রয়োজন হত না। তিনি একজনকে দেখা শেষ করেই অপর রোগীর বাসায় যেতে পারতেন।

প্রথম যে-সন্ধ্যায় মাদাম লরেটের মেয়েকে দেখার জন্যে তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়, পরবর্তী সব সপ্তাহই ডাক্তার রিও-র কাছে মনে হত সেই একই রকম। চারদিকে পাখা এবং কৃত্রিম ফুল দিয়ে সাজানো একটা ছোট ফ্লাটের ভেতর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেদিন তাঁকে। কেমন একটা অনিশ্চিত হাসি হেসে রোগীর মা ডাক্তারকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন : ওহ্! সবাই যে রোগের কথা বলাবলি করছে তা যেন আমার বাড়ারে না ধরে থাকে।

তার দেহের উপর চাপা দেয়া পুরু চাদর এবং গায়ের জামা সরিয়ে ডাক্তার একদৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিলেন রোগীর উরু এবং পেটের ওপরের লাল চাকা-চাকা দাগ। তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতি। একবার সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার পরই রোগীর মা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি, দুঃখ-বেদনায় চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। তারপর থেকে প্রত্যেক সন্ধ্যায় তিনি যেখানেই রোগী দেখতে গিয়েছেন, সেখানেই দেখেছেন রোগীর বিভিন্ন অঙ্গের এবং পেটের এই মারাত্মক লালচিহ্নের ওপর দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে শোকে-দুঃখে মুহ্যমান প্রত্যেক মাকেই এমনিভাবে বিলাপ করতে। তারপরই দুখানা হাত এসে প্রবল আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরত ডাক্তার রিও-র দু বাহু, বাধাহীন স্রোতের মতো বেরিয়ে আসত বাক্যের ধারা, শুরু হত অজস্র রকমের অঙ্গীকার এবং কান্নাকাটি, এ্যাম্বুলেন্সের বিলম্বসূচক ঘণ্টাধ্বনি যতই কাছে আসত, ততই মন মন তাঁর চোখের সামনে অবতারণা হতে থাকত শোক এবং বেদনা প্রকাশের বিভিন্ন দৃশ্যের। কিন্তু মানুষের বেদনার সব প্রকাশই যেমন নিরর্থক, অসার; এগুলিও ঠিক তেমনি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় দীর্ঘ সময় ধরে পরপর এই একই দৃশ্যের অবতারণা হত তার চোখের সামনে। সেই একই দৃশ্য যেন আসত ফিরে ফিরে, এছাড়া চাইবার মতো তেমন অন্য কিছুই যেন

ছিল না ডাক্তারের তখন। বিমূর্ত চিন্তার মতোই প্লেগও যেন তখন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিরক্তিকরভাবে একঘেয়ে। চারদিকে যা-কিছু ঘটছিল তার ভেতর একটা উপাদানই দেখা যেত পরিবর্তনশীল এবং সে-উপাদান ডাক্তার রিও নিজে। স্যাঁচু অর রিপাবলিকের র‍্যাঁবেয়ারকে যে হোটেলে ঢুকতে দেখেছিলেন, সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটা জিনিসই তিনি সেদিন অনুভব করছিলেন যে, একটা ঊষর নির্লিপ্ততা যেন ক্রমেই তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

অবসাদময় একটার-পর-একটা সপ্তাহ এইভাবে কেটে গেল। সন্ধ্যার-পর-সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। শহরের অধিবাসীরা দলে দলে রাস্তায় বেরিয়ে এসে সেই একই উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে কাটিয়ে দিল। কিন্তু তারপর ডাক্তার রিও-র যেন একটা শিক্ষালাভ হল। দয়ামায়ার প্রশ্রয় দেবেন না বলে তিনি যে নিজের হৃদয়কে শক্ত করেছিলেন তার আর যেন প্রয়োজন ছিল না। মানুষ যখন দেখে যে দয়ামায়া এগুলো অর্থহীন তখন সে আপনা থেকেই সেইগুলোর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। তার হৃদয় যে ক্রমেই অন্তর্মুখী হয়ে উঠছিল মনের ভেতর এইরকম একটা অনভূতি জাগিয়ে তিনি যেন কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করলেন। দিনের-পর-দিন যে দুঃসহ কষ্টকর বোঝা তাঁকে বইতে হচ্ছিল, তার ভেতর এটাই ছিল তাঁর কাছে একমাত্র সান্ত্বনা। তিনি জানতেন এর ফলে তাঁর দায়িত্ব সহজ হয়ে আসবে। সুতরাং তিনি মনে-মনে আনন্দ অনুভব করলেন। সেদিন তাঁর দুটোর দিকে যখন ডাক্তার বাসায় ফিরলেন এবং তাঁকে তাঁর দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাইতে দেখে তাঁর মা যখন একটু চমকে উঠলেন, তখন তিনি যেন সেই জিনিসটার জন্যে পরিতাপ করলেন, যেটাকে সেই মুহূর্তে ডাক্তার একমাত্র উপশম বলে ভাবতে পারতেন। বাস্তব সত্তাহীন কোনোকিছুর সঙ্গে যদি নিরন্তর তোমাকে সংগ্রাম করতে হয়, তাহলে তার কিছু কিছু অভিব্যক্তি তোমার চেহারার মধ্যেও থাকা যে প্রয়োজন।

কিন্তু র‍্যাঁবেয়ারও সেটা অনুধাবন করবেন তা আশা করা কি সম্ভব? তাঁর দৃষ্টিতে তার সুখের অন্তরায় যদি কিছু থাকে তা হল এই বিমূর্ত চিন্তাভাবনা। বাস্তবিকই ডাক্তার রিও স্বীকার করলেন এ সম্পর্কে হয়তো র‍্যাঁবেয়ারের কথাই ঠিক। কিন্তু তিনি এ-ও জানতেন যে, এই বিমূর্ত চিন্তাভাবনার আবেদন অনেক সময় মানুষের কাছে সুখের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এবং তখন হয়তো, কেবল তখনই একে মূল্য দিয়ে আর উপায় থাকে না। এবং ঠিক এই জিনিসটাই যে র‍্যাঁবেয়ারের জীবনেও ঘটতে যাচ্ছিল, সেটা ডাক্তার জানতে পারলেন—যখন আরও বেশ কিছুদিন পরে র‍্যাঁবেয়ার তার নিজের সম্পর্কে বহু কথা ডাক্তারকে বললেন। এইভাবে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সুখের আকাঙ্ক্ষা এবং প্লেগ সম্পর্কিত তার বিমূর্ত চিন্তাভাবনার মধ্যে নিরন্তর যে একটা নিষ্ফল দ্বন্দ্ব চলছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে যে দ্বন্দ্বই হয়ে উঠেছিল আমাদের শহরের জীবনযাত্রার প্রধান অঙ্গ, র‍্যাঁবেয়ারও তখন তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। তবে এটা অবশ্য সত্য যে, তাঁর উপলব্ধি ছিল ডাক্তার রিও-র নিজের উপলব্ধি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের।

৩
একজনের দৃষ্টিতে যা ছিল শুধু কতকগুলো চিন্তাভাবনা, অবাস্তব তত্ত্ব; অপর কারো
দৃষ্টিতে তাই হয়ে উঠল সত্য, বাস্তবের স্বরূপ। প্লেগের প্রথম মাসটা শেষ হল এক
বিরাট নিরাশার মধ্য দিয়ে; একদিকে যেমন প্লেগের প্রকোপ হঠাৎ আবার মারাত্মক হয়ে
উঠল, অন্যদিকে শোনা গেল ফাদার প্যানালুর, সেই জেসুইট যাজক, যিনি রোগাক্রান্ত
মিশেলকে পথের মাঝে হাত বাড়িয়ে সাহায্য করেছিলেন, তার এক নাটকীয় ধর্ম-
উপদেশ। ওরাও-এর ভৌগোলিক সোসাইটিতে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য তিনি
ইতিমধ্যেই কিছুটা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁর বেশির ভাগ অবদান
ছিল প্রাচীন উৎকীর্ণ-বিষয়ক গবেষণা-কাজের ওপর; এ-সম্পর্কে তিনি ছিলেন একজন
প্রামাণিক মতের; কিন্তু সাম্প্রতিককালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ওপর পরপর কয়েকটা
বক্তৃতাদানের ফলে তিনি তাঁর বিশেষ অবদানের ক্ষেত্রে বাইরের লোকের মাঝেও
খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এ-ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের মধ্যে, যা-কিছু
নিখাদ এবং খাঁটি, যা একদিকে যেমন সাম্প্রতিককালের ধর্ম-বিষয়ক শৈথিল্যকেও
মার্জনার চোখে দেখতে নারাজ, তেমনি আবার যারা অতীতের দোহাই দিয়ে আধুনিক
জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায় তাদেরকেও সমর্থন দান
করতে অসম্মত—তারই একজন সাহসী প্রবক্তা হিসাবে। এইসব বক্তৃতা দানকালে তাঁর
শ্রোতৃবর্গ যাতে কঠিনভাবে আঘাত পায়, এমন কিছু তাদের স্খলন এবং দুর্বলতা
তাদের চোখের সামনে তুলে ধরতেও তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। এইসব কারণেই
তিনি স্থানীয় যশস্বী ব্যক্তিদের একজন হয়ে উঠেছিলেন।

প্রথম মাসের শেষের দিকে চার্চের কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন যে, চার্চ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
হিসাবে তার নিজস্ব হাতিয়ারের সাহায্যে প্লেগের বিরুদ্ধে এক সংগ্রাম শুরু করবে।
তাঁরা একটা প্রার্থনা-সপ্তাহ উদযাপনের আয়োজন করলেন। স্থির হল যে, যিনি নিজেও
প্লেগের শিকার হয়েছিলেন সেই মহাপ্রাণ ব্যক্তি সেন্ট রচের উদ্দেশে রবিবারে এক
বিরাট ভোজ-উৎসব উদযাপনের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের ধর্মানুরক্তির প্রদর্শন সম্পন্ন
হবে। এই উপলক্ষে জনসাধারণকে ধর্মীয় বাণী শোনাবার জন্য ফাদার প্যানালুকেও
আমন্ত্রণ জানানো হল। ফাদার প্যানালু তখন সেন্ট আগস্টান এবং আফ্রিকান চার্চের
ওপর যে-গবেষণাকাজে লিপ্ত ছিলেন এবং যার জন্য তিনি ইতিমধ্যেই জেসুইট পর্যায়ে
যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তা একপক্ষকাল সময়ের জন্য স্থগিত রাখলেন।
স্বভাবত উৎসাহী এবং আবেগপ্রবণ হওয়ায় তিনি প্রবল আগ্রহের সঙ্গে এই দায়িত্ব
নিজের স্কন্ধে তুলে নিলেন এবং পরিপূর্ণভাবে এই কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এই
উপলক্ষে তিনি যে ধর্মীয় বাণীটা শোনান তা আগে থেকেই সাধারণের মধ্যে
আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে চালু ছিল এবং তিনি যেদিন তাঁর বাণী দান করেন সেই
দিনকে সমকালীন ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থেকে যায়।
প্রার্থনা-সপ্তাহ উপলক্ষে চার্চে যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় তাতে জনসমাবেশ হয়েছিল
প্রচুর। এ থেকে অবশ্য এটা ধরে নেওয়া সঙ্গত হবে না যে, সাধারণ সময়ও ওরাও-
এর অধিবাসীরা ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ,

রবিবারের সকালগুলোয় কে পার্কে যাবে আর কে সমুদ্রস্নানে যাবে এই নিয়ে শহরের
অধিবাসীদের মধ্যে যেন রীতিমতো একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। অবশ্য এটাও
অনুমান করা ভুল হবে যে হঠাৎ বোধ হয় তারা যেন বিশেষ আলোর সন্ধান পেয়েছিল,
আর তারই ফলে তাদের সবার অন্তরে একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল।
তবে এটা সত্যি যে, হঠাৎ শহরের গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং বন্দরের সংযোগ সম্পূর্ণ
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াতেই সমুদ্রস্নানের ব্যাপারটা তাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে
দাঁড়িয়েছিল; অধিকন্তু তাদের মনের অবস্থাও তখন ঠিক স্বাভাবিক ছিল না, তাদের
উপর যে কতবড় একটা বিপর্যয় নেমে এসেছে সেটা নিজেরা স্বীকার না-করলেও
সুনিশ্চিত একটা পরিবর্তন যে ইতিমধ্যে ঘটেছে, অত্যন্ত সুস্পষ্ট কারণে সেটা অনুভব
না করে তাদের উপায় ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের অনেকেই তখনও পর্যন্ত মনে-
মনে আশা পোষণ করত যে, এই বিপর্যয়ের উপশম হবে এবং তারা নিজেরা এবং
তাদের নিজেদের পরিবারবর্গ কোনো-না-কোনো প্রকারে প্লেগের আক্রমণের হাত
থেকে রেহাই পাবে। সুতরাং নিজেদের আচার-আচরণের পরিবর্তনের জন্য
কোনোরকম বাধ্যবাধকতা অনুভব করত না তখনও তারা। তাদের কাছে প্লেগ ছিল
যেন এক অবাঞ্ছিত অতিথির মতো। সে যেমন এসেছে তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবে নিজ
থেকেই একদিন বিদায় নেবে—এই ছিল তাদের ধারণা। তারা শঙ্কিত হয়েছিল সত্যি,
কিন্তু অবস্থা তাদের জন্যে তখনও তাদের কাছে অতখানি নৈরাশ্যজনক হয়ে ওঠেনি,
যখন প্লেগ তাদের কাছে নিজেদের অস্তিত্বের পেশিস্বরূপ বলে মনে হতে পারত, যখন
জীবনকে এক মহা-আশীর্বাদস্বরূপ তারা ভোগ করে আসছিল।

সংক্ষেপে একটা কিছু পরিবর্তনের আশা করছিল তখনও তারা। ধর্মের ব্যাপারে
যেমন, অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কেও ঠিক তেমনি, প্লেগ তাদের মধ্যে এমন একটা
মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, যাকে যেমন একদিকে ঠিক নির্লিপ্ততাও বলা চলে না,
তেমনি আবার অতিমাত্রার উৎসাহ বা কৌতূহলও বলা চলে না; যে মানসিক অবস্থার
একমাত্র সঠিক নামকরণ হতে পারে নিরাসক্তি। ডাক্তার রিও একজন চার্চগামী
ব্যক্তিকে যে মন্তব্য করতে শুনেছিলেন—আর যাই হোক এর দ্বারা তো আর কিছু ক্ষতি
হচ্ছে না আমাদের। যেসব মানুষ প্রার্থনা-সপ্তাহে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের অনেকের
মুখ থেকেই এই একই মন্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যেতে পারত। এমনকি তারিউ পর্যন্ত
যেখানে নোটবুকে লিপিবদ্ধ করেন যে, চীনদেশের লোকেরা এই অবস্থায় প্লেগের
দেবতাকে প্রসন্ন করবার জন্যে তার সামনে তাম্বুরা বাজাতে থাকে, তার পরেই আবার
মন্তব্য করেন যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই তাম্বুরি বাজানোটা অন্যান্য রোগ-প্রতিষেধক
ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনীয় এবং সত্যিই যে অধিক ফলদায়ক নয় তা বলা শক্ত। শেষে
গিয়ে শুধু এই মন্তব্যটুকু যোগ করেন যে, এই বিতর্কের মীমাংসার জন্যে প্লেগের
দেবতা বলে সত্যিই কোনোকিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা সেটাই আমাদের প্রথম জানার
দরকার এবং যেহেতু সে-বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সুতরাং এ-ব্যাপারে আমরা যে
মতামত গড়ে থাকি না কেন, তা আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যেতে বাধ্য।
যাহোক সারা প্রার্থনা-সপ্তাহ ধরে শহরের প্রধান গির্জায় প্রায় সবসময় দেখা যেতে

লাগল অসংখ্য প্রার্থনাকারী মানুষের ভিড়। প্রথম দু-তিন দিন অনেকেই গির্জার বারান্দার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত; বারান্দার সামনের পথে এবং ডালিমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করত। দূর থেকে শুনত গির্জার ভেতর মিলিত কণ্ঠের প্রার্থনা এবং আহ্বানের শেষ মন্ত্রধ্বনি উচ্ছল তরঙ্গের মতো প্রবল উচ্ছ্বাসে স্ফীত হয়ে উঠছে, যার পশ্চাতের প্রবাহ আশেপাশের রাস্তায় পর্যন্ত গিয়ে আছড়ে পড়ছিল যেন। কিন্তু তাদের ভিতর থেকে কেউ অগ্রগামী হয়ে গিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যেটুকু দেরি, তারপরেই দেখতে দেখতে সবাই গির্জার ভেতর গিয়ে ঢুকতে শুরু করল, প্রার্থনা এবং আহ্বানে কণ্ঠ মেলাতে লাগল। রবিবারের দিন যখন ফাদার প্যানালুর বাণী দেবার সময় আসল, দেখা গেল উপাসনাকারীরা গির্জার প্রধান অংশ ছাপিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আশেপাশের সংলগ্ন সমস্ত স্থান ভরে ফেলছে। আগের দিন থেকেই সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, সেদিন সকাল থেকেই প্রবল বর্ষণ শুরু হল। যারা গির্জার বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা সবাই একে একে মাথায় ছাতি খুলে ধরলেন। যখন ফাদার প্যানালু প্রচারবেদির উপর গিয়ে আরোহণ করলেন, দেখলেন, গির্জার অভ্যন্তর ভাগ ধূপের মৃদু সুবাস এবং সিক্ত জামাকাপড়ের গন্ধে ভরে উঠেছে।

ফাদার প্যানালুর দৈহিক গঠন ছিল বলিষ্ঠ, উচ্চতা—মাঝারি। বেদির সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর প্রকাণ্ড থাবায় বেদির চারপাশে ঘেরা কাঠের রেলিং জাপটে ধরে কিছুটা ঝুঁকে পড়ে যখন তিনি দাঁড়ালেন, তখন মনে হতে লাগল শুধু একটা কৃষ্ণবর্ণ বিরাট দেহকাণ্ড যেন সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে—দেহকাণ্ডের ওপর বসানো একজোড়া গোলাপি গাল আর চোখে লাগানো একজোড়া চকচকে স্টিলের ফ্রেমের চশমা। বলিষ্ঠ আবেগময় কণ্ঠে বক্তৃতা দেওয়াই তাঁর অভ্যাস এবং তাঁর গলার স্বর গিয়ে পৌঁছাতও বহুদূর। সমবেত উপাসনাকারীদের উদ্দেশ করে তিনি যখন সুস্পষ্ট এবং জোরালো কণ্ঠে এই বলে তাঁর বাণী শুরু করলেন—ভ্রাতৃবৃন্দ, যে এক কঠিন বিপর্যয় নেমে এসেছে আপনাদের ওপর, কিন্তু ভ্রাতৃবৃন্দ, এই বিপর্যয় আপনাদেরই কৃতকর্মের প্রতিফল—তখন উচ্চকিত বিস্ময়ের একটা মৃদু কম্পন সামনের শ্রোতৃবর্গের ভেতর থেকে শুরু হয়ে বারান্দার বাইরে নিচে বৃষ্টির ভেতর দাঁড়িয়েছিল যে বিরাট জনসমষ্টি, তাদের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। কিন্তু ঠিক পরবর্তী মুহূর্তেই তিনি যে-কথাগুলো উচ্চারণ করলেন, নিখুঁত যুক্তির বিচারে তাদের সঙ্গে তাঁর এই নাটকীয় মুখবন্ধের কোনোরকম যোগসূত্র ছিল না যেন। তবে যতই তিনি অগ্রসর হতে থাকলেন ততই তাঁর শ্রোতৃবর্গের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল যে একজন সুদক্ষ বাগ্মীর বিশিষ্ট কৌশল হিসাবে তাঁর সমগ্র উপদেশ-বাণীর সারাংশ তিনি একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতের মতো প্রারম্ভেই তাঁর শ্রোতৃবর্গের দিকে ছুড়ে মেরেছেন এবং তার পরেই মিশর থেকে ইহুদিদের প্রস্থানের সময়কার মিশরে প্লেগের—বাইবেলে যে বর্ণনা আছে তারই মূল উদ্ধৃতি দিয়ে বলে চললেন : ইতিহাসে প্রথম যখন এই বিপর্যয়ের আবির্ভাব হয়, তখন একে ব্যবহার করা হয়েছিল তাদেরই প্রতি আঘাত হানার অস্ত্র হিসাবে। ফেরাউন স্রষ্টার ইচ্ছার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিল, তাই প্লেগের বিপর্যয় নেমে এসেছিল তার ওপর, যাতে করে সে স্রষ্টার ইচ্ছার কাছে অনুনয় জানাতে বাধ্য হয়। এইভাবে মানুষের ঊষাকাল

থেকেই প্লেগকে প্রেরণ করা হয়েছে, যারা ঈশ্বত এবং গর্বিত হৃদয় তাদের সম্পূর্ণ করবার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে স্রষ্টার অভিশাপ হিসাবে, যারা স্রষ্টার আদেশ এবং নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে চেয়েছে, তাদেরকে হতমান করবার জন্যে।—সুহৃদ বন্ধুগণ, এই বিষয়টি আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করুন এবং আসুন, আমরাও নতজানু হয়ে স্রষ্টার কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করি।

ইতিমধ্যে বাইরে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছিল। গির্জার পূর্বাংশের জানালার ওপর অবিরাম বারিপাতের ফলে চারপাশের স্তব্ধতা যেন আরো গভীর হয়ে উঠেছিল। ফাদার প্যানালুর এই আবেদন যখন সেই নিস্তব্ধতা পেরিয়ে শ্রোতৃবর্গের কাছে পৌঁছাতে লাগল, তখন আপনা থেকেই তাদের মন একটা সহজ বিশ্বাসে নুয়ে এল যেন। অনেকেই মুহূর্তকয়েক ইতস্তত করে বসবার আসন ছেড়ে নেমে সামনেই নতজানু হয়ে বসে পড়লেন। অপর যারা ছিলেন তারাও এদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাটাকেই সঙ্গত বলে মনে করলেন এবং ক্রমেই সেটা বিস্তার লাভ করতে লাগল, যার ফলে অল্পসময়ের ভেতর দেখা গেল গির্জার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি সবাই নতজানু হয়ে প্রার্থনায় নিমগ্ন। তাদের নড়াচড়ার সময় চেয়ারের ক্ষীণ শব্দ ছাড়া একটা শান্ত নীরবতায় ভরে গেল সবকিছু মুহূর্তের মধ্যে। ফাদার প্যানালু এবার তার দীর্ঘ চওড়া দেহটিকে সোজা করে দাঁড়ালেন, সমস্ত বুক ভরে নিশ্বাস নিলেন একবার। তারপর উচ্ছল আবেগে বয়ে চলল তার ধর্মীয় বাণীর স্রোতোধারা। যতই তিনি অগ্রসর হতে থাকলেন, ততই তার গলার স্বর আবেগময় এবং গুরুগম্ভীর শোনাতে লাগল।

—প্লেগের আবির্ভাব হয়েছে যে এখানে, তার অর্থ আমাদের নিজেদের সম্পর্কে ভেবে দেখবার সময় এসেছে। যারা বরাবর ন্যায় এবং সত্যের পথে চলে এসেছেন, তাদের শঙ্কিত হবার তেমন কিছু নেই; কিন্তু যারা অন্যায় এবং অন্য কাজে লিপ্ত, তাদের হৃদয় সঙ্গত কারণেই কম্পিত হবে। সমগ্র পৃথিবীটাই যেন মহান স্রষ্টার কাছে শস্য-মাড়াইয়ের এক বিরাট খামারস্বরূপ, আর এই প্লেগ হচ্ছে তাঁর হাতে শস্য-মাড়াইয়ের দণ্ড। যতদিন পর্যন্ত তিনি শস্য ঝেড়ে আবর্জনামুক্ত করে গুছিয়ে না তুলতে পারছেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁর অনমনীয় ইচ্ছা অনুসারে মাড়াইয়ের দণ্ড তার কাজ চালিয়ে যাবে। কিন্তু আমরা তো জানি শস্যের চেয়ে আবর্জনার ভাগই বেশি। ডাক আসে অনেকেরই, কিন্তু শেষ নির্বাচনলাভ করে যারা, তাদের সংখ্যা তো চিরদিনই অত্যন্ত নগণ্য। তবুও এই বিপর্যয় স্রষ্টার সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাকৃত নয়। দীর্ঘদিন ধরে আমরা অন্যায় এবং অসত্যকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি। তাদের প্রতি চোখ বন্ধ করে থাকতে চেয়েছি। দীর্ঘদিন ধরে আমরা অত্যন্ত সহজেই স্রষ্টার অপার করুণা এবং তাঁর স্বেচ্ছাকৃত ক্ষমাকে নিশ্চিত নির্ভর বলে ধরে নিয়েছি। ভেবেছি শুধুমাত্র অনুশোচনায় শেষমুহূর্তে সবকিছু পাইয়ে দেবে আমাদেরকে। আমাদের ভেতর নিষিদ্ধ বলে কিছু নেই। সবাই আমরা একটা তৃপ্তিদায়ক নিশ্চিত আশ্বাসের মধ্যে বাস করে চলেছি। সবাই ধরে নিয়েছি নির্ধারিত দিনটি উপস্থিত হলে সবরকমের পাপকার্য পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র অনুশোচনার দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করব এবং এই নির্ধারিত দিনটি যতদিন না আসছে, জীবনের সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে, সামনে প্রলোভন যা-কিছু আসবে বিনা-

দ্বিধায় তারই দিকে এগিয়ে যাওয়া। তারপর প্রতিফল যদি-কিছু থাকে তার জন্যে স্রষ্টার নিশ্চিত করুণা তো আছেই। দীর্ঘদিন ধরে অপার করুণার দৃষ্টি নিয়ে তিনি চেয়ে থেকেছেন এই শহরের দিকে। কিন্তু কতদিন আর তিনি এমনিভাবে অপেক্ষা করে থাকবেন। তাঁর যে চিরন্তন আশা তা আমরা দীর্ঘদিন ধরে পূরণ হতে দিইনি, সেই বিশেষ ক্ষণটাকে পিছিয়ে দিয়েছি বারে বারে। আর তারই ফলে আজ তিনি ভয়ংকর রুষ্ট হয়েছেন। বিমুখ হয়ে তাঁর করুণার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন আমাদের এই শহরের ওপর থেকে। তাঁর যে করুণার দৃষ্টি এতদিন আমাদের চলার পথকে আলোকিত করে রেখেছিল, তা আজ অপসারিত অন্ধকারের। ভেতর-পথ হাতড়াচ্ছি আমরা সবাই। প্লেগের দুর্যোগের তমসায় আমাদের সামনের পথ আচ্ছন্ন।

অশান্ত ঘোড়া দীর্ঘ সময় বাঁধা থাকলে যেমন থেকে-থেকে একটা নাকের শব্দ করে, সমবেত উপাসনাকারীদের ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন তেমনি একটা ছোট্ট শব্দ করে উঠল। এদিক-ওদিক চেয়ে ফাদার প্যানালু যেন ক্ষণিক বিরতি দিলেন। তারপর কিছুটা নিম্নস্বরে আগের মতো চলতে থাকল ধর্মীয় বর্ণনা।

—সুবর্ণযুগের পুরাকাহিনীতে আমরা পড়েছি যে রাজা আমবার্টোর আমলে সারা ইতালি জুড়ে এক ভয়ংকর প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। তার নিষ্ঠুরতম ধ্বংসলীলা চলেছিল রোম এবং প্যাভিয়ায়। এই ধ্বংসলীলা এতই ভীতিপ্রদ যে সেখানে প্লেগে যত লোকের মৃত্যু হয়েছিল, তাদের সবাইকে কবর দিতে পারে এমন যথেষ্ট সংখ্যক লোক আর জীবিত ছিল না তখন। এমনি সময় সেখানে দুজন স্বর্গীয় দূতের আবির্ভাব ঘটতে দেখা যায়। তাদের একজন সৎ আর একজন অসৎ প্রকৃতির। তার পরেই সবাই দেখতে পায় এই সৎ প্রকৃতির স্বর্গীয় দূত, অসৎ প্রকৃতির স্বর্গীয় দূতটাকে যার হাতে ছিল মস্ত এক শিকারের বর্শা, আদেশ করছে তার সেই বর্শা দিয়ে বিভিন্ন বাড়িতে আঘাত হানতে এবং সে যে-বাড়িতে যে-কয়েকবার আঘাত করছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়ি থেকে ততটা মৃতদেহ যেন আপনা থেকেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

এবার ফাদার প্যানালু তার দুই বাহু খোলা বারান্দার দিকে প্রসারিত করে ধরলেন, যেন বাইরে দোদুল্যমান বৃষ্টির পর্দার আড়ালের কোনোকিছুর প্রতি তিনি ইঙ্গিত করতে চাইছিলেন : ভ্রাতৃবৃন্দ—তিনি আবার উচ্চস্বরে বলে চললেন—সেই মারাত্মক শিকার শুরু হয়েছে, এবং শহরের পথে পথে ছড়িয়ে রয়েছে তার ধ্বংসলীলা। ঐ দেখুন, এখনও আমাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে মহামারীর স্বর্গীয় দূত, লুসিফারের মতো অধর দেহকান্তি তার। পৃথিবীতে যতকিছু অমঙ্গল এবং অসত্য আছে, তারই উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি যেন সে। আপনারই বাড়ির ছাদের উপর শূন্যে ঘুরছে সে। ঐ দেখুন,তার দক্ষিণ হাতে প্রকাণ্ড এক বর্শা। যে-কোনো মুহূর্তে আঘাত হানবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। আর বাম হাতটাও প্রসারিত করে রেখেছে অপর কারো-না-কারো বাড়ির দিকে। হয়তো এই মুহূর্তে আপনার বাড়ির দিকেই সঠিক অঙ্গুলি নির্দেশ করছে সে। তার জ্বলন্ত বর্শার সশব্দ আঘাত পড়ছে আপনার দরজার ওপর, ভেঙে ফেলছে দরজা, প্লেগ হয়তো এখন আপনার বাড়িতেই ঢুকে পড়ছে, আপনার শোবার ঘরে গিয়ে জেঁকে বসেছে। আপনার ফেরার অপেক্ষা করছে, বিশ্ববিধানের মতোই

অবশ্যম্ভাবী সে, অসীম তার ধৈর্য, প্রতিমুহূর্তের জন্যে সে সজাগ, শুধু সময় গুনে চলেছে সে। আঘাত করবে বলে যদি সে তার হাত একবার উত্তোলিত করে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনো শক্তি নেই, এমনকি আমার কথাগুলো বিশেষভাবে লক্ষ করবেন, মানুষের এত গর্বের যে আবিষ্কার সেই বিজ্ঞানের শক্তি তারও সাধ্য নেই যে, সে সেই হাতকে প্রতিরোধ করে। খামারে শস্য-মাড়াইয়ের সময় তুষ যেমন চারদিকে নিক্ষিপ্ত হয়, তেমনি দুঃখ এবং যন্ত্রণার যে রক্তাক্ত খামারের ওপর আমরা সবাই রয়েছি, সেখান থেকে যে-কোনো মুহূর্তে আমরাও তুষের মতোই দূরে ছিটকে পড়ব।

এর পরেই ফাদার প্যানালুর বক্তৃতা উচ্ছল আবেগময় হয়ে উঠল। শস্য-মাড়াইয়ের দণ্ডের যে প্রতীক তিনি কিছু আগে ব্যবহার করেছিলেন, সেই একই প্রতীকের অস্ত্র নিয়ে শ্রোতাদের উদ্দেশ করে বলে চললেন—কল্পনা করুন, বিরাট আকারের একটা কাঠের দণ্ড যেন সারাক্ষণ এই শহরে বন বন করে ঘুরছে, সামনে যা-কিছু পাচ্ছে এলোপাতাড়ি আঘাত করছে। আবার শূন্যে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে সেই দণ্ড, আর বৃষ্টির ধারার মতোন তার গা থেকে রক্তের ধারা ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে এবং নিচে চারদিকে ধ্বংস এবং হত্যাকাণ্ডের চিহ্ন সুস্পষ্ট। এ যেন সত্যের ফসল উৎপাদনের জন্যে বীজ বপনের সময়ের জন্যে প্রস্তুতি।

এই দীর্ঘ একটানা বক্তৃতার পর ফাদার প্যানালু কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন। তাঁর মাথার চুল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল কপালের ওপর; সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল আর তাঁর হাত বেয়ে সেই কম্পন ছড়িয়ে পড়ছিল যেন প্রচারবেদি পর্যন্ত। আবার যখন বক্তৃতা শুরু করলেন, তাঁর গলার স্বর অনেক নিচু, কিন্তু শ্রোতৃবর্গের প্রতি অভিযোগের আবেগে কম্পমান।

—দেখুন, নিজেদের সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবার সময় এখন আমাদের সামনে উপস্থিত। আমরা বরাবর এরকম একটা বিশ্বাসকে লালন করে এসেছি যে সপ্তাহে রবিবারটায় যদি গির্জায় গিয়ে প্রার্থনাসভায় যোগ দিই, তাহলে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোর জন্য আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত, যথেচ্ছভাবে চলাফেরা করতে আর কোনো বাধা নেই। অন্তত সহজভাবে বিশ্বাস করে এসেছি, ধর্মের প্রতি অবহেলাজনিত আমাদের যে অপরাধ তার স্খালনের জন্যে সংক্ষিপ্ত কিছু কিছু বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালন, আর সপ্তাহে একদিন করে গির্জার উপাসনা, সভায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে এগুলোই যথেষ্ট। কিন্তু সত্যিই স্রষ্টা এই ধরনের উপহাসের পাত্র নন। সৃষ্টির প্রতি তাঁর যে অপরিসীম ভালোবাসা, এই সামান্য মিলনে তা পরিতৃপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি আরো ঘন ঘন এবং আরো দীর্ঘ সময় ধরে আমাদেরকে কাছে পেতে চান। এটাই তাঁর ভালোবাসার একমাত্র ধরন। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সাহচর্যের প্রত্যাশা করেছেন তিনি। কিন্তু ব্যর্থতার জন্যে আজ তিনি আমাদের প্রতি বিমুখ, আর তারই ফলে আজ আমাদের ওপর নেমে এসেছে এই বিপর্যয়। সৃষ্টির অভিজ্ঞান থেকে শুরু করে যখনই কেউ বা কোনো শহর তার ইচ্ছার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছে, তখনই তাদের ওপর নেমে এসেছে ঠিক এই ধরনের বিপর্যয়। আমরাও সেই একই শিকার সম্মুখীন হয়েছি—যে শিক্ষা একদিন পেতে হয়েছিল কেইন এবং তার সন্তান-সন্ততিদের, সডম বা সোমবাইন শহরের অধিবাসীদের; যব এবং ফেরাউনকে এবং আরো অনেককে,

যারা স্রষ্টার ভালোবাসা এবং করুণার প্রতি নিজেদের হৃদয়কে পাষাণ করে তুলতে চেয়েছিল, তাদের মতো। যেদিন থেকে আমাদের জন্যে এবং মহামারীর জন্যে শহরের গেট বন্ধ হয়ে গেছে, সেদিন থেকে আমাদেরকেও মানবতাকে তথা সমগ্র সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয় অনুভব করতে পারছেন যে, জীবনের আদি এবং পরিণাম সম্পর্কে গভীরভাবে অনুধাবন করবার সময় এসেছে।

বাইরে থেকে আর্দ্র বাতাসের একটা ঝাপটা এসে ঢুকল গির্জার ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে বাতির শিখাগুলো নুয়ে পড়ল, কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল থেকে থেকে। মোম পোড়ার ঝাঁঝালো গন্ধ, কাশি ও চাপা হাসির শব্দ ভেসে আসতে লাগল একসঙ্গে। একটা সূক্ষ্ম এবং নিপুণ কায়দায় তাঁর যে কৌশল বরাবরই সবার কাছে সমাদর পেয়ে থাকে, ফাদার প্যানালু আবার ফিরে আসলেন তাঁর বক্তৃতার প্রথম প্রসঙ্গে। সম্পূর্ণ শান্ত এবং আবেগহীন গলায় আবার তিনি বলে চললেন : আমি অনুমান করতে পারি, ইতিমধ্যেই আপনারা অনেকেই ভাবতে শুরু করেছেন, আমার শেষ লক্ষ্য কী, কোথায় নিয়ে চলেছি আমি আপনাদের। কিন্তু এতক্ষণ ধরে আমি যা-কিছুই বলে থাকি না কেন, আমার লক্ষ্য একই—আপনাদের সত্যের পথে নিয়ে যাওয়া, আর সেইসঙ্গে সবাইকে শেখানো, হ্যাঁ সত্যি তাই, সবাইকে শেখানো কীভাবে এই বিশ্বসৃষ্টির মহাআনন্দে শরিক হতে হয়। কারণ যখন সামান্য দুকথা উপদেশ শুনলে বা অল্পকিছু সাহায্য পেলেই মানুষ সঠিক সত্যের পথে চলতে পারে, সে-সময় আপনাদের জন্য উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখন যা সত্য তা সবার জন্যে কঠোর নির্দেশস্বরূপ—সবার জন্য অবশ্যপালনীয়। এ সত্য হচ্ছে রক্তাক্ত বর্শার মতো, যা এক সংকীর্ণ পথে চলার জন্যে কঠোরভাবে সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে, যে পথ মুক্তির, যে পথ পরিত্রাণ লাভের। সুতরাং ভ্রাতৃবৃন্দ, স্রষ্টার সেই অপার অনুকম্পা, যা সবকিছুর ভেতর সত্য ও অসত্যের নিয়ামক, যা একাধারে রোষ এবং করুণা, যা একই সঙ্গে প্লেগের এই বিপর্যয় এবং পরিত্রাণ লাভের পথ—তাই সবশেষে এই রূপ নিয়ে আপনাদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছে। এবং এই যে মহামারী, যা দিনের-পর-দিন চোখের ওপর শত শত জীবন নিধন করে চলেছে, তা আবার অন্যদিকে আপনাদের হিত সাধন করছে এবং সবার জন্যে মুক্তির সঠিক পথ নির্দেশ করছে।

—বহু শতাব্দী পূর্বে আবিসিনিয়ার খ্রিষ্টান অধিবাসীরা একবার এই প্লেগের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল শাশ্বত জীবন লাভের বিধি-নির্দেশিত পথ। তখন এমনও দেখা গিয়েছিল যে, যাদের প্লেগে ধরেনি এমন বহু মানুষ নিজেদের মৃত্যুকে নিশ্চিত করার জন্যে যে বিছানায় প্লেগে রোগী মারা গিয়েছে তা থেকে চাদর তুলে নিয়ে নিজেদের সর্বাঙ্গে জড়িয়েছে। পাপময় জীবন থেকে পরিত্রাণ লাভের এই-যে উন্মত্ত অন্বেষা, এ-যে কোনোক্রমেই প্রশংসনীয় নয়, সেটা আমিও আপনাদের মতোই অনুভব করি ও স্বীকার করি। এ তো পরিষ্কার বাড়াবাড়ি, এমন একধরনের ধৃষ্টতা, যা সবার চোখেই নিন্দনীয়। কোনোকিছুর জন্যেই স্রষ্টাকে বাধ্য করতে চাওয়া নিশ্চয়ই সঙ্গত নয়, যেমন সঙ্গত নয় প্রত্যেকটা ঘটনার জন্য বিধিনির্দিষ্ট যে ক্ষণ তাকে ত্বরান্বিত করতে চাওয়া। কারণ, যেসব ঘটনাপরম্পরা স্রষ্টা চিরন্তনভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং যা অনিবার্য, তাকে ত্বরান্বিত করবার [illegible] কিছু করতে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ধর্মের প্রতি

বিরুদ্ধাচরণের পথে পা বাড়ানো। তবুও একথা অবশ্যই মানতে হবে যে আবিসিনিয়ার খ্রিষ্টানদের এই-যে অতিরিক্ত উৎসাহ, যা আমাদের দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে অহেতুক বাড়াবাড়ি, তা থেকেও আমরা হয়তো কিছু কিছু মহৎ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। তাদের অনেক আচরণই হয়তো এমন, যার সঙ্গে আমাদের অধিক সংস্কারমুক্ত মন ও চিন্তাধারার কোনোরকম সঙ্গতি নেই। কিন্তু মানুষের প্রত্যেকটা দুঃখ-যন্ত্রণার তমসাময় অন্তর্দেশে অনির্বাণ জ্বলে যে-শিখা তা অতি ক্ষুদ্র অথচ নিষ্কম্প। তাদের এই আবেগময় আগ্রহ এবং আচরণ যেন তারই অস্তিত্বের কিঞ্চিৎ আভাস। এবং যে গভীর তমসাচ্ছন্ন পথ পেরিয়ে তবে আমরা মুক্তির নাগাল পেতে পারি, সেই পথকেও আলোকোজ্জ্বলিত করে তুলতে পারে কেবল এই উজ্জ্বল শিখা। স্রষ্টার যে ইচ্ছা নিরন্তর কাজ করে চলেছে, যার অমোঘ প্রভাবে অনুক্ষণ অসত্য সত্যে রূপান্তরিত হচ্ছে, এ হচ্ছে তারই জ্যোতির্ময় প্রকাশ।

তাই বলছি, ভ্রাতৃবৃন্দ, আবার সেই মঙ্গলময় মুহূর্ত এসেছে আমাদের সামনে, শঙ্কা ও দুঃখ বেদনার যে উপত্যকা ভূমিতে আমাদের বসবাস, তা থেকে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে এই ক্ষুদ্র আলোকবর্তিকা, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে এক পবিত্র শান্তির দিকে যা সবকিছু সৃষ্টির উৎস, তারই সান্নিধ্যে। অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা এখন নিশ্চয় অনুধাবন করতে পারছেন কী বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে আপনাদের সামনে। স্মরণ রাখবেন—এ হচ্ছে আপনাদের জন্যে এক বিরাট সান্ত্বনা। সুতরাং স্রষ্টার এই ঘর ছেড়ে আবার যখন আপনারা বাইরের পৃথিবীতে প্রবেশ করবেন তখন যেন এখানে যেসব ভর্ৎসনা ও ক্রোধের উক্তি শুনেছেন শুধু সেগুলোকেই মনে রাখবেন না; সেইসঙ্গে এই-যে সান্ত্বনা ও আশ্বাসের বাণী শুনলেন, সেগুলোও যেন আপনাদের অন্তরে জাগরূক থাকে।

গির্জার ভেতর সবাই ভাবল, ফাদার প্যানালুর উপদেশ বোধহয় এখানেই শেষ। বাইরে যেন বৃষ্টি থেমে গেছে; বৃষ্টির কণাসিক্ত সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল হলুদ দেখাচ্ছিল গির্জার সবকটা উদ্যান। আশেপাশে রাস্তা থেকে কথাবার্তার অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছিল থেকে থেকে, আর তার সঙ্গে গাড়িঘোড়া চলার চাপা গুঞ্জন। শহর যেন আবার আকস্মিক তার প্রাণস্পন্দন ফিরে পেয়েছিল, ফিরে পেয়েছিল তার গম্ভীর স্বর। পোশাক-পরিচ্ছেদের মৃদু খসখসানির মধ্যে গির্জার ভেতরের উপাসনাকারীরা প্রত্যেকেই খুব সাবধানতার সঙ্গে নিজের নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল।

কিন্তু সত্যি ফাদার প্যানালুর উপদেশ তখনও সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। আরও কিছু বলার ছিল তার। তিনি আবার এই বলে শুরু করলেন : যখন তিনি একবার তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে এই প্লেগ স্রষ্টারই প্রেরিত, তিনি নিজেই পাঠিয়েছেন এই প্লেগ সবার শাস্তির জন্য, সুতরাং তারপরেও আবার এই শেষ সময়ে আবেগময় কোনো দীর্ঘ বক্তৃতা শোনাবেন, এই বেদনার্ত পরিবেশে তা কোনোক্রমেই শোভন হবে না। শুধু তিনি এইটুকু আশা করেন এবং বিশ্বাসও করেন যে, সত্যকে তিনি এই মুহূর্তে তাদের সামনে উদ্ঘাটিত করেছেন, তারই আলোকে উপস্থিত সবাই নিজের নিজের অবস্থা নিরীক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তার প্রচার-বেদি ছেড়ে যাবার মুহূর্তে, মার্সীয়ের

কফমৃত্যু সম্পর্কে এক পুরাতন ঘটনাপঞ্জিতে যেসব জিনিস তিনি পড়েছেন তারই কিছু কিছু এখন তার শ্রোতাদের শোনাবেন। এই ঘটনাটি যার রচিত সেই ম্যাথু ম্যারে নিজের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে অত্যন্ত বিলাপের স্বরে লিখেছেন : এক কঠিন নরকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তাকে। তার সামনে আশার আলো বলে কিছু ছিল না—স্রষ্টার অনুকম্পা লাভের কোনো আস্থা ছিল না এর সামনে, আর এমনি অবস্থার ভেতর কঠিন যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যায় তার জীবন।

ফাদার প্যানালু আক্ষেপ করে বললেন—ম্যাথু ম্যারের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে সত্যিকারের অন্তর্দৃষ্টি থেকে তিনি ছিলেন বঞ্চিত। খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী প্রত্যেকটি মানুষকে যে আশা দেয়া হয়েছে, স্রষ্টার অনুকম্পা লাভের যে আশ্বাস দেয়া হয়েছে, তা যে শাশ্বত ও সর্বব্যাপী, সেই সত্যকে তিনি, ফাদার প্যানালু আজ যেভাবে উপলব্ধি করেছেন, এমন গভীরভাবে পূর্বে আর কখনো তা করেননি। তাই চারদিকের এই নৈরাশ্যের অন্ধকারের ভেতরেও তিনি আশা পোষণ করেন যে, বর্তমান দুর্যোগের এই বিভীষিকা সত্ত্বেও, লক্ষ লক্ষ যন্ত্রণাকাতর নরনারীর এই করুণ আর্তনাদ সত্ত্বেও, এই শহরের অধিবাসীরা সবাই মিলিতভাবে স্রষ্টার কাছে হাত তুলে একবার প্রার্থনা জানাবে, যে প্রার্থনা সত্যিকারের খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসীদের, যে প্রার্থনা স্রষ্টার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার। আর তার পরের যা-কিছু—তা স্থির করার সব দায়িত্ব স্রষ্টার নিজের।

৪

ফাদার প্যানালুর এই ধর্মোপদেশে কোনো প্রভাব সত্যি আমাদের শহরের অধিবাসীদের ওপর পড়েছিল কিনা, তা বলা শক্ত। উপদেশ শোনার পর ম্যাজিস্ট্রেট এম. অথন একদিন ডাক্তার রিও-র সামনে বেশ দৃঢ়তার সাথে মন্তব্য করলেন যে তার ধারণা ফাদার প্যানালুর প্রত্যেকটি যুক্তি অকাট্য ও অখণ্ডনীয়। পরে আরও যারা নিজেদের অভিমত প্রকাশ করলেন তাদের কিন্তু এইভাবে পুরোপুরি ফাদার প্যানালুকে সমর্থন জানাতে দেখা গেল না। অনেকেই বলল, ফাদার প্যানালুর বক্তৃতা থেকে শুধু এইটুকু তারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে একটা সম্পূর্ণ অজানা অপরাধের জন্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে তাদের শাস্তি দেয়া হয়েছে। এবং একদিকে যেমন বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের এই কারারুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে আগের মতোই সাধারণ জীবন যাপন করে যেতে লাগল, তেমনি আবার এমন অনেকেই ছিল যারা এই অবস্থার বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহ করে উঠল এবং তখন থেকে তাদের একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়াল কীভাবে নিজেদের এই আটক অবস্থা থেকে মুক্ত করবে। বাইরের পৃথিবীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় এই অবস্থাকে প্রথম প্রথম অনেকেই মোটামুটি সহজেই গ্রহণ করেছিল : নিজেদের ছোটখাটো অভ্যাসকে বজায় রাখার পথে বাধা সৃষ্টি করছে এমন সাময়িক অসুবিধাকে মানুষ যেমন মেনে নেয়, তাদের কাছে এ-ও ছিল অনেকটা তেমনি। কিন্তু আকস্মিক এমন যেন তারা আবার অনুভব করল যে দিগন্তবিস্তৃত নীল আকাশের গম্বুজের নিচে তারা সবাই যেন একধরনের কয়েদি। ইতিমধ্যেই গ্রীষ্মের যে প্রখর উত্তাপ শুরু হয়েছিল তারই

ভিতর এখন নিয়ত সিদ্ধ হতে হচ্ছিল তাদের। হঠাৎ আবার তাদের ভেতর একটা চেতনা জাগল যে, ঘটনাগুলো যে-পথে এগুচ্ছে তাতে তাদের জীবন এমন সম্পূর্ণ বিপন্ন এবং তাদের মনের ভেতর জাগরূক থাকায়, সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাসে আবার যখন তারা নিজেদের অবসন্ন দেহেই শক্তি-সামর্থ্য ফিরে পেত, তখনও অনেক কাজ করে বসত যেগুলো শুধুমাত্র নির্বোধের পক্ষেই সম্ভব।

এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো—সেটা অবশ্য ঘটনাদুটো একই সঙ্গে ঘটার জন্যে হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। যে রবিবারে ফাদার প্যানালু তার ধর্ম-উপদেশ শোনালেন ঠিক সেদিন থেকেই যেন শহরে সর্বত্র একটা বড় রকমের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। এবং এমনই গভীর প্রভাব পড়ল সবার মনের ওপর যে, অনেকেই এমনও সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকল যে তারা যে সত্যি কী-ধরনের অবস্থার মধ্যে বাস করছিল এতদিন পরে এই প্রথম বোধহয় এ-শহরের অধিবাসীরা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মনে হয় শহরের আবহাওয়ায় এ-সময় কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু পরিবর্তনটা আসলে ঘটেছিল বাইরের আবহাওয়ায়, না শহরের অধিবাসীদের অন্তরে, সেটাও বাস্তবে একটা ভাববার বিষয়।

ফাদার প্যানালুর বক্তৃতা করার কিছুদিন পরে ডাক্তার রিও একদিন শহরের বাইরের একজন রুগী দেখতে যাচ্ছিলেন। গ্রাঁদও ছিলেন তার সঙ্গে। দুজনে পথ চলতে চলতে এইসব পরিবর্তনের কথা আলাপ করছিলেন, এমন সময় ডাক্তার আকস্মিক অন্ধকারের ভেতর একজন লোকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। লোকটা ফুটপাথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার ডানদিকে আর একবার বাঁদিকে ঝুঁকে পড়ছিল কিন্তু সামনের দিকে যে এগুবে এমন কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। যে-মুহূর্তে এই ব্যাপারটা ঘটল, ঠিক সেই একই সঙ্গে রাস্তার আলোগুলো হঠাৎ জ্বলে উঠল। এখন যতই দিন যাচ্ছিল ততই রাস্তার আলো জ্বালা হত সাধারণত অধিকতর বিলম্বে এবং ডাক্তার রিও আর গ্রাঁদ যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার ঠিক পেছনের একটা লাইটপোস্টের সম্পূর্ণ আলো গিয়ে পড়ল সামনের লোকটার মুখের ওপর। তার চোখজোড়া সম্পূর্ণ বন্ধ—মুখ বুজে নিঃশব্দে হাসছিল। মুখের চেহারাটাও যেন কেমন বিকৃত। দু-পাশ দিয়ে দরদর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল।

—আরে, এ যে দেখছি একটা বদ্ধ পাগল, ছাড়া গেল কীভাবে গ্রাঁদ মন্তব্য করলেন।

ডাক্তার গ্রাঁদের একখানা বাহু চেপে ধরলেন এবং তাকে ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, এমন সময় লক্ষ্য করলেন গ্রাঁদের সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে।

—চারদিকে যেসব জিনিস ঘটছে দেখছি, তাতে মনে হয়, ডাক্তার মন্তব্য করলেন—আরও যদি কিছুদিন এমনিভাবে চলে তাহলে শিগগির দেখব সারা শহরটা একটা পাগলা গারদে পরিণত হয়েছে।

ডাক্তার রিও-র নিজের দেহও যেন সেই মুহূর্তে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল, গলার ভেতরটাও কেমন যেন শুকিয়ে আসছিল। গ্রাঁদ বললেন—চলুন, দেখি কোথাও কিছু একটু খেয়ে নিই।

কাছেই ছোট একটা কাফের ভেতর গিয়ে ঢুকলেন তাঁরা দুজনে। সারা ঘরের ভেতর আলো বলতে যে-জায়গাটায় মদ বিক্রি হয় শুধু সেই কাউন্টারের উপর একটা বাতি জ্বলছিল। ঘরের ভেতর বাতাসও যেন ভারী, দম আটকে আসার মতো অবস্থা, কেমন একটা অদ্ভুত লালচে রঙ ঘরের ভেতরের বাতাসে। কোনো রহস্যজনক কারণে আশেপাশের সবাই চাপা মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলছিল।

ডাক্তার দেখে আশ্চর্য হলেন, গ্রাঁদ ভেতরে ঢুকেই প্রথম শুকনো মদের অর্ডার দিলেন এবং সেটা হাতে পেতেই একচুমুকে খেয়ে নিঃশেষ করে ফেললেন।—ওহ! যেখান দিয়ে যায়, গলার ভেতর যেন একেবারে আগুনের মতো জ্বালা ধরিয়ে দেয়—গ্রাঁদ মন্তব্য করলেন। কিন্তু মিনিট কয়েক বসতে-না-বসতেই গ্রাঁদ আবার বাইরে যাবার জন্যে ডাক্তারকে তাগাদা দিতে থাকলেন।

রাস্তায় নেমে ডাক্তারের মনে হল চারদিকে অন্ধকারের ভেতর যেন অদ্ভুত সব ফিসফিসানি শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। উপরে রাস্তার আলোগুলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলগুলো ঘিরে রেখেছিল যে অঢেল অন্ধকার তারই ভেতর থেকে নিয়ত একটা শাঁ শাঁ শব্দ উঠছিল। ফাদার প্যানালু যে শস্য-মাড়াইয়ের দণ্ডের কথা উল্লেখ করেছিলেন, আকস্মিক তা ডাক্তার রিও-র মনে পড়ে গেল। চারদিকের এই শূন্য অন্ধকারের মাঝে অদৃশ্য শস্য-মাড়াইয়ের দণ্ড যেন অবিরাম কাজ করে চলেছিল।

—এটা সৌভাগ্য বলতে হবে, শুধু এইটুকুই...গ্রাঁদ হঠাৎ কথাগুলো কয়েকবার বিড়বিড় করে বলে আবার যেন থেমে গেলেন। ডাক্তার রিও তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কী বলতে চাইছেন তিনি।

—আমার খুব বড় সৌভাগ্য যে আমাকে সবসময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়।

—হ্যাঁ, তা বটে, ডাক্তার তাকে সমর্থন জানালেন।—এটাকে একধরনের সৌভাগ্যই বলতে হবে। তারপর চারপাশের শূন্য অন্ধকারের ভেতর থেকে সারাক্ষণ একটা অদ্ভুত ভীতিজনক ফিসফিস শব্দ তাঁর কানে আসছিল, হয়তো সেটাকে এড়াবার জন্যে তিনি আবার গ্রাঁদকে জিজ্ঞাসা করলেন তার পরিশ্রমের ফল কিছু হয়েছে কিনা।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়, কিছুটা এগিয়েছি বলতেই হবে।

—এখনও তাহলে অনেক কিছু বাকি মনে হচ্ছে?

গ্রাঁদকে স্বভাবত, যেমন দেখা যায়, তা থেকে আজ যেন কিছুটা উৎফুল্ল বলে মনে হচ্ছিল এবং কিছুক্ষণ আগে যে মদ খেয়েছেন তার ফলে তার গলার স্বরও মনে হচ্ছিল বেশ একটু সজীব, আবেগময়।

—তা এখন কীভাবে বলব, বলুন। তবে কী, ডাক্তার সাহেব, সেটাই আসল জিনিস নয়। আমি খুব জোরগলায় বলছি সেটাই কিন্তু আসল জিনিস নয়।

চারপাশের অন্ধকার তখন বেশ গভীর কালো, আশেপাশে খুব নিকটেও কিছু দেখবার উপায় ছিল না। তবে ডাক্তার অনুমান করলেন, কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাঁদ বোধহয় তার হাত দুখানাও সজোরে নাড়ছিলেন। মনে হল গ্রাঁদ বিশেষ একটা কিছু বলবার জন্যে ভেতরে ভেতরে ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। যখন একবার তিনি বলা শুরু করলেন, কথাগুলো যেন ঠেলাঠেলি করে একসঙ্গে তাঁর মুখ দিয়ে

বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

—সত্যিই বলছি। আমার যেটুকু আকাঙ্ক্ষা, তা হচ্ছে যেদিন সমস্ত পাণ্ডুলিপিটা শেষ করে কোনো প্রকাশকের হাতে নিয়ে গিয়ে দেব, তখন সে যেন অবশ্য পাণ্ডুলিপিটা আগাগোড়া পড়ে শেষ করার পর উঠে দাঁড়িয়ে তার কর্মচারীদের হঠাৎ করে বলে—হাঁ, সত্যিই বটে! আপনারা সবাই মাথার টুপি খুলে একে সালাম জানান।

কথাগুলো শোনার পর ডাক্তার রিও বিস্ময়ে মৌন হয়ে গেলেন। তাঁর সেই বিস্ময় আরও বাড়ল যখন দেখলেন অথবা সেটা দেখলেন বলেই তাঁর ধারণা হল যে তাঁর পাশেই দাঁড়ানো গ্রাঁদ নিজের হাতখানাকে এমনিভাবে নাড়তে লাগলেন যেন সত্যিই তিনি তাঁর নিজের মাথার টুপি খুলে সেটা সমেত হাতখানাকে এমনভাবে বাড়িয়ে ধরলেন যেন অদৃশ্য কাউকে সালাম দিচ্ছেন। মাথার উপর শূন্য অন্ধকারের ভেতর যে হিসহিস শব্দ শুনছিলেন, সেটাও যেন আকস্মিক বেড়ে গেল।

—এখন নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন—গ্রাঁদ বললেন—কাজটা কতখানি নিখুঁত হওয়া দরকার।

সাহিত্যের জগৎ সম্পর্কে তেমন সুস্পষ্ট কোনো ধারণা অবশ্য ডাক্তার রিও-র ছিল না। তবুও তাঁর মনের ভেতর এ সন্দেহটুকু জাগল যে এমন ছবির মতো সুন্দরভাবে কোনো জিনিসই সেখানে ঘটে না—যেমন কোনো প্রকাশকই নিশ্চয়ই রীতিমতো হ্যাটকোট পরে তার নিজের অফিসের কাজকর্ম দেখাশুনা করে না। অবশ্য এটাও ঠিক যে কোনোকিছু নিশ্চিতভাবে বলাটা সবসময় সম্ভব নয়। কাজেই কোনোরূপ মন্তব্য না করেই নীরব থাকাটা ডাক্তার রিও সমীচীন বলে ভাবলেন। যদিও ব্যাপারটাকে এড়াবার জন্য ডাক্তারের পক্ষ থেকে চেষ্টার অন্ত ছিল না, তবুও মাথার উপরে সেই-যে একটা অদ্ভুত ভীতিজনক শব্দ, প্রেগের সেই-যে অদ্ভুত ফিসফিসানি, অষ্টপ্রহর যেন তাঁর কানে এসে ঢুকছিল। গ্রাঁদের বাসা যে-অঞ্চলে, ইতিমধ্যেই তাঁরা সেখানে এসে পৌঁছেছিলেন। জায়গাটা সাধারণ সমতল থেকে সামান্য একটু উঁচু; সন্ধ্যার ঠিক পরেই ঝিরঝির শীতল বাতাসের একটা কোমল স্পর্শ এসে লাগছিল তাদের মুখে। আর শহরে সমস্ত কোলাহলও যেন ক্রমেই দূরে ভেসে যাচ্ছিল এই সন্ধ্যার মৃদু বাতাসে।

গ্রাঁদ তখনও আপন-মনে বকে চলছিলেন, কিন্তু তিনি যে কী বলছিলেন তা তখন আর ডাক্তার রিও-র কানে যাচ্ছিল না। তবুও অনুমানে মোটামুটি যেটুকু তিনি ধরতে পারলেন তা হচ্ছে এই যে, গ্রাঁদ তার যে সাহিত্যকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তা সম্পূর্ণ করতে গেলে এখনও প্রচুর লিখতে হবে তাকে; আর কাজটা যাতে নিখুঁত ও ত্রুটিশূন্য হয় তার জন্যে অবিরাম প্রাণান্তকর পরিশ্রমেরও প্রয়োজন।

—শুধুমাত্র একটা সঠিক শব্দ খুঁজে পাওয়ার জন্য, গোটা একটা সন্ধ্যা কোনো-কোনো সময় হয়তো গোটা একটা সপ্তাহই কেটে যায়, তাহলে একবার ভাবুন ব্যাপারটা। কখনও কখনও শুধু একটা সংযোজক অব্যয় নিয়েই একক্ম সময় ব্যয় করতে হয়।

গ্রাঁদ আকস্মিক থমকে দাঁড়ালেন। ডাক্তার রিও-র কোটের পেছনে ধরে টানছিলেন সামান্য। তারপর তার প্রায় দন্তহীন মুখের ভিতর থেকে এই কথাগুলো অনর্গল

বেরিয়ে আসতে লাগল : আমার ধারণা, আপনিও সামান্য চেষ্টা করলে ধরতে পারবেন ব্যাপারটা। যেমন ধরুন, 'কিন্তু' এবং 'এবং' এর মধ্যে কোনটা আপনি নেবেন, সেটা স্থির করাটা সত্যিই তেমন কিছু কঠিন নয়। আবার 'এবং' আর 'তারপর' এ দুটোর মধ্যে বেছে নেওয়াটা তার চেয়ে কিছুটা শক্ত। কিন্তু কোনো এক জায়গায় একটা 'এবং' ব্যবহার করবেন, না সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবেন, সেটা স্থির করাটা নিশ্চিত জানবেন অসম্ভব রকমের শক্ত কাজ।

—আচ্ছা এতক্ষণে বুঝলাম আপনার বক্তব্য—ডাক্তার রিও বললেন।

ডাক্তার রিও তাকে পেছনে ফেলে সামনের দিকে কয়েক পা এগিয়ে যেতে গ্রাঁদ কেমন একটু লজ্জিত বোধ করলেন, তাড়াতাড়ি পা বাড়িয়ে সামনে গিয়ে ডাক্তারকে ধরে ফেললেন।

—মাফ করবেন, কিছু মনে করবেন না যেন, গ্রাঁদ বললেন—বুঝছি না হঠাৎ আজ সন্ধ্যায় কেন আমাকে এই পাগলামিতে পেয়ে বসেছে।

ডাক্তার রিও যেন তাকে উৎসাহ দিচ্ছেন এমনিভাবে গ্রাঁদের কাঁধটা একটু চাপড়ে দিলেন। বললেন—গ্রাঁদের সব কথাই তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগের সাথে শুনেছেন। তিনি সবসময় তাকে যে-কোনোরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত! গ্রাঁদ তাতে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করল। তার বাসার কাছাকাছি পৌঁছে, কিছুটা ইতস্তত করার পর তিনি বললেন, ডাক্তার যদি অনুগ্রহ করে একটু তাঁর বাসার ভেতরে যান তাহলে খুব খুশি হবেন তিনি। ডাক্তার সহজেই সম্মত হলেন।

দুজনে গ্রাঁদের খাবারঘরে গিয়ে ঢুকলেন। একটা টেবিলের পাশে গ্রাঁদ একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলেন ডাক্তারকে বসার জন্যে। সারাটা টেবিলের ওপর ছড়ানো ছিল অসংখ্য কাগজের শিট, অত্যন্ত ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে কী সব লেখা তাতে এবং সংশোধনের জন্যে কাটাকুটিও করা হয়েছে বহু জায়গায়।

—ঠিকই ধরেছেন, এগুলোই হচ্ছে আমার পাণ্ডুলিপি। ডাক্তারের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে গ্রাঁদ বললেন—কিন্তু একটু কিছু না-খেয়ে যাবেন? আমার কাছে কিছুটা মদ আছে, দেব?

ডাক্তার রিও মাথা নাড়লেন। টেবিলের উপর ছড়ানো কাগজগুলো তিনি ঝুঁকে পড়ে দেখছিলেন। —না, গুলোর বরং আপনার এখন না-দেখাই ভালো। গ্রাঁদ ডাক্তারকে লক্ষ্য করে বললেন। —এই দেখুন। এই বাক্যটা সবে শুরু করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই মনঃপুত হচ্ছে না। এত যে কষ্ট দিচ্ছে তা আর আপনাকে কী বলব।

গ্রাঁদের নিজের দৃষ্টিও এখন টেবিলের উপর ছড়ানো কাগজের ওপর নিবদ্ধ ছিল। আকস্মিক তার একখানা হাত যেন এক অদ্ভুত আকর্ষণে টেবিলের ওপরের একশিট কাগজের দিকে এগিয়ে গেল। শেষপর্যন্ত তিনি সেই কাগজের শিটটাকে টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে শূন্যে একটা বৈদ্যুতিক বাতির সামনে ধরলেন, বাতির উজ্জ্বল আলো কাগজের আবরণ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকল। আর শূন্যে ধরা কাগজখানা গ্রাঁদের হাতের মধ্যে কাঁপতে লাগল। ডাক্তার লক্ষ্য করলেন, গ্রাঁদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে।

—বসুন এখানে, পড়ে শোনান দেখি, কী লিখছেন।

—হ্যাঁ, শোনাই। গ্রাঁদের চোখের দৃষ্টি এবং মুখের হাসির মধ্যে কেমন একটা ভীরু কৃতজ্ঞতাবোধের ভাব ফুটে উঠল।—আপনাকে শোনাতে পারলে অবশ্যই খুশি হব।

লেখাটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আরও কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেন, তারপর ঝপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

নিচের রাস্তা থেকে যে একটা অদ্ভুত ভন ভন শব্দ উঠছিল, প্লেগের শোঁ শোঁ শব্দের প্রত্যুত্তরই হবে হয়তো, ডাক্তার ইতিমধ্যে সেইদিকে কান দিয়েছিলেন। নিচে বিস্তৃত যে শহর, যা এখন প্লেগের শিকার এবং যা সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন, যেন একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ; তার সম্পর্কে একটু অদ্ভুত রকমের সুস্পষ্ট চেতনা জাগল ডাক্তার রিও-র মনে, যেমন চেতনা জাগল সেখানে প্রতিমুহূর্তে যে লক্ষ লক্ষ যন্ত্রণাকাতর মানুষের করুণ আর্তনাদ চারদিকের গভীর অন্ধকারের চাপে পিষে প্রতিমুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল তার সম্পর্কে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রাঁদের গলার স্বর খুব নিচু কিন্তু বেশ পরিষ্কার আবার ভেসে এল তাঁর কানে :

যে মাসের এক সুন্দর প্রভাতে অনেকেই হয়তো রুচিসম্পন্না এক যুবতী অশ্বারোহিণীকে পাটল রঙের এক সুন্দর মাদি ঘোড়ায় চেপে দুপাশে পুষ্পিত বৃক্ষঘেরা বলগনা অ্যাভিন্যু ধরে যেতে দেখে থাকতে পারে।

গ্রাঁদ থামলেন। আবার নীরবতা ফিরে আসল চারপাশে।

সঙ্গে সঙ্গে নিচের যন্ত্রণাকাতর অসহায় শহর থেকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে এল। গ্রাঁদ ইতিমধ্যেই হাতের কাগজখানা টেবিলের উপর রেখে একদৃষ্টিতে চেয়েছিলেন সেদিকে। খানিক পরেই তিনি ডাক্তারের দিকে মুখ তুলে চাইলেন।

—কেমন হচ্ছে বলে মনে হয় আপনার?

ডাক্তার রিও উত্তরে বললেন, আরম্ভটা শুনে তাঁর মনে রীতিমতো কৌতূহল জেগে গেছে। পরে কী ঘটবে সেটা জানার জন্যে এখন মন চাইছে তাঁর।

জবাব শুনে গ্রাঁদ ডাক্তারকে বললেন—তিনি সমস্তটাই ভুল বুঝেছেন। টেবিলের উপর ছড়ানো কাগজগুলোর ওপর তিনি বেশ জোরের সঙ্গে একটা থাপ্পড় মারলেন, তাঁকে বেশ উত্তেজিত মনে হল। বললেন—এটা তো শুধু একটা যেমা-তেমন খসড়া। আমার কল্পনায় যে-ছবি ভাসছে, তাকে যখন সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তুলতে পারব, ঘোড়া ছোটার তালে তালে আমার শব্দগুলোও যখন সেইরকম গতি লাভ করবে—যেমন কদমে চলছে ঘোড়া—এক—দুই—তিন, এক—দুই—তিন, আমি কী বলতে চাইছি নিশ্চয়ই এবার অনুমান করতে পারছেন—পরের যা-কিছু প্রয়োজন সেগুলো তখন আপনা থেকেই এসে যাবে। আর তার চেয়ে বড় কথা—আমি যে মোহময় বিভ্রম সৃষ্টি করতে চাইছি, সেটা তখন এমনই সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে যে, যেন এই প্রথম বাক্যটা পড়েই বোর্ড বলতে বাধ্য হবেন—টুপি খুলে সালাম জানালাম আপনাকে।

তবে তিনি স্বীকার করলেন লেখাকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এখনও তাকে অগাধ পরিশ্রম করতে হবে। এখন বাক্যটার যে রূপ তিনি দিতে পেরেছেন, সেই অবস্থাতেই সেটাকে ছাপাবার জন্যে কোনো মুদ্রাকরের হাতে ছেড়ে দেবেন,

সেটা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। কারণ যদি বাক্যটার বর্তমান গঠন মাঝে মাঝে তাঁর কাছে ভালোই লাগে তবুও সেটা যে এখনও সবদিক থেকে সুন্দর নয়, সে-সম্পর্কে তিনি সচেতন। এবং সেইসঙ্গে এ-সম্পর্কেও সচেতন যে, বাক্যটার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে এমন একটা সহজ সাবলীল ভাব রয়ে গেছে, যার ফলে যদিও ঠিক অতটা সুস্পষ্ট নয় তবুও চেনা যায় যে অতি সাধারণ লেখা বলতে যা বুঝায় এও তারই কাছাকাছি। যখন হঠাৎ তাদের কানে এল যে, জানালার ঠিক নিচে বাইরের রাস্তার ওপর লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রাঁদ ডাক্তারকে মোটামুটি এই ধরনের একটা কিছু বলছিলেন। ডাক্তার বাইরে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন।

—আচ্ছা দেখবেন শেষপর্যন্ত কী দাঁড় করাতে পারি এ থেকে, গ্রাঁদ আবার বললেন এবং এক ঝলক জানালার দিকে চেয়ে নিয়ে আবার যোগ করলেন—অবশ্য এগুলো শান্ত হবার পর।

তারপর আবার নিচে রাস্তায় দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। ডাক্তার রিও ইতিমধ্যে সিঁড়ি বেয়ে পথে নেমে গিয়েছিলেন। তিনি রাস্তার ওপর গিয়ে দাঁড়াতেই দুজন লোক যেন হঠাৎ এসে তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে বেরিয়ে গেল। মনে হল যেন শহরের কোনো-না-কোনো গেটের দিকেই ছুটছে তারা। সত্যি বলতে কী, একদিকে এই নিদারুণ গরম, তার ওপর প্লেগের নানা বিপর্যয়, দেখতে দেখতে শহরের অনেকেরই তখন মাথাখারাপ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। মারামারি হাতাহাতি ইতিমধ্যে কতক স্থানেই হয়েছিল। প্রায় প্রতি রাতে কিছু-না-কিছু লোককে গেটের নারোয়ানদের দৃষ্টি এড়িয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে দেখা যেত।

৫

আরো অনেকের মতো র‍্যাঁবেয়ারও এ-শহরের ক্রমবর্ধমান আতঙ্কের আবহাওয়ার বাইরে পালাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন। সবসময় তাঁরা সফলকাম না হলেও তাঁদের অধ্যবসায়ও ছিল যেমন সাধারণ চেষ্টার তুলনায় অনেক বেশি, আবার তাঁরা যেসব কলাকৌশলের আশ্রয় নিতেন, সেগুলো ছিল অনেক উন্নত ধরনের। বেশ কিছুদিন ধরেই র‍্যাঁবেয়ার সরকারি কর্মচারীদের পিছনে ঘোরাঘুরি করছিলেন। অবশ্য তাঁর কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাঁর নাকি একটা ধারণা ছিল যে, কোনো কাজে তার অধ্যবসায় সেই পর্যন্ত জয়ী হবেই। তিনি এমন কথাও বলতেন যে, লোকে যে বলে সঙ্কটে বুদ্ধি জোগায়—কতকটা বলতে গেলে সেটা যেন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ক্ষেত্রে ঘটত। সুতরাং দিনের-পর-দিন তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের পিছনে ধরনা দিয়ে ফিরতেন। স্বাভাবিক সময় থাকলে যাদের প্রভাব কার্যকর হতে পারত এমন-সব কর্মচারীদের পেছনেও একইভাবে হাঁটাহাঁটি করতেন।

কিন্তু তখনকার যে-অবস্থা তাতে এসব প্রভাবের বিশেষ কিছু ফল হত বলে মনে হয় না। এদের বেশির ভাগ ছিলেন এমন সব শ্রেণীর মানুষ—রপ্তানি বাণিজ্য, ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন এবং মদের ব্যবসা ইত্যাদি বিষয়ের নানান দিক সম্পর্কে যাদের সুস্পষ্ট

ধারণা ছিল। ইনসিউরেন্সের বিষয় হোক বা পরস্পরের মধ্যে সম্পাদিত কোনো ত্রুটিপূর্ণ চুক্তির ব্যাখ্যা হোক অথবা অনুরূপ কোনো ব্যাপারে সমস্যার উদ্ভব হলে তার মীমাংসার জন্য পরামর্শ দেওয়া হোক, এসব ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা ছিল পরীক্ষিত এবং তাদের উচ্চ গুণাগুণও যথেষ্ট। বাস্তবিকপক্ষে তাদের সৎ ইচ্ছার মনোভাবটাই সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ত সবার। কিন্তু প্লেগের ব্যাপারে কিছু করবে যেখানে, সেখানে তাদের দেখা যেত সম্পূর্ণ অপারগ।

যা হোক, সুযোগ পেলেই র‍্যাঁবেয়ার তাদের পাকড়াও করে নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা বোঝাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু যতকিছু যুক্তিই তিনি দেখান তার মর্মার্থ সবসময় গিয়ে দাঁড়াত একই। এই শহরের অধিবাসী নন তিনি। তিনি এখানে একজন বিদেশী পর্যটক মাত্র। সুতরাং তাঁর ব্যাপার বিশেষ বিবেচনা লাভের যোগ্য। যাদের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন, তাদের বেশির ভাগ লোক সহজেই তার এই যুক্তি মেনে নিতেন। কিন্তু ঠিক পরমুহূর্তেই তারা উল্লেখ করতেন তাঁর মতো অবস্থার লোক শহরে আরও অনেকেই রয়েছেন; সুতরাং তিনি নিজের অবস্থাকে যতটা অনন্যসাধারণ বলে ভাবছেন তা হয়তো সত্যি নয়। এর পরে অবশ্যই র‍্যাঁবেয়ার বলতে চেষ্টা করতেন যে, এই যুক্তির দ্বারা তো আর তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। তখন উত্তরে তারা আবার তাকে বুঝাতে চেষ্টা করত যে এমনিতেই ও-পক্ষের অবস্থা ইতিমধ্যে কিছুটা অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছে, সুতরাং তাঁর জন্যে বিশেষ কিছু করতে গেলে তো আরো সংকটজনক হয়ে উঠবে। কারণ কোনোরকম বিশেষ অনুগ্রহ দেখানো এবং তার দ্বারা, বেশ অনিচ্ছায় তারা উচ্চারণ করত শব্দটা, নজির সৃষ্টির ঝক্কি নেওয়া, এটা তারা মোটেই চায় না।

ডাক্তার রিও-র সঙ্গে এসব নিয়ে কথাবার্তা বলার সময় র‍্যাঁবেয়ার সাধারণত যেসব সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে নিজের ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলতে যেতেন, তাদের বেশ কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করে ফেললেন। উপরে যেসব যুক্তিতর্কের কথা বলা হয়েছে, এই ধরনের যুক্তিতর্কের আশ্রয় নিতেন যারা, তাদের নামকরণ করলেন তিনি খুঁতখুঁতেদের দল। আইনকানুন মেনে চলার প্রশ্ন উঠলে এরা কোনো সময় পান থেকে চুন খসতে দিতেন না। তার পরের শ্রেণীতে ফেললেন যাদের, তারা হলেন সান্ত্বনাদানকারীর দল। তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তারা র‍্যাঁবেয়ারকে সবসময় এরকম একটা আশ্বাস দেবার চেষ্টা করতেন যে, বর্তমান দুর্যোগের অবস্থা খুব বেশিদিন থাকবে না; কিন্তু র‍্যাঁবেয়ার যখন আবার প্রশ্ন তুলতেন যে তবুও এ-অবস্থা মোটামুটি কতদিন থাকতে পারে বলে তাদের ধারণা, তখন তারা তাঁকে এই বলে বুঝিয়ে বিদায় দিতেন যে সামান্য কয়েকদিনের একটু অসুবিধা নিয়ে তিনি বড়বেশি উৎকণ্ঠা দেখাচ্ছেন। এর পরের শ্রেণীতে পড়লেন যারা, তারা হলেন কাজের মানুষের দল। তাদের সঙ্গে কেউ দেখা করতে গেলে সাধারণত বলতেন—কী ব্যাপারে এসেছেন সেটা সংক্ষেপে জানিয়ে একটা নোট রেখে যান। তারপর এটাও জানিয়ে দিতেন যে যথাসময়ে দেখে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবেন। এরও পরে অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়তেন যারা, তাদের ভেতর পর্যায়ক্রমে ছিলেন : তুচ্ছতাচ্ছিল্যকারীর দল—যারা তাঁর

থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ-সম্বলিত চিঠি দিতে চাইতেন। অথবা যেখানে গেলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হতে পারে এমন-সব বিভিন্ন ঠিকানা দিতে চাইতেন তাঁকে; ছিলেন লালফিতের ব্যবসায়ীর দল, যাদের কাছে গেলেই একঘানা ফর্ম ধরিয়ে দিতেন তাঁর হাতে, তা পূরণ এবং সই করার জন্যে, কিন্তু পরে দেখা যেত নথির স্তূপের ভিতর সেই ফর্ম গায়েব করে দিয়েছেন অতিরিক্ত কাজের চাপে ক্লান্ত কর্মচারীর দল, যারা তাঁকে দেখলেই ঊর্ধ্বে হাত তুলে যেন ক্ষমা চাইতেন তাদের রেহাই দেবার জন্যে। ছিলেন, বিরক্ত এবং হয়রান হয়ে যাওয়া কর্মচারীর দল, যারা তাঁকে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নিতেন। আর সবশেষে ছিলেন সনাতনপন্থীদের দল, সংখ্যায় অন্যদের তুলনায় তারাই ছিলেন খুব বেশি। তাদের সামনে গেলে হয় তারা তাঁকে তাঁর কেস-সমেত অন্য অফিসে পাঠিয়ে দিতে চাইতেন; আর না হলে ব্যাপারটি সম্পর্কে অন্য কীভাবে তদবির করতে হবে তার পরামর্শ দিতেন।

দিনের-পর-দিন এইভাবে বিভিন্ন অফিসে ধরনা দেবার রুটিন রক্ষা করার ব্যাপারে গিয়ে র‍্যাবেয়ার একেবারে যেন নাজেহাল হয়ে পড়ছিলেন। তবে লাভের মধ্যে তার এইটুকু হয়েছিল যে প্রতিদিন এই-যে তাঁকে হয় মিউনিসিপ্যাল অফিস নাহয় প্রিফেক্টের হেডকোয়ার্টারে গিয়ে ঘন্টার-পর-ঘন্টা বসে থাকতে হত আর যেখানে নিয়ত তাঁর নাকের ডগায় ঝুলতে থাকত, হয় ইনকামট্যাক্স থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে সরকারি সেভিংস ব্যাংকে অর্থ নিয়োগের আবেদন, কোনো নোটিশ। কখনো-বা এমন সব অফিসে গিয়েও তাঁকে বসে অপেক্ষা করতে হত যেখানে মানুষের মুখ তাদের পিছনে রাখা নথিপত্রের আলমারি ও ধূলিময় নথিপত্রের মতো বিবর্ণ ও অভিব্যক্তিহীন। মিউনিসিপ্যাল অফিস বা প্রিফেক্টের অফিসের কাজকর্ম যে সত্যই কীভাবে চলে সে-ব্যাপারে র‍্যাবেয়ারের একধরনের অন্তর্দৃষ্টি হয়েছিল। র‍্যাবেয়ার একদিন বেশ কিছুটা তিক্ততার সঙ্গেই ডাক্তার রিও-র সামনে মন্তব্য করলেন—প্রতিদিন এই-যে এত পরিশ্রম তিনি করেন, তার ফলে শুধু একটাই লাভ হয় তাঁর : অন্তত সাময়িকভাবে হলেও এই সংকটের চিন্তা থেকে মনকে দূরে রাখতে পারেন। বাস্তবিকই প্লেগের প্রকোপ দিনের-পর-দিন বেড়ে চলেছিল, সেটা যেন কিছুটা র‍্যাঁবেয়ারের অগোচরেই রয়ে গিয়েছিল। আর প্রতিদিন এইভাবে ঘোরাঘুরির ফলে র‍্যাঁবেয়ারের দিনগুলোও কেটে যেত, তাছাড়া সমস্ত শহরের তখনকার যে-অবস্থা তাতে যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষে একটা দিন পার করে দেওয়ার অর্থ ছিল, অবশ্য তার পরেও টিকে যেতে পারলে এই অগ্নিপরীক্ষার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের সেই বিশেষ-ক্ষণটার দিকে চব্বিশঘণ্টা কাল এগিয়ে যাওয়া। ডাক্তার রিও-র অবশ্য র‍্যাবেয়ারের এইসব যুক্তিতর্ক মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তবে এগুলো তাঁর কাছে অতি সাধারণ খেলো যুক্তি বলে মনে হত।

ঠিক এমন সময় র‍্যাবেয়ার যেন আশার ক্ষীণ আলো দেখতে পেলেন। প্রিফেক্টের অফিস থেকে একটা ছাপানো ফর্ম এসে পৌঁছাল তাঁর কাছে, ফর্মের শূন্য ঘরগুলোকে সতর্কতার সঙ্গে পূর্ণ করে দিতে হবে তাকে। তবে তাঁর নিজের পরিচয়, তাঁর পরিবার এবং তাঁর আয়ের বর্তমান এবং অতীত উৎস ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে হবে অর্থাৎ তাঁর নিজের সম্পর্কে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ জবাব দেওয়া প্রয়োজন।

এ থেকে র‍্যাঁবেয়ারের ধারণা হল যাদের শহর ত্যাগ করে অবিলম্বে নিজের নিজের দেশে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হবে, সম্ভবত তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের তালিকা প্রস্তুতের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এরই ভেতর একদিন কোনো একটা অফিসের এক খুদে কর্মচারীর কাছ থেকে সামান্য কিছু কিছু খবর, যা তিনি সংগ্রহ করতে পারলেন, তাতে তাঁর ধারণা আরও দৃঢ় হল। কিন্তু আরো কিছুটা অনুসন্ধানের পর যখন তিনি যে-অফিস থেকে ফর্ম পাঠানো হয়েছিল সেই অফিস আবিষ্কার করলেন, তখন তাঁকে জানানো হল যে বিশেষ কোনো জরুরি অবস্থার কথা চিন্তা করেই এসব সংবাদ সংগ্রহ করা হচ্ছে।

—কী ধরনের জরুরি অবস্থা, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

তাঁকে জানানো হল যে : এই জরুরি অবস্থা, প্লেগে আক্রান্ত হওয়া এবং মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় সেক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু সম্পর্কে তার পরিবারকে সংবাদ দেওয়ার ব্যাপার এবং হাসপাতালে তার চিকিৎসার জন্যে যেসব খরচ-খরচা হবে সেগুলো মিউনিসিপ্যালিটি বহন করবে, না যথাসময়ে তা তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কাছে থেকে আদায় করা হবে, সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সাহায্যে আসবে। বাইরে থেকে বিচার করলে র‍্যাঁবেয়ারের কাছে এর অর্থ দাঁড়াল এই যে, যে ভদ্রমহিলা তাঁর ফেরার পথ চেয়ে অপেক্ষা করছিলেন, তার সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়নি, কারণ এটুকু সুস্পষ্ট যে কর্তৃপক্ষ তখন পর্যন্ত তাদের দুজনের প্রতি দৃষ্টি রাখছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র এটুকু জেনে কী এমন সান্ত্বনাই-বা তিনি পেতে পারতেন। তবে এর ভেতরে অবশ্য লক্ষ্য করবার মতো অন্য ব্যাপার ছিল এবং সেটা উপলব্ধি করে র‍্যাঁবেয়ার নিজেও যথেষ্ট বিস্মৃত বোধ করলেন : এই কঠিন বিপর্যয়ের ভেতর সরকারি অফিসগুলো কেমন নির্বিকারভাবে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। এমনকি, যেসব কাজের সঙ্গে বর্তমান জরুরি পরিস্থিতির কোনোরকম সম্পর্ক পর্যন্ত ছিল না, এমন অনেক ব্যাপারেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অবগতি ছাড়াই কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এই অফিসগুলো নিজেদের দায়িত্বেই অনেক কাজের সূচনা করে দিত শুধুমাত্র এই কারণে যে, কোনো একসময়ে এই ধরনের কাজের জন্যে এইসব সংস্থা গড়ে উঠেছিল।

এরপর থেকে যে-অবস্থার সূত্রপাত হল, তা একদিক থেকে যেমন সবচেয়ে সহজ আবার সবচেয়ে কঠোর বলে মনে হল র‍্যাঁবেয়ারের কাছে। এখন থেকে সারাটা দিন শুধু অফিসে কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া তার করার কিছু রইল না। বিভিন্ন সরকারি অফিসে, যেখানে যেখানে যাবার কথা, ইতিমধ্যে সবই ঘোরা শেষ করে ফেলেছিলেন; যেখানে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন তাও তখন তার সম্পূর্ণ সারা এবং তখন তিনি এটাও উপলব্ধি করে ফেলেছেন যে এসব দিয়ে আপাতত আর তার কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

সুতরাং তখন তার কাজ দাঁড়িয়েছিল সারা দিনভর এক কাফে থেকে আরেক কাফেতে ঢুঁ মেরে বেড়ানো। সকালবেলাগুলোয় সাধারণত তিনি কোনো একটা কাজে বাইরের চত্বরে বসে দৈনন্দিন সংবাদপত্রের পাতা উল্টে যেতেন। মাঝে-মাঝে

আশা থাকত যে দুর্বিপাক যে ক্রমেই উপশমের দিকে যাচ্ছে এমন কোনো ইঙ্গিত হয়তো খুঁজে পাবেন সেখানে। আবার কখনো হয়তো-বা দীর্ঘ সময় ধরে পথচারীদের মুখ নিরীক্ষণ করতে থাকতেন, কিন্তু একটানা একই বিষণ্ণ চেহারা দেখতে দেখতে অনেক সময় মুখ ঘুরিয়ে নিতেন। সকাল থেকে খুব কম হলেও রাস্তার অপর পারের বিভিন্ন দোকানের সামনের সাইনবোর্ড এবং তারই সঙ্গে যেসব জনপ্রিয় পানীয়, এখন আর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা নেই, দোকানের সামনে তাদের বিজ্ঞপ্তিগুলো পড়ে শেষ করবার পর তিনি হঠাৎ সেখান থেকে উঠে দুপুরের রোদে শূন্য রাস্তায় রাস্তায় একাকী পায়চারি করে বেড়াতেন। এরকম উদ্দেশ্যহীনভাবে শহরের নির্জন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা আর মাঝে মাঝে কোনো কাফে বা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুঁ দেয়া, এই করে তিনি সন্ধে অবধি সময় কাটিয়ে দিতেন। এমন সময় ডাক্তার রিও একদিন সন্ধ্যায় তাঁকে এক কাফের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে দেখলেন, যেন ভিতরে ঢুকবেন কিনা সে-ব্যাপারে মনস্থির করতে পারছিলেন না। অবশ্য শেষপর্যন্ত যেন তিনি ভেতরে ঢোকাটাই স্থির করলেন এবং ঘরের ভেতর পেছনদিকে একটা টেবিলে গিয়ে বসলেন। এই সময়টায় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে কাফের মালিকরা সাধারণত সন্ধ্যার পর ঘরের ভেতর বাতি জ্বালাতে যতক্ষণ সম্ভব দেরি করত।

র‍্যাঁবেয়ার যখন কাফের ভেতর গিয়ে ঢুকলেন, সন্ধ্যার ধূসরতা তখন ঘরের চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করছে। অস্তগামী সূর্যের লালিমা তখনও দেয়ালে আয়নাগুলোর ওপরে কাঁপছে। শ্বেতপাথরের সাদা ছাউনি দেওয়া ঘরের ভেতরকার টেবিলগুলো দ্রুত ঘনায়মান অন্ধকারের ভেতরে ঝকঝক করছে যেন। নির্জন কাফের ভেতর র‍্যাঁবেয়ারকে এইভাবে বিষণ্ণ বসে থাকতে দেখে ডাক্তারের মনে হল, সত্যিই তার অবস্থা বড় করুণ এবং ভাবাতুর। নিজেকে যেন সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন তিনি, সেখানকার অনেকগুলো ছায়ার ভিতর র‍্যাঁবেয়ার নিজেও যেন আর একটা ছায়া মাত্র। ডাক্তার রিও অনুমান করলেন—নিশ্চয় র‍্যাঁবেয়ার এই মুহূর্তগুলোয় নিজেকে সবচেয়ে পরিত্যক্ত বোধ করে। আর বাস্তবিকই প্রতিদিন এটা এমন একটা নিয়ম যখন সাধারণত শহরের প্রতিটা কয়েদিই নিজের নিজের নিঃস্ব অবস্থাকে বড় করুণভাবে উপলব্ধি করে এবং প্রত্যেকেই এই বলে নিজের মনকে তখনকার মতো দৃঢ় করতে চেষ্টা করে যে, যেমন করেই হোক মুক্তির একটা পথ সত্বর তাকে বার করতেই হবে। ডাক্তার রিও আর সেখানে অপেক্ষা না করে দ্রুত অন্যত্র চলে গেলেন।

র‍্যাঁবেয়ার কিছুটা সময় মাঝে মাঝে রেলস্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করে করেও কাটিয়ে দিতেন এসময়। প্ল্যাটফরমের উপর বড় একটা কাউকে যেতে দেওয়া হত না, কিন্তু ওয়েটিংরুমগুলোয় বাইরের দিক থেকেও ঢোকা যেত। সেগুলো প্রায় সবসময় খোলা পড়ে থাকত এবং যেহেতু ঘরগুলো মোটামুটি ঠাণ্ডা ব্যস্ত আর কিছুটা অন্ধকার। গ্রীষ্মের সময় ফকির ভিখারির দল গিয়ে ভিড় জমাত সেখানে। র‍্যাঁবেয়ার বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে দিতেন রেলের টাইম টেবিল, প্ল্যাটফরমের উপর থুতু ফেলা নিষেধ ঘোষণার বিভিন্ন নোটিশ এবং প্যাসেঞ্জারদের চলাফেরা সম্পর্কে বিভিন্ন নির্দেশ

ইত্যাদি পড়ে পড়ে। যখন এগুলো পড়া শেষ হয়ে যেত, নির্বিকার একটা কোণ দেখে নিয়ে তিনি বসতেন। ওয়েটিংরুমের যে-ঘরটায় সাধারণত গিয়ে তিনি বসতেন, তার মাঝখানটায় লোহার মস্ত একটা পুরোনো স্টোভ, বেশ কয়েক মাসই হবে হয়তো তাতে আগুন জ্বলে না, সেটা যেন বড়রকম একটা চিহ্নের মতো ঘরের মাঝখানে রয়ে গিয়েছিল। তার মেঝের ওপর আট এই সংখ্যার অনুকরণে বিভিন্ন প্যাটার্ন আর যেখানে-সেখানে দেখা যেত বহুদিন আগে থেকে পড়া চায়ের ছোপ-ছোপ দাগ। চারপাশে বাইরে দেওয়ালে ক্যানেস বা ব্যান্ডলে নির্বিবাদ ছুটি কাটানোর জন্যে টাঙানো হয়েছে এমন সব রঙচঙে পোস্টার।

র‍্যাঁবেয়ার ওয়েটিংরুমের নির্জন এককোণে গিয়ে বসতেন এবং সবকিছু থেকে বিভিন্ন মানুষের কাছে স্বাধীনতার যে স্বাদ, সেই স্বাদ যেন তিনি সুন্দরভাবে অনুভব করতেন এখানে বসে। সেই মুহূর্তে যেসব স্মৃতি তাঁর বেদনাদায়ক বলে মনে হত, অন্তত ডাক্তার রিও-র কাছে এসব সম্পর্কে পরে যেগুলি বলেছিলেন—তা হচ্ছে প্যারিসের জীবনের পুরোনো স্মৃতি। তাঁর কল্পনায় যেন সম্পূর্ণ অনাহূতভাবে একের-পর-এক ভেসে উঠত পুরোনো পাথরে বাঁধানো নদী, প্যালেস রয়ালের অগণিত পায়রার ঝাঁক, গ্যরে দ্য নার্ড আর প্যানথিয়েনের চারপাশের আরো এমন-সব দৃশ্য সেগুলোকে সত্যই যে তিনি এত গভীরভাবে ভালোবাসতেন, পূর্বে তা কোনোদিনই অনুভব করেননি বা যখন মনের ভিতর এইসব স্মৃতি জেগে উঠত, তখন অন্যকিছু করার স্পৃহা যেন সম্পূর্ণ তার মন থেকে উবে যেত।

ডাক্তার রিও অবশ্য সুস্পষ্ট অনুমান করতে পারতেন যে, র‍্যাঁবেয়ার তার প্রেমের পুরোনো স্মৃতির সঙ্গে এগুলোকে সব এক করে ফেলেছেন। পরে যখন আবার র‍্যাঁবেয়ার ডাক্তারকে বললেন যে সাধারণত ভোর চারটার দিকে জেগে গিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্যারিসের পুরোনো স্মৃতি নিয়ে মনের ভিতর নাড়াচাড়া করতে তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগে; ডাক্তার তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সহজেই অনুমান করতে পারলেন—এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যূষের এই সময়টায় বিশেষ করে র‍্যাঁবেয়ার তাঁর প্যারিসে ফেলে আসা প্রেমিকার স্মৃতি রোমন্থন করতে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে এটাও ঠিক যে শুধুমাত্র এই সময়টায় র‍্যাঁবেয়ার তার প্রেমিকাকে একান্তভাবে তার আপনার বলে ভাবতে পারতেন। ভোর চারটা অবধি জেগে থেকে কেউ যে কিছু করবে সে-সম্ভাবনা সাধারণত খুব অল্প, আর ঠিক তার আগে তার প্রেমিকা যদি তার প্রতি কোনোরকম বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে তো, অন্তত সেই মুহূর্তে তার নিদ্রিত থাকাটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, এটা একান্তই সত্য যে, এই সময়টায় সবাই সাধারণত নিদ্রামগ্ন থাকে, আর এটা আমাদের সবার কাছেই মস্ত একটা সান্ত্বনার ব্যাপার। কারণ প্রেমাতুর প্রত্যেকটা হৃদয়ের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে নিজের ভালোবাসার জনকে অনুক্ষণ এবং সচেতনভাবে আপন করে পাওয়া, আর তা যদি কোনো কারণে সম্ভব না হয়, সাময়িক বিচ্ছেদ যদি অবশ্যম্ভাবী হয়েই ওঠে, তাহলে তাকে এমন এক স্বপ্নের মধ্যে নিমজ্জিত বলে কল্পনা করতে থাকা যে পুনরায় মিলনের মুহূর্ত না-আসা পর্যন্ত সে-সম্পর্ক ভাঙার কোনো সম্ভাবনা নেই।

৬

ফাদার প্যানালুর ধর্মীয় বক্তৃতার অল্প কিছুদিন পর থেকে শহরে উৎকট রকমের গরম পড়া শুরু হল। রবিবার দিন সেই-যে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল তার পরের দিন সূর্য যেন বাড়িঘরের মাথার উপর নেমে এসে সর্বক্ষণ আগুন ছড়াতে লাগল। তারপর প্রথমে একদিন সারাক্ষণ যেন লু হাওয়া বইতে থাকল। চারপাশে দেওয়ালগুলো পর্যন্ত যেন শুকিয়ে হাড়-চামড়া সার হয়ে উঠল। এরপরই সূর্য যেন এগিয়ে এসে নিজের হাতে সমস্ত দায়িত্ব তুলে নিল। উত্তাপ আর প্রখর আলোর অবিরাম স্রোত বয়ে যেতে থাকল যেন সারাদিন শহরের উপর দিয়ে। ওপরে ঢাকা অলিন্দ আর বাড়িঘরের অভ্যন্তর ছাড়া সবকিছুই এই জ্বলন্ত রোদে দগ্ধ হতে থাকল যেন। সূর্য যেন এই শহরের অধিবাসীদের প্রতিটি অলিগলি, প্রতিটা নিভৃত স্থানেও অনুসরণ করে ফিরতে লাগল। যেখানেই পেত, সেখানে গিয়েই আঘাত করত তাদের।

গ্রীষ্মের এই প্রখর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে প্লেগের মৃত্যুর সংঘাতও আশ্চর্যজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় প্রথম সপ্তাহে মৃত্যুর হার দাঁড়িয়েছিল প্রায় সাতশো'র কাছাকাছি—সারা শহরে কেমন যেন একটা গভীর অবসাদ এবং অনুৎসাহের ভাব লক্ষ্য করা গেল। শহরতলিতে দীর্ঘ রাস্তা আর সিঁড়িতে প্রাণের চিহ্নটুকু পর্যন্ত ছিল না কোথাও। সাধারণত এসব অঞ্চলের লোকেরা দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাত বাড়ির দরজার সামনে গল্পগুজব এবং হৈচৈ করে; কিন্তু এখন প্রত্যেকটি দরজাই দেখা যেত বন্ধ, লোকজন নেই কোথাও, এমনকি প্রত্যেকটা বাড়ির জানালাগুলোর পর্দা পর্যন্ত দেখা যেত নামানো। অবশ্য বাইরের প্রখর উত্তাপ, না প্লেগের আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে এমন করা হত তা বলা শক্ত। মাঝে মাঝে কোনো-কোনো বাড়ি থেকে আকস্মিক কান্নার আর্তনাদ শোনা যেত। প্রথম প্রথম যখন এরকম কিছু ঘটত, তখন সহৃদয়তার জন্যেই হোক, অথবা ঔৎসুক্যের বশেই হোক, বাড়ির বাইরে রীতিমতো লোকজনের ভিড় জমে উঠত। সবাই জানবার চেষ্টা করত কী ঘটল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই বিপর্যয়ের মধ্যে বাস করবার ফলে সবার অন্তর বোধহয় কঠিন হয়ে উঠেছিল। মানুষ ঠিক তার পাশেই এই ধরনের দৃশ্য দেখলেও এখন আর কিছুমাত্র বিচলিত বোধ করত না—সহজভাবে পাশ কাটিয়ে যেত। এইসব করুণ আর্তনাদ এখন মানুষের কাছে সাধারণত কথাবার্তার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শহরের বাইরে যাবার গেটের সামনে প্রতিদিন যে মারামারি হত, যা ঠেকাবার জন্যে পুলিশকে অনেক সময় রিভলবার পর্যন্ত ব্যবহার করতে হত; তার ফলে শহরের সবখানেই কেমন যেন একটি উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব বিরাজ করত। গেটের সামনে এইভাবে নিয়মিত সংঘর্ষের ফলে অবশ্যই কেউ-না-কেউ আহত হত; কিন্তু তখনকার সেই প্রচণ্ড উত্তাপ এবং ত্রাসের দরুন সবকিছুকেই অতিরঞ্জিত করা হত এবং গেটে কেউ আহত হলে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়েছে বলে চারিদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ত।

আরও একটা জিনিস তখন অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং নিশ্চিত বলে মনে হত। চারিদিকে ক্রমেই অসন্তোষ বাড়ছিল এবং অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে পারে আশঙ্কা করে স্থানীয় সরকারি কর্মচারীরা নিজেদের ভিতরে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা শুরু

করেছিল। অবস্থা যদি সত্যিই এমন দাঁড়ায় যে মহামারীর আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে শহরের লোকেরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে, তাহলে সেই অবস্থায় কী কী ব্যবস্থা নেয়া দরকার তা নিয়ে বিতর্কের শুরু হত তাদের ভেতর। শহর ত্যাগের চেষ্টা করা যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ—সেই একই নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করে প্রতিদিন সংবাদপত্রে নতুন নতুন নিয়মকানুন ছাপা হত। সে-সঙ্গে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হত যে, এই নিয়ম যারা ভঙ্গ করবে, শাস্তিস্বরূপ তাদের দীর্ঘদিন কারাবরণ করতে হবে।

কিছুদিন ধরে শহরে একধরনের নতুন পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নুড়িবিছানো শূন্য রাস্তার উপর ঘোড়ার খুরের শব্দ বেজে উঠত, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যেত দুপাশে বন্ধ সমান্তরাল ঘরবাড়ির ভেতর দিয়ে যে-রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে দলে দলে অশ্বারোহী পুলিশ। মাঝে মাঝে গোলাগুলিরও আওয়াজ শোনা যেত। যাতে রোগের সংক্রমণ ছড়াতে না পারে সেইজন্য শহরের সমস্ত কুকুর এবং বেড়ালকে মেরে ফেলার জন্য সম্প্রতি যে একটা ব্রিগেডকে নিয়োগ করা হয়েছিল, গোলাগুলির আওয়াজ ছিল তাদের কর্মতৎপরতার ফল। শহরের সবাই এমনিতেই যখন স্নায়বিক উত্তেজনায় ভুগছিল, তার ওপর এইসব গোলাগুলির শব্দ যখন চারিদিকের শান্ত নীরবতাকে ভেঙে খানখান করে ছড়িয়ে পড়ত, তখন স্বভাবতই সবার মনেই উত্তেজনা হঠাৎ বাড়ত।

একদিকে যেমন ছিল গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ আর চারপাশে থমথমে নীরবতা, অন্যদিকে সবার অন্তরে অন্তরে ছিল অনুক্ষণ একটি বিপদের আশঙ্কা। সুতরাং সেই অবস্থায় সামান্য যা-কিছুই ঘটত না কেন, এমনকি কোথাও একটু শব্দ হলেও, তার একটা অতিরঞ্জিত তৎপরতা দেখা যেত সবার চোখে। আকাশের নিয়ত পরিবর্তনশীল চেহারা, মাটির সোঁদা গন্ধ যা থেকে অনুমান করা যেত যে ঋতু-পরিবর্তনের সূত্রপাত শুরু হয়েছে, এসব তখন মানুষ খুঁটিয়ে লক্ষ্য করত। একটা ব্যাপার সবাই আতঙ্কের সঙ্গে উপলব্ধি করত। সবাই আশঙ্কা করত গরম পড়তে শুরু করলে মহামারীর প্রকোপ আরও নিশ্চয় বাড়বে। অথচ গ্রীষ্ম যে কাছে এসে গেছে, চারিদিকে তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত চোখে পড়ত। ছাদের উপর সন্ধ্যার বাতাসের চামচিকেদের চিঁচিঁ আওয়াজ তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠতে শুরু করছিল। জুনের গোধূলি আকাশের যে একটা বিশাল ব্যাপ্তি থাকে, যখন দিগন্তকে মনে হয় অনন্ত দূরবর্তী, সেই ব্যাপ্তিও ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে মনে হত। তখন বাজারে যে ফুল পাওয়া যেত তাতে আর কুঁড়ি খুঁজে পাওয়া যেত না। তাই দেখা যেত সম্পূর্ণ ফোটা ফুল সকালের বাজার ভেঙে যাওয়ার পর শহরের ধুলামলিন রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে থাকত পদদলিত অসংখ্য ঝরে পড়া পাপড়ি। বসন্ত যে বিদায় নিতে চলেছিল তার অন্তরের সমস্ত আবেগ অজস্র পুষ্পের মাঝে উজাড় করে দিয়ে, সে যে তখন নিঃশেষিত প্রায়, সেটা সবাই তখন সহজেই অনুমান করতে পারত। আর প্রতিমুহূর্তে এইসব ফুল-উত্তাপ এবং প্লেগের যুগপৎ আক্রমণের মুখে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে অনুক্ষণ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত যেন। শহরের অধিবাসীদের কাছে গ্রীষ্মের আকাশ, চারপাশের ধুলামলিন রাস্তা তাদের নিজের অন্তরের মতই মধুর মনে হতো—যাদের চেহারা এবং প্রতিদানে শহরে প্লেগে শত শত লোকের মৃত্যু। এ সবকিছুরই তাৎপর্য ছিল একইরকম ভয়ংকর এবং অসম্ভব।

চারদিকে এখনকার এই-যে সূর্যের আলো এবং নিরবচ্ছিন্ন এই উজ্জ্বল দিন, যাদের একসময় মানুষ শুধুমাত্র অলস বিশ্রাম বা ছুটির দিনের অনুষঙ্গ হিসাবে কল্পনা করত, এখন আর তাদের সেই পুরোনো আকর্ষণ ছিল না যেন, যার জন্যে শহরের অধিবাসীরা এইসব দিনে সমুদ্রের বেলাভূমিতে ছুটত নাচানাচি করবার জন্যে, হালকা প্রেমের জন্যে। রুদ্ধ শহরের অথণ্ড নীরবতার মাঝে এই উজ্জ্বল দিনগুলোকে মনে হত শূন্যগর্ভ অতীতের সুখময় গ্রীষ্মের সেই ঐন্দ্রজালিক মোহ। প্লেগের এই আকস্মিক আক্রমণে মানুষের রূপরস সবকিছুরই যেন অকালমৃত্যু ঘটছিল, আনন্দ-ফুর্তি যেন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছিল সবার কাছে।

বাস্তবিকই মহামারীর ফলে যেসব পরিবর্তন এসেছিল, এগুলোও তাদের অন্যতম। পূর্বে বরাবরই গ্রীষ্মের আগমনকে আমরা আহ্বান জানিয়েছি আনন্দের প্রত্যাশা নিয়ে। শহর থেকে যে-কোনো সময় সমুদ্রে গমন ছিল সবার জন্যে অবারিত এবং শহরের তরুণ ছেলেমেয়েদের দল সমুদ্রে গিয়ে ইচ্ছামতো হাসত, খেলত, আনন্দে নেচে বেড়াত। কিন্তু এবারের গ্রীষ্মে সমুদ্র ছিল সবার নাগালের বাইরে। তরুণ ছেলেমেয়েদের দল যে ইচ্ছামতো দৈহিক আমোদ-প্রমোদের ভিতর নিজেদের ডুবিয়ে দেবে সে-সুযোগ থেকে তারা হয়ে পড়ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত। সুতরাং এইরকম একটা পরিবেশের ভিতর তেমন কীই-বা করার ছিল শহরের অধিবাসীদের।

আবার সেই তারিউ-র কাছে শহরবাসীদের এই সময়কার জীবনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত চিত্র পাওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য, তিনিও প্রথমে প্লেগের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন, তারপর মন্তব্য করেছেন : যেদিন থেকে বেতারে মৃত্যুর সাপ্তাহিক সমষ্টি ঘোষণার পরিবর্তে প্রত্যেক দিনের সংখ্যা, যেমন নিরানব্বই, একশত সাত, বা একশত কিংবা ইত্যাদি ঘোষণা শুরু হয় তখন থেকে মহামারীর এক নতুন সূত্রপাত হয়। শহরের সংবাদপত্রগুলো এবং সরকারি কর্তৃপক্ষ এখন প্লেগের সঙ্গে ফুটবল প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। কারণ শুধুমাত্র সংখ্যাগতভাবে বিচার করলে একশ ত্রিশ মৃত্যুর সংখ্যা সাপ্তাহিক সমষ্টির ন'শো দশের চেয়ে সত্যিই অনেক কম। সুতরাং তারা কল্পনা করতেন যেন এই প্রতিযোগিতায় তারা জিতছেন। মহামারী সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য বা করুণ কোনো ঘটনা চোখে পড়লে সেগুলোও তিনি যত্নের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন তিনি এক স্থানে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন যখন তিনি এক শূন্য রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঠিক তাঁর মাথার উপর তিনতলার এক ছাদের অন্ধকার শোবার ঘরের জানালা আকস্মিক খুলে যায় এবং ভেতর থেকে একজন মহিলা বারদুই করুণ চিৎকার করে ওঠার পর আবার তেমনই বন্ধ হয়ে যায়। ডাক্তার রিও তাঁর ডাইরিতে ব্যাপারটা লিপিবদ্ধ করেন যে আকস্মিক শহরের সমস্ত দোকান থেকে পিপারমেন্ট লজেন্স উধাও হয়ে যায়, কারণ তখন সবার মনে একটা ধারণা ছিল যে এই লজেন্স মুখে রাখলে প্লেগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

আগের মতোই তখনও জ্যাঁ তারিউ সামনের ব্যালকনিতে তাঁর সেই প্রিয় বৃদ্ধ লোকটির গতিবিধি আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। তাঁর অনুমান খুদে জীবজন্তু শিকারি এই ভদ্রলোকের জীবনেও একধরনের ট্রাজেডি নেমে এসেছিল। একদিন

সকালে আকস্মিক রাস্তার ওপর বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায়। কয়েক তাল সিমেন্ট আঘাতে, তারিউ যেভাবে ঘটনাটিকে বর্ণনা করেছিলেন, রাস্তার ওপর যে বিড়ালগুলি খেলা করতে দেখা যেত তাদের অধিকাংশ প্রাণ হারায়। বাকি যেগুলি তারাও প্রাণের ভয়ে অন্যত্র উধাও হয়ে যায়। যাই হোক, তারপর থেকে আশেপাশে কোথাও তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সেদিনও খুদে বৃদ্ধ লোকটা তাঁর নির্দিষ্ট সময়ে বাল্কনিতে বার হয়ে আসলেন। কেমন একটু বিস্ময়ের ভাব দেখালেন; শেষে রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে রাস্তার এদিক-ওদিক বিড়ালগুলিকে খুঁজতে লাগলেন। শেষে এমনভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন যেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন, ডান হাতের আঙুলগুলো দিয়ে অস্থিরভাবে রেলিং-এর উপর চাপ দিতে লাগলেন। এইভাবে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর তাঁর হাতে যে কয়েক টুকরো কাগজ ছিল, সেগুলোকে কুচি কুচি করে ছিড়লেন। নিজের ঘরের দিকে ফিরে গেলেন একবার। তারপর আবার ফিরে আসলেন ব্যালকনিতে। এবার আরও দীর্ঘ কিছু সময় বাইরে অপেক্ষা করার পর ফের ঘরের দিকে গেলেন। ভেতরে ঢুকেই জানালাগুলো সমস্ত বন্ধ করে দিলেন। সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতেও এই একই আচরণের পুনরাবৃত্তি করে চললেন। যতই দিন যেতে লাগল, তাঁর বৃদ্ধ চেহারায় কেমন একটা বিষাদ এবং হতবুদ্ধির ভাব ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল। আটদিনের দিন তারিউ বৃথাই তাঁর ব্যালকনিতে বেরুনোর অপেক্ষা করে রইলেন, যা সবার চোখেই তখন সুস্পষ্ট—বাইরে সেই বিপন্ন অবস্থা থেকে নিজেকে দূরে রাখবার জন্যে যেন তিনি জোর করে জানালা বন্ধ করে রেখেছিলেন। তারিউ তার ডাইরিতে এই ঘটনার বর্ণনা শেষে এক সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেন : প্লেগের সময় বিড়ালের উপর থুতু ফেলাও নিষেধ।

সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এক প্রসঙ্গে তারিউ তার ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করেন যে, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাইরে থেকে হোটেলে ফেরার পর তার চোখে পড়ত হোটেলের রাতের দারোয়ান বন্দুক ধরে প্রহরীর মতো হলঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত নিয়মমতো পায়চারি করছে। কারোর সঙ্গে পরিচয় হতেই সে শোনাতে ছাড়ত না যে তখন যেসব জিনিস ঘটছিল, সেগুলি সে আগে থেকেই অনুমান করতে পেরেছিল। তারিউ তার কথায় সম্মতি জানিয়ে বললেন—একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করছিলেন সেটা অবশ্য সত্য। কিন্তু তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী ভূমিকম্প সম্পর্কে। তখন সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ান বলে উঠলেন—সত্যি যদি ভূমিকম্প হত সেটাও এই অবস্থার চেয়ে ঢের ভালো ছিল। একবার হয়তো ঝাঁপায়ে উলট-পালট করে দিয়ে যেত সবকিছু, কিন্তু তাতেই তার শেষ। তারপর কে মরল বা কে বাঁচল হিসাব করে দেখা যেত, কিন্তু এই দুর্বিপাক যে রোগ ডেকে এনেছে তাতে অন্যকিছু চিন্তা করার উপায় নেই।

হোটেলের ম্যানেজারকেও একই রকম হতাশা এবং বিষণ্ণ দেখা যেত। মহামারীর গোড়ার দিকে বাইরে থেকে যারা হোটেলে এসে উঠেছিল, শহর ছেড়ে যাবার কোনো উপায় নেই দেখে তাদের অনেকেই সাময়িকভাবে হোটেলেই রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন দেখল প্লেগের কোনোরকম উপশম হবার উপায় নেই, একে একে শহরের

বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে গিয়ে উঠতে লাগল। যে-কারণে তাঁর হোটেলের সব ঘর ভরে উঠেছিল, সেই একই কারণে আবার সেই সবঘরই খালি পড়ে রইল। কারণ বাইরে থেকে যে নতুন কোনো লোক আসবে তার আর উপায় ছিল না। যে সামান্য দুএকজন তখন হোটেল থেকে বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তারিউ ছিলেন তাঁদের একজন। ম্যানেজারের সঙ্গে তারিউ-এর দেখা হলেই তিনি তাকে স্মরণ করে দিয়ে প্রায়ই বলতেন, শুধুমাত্র ভদ্রলোক হিসাবে অসুবিধার মধ্যে ফেলতে চান না এইজন্যে, নইলে বহুদিন আগেই তিনি হোটেল বন্ধ করে দিতেন।

তারিউকে তিনি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন—মহামারী কতদিন ধরে চলবে বলে তার ধারণা। লোকে বলে, তারিউ জবাবে বলতেন—শীত আরম্ভ হলেই এসব রোগ আপনা থেকেই বিদায় নেয়। উত্তর শুনে ম্যানেজার ভাবিত দৃষ্টিতে তারিউ-এর দিকে তাকাতেন—কিন্তু আপনারা কি জানেন না যে এসব অঞ্চলে বৎসরের কোনো সময় তেমন শীত পড়ে না। আর তাছাড়া এর অর্থ হচ্ছে আরো কয়েক মাস ধরে মহামারীর এই প্রকোপ সইতে হবে। আরও একটা ব্যাপার আমার নিজের জন্যে চিন্তা করা উচিত। মহামারীর উপশম হওয়ার পরও অন্তত বেশ কিছুদিন লোকে এই শহরে আসতে চাইবে না। প্রকৃতপক্ষে বাইরের লোক এই শহরে আনাগোনার ফলে এখানে যে একটি পর্যটনের নিয়মিত ব্যবসা চলত, মহামারীর ফলে সেটাও মনে হয় সাময়িকভাবে হলেও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে।

অল্প কদিনের অনুপস্থিতির পর পুরোনো সেই পরিবারের পেচক-মুখো কর্তা আবার হঠাৎ একদিন এসে দেখা দিলেন। সঙ্গে ছিল কলের পুতুলের মতো নড়াচড়া করত যে দুটো কুকুরসদৃশ বাচ্চা, তার সেই ছেলেমেয়ে দুজনা। খবর নিয়ে জানা গেল তাঁর স্ত্রী বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ আপাতত বন্ধ রেখেছেন। তাঁর মা প্লেগে আক্রান্ত, তাই তাঁর সেবাশুশ্রূষা নিয়ে তিনি ব্যস্ত।

—দেখুন, হোটেল এদের এই আসাটা আমি মোটেই পছন্দ করি না, হোটেলের ম্যানেজার একদিন তারিউকে বললেন—মাদাম অথনের সঙ্গে কারো মেলামেশা থাক বা নাই থাক, তাঁকেও প্লেগে ধরবে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তার অর্থ, এই পরিবারের সবাইকে সন্দেহ করা যেতে পারে।

তারিউ তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, সেভাবে যদি দেখেন তাহলে তো আমাদের সবার সম্পর্কেই সন্দেহ করা চলে। কিন্তু তাতে ম্যানেজারের নিজের যে চিন্তাভাবনা তার যে কোনোরকম পরিবর্তন হল বলে মনে হয় না।

—না না, কী বলছেন আপনি? আপনাকে বা আমাকে প্লেগে ধরবে বলে নিশ্চয় কেউ সন্দেহ করে না; কিন্তু তাদের সম্পর্ককে লোকে তাই করে।

যা হোক এম. অথন নিজে সে-ব্যাপারে কোনোরকম বিবেচনার পরিচয় দেবেন তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যেত না তাঁর ভেতর। শুধুমাত্র এই প্লেগের ভয়ে তিনি তাঁর চিরদিনের অভ্যাস পরিত্যাগ করবেন—তার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। আগের মতোই নিজের স্বভাবসুলভ মর্যাদার সঙ্গে এখনও হোটেলে এসে বসতেন ছেলেমেয়ে দুজনকে সামনে নিয়ে, ঠিক আগের মতোই বসতেন খাবার টেবিলে।

সহানুভূতির লেশ নাই এমনি উদাসীন কণ্ঠে সুন্দর কথায় তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে পরামর্শ দিতেন। শুধুমাত্র ছেলেটার চেহারায় যেন আগের থেকে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল। তার পরনে তার বোনের মতোই কালো পোশাক; কিন্তু চোখমুখ আগের চেয়ে বদলে যাওয়ায় তাকে দেখতে হয়েছিল তার বাবার এক নিখুঁত খুদে সংস্করণ। হোটেলের একদিন অথন সম্পর্কে বলেছিল—এই-যে ফিটফাট ভদ্রলোকটাকে দেখছেন, মরবার সময়ও উনি অমনি সাজপোশাক নিয়েই মরবেন। উনার ভাবখানা সেইরকমই! জামাজুতা পরে এখন তৈরি হয়ে আছেন, এখন শুধু ডাক আসলেই হয়। আবার যে-কেউ তাকে অন্য পোশাক পরাবে তার সুযোগ দেবেন না উনি।

ফাদার প্যানালুর ধর্মীয় বক্তৃতা সম্পর্কেও তারিউর কিছু কিছু মন্তব্য করার ছিল : এই ধরনের মাত্রাতিরিক্ত আবেগ প্রকাশের কারণ আমি অনুধাবন করতে পারি। ব্যাপারটা মোটেই বিরক্তিকর বলে মনে হয় না আমার কাছে। মহামারী যখন কোথাও শুরু হয় বা যখন তা উপশমের দিকে যায়, তখন এই ধরনের বাগ্মিতা প্রকাশের একটা প্রবণতা সবসময় দেখা যায়। মহামারীর শুরুতে এই প্রবণতার অর্থ হচ্ছে পুরোনো অভ্যাসগুলো তখন যায়নি। কিন্তু শেষের দিকে আবার যখন এই প্রবণতা দেখা দেয়, অনুমান করতে হবে যে আগের পুরোনো অভ্যাস সব ফিরে আসতে শুরু করছে। কারণ চরম বিপদের মধ্যে পড়লেই না মানুষ সত্যের মুখোমুখি হতে সাহস পায়। অর্থাৎ তখন সে মৌন হয়ে ওঠে। সুতরাং সবকিছুই নীরবে দেখে যাওয়া ছাড়া করার আর কিছু নেই আমাদের।

তারিউ তাঁর ডাইরিতে একথাও লিপিবদ্ধ করেন যে, ডাক্তার রিও-র সঙ্গে তাঁর একবার প্লেগের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু সেই আলোচনা সম্পর্কে তাঁর শুধু এইটুকু স্মরণ ছিল যে তার একটা সুফল পাওয়া গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি মাদাম রিও-র, ডাক্তার রিও-র মার চোখের বর্ণনা দিয়ে মন্তব্য করেন যে তাঁর চোখের মণি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, স্বচ্ছ হলুদ এবং তার সঙ্গে আরো একটা অদ্ভুত মন্তব্য যোগ করেন—যার চোখের দৃষ্টিতে এতখানি সহৃদয়তা প্রতিফলন ঘটতে পারে, প্লেগ যে তার কাছে পরাভব মানবে সেটা সুনিশ্চিত।

ডাক্তার রিও-র সেই হাপানির রোগী সম্পর্কেও তারিউ তার ডাইরিতে বিস্তারিত অনেককিছু লিপিবদ্ধ করেন। ডাক্তার রিও-র এবং তাঁর মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয়, তার অল্প কিছুদিন পরই তারিউ একদিন ডাক্তার রিও-র সঙ্গে এই রোগীর বাসায় বেড়াতে যান। তারিউকে অভ্যর্থনা জানাবার সময় লোকটি চোখেমুখে তাঁর চিরদিনের অভ্যাসমতো ফুর্তিতে তাঁর হাত দুখানা কচলাতে শুরু করেছিলেন। তারা দুজনে যখন তাঁর ঘরে গিয়ে ঢোকেন, বৃদ্ধ তখন তাঁর বিছানায় শুয়ে ছিলেন, বরাবর যেমন থাকে তার সামনে মটরদানা ভর্তি দুটো পাত্র, রাখা ছিল।—এই যে আরো একজন এসেছেন দেখছি, তারিউকে দেখে সে মন্তব্য করেছিল—পৃথিবীতে সবকিছুই যেন উলটপালট হয়ে গেছে দেখছি। এখন রোগীর চাইতে ডাক্তারের সংখ্যাই দেখছি বেশি। কারণ রোগী যারা তারা তো এখন দিনের-পর-দিন মরছে, তাই নয় কি! ধর্মযাজক সেদিন ঠিকই বলেছেন—

আমরা নিজেরাই তো এই অভিশাপ ডেকে এনেছি। পরের দিন কোনোরকম সংবাদ না দিয়েই তারিউ আবার গিয়ে দেখা করলেন এই হাঁপানি-রোগীর বাসায়।

তারিউ তার ডাইরিতে এই লোকটা সম্পর্কে যেসব বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তাতে দেখা যায়, এই বৃদ্ধ শুদ্ধব্রত্যের জীবনে যতটুকু পরিশ্রম করা প্রয়োজন, ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নেয়া যে একজন মানুষের জীবনে যতটুকু পরিশ্রম করা প্রয়োজন, ইতিমধ্যেই তা সেরে ফেলেছে। তারপর সেই-যে বিছানা নেয়, তা আর সে ছাড়ে না; আর সে যে হাঁপানি রোগের জন্যে এই অবসর জীবন শুরু করেছিল, মোটেই তা নয়। এই রোগ তার চলাফেরায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করত না। সামান্য একটা বাঁধা আয় তার ছিল, তারই সাহায্যে এতদিন সে নিজের খরচপত্র চালিয়ে এসেছে। এখন এই পঁচাত্তরের মতো বয়সেও তার আনন্দ-স্ফূর্তি আগের মতোই অম্লান ছিল। চোখের সামনে কোনো ঘড়ি দেখলে তার মেজাজ ঠিক থাকত না, সত্য বলতে কী, ঘড়ি বলতে কোনো জিনিস তার বাসায় দেখা যেত না। ঘড়িটা হচ্ছে—বৃদ্ধ তারিউর কাছে মন্তব্য করেছিলেন—মূর্খদের প্রয়োজনে, তার দামও তেমনি। তার নিজের সময়ের অর্থাৎ কখন তার খাবার সময়, সেটা সে হিসাব রাখত দুটো পাত্রে রাখা কিছু মটরদানার সাহায্যে। সকালবেলা সে ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই তার সামনে দুটো কড়াই রেখে দেওয়া হত, যার একটাতে মটরদানা ভর্তি। ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে সারাক্ষণ ভর্তি পাত্র থেকে একটা একটা করে মটরদানা তুলে খালি পাত্রটাতে রাখত সে। সবসময় খেয়াল রাখত হাত নাড়াবার গণ্ডির মধ্যে যেন কোনোরকম তারতম্য না হয়। এইভাবে দুটো পাত্র আর মটরদানার সাহায্যে সে সময় নির্ণয় করত, এমনকি প্রয়োজন হলে যে-কোনো মুহূর্তে সঠিক সময় সে বলে দিতে পারত। প্রথম পাত্র থেকে মটরদানা তুলে তুলে দ্বিতীয় পাত্রটা ভরা, তারপর দ্বিতীয় পাত্রটা থেকে নিয়ে প্রথম পাত্রটা ভরা—এইভাবে পরপর পনেরোবার ভরা শেষ হলে সাধারণত তার দুপুরের খাবার সময় উপস্থিত হয়। এর চেয়ে সহজ ব্যবস্থা আর কী চায়?

বৃদ্ধ লোকটার সারকথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে এটা সত্যি যে, খুব অল্পবয়স থেকেই ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবিকই কোনোদিনই ধৈর্যহীন কোনো ব্যাপারে তার খুব একটা আগ্রহ দেখা যেত না। সাধারণত কাজকর্ম, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা, কাজে বা রেস্তোরাঁয় খাওয়া, গান-বাজনা, মেয়েছেলের সঙ্গে বাইরে বেড়ানো; যাই হোক না, সবার প্রতিই তার দেখা যেত ভয়ংকর রকমের অনীহা। এমনকি নিজের জন্মস্থান ছেড়ে সামান্য কদিনের জন্যও যে বাইরে কোথাও যাওয়া, তা-ও সে করেনি জীবনে কোনোদিন। কোনো এক পারিবারিক ব্যাপারে শুধু একবার তাকে আলজিয়ার্সে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল এবং এই রাতটা তার কাছে ছিল একটা মস্ত দাবাতারের ব্যাপারের মতো। কিন্তু সেখানে যাওয়াও তার হয়ে ওঠেনি। ওরাও-এর পরেই যে স্টেশন, সেখানেই ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিলেন এবং পরের ট্রেনেই ওরাও-এ ফিরে এসেছিলেন।

মানুষের সাচ্ছন্দ্যহীনতার এইধরনের জীবনযাপন করা দেখে তারিউ বিস্ময় প্রকাশ করত—সে তার নিজের আচরণের সমর্থনে চলেছিল। ধর্মীয় মতে জীবনের প্রথম

ভাগটা হচ্ছে ওঠার, আর শেষটা পড়ার। জীবনে একবার যখন এই পড়া শুরু হয় তখন থেকে মানুষের কামনা করবার মতো আর কিছুই থাকে না। কারণ জীবনের শেষের যে দিনগুলি সেগুলো তো যে-কোনো সময় টুপ করে সরে যেতে পারে। এইরকম আশ্চর্য আয়ু নিয়ে সবসময় কী-বা এমন করতে পারে মানুষ! তার চেয়ে জীবনের এই সময়টা কিছু না-করে কাটিয়ে দেওয়াই ভালো। নিজের কথায় নিজেই সে প্রতিবাদ করছে, এ-ব্যাপারেও তার যেন কোনোরকম দ্বিধাবোধ ছিল না। কারণ কিছু পরেই সে তারিউকে বলেছিল যে, স্রষ্টা বলে কেউ নাই বোধ হয়। তাই যদি থাকত তাহলে ধর্মযাজকদের থাকার প্রয়োজন হত না। পরে উপলব্ধি করলেন যে, বৃদ্ধের এই বিশেষ জীবন-দর্শনের মূলে ছিল একধরনের বিরক্তি, শহরের যে-অঞ্চলে তার বাস সেখানে বিভিন্ন ধর্মযাজকদের প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে সাহায্যের জন্যে যে উৎপীড়ন করা হয়, তা থেকেই তার জন্ম। এই বিরক্তি বৃদ্ধ তারিউর কাছে তার নিজের একরাশ গোপন কামনার কথা প্রকাশ করে পরপর কয়েকবারই উল্লেখ করে যা তার সেই চেহারাটায় পরিষ্কার ধরা পড়ে যায়। অন্তরে অন্তরে সে কামনা করত যেন খুব বেশি বয়সে তার মৃত্যু হয়।

—সত্যি কি ভদ্রলোক অতিমাত্রায় পুণ্যবান মানুষ? তারিউ নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে। তারপর আবার নিজেই জবাব দেয় সে প্রশ্নের—শুধুমাত্র কতগুলো অভ্যাসের সমষ্টিকে যদি পুণ্যকাজের লক্ষণ বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে সে তাই।

ইতিমধ্যে তারিউ এই শহরের প্লেগ-আক্রান্ত কোনো-একদিনের জীবনযাত্রায় দীর্ঘ এক বর্ণনা রচনায় হাত দিয়েছিলেন। সেবারের গ্রীষ্মে শহরের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার এক নিখুঁত চিত্র দেখানোই ছিল তার উদ্দেশ্য। মাতালদের ছাড়া—এই মন্তব্য করেন—এখন আর এই শহরে বড় একটা কাউকে হাসতে দেখা যায় না। একবার মাতালরা যখন হাসতে শুরু করে তখন আর তাদের কোনোরকম মাত্রাজ্ঞান থাকে না। এই মন্তব্যের পরেই তিনি তাঁর আসল বর্ণনা শুরু করেন :

প্রত্যূষে রাস্তাঘাট তখন সম্পূর্ণ নির্জন, ঝিরঝিরে বাতাস বইছিল, বিশেষ করে এই সময়টায়, যখন তার হাতে যারা তার শিকার হয়েছিল তাদের পালা শেষ হয়ে গেছে, অথচ পরের দিন নতুন আবার যাদের মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হবে তাদের সময় ঠিক আসেনি—এই দুইয়ের মাঝখানে যে ফাঁক সেই সময়টায় প্লেগ যেন তার সংহারের কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকত। কঠিন পরিশ্রমের পর বুকভরে নিশ্বাস নিত। চারপাশের দোকানপাট তখন যেন বন্ধ। আর কিছুক্ষণ পরেই অন্যান্য দোকানগুলো খোলা হলেও সেসব দোকানের সামনে নোটিশ টাঙানো : 'প্লেগের জন্যে বন্ধ'। সেগুলো খোলার যে কোনো সম্ভাবনাই নাই তা এই নোটিশ থেকেই সুস্পষ্ট। তাদের চোখের পাতায় তখন পর্যন্ত ঘুমজড়ানো, তখন পর্যন্ত দৈনিক সংবাদ হাঁকতে শুরু করেনি। ভিক্ষুকরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে অধিক জায়গা নিয়ে আলস্যভরে শুয়ে পড়েছিল। ঘুমের ভিতর মানুষ যেমন হাঁটে, তেমনভাবে সংবাদপত্রের ঐ হকারেরাও ঘুমের ঘোরের মধ্যেই যেন তাদের হাতের কাগজ এগিয়ে দিচ্ছিল লাইটপোস্টের দিকে। খানিক পরে যেই শহরে ট্রাম-চলাচল শুরু হল, অমনি তারা ঘুম থেকে জেগে

উঠে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। মেলে ধরল হাতে সংবাদপত্র, যাতে বড় বড় স্পষ্ট অক্ষরে লেখা : প্লেগ! এবার হেমন্তেও কি প্লেগের উপদ্রব সইতে হবে? প্রফেসর রি. বললেন প্লেগের চুরানব্বইতম দিনের মৃত্যুসংখ্যা হচ্ছে ১২৪ জন।

বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে কাগজ না-থাকায় কিছুসংখ্যক পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা কম করে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন বটে, কিন্তু 'প্লেগ ক্রনিকল' নামে একটা নতুন পত্রিকাও এরই মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়েছিল প্লেগের প্রকোপ সত্যিই বাড়ছে, না কমছে, সে-সম্পর্কে শহরবাসীর কাছে নিষ্ঠার সহিত সঠিক সংবাদ পরিবেশন করা। রোগের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সবচে প্রাথমিক যেসব তথ্য পাওয়া যাবে, সেগুলো সবার কাছে সরবরাহ করা। রোগের বিস্তার রোধের জন্য সাহায্যের আদর্শ নিয়ে যারা এগিয়ে আসতে চান, তারা যে সামাজিক অবস্থার লোকই হোক-না কেন, তাদের এই সংবাদপত্রের কলম ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া জনসাধারণের মনে সাহস জোগায়। কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন যেসব নতুন নতুন নির্দেশ জারি করবেন সেগুলো ঠিকমতো ছাপানো এবং এই জরুরি অবস্থার মোকাবেলার জন্যে যারা সক্রিয় এবং আন্তরিক সাহায্য দিতে চান তাদের উদ্যোগ এবং চেষ্টাকে সংগঠিত করা এবং সঠিক পথে পরিচালিত করা। কার্যক্ষেত্রে, অল্প কিছুদিন পর থেকেই দেখা যেতে লাগল—এই পত্রিকায় দীর্ঘকাল জুড়ে বার হত শুধু প্লেগের অব্যর্থ প্রতিষেধক সম্পর্কে নানা বিজ্ঞাপন।

এসব দোকান খোলার ঘন্টাখানেক আগে থেকে তাদের সামনে মানুষ লাইন দিতে শুরু করেছিল। সকাল ছটার দিকে দেখা গেল হকাররা দৈনিক বিভিন্ন সংবাদপত্র তাদের কাছে বিক্রি করবার পর ট্রামভর্তি হয়ে তাদের কাছে বিভিন্ন শহর থেকে যেসব লোক এসে নামল তাদের কাছেও হকাররা কাগজ বিক্রি করল। এখন সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্যে ট্রামই শহরের একমাত্র বাহন। তাদের ফুটবোর্ডের ওপর যেমন সবসময় লোক দাঁড়িয়ে, তেমন হাতল ধরেও থোকায় থোকায় ঝুলছে। তার ফলে ট্রামগুলোর চলতে খুব কষ্ট হত। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে ট্রামের ভেতর প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জার পরস্পরের দিকে পেছন করে দাঁড়াবার চেষ্টা করত। কোনোরকমে তাদের দেহটা কুঁকড়ে বাঁকিয়ে হলেও ফিরে দাঁড়াত; অবশ্য এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সংক্রমণ; এভাবে ট্রাম যেই কোথাও থামাল অমনি তার গেটের ভেতর হতে অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ ঠেলে বার হয়ে আসত রাস্তার উপর। ট্রাম থেকে রাস্তায় বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই চেষ্টা করত এমন একটা স্থানে গিয়ে দাঁড়াতে, যাতে তার এবং নিকটতম ব্যক্তিটির মধ্যে একটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় থাকে।

প্রথমেই রাস্তায় বের হয়ে এসেছিল যে ট্রামগুলো, সেগুলো একে একে চলে যাবার পর শহর আস্তে আস্তে জাগ্রত হতে লাগল যেন। প্রত্যুষ থেকেই যেখানে খরিদ্দারের ভিড় হয় সেই ঘরগুলোর দরজা খুলে গেল। তাদের কাউন্টারের উপর দেখা গেল অসংখ্য রকমের কার্ড, কোনোটাতে লেখা : 'কফির ব্যবস্থা নেই'; কোনোটাতে : 'নিজের নিজের চিনি সঙ্গে আনবেন' এবং এই ধরনের আরও অনেক কিছু। এর পর থেকে খোলা শুরু হল বাকি দোকানপাট। শহরের রাস্তায় ইতিমধ্যেই প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে আলোর স্পর্শ

ছড়িয়ে পড়েছিল শহরের চারিদিকে। এবং এই সকাল থেকে আকাশের চেহারা হয়ে উঠল তামার মতো। এই সময়টায় সাধারণত যাদের হাতে কিছু করবার থাকে না তারা বাইরে বেরিয়ে আসে, বুলভার্দে গিয়ে ভিড় জমায়, তাদের অধিকাংশকে দেখলে মনে হয় যেন শুধুমাত্র বিলাস-ব্যসনের প্রাচুর্য দেখিয়েই তারা প্লেগকে পরাভূত করতে চায়। প্রতিদিন বেলা এগারোটার সময় মনে হয় যেন পোশাক-পরিচ্ছদের প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। যুদ্ধের পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে দলে দলে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে থাকে তরুণ ছেলেমেয়ের দল। মানুষের মধ্যে যে বাঁচবার একটা দুর্বার উন্নত আকাঙ্ক্ষা জাগে, এদের দিকে চাইলে তা কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। মহামারী যতই ছড়িয়ে পড়তে থাকে, মানুষের নৈতিক দুর্বলতাও ততোধিক প্রসার পেতে থাকে। মিলানের স্যাটারনালিয়ার যদি এখানে পুনরাবৃত্তি হয়, তাতেও বিস্মিত হবার কিছুই থাকে না। দেখা যাচ্ছে স্ত্রী-পুরুষ কবরের চারপাশে উন্মত্ত নৃত্যে মেতে উঠেছে।

দুপুরবেলা একঝলকে সমস্ত রেস্তোরাঁ ভরে যায়। যারা ভিতরে বসবার জায়গা পায় না, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। সূর্যের উত্তাপ যতই প্রখর হয়ে ওঠে আকাশের উজ্জ্বলতা ততই ম্লান হয়ে আসে। দুপুরের আহারের প্রত্যাশায় যারা আসে তারা সামনের শামিয়ানার তলায় দাঁড়ায়। আবার অনেকে বাঁধানো রাস্তার ধার বরাবর লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে যায়। দুপুরের খাড়া রোদে ঝলসাতে আর হাঁপাতে থাকে যেন। রেস্তোরাঁগুলোয় এত ভিড় হবার কারণ, অনেকেই দুপুরের খাবার ঝঞ্ঝাটটা এখান থেকেই সেরে ফেলতে চায়। কিন্তু রোগ-সংক্রমণের ভয় নিবারণের ব্যাপারে এগুলো তেমন কিছু সাহায্য করত বলেও মনে হয় না। কারণ যারা এখানে আহার করত তাদের অনেককেই দেখা যেত খাবার-প্লেট ঠিকমতো দেখেশুনে মুছে নিচ্ছে। এই তো কিছুদিন আগেও অনেক রেস্তোরাঁর সামনে নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল : 'এখানে প্লেট ছাড়া কাঁটাচামচ প্রত্যেকটা জিনিস বীজাণুমুক্ত করবার জন্যে নিয়মিত ধুইয়ে নেওয়া হয়।' কিন্তু এই ধরনের প্রচারণা কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। কারণ এমনিতেই প্রত্যেক রেস্তোরাঁয় যথেষ্ট লোকের ভিড় হত। তার ওপর লোকেরা এসময় টাকাপয়সা ব্যয় করত যেন মুক্তহস্তে। বাছাই-করা সেরা মদ আর তা না হলেও অন্তত সেরা মদ বলে ইতিমধ্যেই বাজারে চালু হয়েছিল যেগুলো, সবচেয়ে দামি চাট— এসবই তো চাইত সবাই, অর্থাৎ কোনোরকম চিন্তাভাবনা ছাড়া দেদার যথেষ্টভাবে পয়সাকড়ি খরচ করার একটা বেপরোয়া মনোভাব সবাইকে পেয়ে বসছিল যেন ক্রমেই। হঠাৎ একদিন এক রেস্তোরাঁয় লোকজন খুব আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, কারণ একজন লোক সেখানে কেমন একটু অস্বস্তিবোধ করতে থাকে, তার চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে, সে টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে যায়।

বেলা দুটোর কাছাকাছি সময় থেকে শহরের রাস্তাঘাটে সর্বত্র তখন শুধু যেন নিরবচ্ছিন্ন শান্ত সূর্যের আলোর ঝরনা, রাশি রাশি ধুলা আর প্লেগের অপ্রতিহত প্রকোপ এগুলোই চোখে পড়ে। দীর্ঘ অবসাদময় নশ্বর এই সময়গুলোয় মনে শুধু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধূসর অট্টালিকার সামনে দিয়ে অবিরাম উত্তাপের স্রোত বয়ে চলছে। এইভাবে দুপুর গড়িয়ে যায়। একাকার হয়ে মিশে যায় সন্ধ্যার প্রারম্ভের মাঝে, শহরের বিচিত্র

কলকাকলির ওপর লাল উজ্জ্বল আবরণের মতো নেমে আসে সন্ধ্যা। গ্রীষ্মের এই প্রখর উত্তাপ শুরু হয় যখন, তখন কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সন্ধ্যার সময়গুলোয় রাস্তাঘাট দেখা যেত সম্পূর্ণ জনশূন্য। কিন্তু এখন সন্ধ্যার শুরুতে যে মৃদু শীতল বাতাস বইতে শুরু হয়, সারাদিনের শ্রান্তির কিছুটা লাঘব হয়। যেন হয়তো-বা মনের ভেতর আশার সঞ্চার শুরু হয়। স্রোতের মতো বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকে মানুষ। বাইরে এসে তারা শুধুই বকতে থাকে। যেন বকতে বকতে তাদের নেশা ধরে যায় অথবা পরস্পরের সহিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যুক্তিতর্কে মেতে ওঠে, আবার হয়তো-বা প্রেম-বিনিময়ে তন্ময় হয়ে ডুবে যায়। চারদিকে অস্তগামী সূর্যের শেষ উজ্জ্বল লালিমায় পৌঁছলে সে আসে, তারই ভেতর থেকে মুখর যুগল-যুগল প্রেমিক-প্রেমিকার ভারে অবনত এই শহর যেন দাঁড়হীন নৌকার মতো সন্ধ্যার প্রাণবন্ত অন্ধকারের দিকে ভেসে চলে। মাথায় ফেল্টহ্যাট, বুকের ওপর দোদুল্যমান টাই, একজন উৎসাহী ধর্মপ্রচারক ভিড়ের মধ্য দিয়ে বৃথাই বেঁকে বেঁকে চলেছিলেন : 'ঈশ্বর মহান এবং... তারই কাছে আবার যেতে হবে আমাদের।' কিন্তু ভিড়ের ভিতরে বেশিরভাগ লোক তখন অধিক আগ্রহে ছুটে চলে অনেক তুচ্ছ এমন একটা-কিছু পাবার আশায়, যা সেই মুহূর্তে তাদের কাছে স্রষ্টার চেয়ে ঢের বেশি কামনার বস্তু।

গোড়ার দিকে যখন এই প্লেগকে শহরের অধিবাসীদের কাছে আর পাঁচটা সাধারণ দুর্বিপাকের মতোই মনে হত, তখন হয়তো তাদের ওপর ধর্মের প্রভাব কিছুটা খাটত। কিন্তু যখন থেকে শহরের অধিবাসীরা উপলব্ধি করল যে কঠিন বিপদ অপেক্ষা করছে তাদের সামনে, তখন তারা সম্পূর্ণ আনন্দ-ফূর্তির মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চাইল। দিনের আলোয় তাদের চোখেমুখে যে বীভৎস শঙ্কার ছায়া ফুটে উঠত, উজ্জ্বল শিখাদীপ্ত ধুলামলিন সন্ধ্যায় সেই শঙ্কা আবার রূপান্তরিত হত বিকারগ্রস্ত উল্লাসে। একটা বন্য উন্মাদতা যেন তাদের রক্তস্রোতে আগুন ধরিয়ে দিত এবং আমিও তাদেরই একজন, তাদের থেকে ভিন্ন কেউ নই। কিন্তু সত্যিকারের গুরুত্ব দেব কিসের ওপর—? মৃত্যু আমার মতো মানুষের জন্যে এমন কীই-বা। এটা এমন কিছু যার দ্বারা তাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়।

৭

তারিউ তার ডাইরিতে ডাক্তার রিও-র সঙ্গে যে সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেন তিনি নিজেই তার জন্য ডাক্তারের নিকট অনুরোধ জানিয়েছিলেন। দৈবক্রমে সেদিন সন্ধ্যায় তারিউ তার বাসায় পৌঁছবার ঠিক আগে ডাক্তার রিও কিছুক্ষণের জন্য তাঁর মা'র মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন। ডাক্তারের মা তখন খাবারঘরের এককোণে শান্তমনে বসেছিলেন। সেদিনও মা তারই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন কিনা সে-সম্পর্কে ডাক্তার রিও নিশ্চিত ছিলেন না। যাহোক তিনি বাসায় ফিরলেই সবসময় লক্ষ্য করতেন তার মার চেহারায় যেন একটা পরিবর্তন আসত। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম-ক্লান্ত জীবনযাপনের ফলে তার মার চেহারায় যে একটা শান্ত আত্মসমর্পণের ভাব ফুটে

উঠেছিল, তাকে কাছে পেলেই তা আবার আকর্ষক প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত। কিন্তু সেটা ক্ষণিকের ব্যাপার। পরমুহূর্তেই আবার তার সমাহিত ভাবের মধ্যে ফিরে যেতেন। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি বাইরে শূন্য রাস্তার দিকে চেয়ে ছিলেন। রাস্তায় আলোর লাইটপোস্ট থেকে আলোর উজ্জ্বল ছটা ছড়িয়ে পড়ছিল চারপাশের গভীর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে।

—প্লেগের উপশম না-হওয়া অবধি এমন কম আলো দেয়া হবে, তাই না? মাদাম রিও জিজ্ঞাসা করলেন।

—হ্যাঁ মা, মনে হয় তাই।

—এখন শীত পর্যন্ত এই অবস্থা চললেই হয়; তাহলে ভয়ংকর খারাপ লাগবে তখন।

—ঠিকই বলছ তুমি।

ডাক্তার রিও লক্ষ্য করলেন তাঁর মার দৃষ্টি এসে পড়ল তাঁর কপালের ওপর। তিনি জানতেন গত কয়েকদিনের অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং উৎকণ্ঠার ফলে তাঁর কপালে কুঞ্চন-রেখা দেখা দিয়েছে।

—আজকে দিনটা কেমন গেল? মা জিজ্ঞাসা করলেন।

—সেই একই অবস্থা।

একই অবস্থা বটে। এই একই রকম অবস্থার অর্থ হচ্ছে প্যারিস থেকে যে নতুন সিরাম এসে পৌঁছেছিল, পুরোনো সিরামের মতো কাজ দিচ্ছিল না এবং মৃত্যুর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছিল। যেসব পরিবারে ইতিমধ্যে প্লেগে আক্রান্ত, সেগুলো ছাড়া অন্য কোথাও যেয়ে টিকা দেওয়া হবে, তার আয়োজন করা তখন সম্ভব ছিল না। তাই সাধারণভাবে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে চাইলে প্রচুর সিরামের প্রয়োজন ছিল। প্লেগের রোগীর দেহের ফোকগুলো সহজে ফাটতে চাইত না। সময় পার হয়ে গেলে পাকা ফলের থোকা যেমন শক্ত হয়ে ওঠে এগুলোও ছিল অনেকটা তেমন। ফলে রোগীরা যন্ত্রণায় ভীষণ কষ্ট পেত।

মহামারী যে নতুন আর একটা রূপ নিচ্ছিল, সেদিন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তারই প্রমাণস্বরূপ দুটো রোগী পাওয়া যায়। প্লেগ থেকে তখন নিউমোনিয়া হওয়া শুরু হয়েছিল। ঠিক সেইদিনই সকালবেলা এক মিটিঙে পরিশ্রান্ত ডাক্তারের দল, মুখে মুখে চারিদিকে দ্রুত সংক্রামিত হতে না পারে, যেটা নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে হওয়া স্বাভাবিক, তার জন্যে নতুন কিছু আইনকানুন প্রবর্তনের জন্য প্রিফেক্টকে কিছুদিন থেকে ভীষণভাবে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। কিন্তু প্রিফেক্টের তখন যা অবস্থা তাতে মনে হয় অনেক আগেই তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। ডাক্তারদের পরামর্শমতো নতুন আইনকানুন তিনি কিছু কিছু প্রবর্তন করলেন বটে; কিন্তু আগে যেমন ঘটেছে, এগুলোও অনেকটা অন্ধকারে তীর মারার মতো হল।

ছেলেবেলায় তার দিকে নিবদ্ধ মায়ের বাদামি কোমল স্নেহাতুর চোখের দিকে চাইলে তিনি যে ভালোবাসা অনুভব করতেন, হঠাৎ এখন আবার মায়ের দিকে চেয়ে থাকলে স্মৃতির তলায় হারিয়ে যাওয়া সেই একই অনুভূতি তাঁর সারা অন্তরে ছাপিয়ে উঠল যেন।

—মা কি কোনো সময় ভয় পাও না?
—এই বয়সে আর ভয় পাবার মতো কিছু থাকে রে!
—এখনকার যা বড় দিন তার ওপর আমি তো প্রায় বাসায় ফেরবার অবসর পাইনে।
—তুই নিশ্চিত ফিরে আসবি জানা থাকলে আমার আর তখন অপেক্ষা করতে খারাপ লাগে না। আর যখন তুই সামনে আসিস তখন বাইরে কোথায় কী করছিস সেগুলোই মনে-মনে ভাববার চেষ্টা করি। আর কোনো খবর আছে?
—তার শেষের টেলিগ্রামটা যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে সবকিছু যেভাবে আশা করা হয়েছিল সেইভাবেই চলছে। জানো মা, আমি যাতে খুব বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে না পড়ি তারই জন্যে সে এসব লেখে।
বাইরের দরজায় বেল বেজে উঠল। ডাক্তার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে দরজা খোলার জন্যে এগিয়ে গেলেন। সিঁড়ির চাতালের উপর স্বল্প আলো। তারিউকে দেখাচ্ছিল ধূসর রঙের একটা প্রকাণ্ড ভল্লুকের মতো। রিও আগন্তুককে বসবার জন্যে তার সামনেই একখানা চেয়ার এগিয়ে চেয়ারের পাশেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তাদের দুজনের মাঝখানে রেখেছিল ঘরের ভিতরের একমাত্র আলো—একটা ডেস্ক ল্যাম্প।
তারিউ সোজাসুজি তার কথা পাড়লেন।
—আমার ধারণা, তারিউ বললেন—আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে কোনো আপত্তি নেই। ডাক্তার সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নাড়লেন।
—বড়জোর পনেরোদিন কি একমাস, তারিউ বলে চলেন—তারপর আর আমাদের করার মতো কিছু থাকবে না, কারণ তখন সবকিছুই নাগালের বাইরে চলে যাবে।
—আমি নিজেও তাই মনে করি।
—এখানে যে স্বাস্থ্য দফতরটা রয়েছে, তাদের ভালোভাবে দায়িত্ব পালনের মতো অবস্থা নেই মোটেই। সেখানে প্রয়োজনীয় লোকজন নেই, সেটাও একটা কথা; অথচ আপনাদের যা অবস্থা দেখছি, খাটনির চোটে কারো পা ছড়াবার শক্তি নেই।
ডাক্তার রিও স্বীকার করলেন, অবস্থা কতকটা সেইরকমই বটে।
—আচ্ছা, তারিউ বললেন—শুনছি নাকি বাধ্যতামূলকভাবে সকলকে দিয়ে এই কাজে সাহায্য করা যায় কিনা কর্তৃপক্ষ সেটা চিন্তা করছেন। সবল দেহের সব মানুষকেই নাকি মহামারী প্রতিরোধের কাজে সাহায্য করতে হবে।
—আপনি যা শুনেছেন তা স্থির করা হয়েছিল বটে; কিন্তু এমনিতেই সরকারের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব তেমন ভালো নয়, আর তাছাড়া প্রিফেক্ট নিজেও সবসময় মনস্থির করতে পারেন না। বাধ্যতামূলকভাবে কিছু করতে গেলে জনসাধারণ সেটাকে ভালো চোখে দেখবে না।
—এমন আশঙ্কা যদি সত্যিই থাকে, তাহলে স্বেচ্ছাকৃত সাহায্যের জন্যে নিশ্চয় তিনি সকলের কাছে আবেদন জানাতে যাবেন।
—সেটা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। কিন্তু তাতে তেমন সাড়া পাওয়া যায় না।
—সেটা সরকারি সংস্থার মাধ্যমে করা হয়েছিল এবং তাও তেমন আন্তরিকতার

সঙ্গে নয়। সরকারি সংস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে কল্পনাশক্তির অভাব। কোনো বিপদের মোকাবেলা করতে গেলে সরকারি কর্তৃপক্ষ সবসময়ই নিজেদের অক্ষমতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। মহামারীর সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে তারা যেসব প্রতিষেধক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেন, সেগুলো সাধারণ মহামারীর প্রকোপকে বাধা দেবার জন্যেও যথেষ্ট নয়। সুতরাং এইভাবে সবকিছু তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে রাখলে তারা যেমন মারা পড়বেন তেমনই আমরাও।
—সেরকম সম্ভাবনাটাই মনে হয় বেশি, ডাক্তার রিও বললেন—তবে আরও একটা ব্যাপার আপনাকে জানানো উচিত, সেগুলোকে জেলের সাধারণ কয়েদিদের দ্বারা করানো যায় কিনা সেটা এখন কর্তৃপক্ষ চিন্তা করছেন।
—আমার তো মনে হয় সাধারণ মানুষের ওপরই কাজের দায়িত্ব দেওয়া উচিত।
—আমার নিজের অভিমতও অবশ্য তাই। কিন্তু জানতে পারি কি, কেন আপনি এই ব্যবস্থাকে বেশি পছন্দ করেন? কোনো মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া যে আমি ঘৃণা করি।
ডাক্তার রিও তারিউর চোখের ওপর চোখ রাখলেন।
তাহলে—কী করতে চান আপনি এই অবস্থায়?
—আমার কিছু বক্তব্য আছে। যারা স্বেচ্ছায় এই কাজে সাহায্য করতে পারবে বলে এগিয়ে আসতে চায়, এমন কিছু সংখ্যক লোককে নিয়ে কয়েকটা দল গড়ে তোলার একটা প্ল্যান আমি ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করেছি। প্ল্যানটাকে যাতে কার্যকর করা যায় তারই উপযোগী ক্ষমতা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে। তার পরে আর সরকারি কর্মচারীদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চাই না আমরা। তাছাড়া এমনিতেই সরকারি কর্মচারীদের ওপর দায়িত্ব অনেক। নতুন কিছু করবার মতো অবকাশ কোথায় তাদের? সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের মধ্যে আমার প্রচুর বন্ধুবান্ধব আছে। তারাই ছোট আকারে এই প্ল্যানের কাজ শুরু করবেন। অবশ্য আমিও তাদের সঙ্গে থাকব।
—আমার পক্ষ থেকে সেটা আর হয়তো উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, ডাক্তার রিও বললেন—অত্যন্ত আগ্রহ এবং আনন্দের সঙ্গে আমি আপনার এই প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। আমার ওপর যে দায়িত্ব রয়েছে তাতে সাহায্য করবার জন্যে, বিশেষ করে বর্তমান অবস্থায় যে খুব বেশি লোককে পাব তেমন সম্ভাবনা নেই। কর্তৃপক্ষকে দিয়ে আপনার প্ল্যান অনুমোদন করিয়ে নেবার সমস্ত দায়িত্ব আমি নিলাম। তাছাড়া এই ব্যাপারে তারা যে অন্যকিছু ব্যবস্থা করবেন তেমন সুযোগ কোথায়।
—কিন্তু, ডাক্তার রিও কিছুক্ষণের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করলেন—কিন্তু একটা ব্যাপার নিশ্চয় আপনার অজানা নেই যে এই কাজে সাহায্য করবার জন্যে যারা এগিয়ে আসতে চান, তাদের নিজেদের জীবন বিপন্ন হবারও কিছুটা আশঙ্কা থাকে। সুতরাং আমার মনে হয় এ-প্রশ্নটা আগে থেকেই আপনার কাছে পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত: আপনি কি এই কাজের বিপদের সম্ভাবনা সত্যিই ভালোভাবে চিন্তা করে দেখেছেন?
ডাক্তার রিও-র তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে তারিউ তার ধূসর চোখের দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন।

—ফাদার প্যানালুর ধর্ম-উপদেশ আপনি নিশ্চয় শুনেছেন ডাক্তার। সে-সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

তারিউ যেমন অত্যন্ত সাধারণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন, ডাক্তার রিও-ও ঠিক তেমনি শান্ত গলায় জবাব দিলেন।

—আমি জীবনে যথেষ্ট হাসপাতালে ঘোরাফেরা করেছি, বহু কিছু দেখেছি। সুতরাং জ্বলন্তভাবে শান্তিদানের বিধান সম্পর্কে কোনো ধারণা যে আমি ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারব না সেটাই স্বাভাবিক। তবে কী, একটা ব্যাপার আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন যে যারা খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাস করে বলে মনে করে, তারা বাস্তবিকই কোনোরকম ভাবনাচিন্তা না-করেই এ-ধরনের কথাবার্তা বলে। তাদের সম্পর্কে যা ধারণা করা হয়, নিশ্চয়ই তারা তার চেয়ে অনেক ভালো মানুষ।

—যাই হোক, মনে হচ্ছে ফাদার প্যানালুর মতো আপনিও বিশ্বাস করেন যে, এই মহামারীর একটা কল্যাণকর দিক আছে : এর দ্বারা মানুষের দৃষ্টি উন্মোচিত হয়, মানুষ ভাবনাচিন্তা করতে বাধ্য হয়।

ডাক্তার রিও একটা আধৈর্যের ভাব দেখিয়ে মাথাটা নাড়তে লাগলেন।

—মানুষের দেহে যত রকমের রোগ জন্মায় তাদের সবার ক্ষেত্রেই তো এই একই কথা বলা চলে। পৃথিবীতে যা-কিছু অনিষ্টকর, অশুভ, তাদের সম্পর্কে যেটা সত্যি, প্লেগের বেলায়ও সেই একই জিনিস সত্যি, অনেক সময় এগুলো মানুষকে তার সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠতে প্রেরণা জোগায়; কিন্তু তা সত্ত্বেও প্লেগ মানুষের জন্যে যে-পরিমাণ কষ্ট, যে দুর্ভাগ বয়ে আনে, যদি কেউ পাগল অথবা কাপুরুষ অথবা সম্পূর্ণ অন্ধ না হয়, তাহলে সেগুলো চোখের ওপর দেখার পরও কোনোরকম প্রতিরোধের চেষ্টা না করে একে সৃষ্টির অনিবার্য বিধান বলে মেনে নিতে পারে।

এমন নয় যে, কথা বলার সময় ডাক্তার রিও উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। তবুও তারিউ এমনভাবে ইশারা করলেন, যেন তিনি ডাক্তারকে শান্ত হতে বললেন। তারিউ নিজেও কিন্তু এখন হাসছিলেন।

—এটা তো ঠিক, ডাক্তার রিও নিজের কাঁধ দুখানায় একবার ঝাঁকানি দিলেন—কিন্তু আপনি তো এখনও আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। আপনি যে-কাজে সাহায্য করবেন বলে এগিয়ে আসতে চাইছেন তার ঝুঁকি সম্পর্কে সত্যিই চিন্তা করছেন কি?

তারিউ তার কাঁধদুটোকে চেয়ারের পেছনে ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন। তারপর তার মাথাটাকে বাড়িয়ে দিলেন টেবিলের উপরের আলোর দিকে।

—আচ্ছা ডাক্তার, বলুন তো আপনি স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন?

এবারও তারিউ অত্যন্ত শান্ত সাধারণ গলায় ডাক্তারকে প্রশ্ন করলেন। কিন্তু এবার জবাব দেবার আগে ডাক্তার রিও যেন কিছুটা চিন্তা করলেন।

—হয়তো না, কিন্তু এ জবাবের সত্যিই কি কোনো তাৎপর্য আছে? ব্যক্তিগতভাবে যদি সত্যিই এ-প্রশ্নের জবাব দিতে হয় তাহলে বলব, এখনও অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি। কিছু-একটার নাগাল পাব বলে হয়তো প্রাণপণে চেষ্টাও করছি। প্রথমজীবনের সেই যে একটা সহজ বিশ্বাস...

—তাহলে দেখুন এখানেই হচ্ছে আপনার এবং ফাদার প্যানালুর মধ্যে পার্থক্য।

—সেখানেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ফাদার প্যানালু প্রচুর লেখাপড়া করেছেন, তিনি পণ্ডিত মানুষ, কিন্তু মৃত্যুকে প্রত্যক্ষভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছে তাঁর আর কতটুকু? তাই তিনি সত্য—খুব বড় অক্ষরের 'স' দিয়ে লেখা হয় যে সত্য—সম্পর্কে এতখানি দ্বিধাহীন নিশ্চয়তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন; কিন্তু গ্রামে বাস করেন যে ধর্মযাজক, গাঁয়ের প্রত্যেক লোকের সঙ্গে যার প্রতিদিনের যোগাযোগ, ওঠাবসা, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে চরম মুহূর্তেও যিনি তাদের সামান্য একটু শ্বসনের আশায় সংগ্রাম করতে দেখেন, তিনিও হয়তো আমারই মতো চিন্তা করবেন, বিশ্বাস করবেন। জীবনে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মহত্ত্ব কোথায় সেটা দেখাবার চেষ্টা না করে কীভাবে তাদের সেই দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া যায় সেটাই তিনি প্রথম চেষ্টা করবেন। ডাক্তার রিও এবার উঠে দাঁড়ালেন : তাঁর মুখ অন্ধকারের আড়ালে ঢাকা পড়ল।—এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা এখন থাক, তিনি বললেন—কারণ আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে চাইবেন না।

তারিউ তার চেয়ারে যেমন বসেছিলেন তেমনই বসে রইলেন। তাঁর চোখে হাসির ছটা।—ধরুন আপনার প্রশ্নের জবাবে আপনাকে যদি পাল্টা প্রশ্ন করি?

ডাক্তার রিও-র নিজের চোখেমুখে এবার হাসি ফুটে উঠল।

—সবসময় নিজেকে একটা রহস্যের আড়ালে রাখতে চান আপনি, তাই না? আচ্ছা শুরু করুন, আপনার কী প্রশ্ন করার আছে।

—আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, তারিউ বললেন—স্রষ্টার অস্তিত্ব যখন সত্য সত্য বিশ্বাস করেন, দুঃখী এবং অসহায় মানবতার প্রতি আবার আপনার অনুরক্তি দেখানোর কারণটা কী? মনে হচ্ছে আপনার কাছ থেকে সঠিক উত্তর পেলে আমার পক্ষে জওয়াব দেওয়াটা সহজ হবে।

ডাক্তার রিও-র মুখখানা তখনও অন্ধকারের আড়ালে ঢাকা ছিল। তিনি বললেন—তারিউর প্রশ্নের জবাব তিনি আগেই দিয়েছেন : সর্বশক্তিমান কোনো বিশ্বস্রষ্টার ওপর যদি তাঁর বিশ্বাস থাকে, তাহলে তিনি নিজে আর রোগীর পরিচর্যা নিয়ে অত উৎকণ্ঠা দেখাতেন না, পরম নির্ভরতায় সবকিছু সেই সর্বশক্তিমানের হাতে ছেড়ে দিতেন। কোনো মানুষেরই হয়তো এখন আর এই ধরনের কোনো স্রষ্টার ওপর বিশ্বাস নেই, এমনকি ফাদার প্যানালু, যার এইধরনের বিশ্বাস আছে বলে তার নিজের ধারণা, প্রকৃতপক্ষে তারই তা নেই। তার একটা মস্ত প্রমাণ পৃথিবীতে এখন আর কেউই নিয়তির ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে তার ওপর সবকিছু ছেড়ে দেয় না। যাহোক, সৃষ্টিকে তিনি যেভাবে পেয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে যেভাবে সংগ্রাম করে চলেছেন, তাতে ডাক্তার রিও-র ধারণা তিনি সঠিক পথেই চলেছেন।

—আচ্ছা, এখন বুঝলাম, তারিউ মন্তব্য করলেন—নিজের পেশা সম্পর্কে তাহলে আপনার এই ধারণা।

—কতকটা তা-ই ধরে নিতে পারেন। ডাক্তার রিও আবার আলোর পরিমণ্ডলের মধ্যে ফিরে আসলেন।

তারিউ তার ঠোঁটজোড়া একত্র করে শিস দেওয়ার মতো একটা শব্দ করলেন। ডাক্তার একদৃষ্টে তারিউর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

—এইতো আপনি ভাবছেন নিজের পেশা সম্পর্কে, যার এইরকম ধারণা তার অন্তরে নিশ্চয় গর্ববোধ আছে। কিন্তু একটা কথা আপনি নিশ্চিত জেনে রাখুন, শুধুমাত্র মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার জন্যে যেটুকু গর্ববোধ থাকার প্রয়োজন তার অতিরিক্ত কিছুই নেই আমার মধ্যে। আমার ভবিষ্যৎ যে কী বা এসব শান্ত হয়ে গেলে আমার জীবনে কী ঘটতে পারে সে-সম্পর্কে আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। এই মুহূর্তে আমি শুধু এইটুকু জানি : শহরে বহুলোক অসুস্থ এবং তাদের চিকিৎসার, সেবার প্রয়োজন। প্লেগের উপশম হয়ে যাবার পর তারা যেমন নিজেদের সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে দেখবে, আমিও হয়তো তাই করব। কিন্তু এখনকার জন্যে যেটা প্রয়োজন, তা হচ্ছে তাদের সুস্থ করে তোলা। তাদের রক্ষার জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা আমি করছি। আমার জন্যে সেটাই যথেষ্ট।

—কিন্তু কার হাত থেকে তাদের রক্ষা করছেন?

ডাক্তার রিও জানালার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। দূর দিগন্তে ছায়ার মতো যে একটা রেখা চোখে পড়ছিল সেটাই ছিল সমুদ্রের অস্তিত্বের স্বাক্ষর। ডাক্তার রিও অনুভব করলেন তিনি বড় পরিশ্রান্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও অনুভব করলেন যে তাঁর এই সঙ্গী একজন খামখেয়ালি মানুষ। হয়তো চিন্তাভাবনার হাত এড়িয়ে এবং কিছুটা নিজের হৃদয়ের ভার লাঘবের আকাঙ্ক্ষি আরও একটা আবেগের সঙ্গেও যেন তিনি ভেতরে ভেতরে সংগ্রাম করছিলেন।

—আমার কোনো ধারণাই ছিল না তারিউ, আমি নিশ্চয় করে বলছি এসব সম্পর্কে আমার সুস্পষ্ট তেমন কোনো ধারণাই ছিল না। যখন এই পেশায়ই এসেছিলাম,বলতে গেলে তখন কোনোরকম ভাবনাচিন্তাই করিনি। এসেছিলাম এই কারণে, মনে হচ্ছিল এই পেশার প্রতি আমার একটা আস্থা আছে। কারণ আরও পাঁচটা পেশার মতো এমন একটা পেশা, যাতে ঢোকার জন্যে তরুণ ছেলেমেয়েরা একসময় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। আরও একটা কারণ হয়তো, যেহেতু আমি শ্রমিকের ঘরে জন্মেছিলাম, এই পেশায় ঢোকাটা আমার জন্যে খুব কষ্টকর ছিল। আর তারপর, তারপর আমি অসংখ্য মানুষকে আমার চোখের ওপর মরতে দেখেছি। আপনি বিশ্বাস করবেন, পৃথিবীতে এমন বহু মানুষ আছে যারা কখনও মরতে চায় না। যখন তার নাভিশ্বাস উঠছে, এমন মুহূর্তেও আপনি কোনো স্ত্রীলোককে চিৎকার করতে শুনেছেন? না, কখনও না। কিন্তু আমি তা দেখেছি। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। আমি এসবের প্রতি যে নিজেকে কঠোর করে তুলব এমন মনোবল আমার সত্যিই নেই। আমার বয়স তখনও ছিল অত্যন্ত কাঁচা। তাই এইসব জিনিস দেখতে দেখতে আমার সমস্ত মন যেন সমগ্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠেছিল, অথবা এইভাবেই হয়তো আমি তখন এসব জিনিস চিন্তা করতাম। পরের দিকে অবশ্য এই উগ্র বিদ্রোহের মনোভাব কিছুটা কেটে যায়। আমার মন কিছুটা নরম হয়ে ওঠে। মানুষকে আমার চোখের সামনে মরতে দেখতে হবে, শুধু এই ব্যবস্থার সঙ্গে আমি কোনোদিনই নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলতে

পারিনি। আমার যা-কিছু জ্ঞান বা উপলব্ধি তা হচ্ছে এই-ই।

ডাক্তার রিও চেয়ারে এসে বসলেন, তাঁর মুখ শুকিয়ে আসছিল।

—হ্যাঁ, তবে কী? তারিউ আবার তাকে উৎসাহ করতে চাইলেন।

—তবে কী, ডাক্তার নিজেও আবার পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর আবার বললেন, ব্যাপার ছিল যা আপনাদের মতো লোক যারা, তারা সম্ভবত কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন। সমগ্র সৃষ্টিব্যবস্থা যখন এমনই, যেখানে সবকিছুর নিয়ন্ত্রা মৃত্যু, সুতরাং আমরা যদি তার অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে অস্বীকার করি এবং স্বর্গে যেখানে নীরবে বসে তিনি সবকিছু চেয়ে চেয়ে দেখছেন সেদিকে হাত তুলে তাঁর সাহায্য এবং করুণার জন্যে আবেদন না-জানিয়ে আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে মৃত্যুকেই পরাভূত করতে সংগ্রাম চালিয়ে যাই, সেটাই বরং স্রষ্টার জন্য ভালো নয় কি?

তারিউ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন, তা হয়তো ঠিক।—তবে কী, যেখানে আপনার বিজয় হত সে-বিজয় কোনোদিনই স্থায়ী হবার নয়।

ডাক্তার রিও-র মুখের ওপর কালো একটা রেখা পড়ল।

—হ্যাঁ আমি সে-ব্যাপারেও সচেতন, তবে শুধুমাত্র সেই কারণেই এই সংগ্রাম থেকে আমরা পিছিয়ে আসব, সেটা আমি মানতে রাজি নই।

—সেটা যে সত্যিই একটা সঙ্গত কারণ নয় তা আমিও স্বীকার করি। এক্ষণে আমি অনুধাবন করতে পারলাম এই প্লেগের মহামারীর আপনার কাছে তাৎপর্য কী!

—এটা আমার একটা নিরবচ্ছিন্ন পরাজয় বলে ধরে নিতে হবে।

তারিউ কয়েক মুহূর্তের জন্যে ডাক্তারের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে পা ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ডাক্তার রিও তাঁকে পেছনে পেছন অনুসরণ করলেন। দুজনে যখন প্রায় পাশাপাশি হয়েছেন, তারিউ মেঝের দিক থেকে চোখ তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন : এসব আপনাকে ভাবতে শেখাল কে ডাক্তার?

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের দিক থেকে উত্তর এল : জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট দেখেছি এবং সয়েছি। হয়তো তারই ফল।

ডাক্তার তার অস্ত্রোপচারের ঘরের দরজাটা খুলে দিলেন। তারিউকে বললেন তিনিও বাইরে যাবেন। শহরতলিতে তাঁকে একটা রোগী দেখতে যেতে হবে। তারিউ বললেন, তাহলে তারা দুজনেই একত্রে যেতে পারেন। ডাক্তার রিও সম্মত হলেন।

যাবার পথে হলঘরে মাদাম রিও-র সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ডাক্তার তারিউর সঙ্গে মা'র পরিচয়ও করিয়ে দিলেন।

—দ্যাখো মা, ইনি হচ্ছেন আমার একজন বন্ধু, ডাক্তার রিও বললেন।

—আচ্ছা, মাদাম রিও বললেন—তোমার সঙ্গে পরিচয়ে আমি খুব খুশি হলাম বাবা!

মাদাম রিও যখন চলে যাচ্ছিলেন, তারিউ অনেকক্ষণ ধরে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। চাতালে নেমে সিঁড়ির আলো জ্বেলে দেবার জন্যে সুইচ টিপলেন। কিন্তু সিঁড়িতে আলো এল না। সম্ভবত বিদ্যুৎ সংরক্ষণের নতুন কোনো ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছিল। কিছুদিন

থেকে দেখা যেত রাস্তায় যেমন, বাড়িতেও প্রায়ই মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক লাইট খারাপ হয়ে যায়। হয়তো এমনও হতে পারে যে শহরের আর সবার মতো গেটের দারোয়ানও তার কর্তব্যের প্রতি তেমন মনোযোগ দেয় না। এসব নিয়ে দীর্ঘ চিন্তাভাবনা করার মতো সময় ছিল না। পেছন থেকে তারিউর ডাক শুনতে পেলেন।

—হয়তো অর্থহীন শোনাবে তবু একটা কথা ডাক্তার, তারিউ বললেন—আপনার কথাগুলো মনে হয় ঠিক।

ডাক্তার নিজের কাঁধ দুখানায় সামান্য একটু ঝাঁকুনি দিলেন, অন্ধকারের ভিতর সেটা তারিউর চোখে পড়ল না।

—সত্যি কথা বলতে কী, এগুলো আমার ভাবনাচিন্তার কথা নয়। কিন্তু আপনার—আপনার কী ধারণা এসব সম্পর্কে?

—ও! তারিউ বললেন—আমার আর শেখার মতো কিছু নেই।

ডাক্তার চিন্তান্বিতভাবে হঠাৎ থামলেন। সিঁড়ির ওপর তারিউর পা পিছলে গেল। ডাক্তার কাঁধ ধরে তিনি কোনোপ্রকারে নিজেকে সামলে নিলেন।

—সত্যি তাহলে আপনার ধারণা, জীবন সম্পর্কে সবকিছু আপনার জানা?

অন্ধকারের ভেতর থেকে আবার সেই একই শান্ত এবং সুনিশ্চিত কণ্ঠের জবাব এল : হ্যাঁ, হয়তো তাই।

রাস্তায় নামার পর তাদের খেয়াল হল, ইতিমধ্যে বেশ রাত হয়েছে, এগারোটা বাজে বোধহয় তখন। একটা অস্পষ্ট খসখসে শব্দ ছাড়া শহরের চারিদিক মনে হচ্ছিল শান্ত। দূরে এ্যাম্বুলেন্সের ঘন্টার একটা ক্ষীণ ঝনঝন শব্দ শোনা যাচ্ছিল। দুজনে গাড়ির ভেতর গিয়ে বসলেন, ডাক্তার ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলেন।

—কাল অবশ্য অবশ্য একবার হাসপাতালে আসবেন, ডাক্তার বললেন—একটা ইনজেকশন দেব এই দুঃসাহসিক কাজে নামবার আগে। এর দ্বারা আপনার জীবন কতখানি বিপন্ন হতে পারে সেটা সময় থাকতেই জেনে রাখা ভালো। এর ভেতরে আপনার মৃত্যুর আশঙ্কা তিন আর বাঁচার আশঙ্কা মাত্র এক।

—আপনি যে-ধরনের হিসাব-নিকাশ করছেন সেটা যে সত্যি নয়, সেটা আপনি যেমন জানেন তেমন আমিও জানি। শ-খানেক বছর আগে একবার এক প্লেগের মহামারীতে পারস্যের এক শহরের সমস্ত লোক নির্মূল হয়ে যায় এবং শুধু একটা লোক শেষপর্যন্ত বেঁচেছিল। সেখানে এই যে একটা লোক সবার মৃত্যুর পরও বেঁচেছিল, তার কাজ ছিল প্লেগে যারা মারা যেত তাদের গোসল এবং দাফন করানো। শেষ লোকটার মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত সে এই একই কাজ করে যায়।

—সেখানেও মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল তিন এবং বাঁচার সম্ভাবনা ছিল এক। কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় শেষপর্যন্ত তার জয় হয়েছিল, এবার ডাক্তার রিও-র গলার স্বর আগের থেকে কিছু নিচে মনে হল—তবে কী, হয়তো আপনার কথাই ঠিক। এসব ব্যাপারে আমরা কতটুকুই বা জানি বা নিশ্চিত হতে পারি।

ইতিমধ্যে তাঁরা শহরতলির মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সামনে পড়ছিল হেডলাইটের আলোয় উজ্জ্বল শূন্য পরিত্যক্ত রাস্তা। ডাক্তার গাড়ি থামালেন। গাড়ির

সামনে দাঁড়িয়ে তারিউকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি তার সঙ্গে ভেতরে যেতে চান, না বাইরে সেখানেই অপেক্ষা করবেন। তারিউ বললেন—হ্যাঁ।

হঠাৎ আকাশ থেকে বিদ্যুতের ক্ষীণ একঝলক আলো এসে পড়ল তাঁদের মুখের ওপর। ডাক্তার ছোট করে একটু হাসলেন। তাঁর হাসির ভেতর যেন দৃঢ়তা প্রকাশ পেল।

—বলে ফেলুন তো দেখি একবার, ডাক্তার তারিউর দিকে চেয়ে বললেন—পৃথিবীতে এতকিছু থাকতে হঠাৎ এর মধ্যে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা পেলেন কী থেকে?

—সেটা হয়তো আমি নিজেও জানি না। আমি...আমি যেসব নৈতিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করি, সেগুলো হয়তো এই প্রেরণার উৎস।

—আপনি যেসব নৈতিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন, সেগুলো কি জানতে পারি?

—সেগুলো হয়তো আর কিছুই নয়, আমার নিজের উপলব্ধি করার শক্তি।

তারিউ সামনের বাসাটার দিকে এগিয়ে গেলেন। বৃদ্ধ হাঁপানি রোগীর ঘরে ঢোকার পর তবে ডাক্তার রিও তার মুখের চেহারা দেখতে পেলেন।

৮

পরের দিন থেকেই তারিউ তার নিজের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শুরু করে দিলেন ও তখনই যারা তাঁর সঙ্গে কাজে নামতে উৎসুক এমন কিছু সংখ্যক লোককে নিয়ে একটা দল গড়ে ফেললেন। পরে তাঁর পরিচালনায় আরও এইধরনের দল গড়ে উঠল।

যাহোক এই স্যানিটারি দলগুলোর যতটুকু পাওনা, তাদের তার অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এটা নিঃসন্দেহে সত্য,আমাদের শহরের অনেকেই এই দলগুলোর সেবার কাজ সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু বলার লোভ সংবরণ করতে পারবে না। কিন্তু কাহিনীকারের নিজের ধারণা, মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যেটা নিকৃষ্ট দিক, অপছন্দ হলেও তারই প্রতি প্রয়োজনে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা জানানো। কারণ এই মনোভাব থেকে এইটাই প্রমাণ হয় যে অপরের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি উপেক্ষা এবং মহানুভবতাবোধের অভাবে এইটাই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম; আর মহৎ কর্তব্যপরায়ণতার যে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে তাদের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম মাত্র। কাহিনীকার নিজে ঐ ধরনের কোনো মতবাদে বিশ্বাসী নন। পৃথিবীর সবকিছুর উৎস হচ্ছে মানুষের অজ্ঞতা, এবং ঈর্ষা ও হিংসার দ্বারা পৃথিবীতে যে-পরিমাণ অনিষ্ট সাধিত হয়, যদি সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি না থাকে, তাহলে যে-কোনো মহৎ উদ্দেশ্য থেকেও সেই একরকম ক্ষতিসাধন অসম্ভব নয়। সঠিকভাবে বিচার করলে মানুষ যে-পরিমাণ অসৎ, হয়তো তার চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণ সৎ; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সেটা বড় কথা নয়। আর তা ছাড়া এটা অত্যন্ত সত্যি যে মানুষ মাত্রেরই, অল্প হোক আর বেশি হোক, অজ্ঞতা আছে এবং তাকেই আমরা দোষগুণ আখ্যা দিয়ে থাকি। মানুষ যখন নিজেকে সর্বজ্ঞতার অধিকারী বলে কল্পনা করতে সাহসী হয় এবং তারই বলে অপরকে হত্যার অধিকার পর্যন্ত দাবি করতে দ্বিধাবোধ করে না, সেটাই হচ্ছে মানুষের এমন এক অজ্ঞতা। যে মানুষ ঘাতক, আর

দৃষ্টি অন্ধ, যেখানে দৃষ্টি বা জ্ঞানের কোনো সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা নেই, সেখানে সত্যিকারের কোনো শুভ বা ভালোবাসার প্রত্যাশা করা নিরর্থক।

সুতরাং এই-যে স্যানিটারি দলগুলো, যেগুলো গড়ে উঠছিল তারিউর একান্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, তাদের বিচার করতে গেলে যেমন নিরাসক্তি প্রয়োজন, তেমনি আবার তাদের কাজকর্ম অনুমোদন করবার মতো মনোভাব থাকারও দরকার। যে সাহসিকতা এবং কর্তব্যপরায়ণতার প্রতি তিনি আপেক্ষিক, ন্যায় এবং ন্যায়সঙ্গত গুরুত্ব দেবার পক্ষপাতী, সেই কারণেই তাদের সম্পর্কে আবেগময় ভাষায় অতিরঞ্জিত করে কিছু বলতেও তাঁর আপত্তি আছে। কিন্তু প্লেগের এই দুর্বিপাক সইতে হয়েছিল যাদের, আমাদের সেই শহরবাসীদের আর্ত এবং বিদ্রোহী হৃদয়ের কাহিনী তিনি এতদিন যেভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে এসেছেন, এখন ঠিক তদনুরূপই করে যাবেন।

এই স্যানিটারি স্কোয়াডে তারিউ যে-দলগুলো গড়ে তুলেছিলেন, তাদের পরবর্তীতে নামকরণ হয়েছিল তাই-ই। যারা ভর্তি হয়েছিল তারা যে সে-বিষয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তা নয়, কারণ তাদের সামনে অন্যকিছু করণীয় ছিল না। সুতরাং এ ঘটনায় তাঁরা যদি অন্যকিছুর প্রয়াস পেতেন; সেটাই বরং কিছুটা অভাবনীয়। এই স্কোয়াডগুলো আমাদের শহরবাসীদের এই দুর্যোগের মোকাবেলা করতে সাহায্য করেছিল এবং সেইসঙ্গে তাদের অন্তরে এই উপলব্ধিও জাগ্রত করেছিল যে প্লেগ যখন একবার তাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন তাকে পরাভূত করবার জন্য যা-কিছু করবার, সবটাই নির্ভর করছে তাদের নিজেদের ওপর। প্লেগ যখন এইভাবে তাদের কর্তব্যকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হল তখন সে তার আসল স্বরূপটা প্রকাশ করে ফেলল অর্থাৎ সে তখন সবার উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

এ পর্যন্ত মনে হয় সবই ঠিক ছিল। দুই-এ দুই-এ যে চার হয়, এটা শেখার জন্যে নিশ্চয় আমরা কোনো স্কুলশিক্ষকের প্রশংসা করিনে, কিন্তু তিনি যে প্রশংসালাভের যোগ্য এই পেশা নির্বাচন করেছেন তার জন্যে অবশ্য তিনি আমাদের কাছ থেকে প্রশংসা দাবি করতে পারবেন। সুতরাং এমন আমরা বলতে পারি তারিউ এবং তাঁর মতো আরো অনেকেই যে বিপত্তি অনেক কিছু না করে বরং দুই-এ দুই-এ চার হয়—সেটা প্রমাণ করেছিলেন, সেটা নিশ্চয় প্রশংসা পাবার যোগ্য। সেইসঙ্গে আবার এটাও বলা উচিত যে এই কাজের দ্বারা তাঁদের অন্তরের যে সদিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছিল সেই একই সদিচ্ছা প্রত্যেকটা স্কুলশিক্ষকের এবং স্কুলশিক্ষকের অনুভূতি আছে যাদের, তাদের সবার অন্তরে বর্তমান। এবং এটাও বিশ্বমানবতার জন্যে সমস্ত পরিবেশ ব্যাপারে যে এইরকম সদিচ্ছাপূর্ণ হৃদয়ের লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে, আমরা যা চিন্তা করে থাকি তার চেয়ে বহুগুণ অধিক; অন্তত কাহিনীকারের নিজের বিশ্বাস তাই। এটা হয়তো বলা নিষ্প্রয়োজন যে তাঁর এই যুক্তির জবাবে অপরের যে একটা বক্তব্য থাকতে পারে যে-সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। অনেকেই হয়তো বলতে পারেন যে, লোকগুলো বেহুদা তাদের জীবনকে বিপন্ন করবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বারবার মানুষের ইতিহাসে এমন ব্যাপার ঘটেছে যে দুই-এ দুই-এ যে চার হয় এটা প্রমাণ করবার জন্যে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে দ্বিধা

করেনি। স্কুলশিক্ষক মাত্রেই এটা অবগত এবং এই গাণিতিক সত্য প্রমাণ করতে যাওয়ার শাস্তি বা পুরস্কার যে কী সেটা জানাটাই বড় কথা নয়; বরং দুই-এ দুই-এ যে সত্যিই চার হয় সেটা জানাটাই আসল। আমাদের শহরবাসীদের মধ্যে যারা এই সংকটের ভিতর নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাদের সামনে বাস্তব বিষয় ছিল সত্যই শহরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে কিনা এবং তার প্রতিরোধের জন্য সংগ্রাম করাটা তাদের জন্যে অবশ্যকর্তব্য কিনা।

ঠিক এই সময় আমাদের শহরে একশ্রেণীর নীতিবাগীশ গজিয়ে উঠেছিল, যারা চারিদিকে প্রচার করে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছিল যে দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে করার কিছুই নেই—মেনে নেওয়া ছাড়া। তারিউ, ডাক্তার রিও এবং বন্ধুবান্ধবরা নিশ্চয় এই বিতর্কের একটা-না-একটা জবাব দিয়ে থাকবেন, কিন্তু সেই জবাবের সিদ্ধান্ত : একতাই হচ্ছে তাদের অটল মনোভাব। এই দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ তারা গড়ে তুলবেই তা সে যেমনই হোক এবং এই সংকটের কাছে কিছুতেই মাথা নোয়াবে না। তখনকার জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ ছিল যত অধিক লোককে সম্ভব আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করা এবং খুব বেশি লোককে যাতে নিজের নিজের প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে না হয়, তার উপযোগী ব্যবস্থা নেওয়া এবং তার জন্যে এখন একটা মাত্র উপায় ছিল : প্লেগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া। সুতরাং তখনকার তাদের এই-যে মনোভঙ্গি সেটা যে সত্যিই তেমন কিছু প্রশংসা পাবার মতো ছিল তা ঠিক নয়। তবে সেই অবস্থায় এটাই ছিল সঙ্গত মনোভাব।

সুতরাং এই অবস্থায় যেটা সবচেয়ে স্বাভাবিক সেটাই করতে উদ্যত হলেন ডাক্তার ক্যাসলও। আপাতত কাজ-চলার মতো যেসব যন্ত্রপাতি তিনি হাতের কাছে পেলেন তার সাহায্যে অটল বিশ্বাসে তিনি একের-পর-এক এজাবেই শহরে বসে সিরাম প্রস্তুত করে চললেন, নিজের প্রতি যে সামান্য যত্ন নেবেন সেদিকেও খেয়াল না করে। ডাক্তার রিও-ও তাঁরই মতো বিশ্বাস করতেন যে, সচনায় রোগবীজাণু থেকে যদি কোনোরকম টিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়, তা বাইরের অন্য যে-কোনো স্থান থেকে আমদানি-করা সিরামের চেয়ে অধিক দ্রুত ফলদায়ক হবে, কারণ স্থানীয় রোগের বীজাণু, দেখা যেত পাঠ্যপুস্তকে সাধারণ প্লেগের বীজাণুর যে যে বর্ণনা দেওয়া থাকে, তা থেকে কিছুটা ভিন্ন। ডাক্তার ক্যাসল এমনও আশা করেছিলেন যে আক্ষর্যজনক স্বল্পসময়ের ভেতর তিনি তার নিজের তৈরি টিকা বাজারে প্রথম সরবরাহের জন্যে প্রস্তুত করে ফেলতে পারবেন।

এবং এই একই স্বাভাবিক কারণে গ্রাঁদ, যার চালচলন বা চিন্তাভাবনার মধ্যে বীরপুরুষের কোনো লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যেত না, মহাউল্লাসের সঙ্গে স্যানিটারি স্কোয়াডগুলোর সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করতে এগিয়ে আসেন। তারিউ যে স্যানিটারি গ্রুপগুলো গড়ে তুলেছিলেন তাদের কয়েকটা শহরের ঘনবসতিপূর্ণ দ্বিঞ্জি এলাকাগুলোয় কাজ শুরু করে দিয়েছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল এইসব এলাকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কিছুটা উন্নতি সাধন করা। স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রতিটা গৃহে যাতে ঠিকভাবে পালন করা হয় সেগুলো তদারক করা এবং সরকারি স্বাস্থ্য

দফতরের তরফ থেকে তখনও পর্যন্ত যেসব চিলেকোঠা বা ভাঁড়ার রোগবীজাণু মুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়নি, তাদের তালিকা প্রস্তুত করা—এই ছিল তাদের প্রধান দায়িত্ব। অপর যেসব ভলান্টিয়ার দল ছিল তারা ডাক্তারদের সঙ্গে রোগীদের বাড়িতেও যেত এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের হাসপাতালে স্থানান্তরের কাজে সাহায্য করত। এমনকি, শেষের দিকে যথেষ্ট সংখ্যক ড্রাইভার না-থাকায় রোগী বা মৃত ব্যক্তিদের বয়ে নিয়ে যাওয়া হত যে ট্রেনে করে, সেই ট্রেনও চালাত তারাই। এসবের জন্য রেজিস্টার এবং পরিসংখ্যানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন গ্রাঁদ।

কাহিনীকারের ধারণা এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে যে শান্ত সাহসিকতা ছিল এই স্যানিটারি দলের প্রেরণার উৎস, তার সত্যিকারের প্রতিমূর্তি ছিলেন গ্রাঁদই, তারিউ বা ডাক্তার নন। যখন এই স্কোয়াডে যোগ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে, তখন মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করতে দেখা যায়নি তাঁকে। হ্যাঁ, এবং তাতে তাঁর হৃদয়ের বদান্যতাই দ্বিতীয় স্বভাবের মতো প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁকে যেন কিছুটা হালকা কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় এটাই ছিল শুধু তাঁর অনুরোধ। কারণ তাঁর বয়সে এত অধিক কাজ করাটা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রতিদিন সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত সময় তিনি এই কাজের জন্যে দিতে পারবেন বলেছিলেন। ডাক্তার রিও যখন তাঁকে উৎসাহের সঙ্গে ধন্যবাদ জানালেন, গ্রাঁদ তাতে বেশ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—কেন, এগুলো আর এমনই কী-বা শক্ত কাজ, প্লেগের এই মহামারী যখন আমাদের মাঝে এসেই গেছে তখন যেভাবেই হোক তাকে বাধা দিতে হবে। এটা তো খুবই সুস্পষ্ট। তবে কী, পৃথিবীতে সবকিছুই যদি এমন সহজ হত!

এর পরেই আবার তাঁর সেই বাক্যরচনার আলোচনা শুরু হত। কোনো কোনো দিন সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রস্তুত করা এবং পরিসংখ্যান রাখার কাজ সারা হয়ে যেত। গ্রাঁদ এবং ডাক্তার রিও দুজনে বসে সাধারণ গল্পগুজব করতেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তারিউকেও তাঁদের এই আলোচনায় সহচর করে নিলেন। এখন গ্রাঁদ যেন প্রতিদিনই অধিকতর আনন্দের সঙ্গে তাঁর এই দুই বন্ধুর কাছে জীবনের সুখ-দুঃখের গল্প করতে লাগলেন। চারপাশে এইরকম প্লেগের প্রকোপ আর তারই মাঝে গ্রাঁদ যে দুরূহ সাহিত্যকর্ম নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন, এখন যেন তাঁরা দুজনেও তাতে সত্যিকারের আগ্রহ দেখাতে শুরু করলেন। বাস্তবিকই সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর দেহমনকে বিশ্রাম দেবার জন্যে এটা তাঁদের কাছেও হয়ে দাঁড়িয়েছিল মস্ত একটা অবলম্বন।

—আপনার সেই অশ্বারোহী ভদ্রমহিলা কতদূর এগুলেন, বলেন শুনি। তারিউ হয়তো মাঝে মাঝে আমোদের সঙ্গে গ্রাঁদকে জিজ্ঞাসা করেন, আর প্রতিবারই গ্রাঁদ একটুখানি হাসি হেসে জবাব দেন—ঘোড়া-কদমে চলেছে। সত্যিই কদমে চলেছে ঘোড়া। একদিন সন্ধ্যায় গ্রাঁদ এসে ঘোষণা করলেন তাঁর অশ্বারোহী নায়িকার আগে 'মার্জিত' এই বিশেষণটাকে শেষপর্যন্ত তিনি বাদ দিয়ে ফেললেন, এখন থেকে তার জায়গায় 'তন্বী' এই শব্দটা ব্যবহার করবেন। এর দ্বারা তাঁর নায়িকার চিত্রটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে—তিনি বুঝিয়ে বললেন। এই নতুন বিশেষণ যোগ করে তিনি যে বাক্যরচনা করেছিলেন সেটাও তখনই তাঁর দুই বন্ধুকে পড়ে শোনালেন :

মে মাসের এক সুন্দর প্রত্যুষে অনেকেই এক তন্বী মহিলাকে একটি সুন্দর মাদি ঘোড়ায় চেপে বই দ্য বলন্যার পুষ্পিত লতাসজ্জিত রাস্তা ধরে যেতে দেখে থাকতে পারেন।

আপনারাই বলুন—এইভাবে বর্ণনায় সত্যি তার চিত্রটা আরও সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে, নাকি? 'মে মাসের' পরিবর্তে 'মে মাসের এক সুন্দর প্রত্যুষে' ব্যবহার করছি এই কারণে যে তাতে ঘোড়ার কদমে চলার সে-ধারণাটি, সেই ব্যঞ্জনাটি আরো সুস্পষ্ট হবে। অবশ্য আমি যা বলতে চাচ্ছি, সেটা আপনাদের কিছুটা অনুভব করতে হবে।

এরপর তিনি 'সুন্দর' এই বিশেষণটির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে নানা ভাবনাচিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন। তাঁর মতে এই বিশেষণটির অর্থ বহনের ক্ষমতা অত্যন্ত স্বল্প, তাঁর মানসচক্ষে যে একটা অতি মনোরম-দর্শন ঘোড়ার চিত্র ভাসছিল, সেটাকে যা ক্ষণিকের মধ্যে এবং সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবে এমন একটা বিশেষণের জন্যে মনে-মনে হাত বাড়াতে শুরু করলেন তিনি। মোটামুটি শব্দটা বেশকিছুটা বাস্তবঘেঁষা বটে; কিন্তু এটাও ঠিক উপযুক্ত নয়, কারণ এর দ্বারা যেন গুণের চেয়ে দোষের ভাগটা বেশি প্রকাশ পায়। আর তাছাড়া এর অর্থটা কেমন যেন একটু বেশি স্থূল। সুন্দরভাবে পালিত শব্দটার ওপর তাঁর সাময়িক লোভ জন্মেছিল। তবে কী, শব্দটা একটু ভার-ভার, এর দ্বারা বাক্যটার ছাঁচটা কেমন একটু হোঁচট খাওয়া হয়। তারপর একদিন সন্ধ্যায় বিরাট একটা বিজয়ের হাসি হেসে তিনি আকস্মিক ঘোষণা করলেন, 'হ্যাঁ, পেয়ে গেছি এবার', 'কালো পাটল জাতের মাদি ঘোড়া'—তাঁর ধারণা গ্রাঁদ তাঁদের বুঝিয়ে বললেন, কালো শব্দটা ব্যবহার করার ফলে একদিকে যেমন মার্জিত এবং সুশ্রী এই দুটো গুণের ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট হয়েছে, তেমনি আবার দৈহিক স্বাস্থ্যের ইঙ্গিতও আছে এর ভেতরে।

—এই শব্দ ব্যবহারটা বোধহয় আপনার ঠিক হল না। ডাক্তার রিও বললেন।

—কেন, ঠিক হল না কেন বলছেন?

—কারণ পাটল বলতে তো আর কোনো বিশেষ জাতের ঘোড়াকে বোঝায় না, ওটা শুধু একটা রঙ মাত্র।

—কোন রঙ?

—সেটা ঠিক কালো না হয়ে অন্য যে-কোনো রঙ মনে করেন।

গ্রাঁদ যেন আবার মহাসমস্যার মধ্যে পড়ে গেলেন।

—অনেক ধন্যবাদ, গ্রাঁদ পুনরায় উৎসাহের সঙ্গে বললেন—আপনারা যে আমাকে এইভাবে সাহায্য করছেন সেটা তো আমার কিছুটা সৌভাগ্যই বলতে হবে। তবে লক্ষ্য করেছেন তো কাজটা বড় কঠিন।

—আচ্ছা 'মসৃণ' শব্দটা ব্যবহার করলে কেমন হয়? তারিউ ইঙ্গিত করলেন।

চিন্তাবিদ গ্রাঁদ আবার গভীর দৃষ্টিতে তারিউর দিকে চেয়ে রইলেন—হ্যাঁ, সত্যিই এবার চমৎকার হবে। তার দুই ঠোঁটের ফাঁকে আবার হাসি ফুটে উঠল।

আবার কিছুদিন পরে গ্রাঁদ হঠাৎ এসে বললেন, 'পুষ্পিত' এই শব্দটার সঠিক ব্যবহার নিয়ে তিনি সত্যিই বড় চিন্তায় পড়ে গেছেন। শহরের মধ্যে শুধুমাত্র ওরাঁ আর মনটেলিমার তাঁর নিজের চোখে দেখা; সুতরাং জানতে চাইছেন বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে। তিনি প্রায়ই জানতে চাইতেন বই দ্য বলন্যার রাস্তাঘাট দেখতে কেমন,

সেখানে কী কী ফুল পাওয়া যায় এবং সেগুলো নিয়ে সেখানকার লোকে করেই বা কী? প্রকৃতপক্ষে তাঁরা যে সেখানে রাস্তার দুপাশে সত্যিই কোনো পুষ্পের শোভা দেখেছেন তা তারিউ বা ডাক্তার রিও কেউই ঠিকভাবে স্মরণ করতে পারলেন না। কিন্তু গ্রাঁদ যেরকম দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন তাতে তাঁদের নিজেদের ধারণা কতখানি সঠিক তা নিয়ে তাঁদের দুজনেরই মনে সন্দেহ জাগল। তাঁদের দুজনেরই একরকম অনিশ্চিত ধারণা দেখে গ্রাঁদ গভীর বিস্ময় প্রকাশ করলেন। শেষপর্যন্ত তিনি মন্তব্য করলেন : সত্যিই! শিল্প ছাড়া আর কেউই দেখছি দৃষ্টির ব্যবহার জানে না।

আরও কয়েকদিন পরে এক সন্ধ্যায় ডাক্তার রিও লক্ষ করলেন, গ্রাঁদ ভীষণ একটা মানসিক উত্তেজনার মধ্যে রয়েছেন। পুষ্পশোভিত-এর জায়গায় নতুন শব্দ বেছে নিয়েছেন পুষ্পবিছানো। নিজের হাত দুখানা ঘষতে ঘষতে গ্রাঁদ বললেন—হ্যাঁ, এবার দেখুন তো ছবিটা কেমন চোখের ওপর ভাসছে। ফুলের গন্ধ পর্যন্ত নাকে ঢুকছে যেন। এবার টুপি খুলে অভিবাদন জানান দেখি আপনারা আমাকে মস্ত বিজয়ীর ভঙ্গিতে।

তিনি আবার নতুন করে যে বাক্য রচনা করেছেন সেটা পড়ে শোনাতে লাগলেন :

'মে মাসের এক প্রভাতে অনেকেই এক তন্বী তরুণীকে মসৃণ পাটল রঙের এক মাদি ঘোড়ায় চেপে বই দা বলনার পুষ্পবিছানো পথ ধরে অগ্রসর হতে দেখে থাকবেন।

কিন্তু সজোরে পড়বার সময় প্রায় একই ধরনের কয়েকটা অক্ষর বারবার উচ্চারণ করতে গিয়ে তাদের শব্দ তাঁর কানে যেন কেমন বিশ্রী শোনাতে লাগল, গ্রাঁদ বারেবারে হোঁচট খেতে থাকলেন, তাঁর কথা যেন ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে বসে পড়লেন তিনি। পরে ডাক্তার রিও-র কাছ থেকে বাসায় ফেরার অনুমতি চাইলেন। তাকে এখন অনেক ভাবনাচিন্তা করতে হবে।

এই সময় বরাবর, পরে অবশ্য প্রকাশ পেয়েছিল ব্যাপারটা—অফিসের কাজ করার প্রতিও তাঁর কিছু কিছু অমনোযোগিতা প্রকাশ পেত। অফিসে নিজের দায়িত্বের প্রতি তাঁর এই অবহেলা গুরুতর অপরাধ হিসাবে দেখা হয়। কারণ সেই সময় মিউনিসিপ্যাল অফিসকে শুধু অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে বিরাট কাজের চাপের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হত তাই নয়, প্রায় প্রতিদিনই তখন নতুন নতুন দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হত তাদের ওপর। গ্রাঁদের ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম মোটেই এগুচ্ছিল না। একদিন ডিপার্টমেন্টের প্রধান তাকে ডেকে উচ্চস্বরে ধমকালেন। বললেন—তাঁকে বেতন দেওয়া হয় তাঁর ওপর যেসব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলো মনোযোগ দিয়ে পালন করবেন বলে। কিন্তু তাঁকে দিয়ে ডিপার্টমেন্টের কোনো কাজই হচ্ছে না এখন আর। আমি শুনছি আপনি স্যানিটারি স্কোয়াডে ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করছেন। যেহেতু অফিসের ছুটির পর আপনি এসব করেন; সুতরাং তাতে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু এইরকম ভীষণ একটা দুর্যোগের সময় আপনি যদি সত্যি কিছু সাহায্য করতে চান তাহলে আপনার উচিত হবে নিজের অফিসে আপনার যেটুকু দায়িত্ব সেটা যথাসম্ভব ভালোভাবে পালন করুন। না হলে আপনার অন্য সব মহৎ চেষ্টা বিফলে যাবে।

—উনি উচিত কথা বলেছেন, গ্রাঁদ বললেন।

—হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক, ডাক্তার রিও-ও সম্মতি জানালেন।

—কিন্তু আমিও কিছুতেই আমার চিন্তাগুলোকে ঠিকভাবে গোছাতে পারছিনে। বাক্যটিকে যে কীভাবে শেষ করব তাই নিয়েই আমার এখন যত চিন্তা, কিছুতেই যেন কোনো সমাধান বার করতে পারছিনে।

বাক্যটার ভেতর উচ্চবর্ণের প্রাচুর্য তখনও তাঁর কানে বাজছিল, কিন্তু দুর্বল প্রতিশব্দ ব্যবহার না করে যে তার কোনোরকম পরিমার্জনা করবেন তারও উপায় দেখছিলেন না। তার ওপর 'পুষ্পবিছানো' শব্দটাকে প্রথম পাওয়ার পর মনে-মনে যেমন উপযুক্ত বোধ করছিলেন এখন যেন আর তেমন পছন্দসই বলে মনে হচ্ছিল না তাঁর। সেখানে রাস্তার দুধারে সম্ভবত সারি সারি ফুলের গাছ লাগানো হয়েছিল অথবা আপনা থেকেই সেগুলো সেইভাবে জন্মেছিল বলে তাঁর অনুমান। সেখানে আবার 'পুষ্পবিছানো' শব্দটাকে ব্যবহার করবেনই বা কীভাবে। বাস্তবিকই কোনো কোনো সন্ধ্যায় তাকে ডাক্তার রিও-র চেয়েও ক্লান্ত মনে হত।

এই-যে একটা ব্যর্থ অন্বেষা, যাকে তিনি মুহূর্তের জন্যেও মন থেকে সরিয়ে রাখতে পারতেন না, তা সত্যিই যেন গ্রাঁদকে ক্রমেই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও দুর্বল করে ফেলছিল। তা সত্ত্বেও স্যানিটারি স্কোয়াডের জন্যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা, অফিসের হিসাবপত্র ঠিক রাখা, এ-কাজগুলো তিনি নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মৃত্যুর সংখ্যা সর্বশেষ কত দাঁড়াল প্রতিদিন তা যোগ দিয়ে দেখতেন, সেগুলোকে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করতেন এবং কীভাবে সেগুলোকে সবচেয়ে সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায়, তা নিয়েও দীর্ঘ সময় ধরে মাথা ঘামাতেন। প্রায়ই দেখা যেত কোনো-না-কোনো হাসপাতালে তিনি ডাক্তার রিও-র কাছে গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং সেখানে অফিসে বা অন্য কোথাও তাঁর জন্য একটা টেবিলের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য বলতেন। মিউনিসিপ্যাল অফিসে তাঁর নিজের টেবিলে যেভাবে বসে কাজ করতেন এখানেও ঠিক সেইভাবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে টেবিলে বসে যেতেন। লেখার পর তাদের কালি শুকিয়ে নেবার জন্য প্রত্যেকটা কাগজের শিট তিনি শূন্যে গরম বাতাসে ধরে নাড়তে থাকতেন, যে বাতাস তখন হয়তো রোগবীজাণু-নাশক ঔষধের গন্ধে অথবা রোগের বীজাণুতে ভারী হয়ে থাকত। এই সময়গুলোয় অন্ততপক্ষে তিনি তাঁর অশ্বারোহী নায়িকার চিন্তা থেকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখার জন্যে সততার সঙ্গে চেষ্টা করতেন।

যাদের নায়ক বলে আখ্যায়িত করা যায় এমন শ্রেণীর লোককে যে সাধারণ মানুষ দৃষ্টান্ত হিসাবে তাদের সামনে দেখতে চায়, এটাই যদি সত্যি হয় এবং এই আখ্যায়িকার একজন নায়ক থাকাটাও যদি একান্ত আবশ্যক বলে মনে হয়, তাহলে কাহিনীকার তার জন্য অবশ্য তাঁর নিজের দৃষ্টিতে যা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত তা পাঠকসম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত করতে চান অতি নগণ্য এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত এই ব্যক্তিকে। যাঁর গুণাবলির মধ্যে ছিল হৃদয়ের কিছুটা সদিচ্ছা এবং যাঁর সামনে ছিল এমন এক আদর্শ, আপাতদৃষ্টিতে যাকে হাস্যকর বলেই মনে হয়। কারণ এর দ্বারা সত্যকে সত্যের মর্যাদা দেয়া হবে। প্রমাণ হবে যে দুই এবং দুই-এর যোগফল সব সময় চারই হয়। আর বীরত্ব সুখের ঠিক পরেই, কখনই তার আগে নয়, কারণ প্রথম স্থানটা সবসময় সুখেরই। ন্যায্য দাবি তার সঙ্গত স্থান অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থান এবং এর

সেখানে কী কী ফুল পাওয়া যায় এবং সেগুলো নিয়ে সেখানকার লোকে করেই বা কী? প্রকৃতপক্ষে তাঁরা যে সেখানে রাস্তার দুপাশে সত্যিই কোনো পুষ্পের শোভা দেখেছেন তা তর্কিতে বা ডাক্তার রিও কেউই ঠিকভাবে স্মরণ করতে পারলেন না। কিন্তু গ্রাঁদ যেরকম দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন তাতে তাঁদের নিজেদের ধারণা কতখানি সঠিক তা নিয়ে তাঁদের দুজনেরই মনে সন্দেহ জাগল। তাঁদের দুজনেরই একরকম অনিশ্চিত ধারণা দেখে গ্রাঁদ গভীর বিস্ময় প্রকাশ করলেন। শেষপর্যন্ত তিনি মন্তব্য করলেন: সত্যিই! শিল্প ছাড়া আর কেউই দেখছি দৃষ্টির ব্যবহার জানে না।

তারও কয়েকদিন পরে এক সন্ধ্যায় ডাক্তার রিও লক্ষ্য করলেন, গ্রাঁদ ভীষণ একটা মানসিক উত্তেজনার মধ্যে রয়েছেন। পুষ্পশোভিত-এর জায়গায় নতুন শব্দ বেছে নিয়েছেন পুষ্পবিছানো। নিজের হাত দুখানা ঘষতে ঘষতে গ্রাঁদ বললেন—হ্যাঁ, এবার দেখুন তো ছবিটা কেমন চোখের ওপর ভাসছে। ফুলের গন্ধ পর্যন্ত নাকে ঢুকছে যেন। এবার টুপি খুলে অভিবাদন জানান দেখি আপনারা আমাকে মস্ত বিজয়ীর ভঙ্গিতে।

তিনি আবার নতুন করে যে বাক্য রচনা করেছেন সেটা পড়ে শোনাতে লাগলেন:

মে মাসের এক প্রভাতে অনেকেই এক ছন্দী তরুণীকে মসৃণ পাটল রঙের এক মাদি ঘোড়ায় চেপে বই দ বুলোনের পুষ্পবিছানো পথ ধরে অগ্রসর হতে দেখে থাকবেন।

কিন্তু সজোরে পড়বার সময় প্রায় একই ধরনের কয়েকটা অক্ষর বারবার উচ্চারণ করতে গিয়ে তাদের শব্দ তাঁর কানে যেন কেমন বিশ্রী শোনাতে লাগল, গ্রাঁদ বারেবারে হোঁচট খেতে থাকলেন, তাঁর কথা যেন ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে বসে পড়লেন তিনি। পরে ডাক্তার রিও-র কাছ থেকে বাসায় ফেরার অনুমতি চাইলেন। তাকে এখন অনেক ভাবনাচিন্তা করতে হবে।

এই সময় বরাবর, পরে অবশ্য প্রকাশ পেয়েছিল ব্যাপারটা—অফিসের কাজ করার প্রতিও তাঁর কিছু কিছু অমনোযোগিতা প্রকাশ পেত। অফিসে নিজের দায়িত্বের প্রতি তাঁর এই অবহেলা গুরুতর অপরাধ হিসাবে দেখা হয়। কারণ সেই সময় মিউনিসিপ্যাল অফিসকে শুধু অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে বিরাট কাজের চাপের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হত তাই না, প্রায় প্রতিদিনই তখন নতুন নতুন দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হত তাদের ওপর। গ্রাঁদের ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম মোটেই এগুচ্ছিল না। একদিন ডিপার্টমেন্টের প্রধান তাকে ডেকে তীক্ষ্ণভাবে ধমকালেন। বললেন—তাঁকে বেতন দেওয়া হয় তাঁর ওপর যেসব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলো মনোযোগ দিয়ে পালন করবেন বলে। কিন্তু তাঁকে দিয়ে ডিপার্টমেন্টের কোনো কাজই হচ্ছে না এখন আর। আমি শুনছি আপনি স্যানিটারি স্কোয়াডে ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করছেন। যেহেতু অফিসের ছুটির পর আপনি এসব করেন, সুতরাং তাতে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু এইরকম ভীষণ একটা দুর্যোগের সময় আপনি যদি সত্যি কিছু সাহায্য করতে চান তাহলে আপনার উচিত হবে নিজের অফিসে আপনার যেটুকু দায়িত্ব সেটা যথাসম্ভব ভালোভাবে পালন করুন। না হলে আপনার অন্য সব মহৎ চেষ্টা বিফলে যাবে।

—উনি উচিত কথা বলেছেন, গ্রাঁদ বললেন।

—হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক, ডাক্তার রিও-ও সম্মতি জানালেন।

—কিন্তু আমিও কিছুতেই আমার চিন্তাগুলোকে ঠিকভাবে গোছাতে পারছিনে। বাক্যটিকে যে কীভাবে শেষ করব তাই নিয়েই আমার এখন যত চিন্তা, কিছুতেই যেন কোনো সমাধান বার করতে পারছিনে।

বাক্যটার ভেতর উষ্মবর্ণের প্রাচুর্য তখনও তাঁর কানে বাজছিল, কিন্তু দুর্বল প্রতিশব্দ ব্যবহার না করে যে তার কোনোরকম পরিমার্জনা করবেন তারও উপায় দেখছিলেন না। তার ওপর 'পুষ্পবিছানো' শব্দটাকে প্রথম পাওয়ার পর মনে-মনে যেমন উৎফুল্ল বোধ করছিলেন এখন যেন আর তেমন পছন্দসই বলে মনে হচ্ছিল না তাঁর। সেখানে রাস্তার দুধারে সম্ভবত সারি সারি ফুলের গাছ লাগানো হয়েছিল অথবা আপনা থেকেই সেগুলো সেইভাবে জন্মেছিল বলে তাঁর অনুমান। সেখানে আবার 'পুষ্পবিছানো' শব্দটাকে ব্যবহার করবেনই বা কীভাবে। বাস্তবিকই কোনো কোনো সন্ধ্যায় তাকে ডাক্তার রিও-র চেয়েও ক্লান্ত মনে হত।

এই-যে একটা ব্যর্থ অন্বেষা, যাকে তিনি মুহূর্তের জন্যেও মন থেকে সরিয়ে রাখতে পারতেন না, তা সত্যিই যেন গ্রাঁদকে ক্রমেই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও দুর্বল করে ফেলছিল। তা সত্ত্বেও স্যানিটারি স্কোয়াডের জন্যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা, অফিসের হিসাবপত্র ঠিক রাখা, এ-কাজগুলো তিনি নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মৃত্যুর সংখ্যা সর্বশেষ কত দাঁড়াল প্রতিদিন তা যোগ দিয়ে দেখতেন, সেগুলোকে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করতেন এবং কীভাবে সেগুলোকে সবচেয়ে সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায়, তা নিয়েও দীর্ঘ সময় ধরে মাথা ঘামাতেন। প্রায়ই দেখা যেত কোনো-না-কোনো হাসপাতালে তিনি ডাক্তার রিও-র কাছে গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং সেখানে অফিসে বা অন্য কোথাও তাঁর জন্য একটা টেবিলের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য বলতেন। মিউনিসিপ্যাল অফিসে তাঁর নিজের টেবিলে যেভাবে বসে কাজ করতেন এখানেও ঠিক সেইভাবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে টেবিলে বসে যেতেন। লেখার পর তাদের কালি শুকিয়ে নেবার জন্য প্রত্যেকটা কাগজের শিট তিনি শূন্যে গরম বাতাসে ধরে নাড়তে থাকতেন, যে বাতাস তখন হয়তো রোগবীজাণু-নাশক ঔষধের গন্ধে অথবা রোগের বীজাণুতে ভারী হয়ে থাকত। এই সময়গুলোয় অন্ততপক্ষে তিনি তাঁর অশ্বারোহী নায়িকার চিন্তা থেকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখার জন্যে সততার সঙ্গে চেষ্টা করতেন।

যাদের নায়ক বলে আখ্যায়িত করা যায় এমন শ্রেণীর লোককে যে সাধারণ মানুষ দৃষ্টান্ত হিসাবে তাদের সামনে দেখতে চায়, এটাই যদি সত্যি হয় এবং এই আখ্যায়িকার একজন নায়ক থাকাটাও যদি একান্ত আবশ্যক বলে মনে হয়, তাহলে কাহিনীকার তার জন্য অবশ্য তাঁর নিজের দৃষ্টিতে যা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত তা পাঠকসম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত করতে চান অতি নগণ্য এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত এই ব্যক্তিকে। যাঁর গুণাবলির মধ্যে ছিল হৃদয়ের কিছুটা সদিচ্ছা এবং যাঁর সামনে ছিল এমন এক আদর্শ, আপাতদৃষ্টিতে যাকে হাস্যকর বলেই মনে হয়। কারণ এর দ্বারা সত্যকে সত্যের মর্যাদা দেয়া হবে। প্রমাণ হবে যে দুই এবং দুই-এর যোগফল সব সময় চারই হয়। আর বীরত্ব সুখের ঠিক পরেই, কখনই তার আগে নয়, কারণ প্রথম স্থানটা সবসময় সুখেরই। ন্যায্য দাবি তার সঙ্গত স্থান অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থান এবং এর

ছাড়া এই ঘটনাপঞ্জিও তার উদ্দিষ্ট আখ্যায়িকার চরিত্রের অনুরূপ। অর্থাৎ সে অনুভূতির বাহ্যদৃষ্টিতে যেমন দূষণীয় নয়, তেমন আবার সাধারণ অভিনীত নাটকের ভেতর যে বিশ্রী একরকমের অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা দেখা যায় সেই দোষ থেকেও মুক্ত।

প্লেগ-উপদ্রুত এই শহরের অধিবাসীদের জন্যে বাইরের পৃথিবী থেকে যেমন বাণী এবং উৎসাহ সৃষ্টির অভিনন্দন পাঠানো হত, সেগুলো যখন তিনি কাগজে পড়তেন বা বেতারে ঘোষণা করতে শোনা যেত, সেই সময়গুলোয় অন্তত ডাক্তার রিও-র মনে এইরকম একটা ধারণা জন্মাত। ট্রেনে বা স্থলপথে পাঠানো সান্ত্বনার বাণী ছাড়াও সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ বা রেডিও থেকে প্রচারিত বক্তৃতা মারফত এই বিচ্ছিন্ন শহরে বহু সহানুভূতিসূচক এবং প্রশংসাসূচক মন্তব্য প্রচারিত হত। মহাকাব্য অথবা সুষ্ঠু বক্তৃতা রচনার ভঙ্গিতে তাতে যেমন অর্থহীন শব্দ ব্যবহার করা হত সেগুলো ডাক্তার রিও-র কানে যেন একধরনের বিশ্রী আওয়াজের মতো শোনাত। বলাবাহুল্য, এই সহানুভূতিবোধ যে অকৃত্রিম এবং স্বতঃসিদ্ধ, সে চেতনতা যে ডাক্তার রিও-র ছিল না তেমন নয়। কিন্তু যা ব্যক্তিমানুষকে বিশ্বমানবতার সঙ্গে একাত্ম করে দিতে পারে তা প্রকাশের চেষ্টা করে মানুষ যে সাধারণ প্রচলিত ভাষায়, এই সহানুভূতিও মনে হয় সেই একই ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করাটা সঙ্গত ছিল। যদিও এ হচ্ছে সেই ভাষা যা গ্রাঁদের দৈনন্দিন ক্ষুদ্র সাহিত্যপ্রচেষ্টার জন্যেও মনে হত সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত; যার, এই প্লেগের অবস্থার মধ্যেও তিনি যে আদর্শের জন্যে সংগ্রাম করে যাচ্ছিলেন, তাকে রূপ দেবার মতো ক্ষমতাটুকুও ছিল না। যে সামান্য কয়েক ঘণ্টা সময় তিনি নিদ্রা যেতেন, তার ঠিক আগে, মাঝরাতে গভীর নিদ্রামগ্ন সমস্ত শহর যখন থমথমে শান্ত, ডাক্তার রিও কোনো-কোনো দিন হয়তো রেডিওটা খুলে দিতেন। স্থল এবং সমুদ্র পেরিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরের পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে সদিচ্ছাপ্রণোদিত কোনো কোনো ডাক্তারের সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসত যেন। শহরের অধিবাসীদের এই আর্ত অবস্থার জন্যে সমবেদনা জানাবার চেষ্টা করছে হয়তো কেউ, হয়তো সফলও হত অনেকে। কিন্তু স্বচক্ষে না দেখলে শত চেষ্টাতেও যে অপরের দুঃখ-কষ্টের অংশভোগী হওয়া সম্ভব নয়, সেটাই প্রমাণ হত এইসব চেষ্টা থেকে।

ওরাও! ওরাও! বৃথাই সমুদ্রপার থেকে চিৎকার এবং বৃথাই ডাক্তার রিও-র আশান্বিতভাবে তাতে কান দেবার চেষ্টা। বাক্যস্রোত যতই দ্রুত বইতে থাকত, ততই সুস্পষ্ট হয়ে উঠত যে গ্রাঁদ এবং সমুদ্রপারের এই ডাক্তারের ভেতরের যে ব্যবধান তার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা সত্যিই অসম্ভব।—ওরাও এবং তার অধিবাসীবৃন্দ আমরাও আপনাদের সহযাত্রী। আমরাও আপনাদের সঙ্গেই আছি।—আবেগময় কণ্ঠের চিৎকার শোনা যেত। ডাক্তার তখন মনে-মনে নিজেকে বলতেন, একসঙ্গে থাকে ঠিকই, তবে সত্যিকারের ভালোবাসার জন্যে বা একত্রে মরবার জন্যে নয়। কিন্তু একত্রে থাকার অর্থ একমাত্র তাই। আসলে সত্যিই তারা আমাদের থেকে অনেক দূরে।

৯

এবং, প্রায়ই যেন ঘটতে দেখা যায় এই অবস্থা সম্পর্কীয় পূর্বের যা-কিছু ঘটনা অর্থাৎ যে-সময়টায় প্লেগ প্রস্তুত হচ্ছিল তার সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার এবং তাকে বিধ্বস্ত করে ফেলবার জন্যে, সেই সময়কার লিপিবদ্ধ করবার মতো যা-কিছু ঘটনা তা হচ্ছিল র‍্যাঁবেয়ার এবং তারই মতো অল্পকিছু সংখ্যক একরোখা লোক, যারা কিছুতেই প্লেগের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে চায়নি। তাদেরই এক দীর্ঘ, হৃদয়বিদারক এবং একঘেয়ে সংগ্রাম, তাদের সে সংগ্রাম ছিল নিজেদের হৃত সুখকে প্লেগের কবল থেকে ছিনিয়ে আনার জন্যে। নিজের সত্তার সে-অংশকে তারা সর্বস্ব দিয়েও রক্ষা করতে প্রস্তুত। প্লেগ যাতে তার ওপর তার লোলুপ থাবা বসাতে না পারে, তা থেকে তাদের রক্ষা করার জন্যে যে সীমাবদ্ধতা ক্রমেই তাদের ওপর চেপে বসছিল, তাকে ঠেকিয়ে রাখবার এটাই ছিল তাদের সামনে একমাত্র পন্থা। তারিউ এবং তার সহকর্মীরা যে বৃহত্তর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তার কোনো সক্রিয় গুণাবলি হয়তো এই প্রতিরোধ-সংগ্রামের ছিল না। তবুও অন্তত কাহিনীকারের নিজের দৃষ্টিকোণেরও একটা নিজস্ব তাৎপর্য ছিল। মানুষের নিজের সম্পর্কে গর্ববোধেরও যে একটা হিতকরী প্রভাব থাকতে পারে, শত ব্যর্থতা এবং অসংলগ্নতা সত্ত্বেও এই প্রতিরোধ-সংগ্রাম ছিল তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

র‍্যাঁবেয়ার চেয়েছিলেন তিনি কিছুতেই প্লেগের কাছে পরাজয় মানবেন না, এবং তাঁর সংগ্রামও ছিল একান্তভাবে তারই জন্যে। যখন থেকে তিনি নিশ্চিত বুঝতে পারেন যে আইনসঙ্গত উপায়ে শহরের বাইরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না, তখনই স্থির করে ফেললেন যে ভিন্ন উপায়ে এবার চেষ্টা করতে হবে তাঁকে। ডাক্তার রিওকে তিনি তাই বলেছিলেন। তিনি প্রথমেই যোগাযোগ করলেন শহরের বিভিন্ন কফিখানার ওয়েটারদের সঙ্গে, যদি তাদের কাছে থেকে এ-সম্পর্কে কোনো সূত্র পাওয়া যায়। প্রতি বড় শহরেই সাধারণের দৃষ্টির আড়ালে কোথায় কী ঘটছে-না-ঘটছে প্রায় ক্ষেত্রেই কফিখানার ওয়েটাররা সেগুলোর খবর রাখে। কিন্তু প্রথমেই যার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হল, পালাবার চেষ্টা করলে যে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে সেটাই সে শুধু তাকে জানাল। পরে আর এক কাফেতে গিয়ে কিছু খোঁজখবর নিতে চেষ্টা করতেই সেখানে তারা তাঁকে শত্রুর চর ভেবে বসল এবং হাঁকিয়ে বের করে দিল। ডাক্তার রিও-র বাড়িতে কটার্ডদের সঙ্গে আকস্মিক যেদিন তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তার আগে পর্যন্ত তিনি তেমন কিছু করে উঠতে পারেননি। তাঁর ব্যাপারে সরকারি কর্তৃপক্ষকে আগ্রহশীল করে তুলতে যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে পড়েছেন, তাই নিয়েই ডাক্তার রিও-র সঙ্গে তিনি আলোচনা করছিলেন, এমন সময় কটার্ড এসে তাদের কথাবার্তার কিছু কিছু শুনলেন।

তার আরও কিছুদিন পরে কটার্ডের সঙ্গে আবার একদিন রাস্তায় আকস্মিক দেখা হতেই খুব-একটা সদিচ্ছার ভাব এবং উৎসাহের সঙ্গে কটার্ড র‍্যাঁবেয়ারকে অভ্যর্থনা জানালেন। অবশ্য কটার্ড এখন কারো সঙ্গে দেখা হলে অনুরূপ আলোচনাই করতেন।

—আরে র‍্যাঁবেয়ার দেখছি। এখনও কিছুই করতে পারেননি মনে হচ্ছে।

—না, কিছুই করতে পারলাম না।

—দেখুন ঐ লাল-ফিতা কারবারিদের পেছনে দৌড়ে কোনো লাভ নেই। ওরা শত চেষ্টা করলেও আপনার ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না।

—সেটা আর আপনি বলবেন কেন, আমি নিজেই বুঝছি এবং সেইজন্যেই ভিন্ন পথ ধরার চেষ্টায় আছি। কিন্তু দেখছি সত্যিই বড় কঠিন কাজ।

—হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক, কটার্ড বললেন, তবে কী...?

এ-ব্যাপারে কিছু করবার মতো উপায় কটার্ড জানতেন। তিনি তা বুঝিয়ে বললেন। র‍্যাঁবেয়ার শুনে কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করলেন। কিছুদিন থেকে একটার-পর-একটা শহরের বিভিন্ন কাফেতে ঢুঁ মেরে বেড়ানোই হয়েছে কটার্ডের একমাত্র অন্যতম কাজ। এর ফলে বেশকিছু সংখ্যক লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও হয়েছে তাঁর। তাদের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন, যেখান থেকে এ-ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, এইরকম একটা সংস্থা নাকি শহরে আছে। প্রকৃত ব্যাপারটা ছিল এই যে, কটার্ড বেশ কিছুদিন থেকে আয়ের অধিক ব্যয়বহুল জীবনযাপন শুরু করছিলেন এবং শহরে যেসব দ্রব্যের রেশনিং ছিল সেইসব জিনিসের দুঃসাহসিক কাজে নিযুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। নিষিদ্ধ সিগারেট এবং নিকৃষ্ট মানের মদ উচ্চমূল্যে বিক্রয় করে ছোট আকারে হলেও নিজের জন্যে কিছুটা টাকাপয়সার সংস্থান তিনি ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন।

—আপনি সত্যিই নিশ্চিত কিছু খবর দিতে পারেন? র‍্যাঁবেয়ার জিজ্ঞাসা করলেন।

—অবশ্যই। সেদিনও এরকম একটা প্রস্তাব এসেছিল আমার কাছে।

—কিন্তু আপনি আর তাতে সম্মত হননি।

—দেখুন এ-ব্যাপারে পরস্পরকে সন্দেহ করে লাভ নেই, কটার্ডের গলার স্বর যেন আগের চেয়ে বন্ধুত্বভাবাপন্ন বলে মনে হল—আমি এর ভেতর যেতে চাইনি এইজন্যে যে আমার নিজের এই শহর ছেড়ে যাবার কোনো ইচ্ছে নেই। কেন যেতে চাইনে তারও অবশ্য কারণ আছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর র‍্যাঁবেয়ারকে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—কিন্তু সেই কারণগুলো যে কী তা তো জানতে চাইলেন না।

—আমি মনে করলাম, র‍্যাঁবেয়ার উত্তরে বললেন—যেগুলো আপনার নিজের ব্যাপার তাতে আমার আগ্রহ দেখানো উচিত হবে না।

—একদিক থেকে তা অবশ্য কিছুটা সত্যি বটে। কিন্তু বিচার করবার আরো একটা দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে। ধরুন, সেটাকে যদি আমি এইভাবে বলতে চাই : প্লেগ যেদিন থেকে এখানে জেঁকে বসেছে, সেদিন থেকে দেখছি আমি অনেক ভালো আছি।

র‍্যাঁবেয়ার কটার্ডের একথার ওপর কোনোরকম মন্তব্য করলেন না। তিনি শুধু প্রশ্ন করলেন—আপনি যে-সংস্থার কথা বলছিলেন তার সাথে যোগাযোগ করবার পথটা কী?

—ও, সেটা জানতে চান, কটার্ড বললেন—সেটা অবশ্য খুব সহজ নয়...। আচ্ছা, আসুন দেখি আমার সঙ্গে।

তখন বিকেল চারটা। মাথার উপর গুমোট আকাশ, অসহ্য গরম পড়ছিল। মনে হচ্ছিল সবকিছুই এমনই তেতে উঠছে যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটতে থাকবে। রাস্তার ওপর কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন ছিল না। দোকানগুলোর সামনে পর্দা টানানো। দুপাশের

দোকানের সারির মধ্য দিয়ে ছায়াঘেরা যে রাস্তা তা ধরে বেশ কিছুদূর নীরবে হেঁটে পার হলেন কটার্ড ও র‍্যাঁবেয়ার। দিনের এটা এমন একটা সময়, প্লেগ যখন বলতে গেলে তার পরাক্রম হারিয়ে ফেলত। চারদিকে তখনকার যে শান্ত নীরবতা; বর্ণ এবং গতির যে অবলুপ্তি চোখে পড়ছিল তা যেমন প্রখর সূর্যের কিরণের জন্যে, তেমন আবার মহামারীর জন্যেও বটে। চারিদিকের বাতাস যে ভারী হয়ে উঠেছিল তা কোনো অদৃশ্য ত্রাসের জন্য, না কেবলমাত্র ধুলাবালির জন্যে তা সঠিকভাবে বলা শক্ত ছিল।

প্লেগের প্রকোপ যে সত্যিই তখন শহরে ছিল সেটা উপলব্ধি করতে গেলেও সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা এবং গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন ছিল। কারণ প্লেগ এখন তার উপস্থিতিকে প্রত্যক্ষ করে তুলত অভাবসূচক কতকগুলো লক্ষণ দ্বারা।

কটার্ড, যার সঙ্গে প্লেগের কিছুটা মিতালির সম্পর্ক ছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, তিনি একত্রে পথ চলার সময় রাস্তায় যে কোথাও একটাও কুকুর চোখে পড়ছে না, আকস্মিক সেদিকে র‍্যাঁবেয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কেননা স্বাভাবিক সময়ে সত্যিই এসব মুহূর্তে সাধারণত কুকুরগুলোকে দেখা যেত দরজার সামনে ক্লান্তভাবে গড়াচ্ছে, লম্বা জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে। বাস্তবে কোথাও যার অস্তিত্ব নেই এমনি একটুখানি শীতল আশ্রয়ের জন্য এদিক-ওদিক চাইছে।

দুজনে এবার বুলভার্দে দ্য পালামিয়ায় সামনের দিকে এগিয়ে চললেন, প্যালেস দা আর্মসকে পেছনে ফেলে আরো কিছু হাঁটবার পর ডকইয়ার্ডের দিকে মোড় নিলেন। বাম হাতে পড়ল সবুজ-রং-করা একটা কাফে, যার সামনে কর্কশ হলুদ রঙের শামিয়ানা টাঙানো, একেবারে রাস্তার ধার অবধি এসে ঝুলে পড়েছিল সেই শামিয়ানা। ভেতরে ঢুকে কটার্ড এবং র‍্যাঁবেয়ার নিজের নিজের কপালের ঘাম মুছে ফেলেন। ভেতরে আশেপাশে কয়েকখানা টেবিল সাজানো, সেগুলোও সবুজ-রং-করা আর কয়েকখানা ভাঁজ-করা চেয়ার। ঘরের ভেতর কোনো লোকজন ছিল না। চারিদিকে মাছি ভনভন করছিল। যে দিকটায়ই মদ বিক্রি হয়, সেখানে কাউন্টারের উপর একটা তোতাপাখি বসেছিল—ডানাগুলো দুপাশে ঝুলে-পড়া। ঘরের শোভা বর্ধনের জন্যেই হয়তো পাশের দেওয়ালে টাঙানো ছিল মলিন মাকড়সার জালে ঢাকা যুদ্ধক্ষেত্রের বাঁধানো কতকগুলি পুরোনো ছবি। প্রত্যেকটা টেবিলে, এমনকি র‍্যাঁবেয়ার যেটার সামনে বসেছিল, পাখির শুকনো বিষ্ঠা ছড়ানো। র‍্যাঁবেয়ার ভাবছিলেন এগুলো আসল কোথা থেকে। এমন সময় দেখতে পেলেন সুন্দর একটা মোরগ, ঘরের এক অন্ধকার কোণে তার আশ্রয় থেকে বার হয়ে ডানা ঝাপটিয়ে লাফাতে লাফাতে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

ঠিক এই সময়টায় উত্তাপ যেন আকস্মিক কয়েক ডিগ্রি চড়ল। কটার্ড কোটটা গা থেকে খুলে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেললেন। টেবিলের ওপর কয়েকবার জোরে জোরে ঘা দিলেন। দেখতে দেখতে পেছনের দরজাটা খুলে, গলা অবধি নীল অ্যাপ্রনে ঢাকা একজন লোক বেরিয়ে আসল। তার দৈহিক গঠন বেশ খর্ব, প্রায় চিৎকারের স্বরে কটার্ডকে অভিবাদন জানাল সে। তারপর সজোরে একটা লাথি মেরে মোরগটাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তার গলার ভারী আওয়াজে মোরগটার ক্রুদ্ধ কক কক আস্ফালন পর্যন্ত চাপা পড়ে গেল। তাঁরা

কী চান জানতে চাইল লোকটা। কর্টার্ড সাদা মদের অর্ডার দিয়ে জানতে চাইলেন—গ্রাসিয়া কোথায়? ছোটখাটো লোকটা উত্তরে জানাল যে গত কয়েকদিন যাবত গ্রাসিয়াকে কাফেতে দেখা যায়নি।

—আজ সন্ধ্যায় আসবে বলে মনে হয়?

—তা কী করে বলব। সে কি তার সব গোপন কথা আমাকে জানায়? আপনিই তো বরং ভালো জানেন সে কখন আসবে বা আসবে না, তাই না?

—তা তো বুঝলাম, এক্ষুনি তার সঙ্গে যে কোনো জরুরি কাজ আছে তা ঠিক নয়; আমার এই বন্ধুর সঙ্গে শুধু তার পরিচয় করিয়ে দিতে চাইছিলাম।

মদ-বিক্রেতা ভদ্রলোক পাশে বসে তার ভিজা হাত দুখানা পরনের এ্যাপ্রনের ওপর মুছল।

—আচ্ছা বুঝলাম, এই ভদ্রলোকও তাহলে আপনাদের মতো ব্যবসা করেন?

—হ্যাঁ, কর্টার্ড সংক্ষেপে জওয়াব দিলেন।

খাটো লোকটা তার নাকের অদ্ভুত একটা শব্দ করল।

—দেখা যাক সন্ধ্যার দিকে একবার আসবেন। বাচ্চাছেলেটাকে তার খোঁজে পাঠাব।

কাফে থেকে বার হয়ে আসবার পর র‍্যাঁবেয়ার কর্টার্ডকে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটা কিসের ব্যবসার কথা বলছিল?

—ও কিছু চোরাচালানের কথা বলছিল, আপনি কী ভেবেছেন? গেটের পাহারাদারকে ফাঁকি দিয়ে কিছু কিছু জিনিসপত্র তারা শহরের ভেতর পার করে আনে। এতে প্রচুর পয়সা।

—বুঝলাম, র‍্যাঁবেয়ার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর আবার বললেন—আমার মনে হয় তাহলে কোর্ট-কাছারিতে নিশ্চয় ওদের জানাশোনা লোক আছে।

—হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন।

সন্ধ্যার দিকে আবার যখন তারা কাফেতে এসে ঢুকলেন, দেখলেন সামনের শামিয়ানা গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। তোতাপাখিটা খাঁচার ভেতর তার দাঁড়ে বসে ডাকাডাকি করছে। ছোট ছোট টেবিলগুলোর চারপাশে লোকজনের ভিড় জমে উঠেছে, তাদের কারও গায়ে শুধুমাত্র শার্ট ছাড়া অন্যকিছু নেই। কর্টার্ড ভেতর ঢুকতেই শার্ট-পরা একজন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তার শার্টের সামনের বোতাম খোলা। কাজেই বুকের অনেকখানি অংশ দেখা যাচ্ছিল। লাল ইটের মতো রং। তার মাথার পেছনের দিকে বসানো শোলার হ্যাট, মুখ রোদে-পোড়া তামাটে, নাকমুখের গঠন মোটামোটা সুন্দর, চোখজোড়া ছোট ছোট, দেখতে কালো, দাঁতগুলো সাদা ঝকঝকে আর আঙুলে পরা গোটা দুইতিনটি আংটি। চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল বয়স ত্রিশের কাছাকাছি।

—বাহবা! লোকটা র‍্যাঁবেয়ারের উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কর্টার্ডকে জানাল—চলুন দেখি দুই-এক পাত্র জমে কিনা।

তারা নীরবে বসে দু-তিন পাত্র করে মদ গিলল।

—একটু বাইরে হাঁটলে কেমন হত, গ্রাসিয়া প্রস্তাব করল।

তিনজনে হাঁটতে হাঁটতে বন্দরের দিকে অগ্রসর হল। গ্রাসিয়া জানতে চাইল

কাজটা কী ধরনের। কর্টার্ড তাকে বুঝিয়ে বললেন যে তিনি তার কথা খাতিরে র‍্যাঁবেয়ারকে পরিচয় করে দিতে চান, তবে সেটা কোনো ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপার নয়। র‍্যাঁবেয়ার শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে চান আর গ্রাসিয়াকে সে-ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে। ঠোঁটের ঝুলানো সিগারেটে টান দিতে দিতে গ্রাসিয়া আগে আগে হেঁটে চলছিল। র‍্যাঁবেয়ারের সম্পর্কে সে কিছু কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু প্রতিবারই সে র‍্যাঁবেয়ারের নাম উল্লেখ না করে বলতে লাগল—তিনি যেন র‍্যাঁবেয়ারের উপস্থিতিকে লক্ষ্যই করেননি এমনই একটা ভাব।

—তিনি পালিয়ে যেতে চান কেন?

—তাঁর স্ত্রী থাকেন ফ্রান্সে। তাই তিনি সেখানে ফিরে যেতে চান।

—আচ্ছা, তার কিছুক্ষণ পর গ্রাসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করল—কী করেন তিনি?

—সাংবাদিকতা।

—এখনও তাই করেন? সাংবাদিকদের কাছে তো কিছু গোপন রাখা শক্ত।

—আমি তো আগেই বলেছি, উনি আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু, কর্টার্ড বললেন।

নীরবে হাঁটতে হাঁটতে তারা প্রায় জেটির কাছাকাছি এসে পড়লেন। জেটির চারপাশে বেড়া দিয়ে ঘেরা, ঢোকার পথ বন্ধ। সেখান থেকে মোড় নিয়ে তারা একটা ছোট তাড়িখানার দিকে এগিয়ে চললেন। সেখান থেকে মাছ-পোড়ার গন্ধ ভেসে আসছিল।

—সে যাই হোক, গ্রাসিয়া শেষে মন্তব্য করল—এ ব্যাপারে সোজাসুজি আমি খুব বেশি সাহায্য করতে পারব না। রাউল হচ্ছে উপযুক্ত লোক, দেখি তার সঙ্গে কথাবার্তা বলব। কাজটা মোটেই সহজ হবে বলে মনে হয় না।

—বেশ তো মন্দ কী! কর্টার্ড যেন বেশ আগ্রহ দেখালেন।

—সে এখন গা ঢাকা দিয়ে আছে, তাই না?

গ্রাসিয়া এবার আর কোনো জবাব দেবার চেষ্টা করল না। তাড়িখানার ভেতর ঢোকার মুখে সে থামল এবং এই প্রথম সরাসরি র‍্যাঁবেয়ারের সঙ্গে কথা বলল।

—আগামী পরশু বেলা এগারোটার সময় আপার টাউনের কাস্টমস ব্যারাকের মোড়ে আবার দেখা হবে, এই বলে গ্রাসিয়া ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল; কিন্তু হঠাৎ যেন আবার কী মনে পড়ে গেল, বলল—কিন্তু মনে রাখবেন, কিছু টাকাপয়সা খরচ করতে হবে। কথাগুলো সে খুব স্বাভাবিক স্বরে বলল।

র‍্যাঁবেয়ার সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন—তাই স্বাভাবিক।

ফেরার পথে র‍্যাঁবেয়ার কর্টার্ডকে ধন্যবাদ জানালেন।

—এসব কী বলছেন আপনি! আপনাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারলেই আমার আনন্দ। তাছাড়া আপনি হচ্ছেন সাংবাদিক মানুষ। কোনোদিন-না-কোনোদিন প্রয়োজন পড়লে আপনি আমার পক্ষে দু-কথা বলতে পারবেন।

দুদিন পরে আপার টাউনে যাবার যে বড় রাস্তা তার উপরে দিয়ে উঠলেন কর্টার্ড এবং র‍্যাঁবেয়ার। দুপাশে কোথাও কোনো বৃক্ষলতা ছিল না। কাস্টমস অফিসারদের যে ব্যারাক তার কিছুটা অংশ হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

গেটের সামনে কিছুসংখ্যক লোক দাঁড়িয়েছিল, ভেতরের কোনো রোগীকে দেখবার অনুমতি পাবে এই আশায় অপেক্ষা করছিল অনেকেই বোধ হয়। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ, কারণ ভেতরের রোগীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। আর যারা ছিল, তাদের লক্ষ্য সম্পূর্ণ এক অচল ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা, হয়তো দণ্ডীখানেকের মধ্যেই সে-সংবাদের আর কোনো মূল্যই থাকবে না। এইসব কারণেই বোধহয় জায়গাটায় সবসময় দেখা যেত কিছু লোকজনের ভিড়, সবসময় দেখা যেত কিছু কিছু মানুষের আনাগোনা এবং গ্রাসিয়াও তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের স্থান নির্বাচন করেছিল তাও বোধহয় এই কারণেই।

—আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, কটার্ড বললেন—এখান থেকে বাইরে যাবার জন্যে এত আগ্রহ কেন। বাস্তবিকই এখানে এখন যেসব জিনিস ঘটছে, সেগুলো অত্যন্ত কৌতূহলের ব্যাপার।

—না, এইসবে আমার কোনো কৌতূহল নেই। র‍্যাঁবেয়ার বললেন।

—হ্যাঁ, তবে এখন এখানে থাকার অর্থ হচ্ছে কিছুটা বিপদের ঝুঁকি নেওয়া।

—শুধুমাত্র তাই যদি ভাবেন; আগের দিনে একজন মানুষকে রাস্তা পার হতে গেলেও এতটুকু ঝুঁকি নিতে হত।

ঠিক সেই মুহূর্তে ডাক্তার রিও-র গাড়ি এসে থামল তাদের পাশেই। গাড়ি চালাচ্ছিলেন তারিউ, ডাক্তার আধা-জাগরিত অবস্থায় পাশে বসেছিলেন। সবার পরিচয় করিয়ে দেবেন বলেই হয়তো তিনি এবার সোজা হয়ে বসলেন।

—আমরা পরস্পরকে চিনি, তারিউ র‍্যাঁবেয়ার সম্পর্কে বললেন—একই হোটেলে থাকি আমরা। তিনি র‍্যাঁবেয়ারকে শহরে পৌঁছে দিতে চাইলেন।

—না, ধন্যবাদ। এখানে একজনের সঙ্গে দেখা করব বলে অপেক্ষা করছি।

ডাক্তার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে র‍্যাঁবেয়ারের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

—হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন সত্যিই একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি। র‍্যাঁবেয়ার তারিউর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন।

—সে কী! কটার্ড বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তার সাহেবও দেখছি জানেন ব্যাপারটা।

—আজ্ঞে, ঐ দেখেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তারিউ কটার্ডকে সাবধান করে দেবার মতো করে তার দিকে চাইলেন।

কটার্ডের চোখের চাউনি নিমেষে বদলে গেল। এম. অধন দ্রুত পা ফেলে বড় রাস্তা ধরে তাদের দিকে এগিয়ে আসলেন। তাঁর চলার গতি দ্রুত হলেও তার মধ্যে একটা মর্যাদাসূচক ভাব ছিল। তাদের পাশাপাশি এসে পৌঁছাতেই তিনি মাথার টুপি নামিয়ে ফেললেন।

শুভপ্রভাত জানালেন তখন তারিউ। গাড়ির ভেতর বসছিলেন যে দুইজন, ম্যাজিস্ট্রেট তখন প্রথমেই তাদের অভিবাদনের জবাব দিলেন। তারপর কটার্ড এবং র‍্যাঁবেয়ারের দিকে ফিরে, যারা গাড়ির অপরপারে দাঁড়িয়েছিলেন, মাথাটা সামান্য একটু নোয়ালেন। তারিউ কটার্ড এবং র‍্যাঁবেয়ারকে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে

দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর মন্তব্য করলেন—সত্যিই বড় দুঃসময় যাচ্ছে।

—মঁসিয়ে তারিউ, শুনছি নাকি নতুন বিধিনিষেধ যাতে সবাই ঠিকভাবে মেনে চলে সেগুলো তদারকের কাজে আপনি সাহায্য করছেন। ম্যাজিস্ট্রেট বলে চললেন—এটা যে কতখানি প্রশংসনীয় কাজ তা আর আমি আপনাকে কী বলব। সত্যিই এক মহৎ দৃষ্টান্ত। আচ্ছা ডাক্তার, আপনার কী ধারণা? মহামারী কি আরো খারাপের দিকে যেতে পারে?

ডাক্তার রিও বললেন, অন্তত সবার আশা করা উচিত যে এর চেয়ে খারাপ আর কিছু ঘটবে না।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—ঠিকই বলছেন, মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হচ্ছে কোনো অবস্থাতেই হতাশ না-হওয়া, কারণ সাধারণ বিধান যে কী তা তো আর সবসময় মানুষের বুদ্ধির গম্য নয়।

তারিউ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে জানতে চাইলেন, বর্তমান অবস্থার দরুন তাঁর কাজকর্ম বেড়েছে কিনা।

—আপনি যা অনুমান করছেন, অবস্থা ঠিক তার বিপরীত। প্রথমশ্রেণীর ক্রিমিনাল কেস বলতে যা বোঝায়, সেগুলো ক্রমে ক্রমেই কমে আসছে। প্রকৃতপক্ষে, আমার এখনকার যা দায়িত্ব তা হচ্ছে নতুন বিধিনিষেধ—যেগুলো জারি করা হচ্ছে, সেগুলো কেউ পালন করল কিনা, তারই তদন্ত করে বেড়ানো। সাধারণ আইনকানুন এখন যেমন মানুষ মেনে চলে এমন আর কখনও তেমন দেখিনি।

—তার কারণ হয়তো এখনকার এই সব বিধিনিষেধের তুলনায় আগেকার সাধারণ আইনগুলো অনেক সহজ। তারিউ মন্তব্য করলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট এতক্ষণ ধরে কেবল ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তাঁর মুখের ওপর যে একটা চিন্তার হালকা ছাপ ফুটে উঠছিল আকস্মিক সেটা যেন মুছে গেল। তিনি বেশ কিছুক্ষণ ধরে তারিউর দিকে চেয়ে রইলেন।

—তাতে আর এমন কী আসে যায়? আইনটাই আর বড় কথা নয়; শাস্তির বিধানটাই হচ্ছে আসল—আর সেটা এমনই জিনিস যা আমাদের সবাইকে মাথা পেতে নিতে হবে।

—এই যে লোকটাকে দেখলেন, ম্যাজিস্ট্রেট দূরে চলে যাবার পর তারিউ বললেন—উনিই হচ্ছেন এক নম্বর শত্রু।

তারিউ গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

আরো কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর কটার্ড এবং র‍্যাঁবেয়ার দুজনেই লক্ষ্য করলেন, গ্রাসিয়া তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের যে চিনতে পেরেছে এমন কোনো ভাব না-দেখিয়ে সে কাছাকাছি এগিয়ে আসল এবং অভিবাদন হিসাবেই যেন শুধু বলল, আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

তাদের চারপাশে লোকজনের যে ভিড় জমেছিল সেখানে সবাইকে মনে হচ্ছিল শান্ত নীরব। ভিড়ের ভেতর বেশির ভাগই মেয়েছেলে। প্রায় প্রত্যেকেরই কাছে ছিল একটা করে পুঁটুলি। প্রত্যেকর মনেই একটা ভ্রান্ত আশা যে, কোনো-না-কোনো

প্রকারে পুটুলিটা নিজের অসুস্থ স্বজনের কাছে গোপনে পৌঁছে দিতে পারবে এবং পুটুলিতে করে প্রত্যেকে যে খাবার এনেছে তা তাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের আত্মীয় খাবার অনুমতি পাবে।

ব্যারাকের গেটে সশস্ত্র পাহারা দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যারাকের সারি সারি ঘর আর গেটের মাঝ বরাবর যে আঙিনা সেখান থেকে কিছুক্ষণ পর পর অদ্ভুত ভূতুড়ে চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। যখনই এমন ঘটছিল বাইরের ভিড়ের সবাই উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ভেতরের রোগীদের ওয়ার্ডের দিকে চাইছিল।

তারা তিনজনেই দাঁড়িয়ে এসব দৃশ্য দেখছিল। এমন সময় ঠিক তাদের পেছনে সতেজ গলায় কে একজন 'শুভ প্রভাত' বলে উঠতেই সবাই একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। এত গরমের মধ্যেও রাউলের পরনে ছিল সুন্দর ছাঁটের কালো স্যুট এবং ধার-ওল্টানো ফেল্ট হ্যাট। তার দেহ দীর্ঘ, বেশ সুগঠিত, শুধু মুখের চেহারাটা একটু বিমর্ষ। তার ঠোঁটজোড়া নড়ল কি না নড়ল, সে দ্রুত এবং পরিষ্কার ভাষায় বলল :

—চলুন দেখি সেন্টারের দিকে একটু হাঁটা যাক....আর গ্রাসিয়া তোমার আর আসার প্রয়োজন নেই।

গ্রাসিয়া একটা সিগারেট ধরিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। বাকি তিনজন একত্রে হাঁটতে হাঁটতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। র‍্যাঁবেয়ার এবং কটার্ড দুজনে দুপাশে, মাঝখানে রাউল। তার চলার গতির সঙ্গে তাল রেখে হেঁটে চলছিল বাকি দুজনে।

—গ্রাসিয়া সবকিছু আমাকে বুঝিয়ে বলেছে, রাউল বললেন—ব্যবস্থা একটা কিছু হতে পারে। কিন্তু আগে থাকতেই আপনাদের জানিয়ে রাখছি, পুরো দশটা হাজার টাকা লাগবে।

র‍্যাঁবেয়ার জানালেন, এই টাকা দিতে তিনি সম্মত আছেন।

—কাল, ডকের কাছাকাছি যে স্প্যানিশ রেস্তোরাঁ আছে, দুপুরে আমাদের সেখানে খাবার কথা রইল।

র‍্যাঁবেয়ার বললেন : বেশ। তাই রইল। রাউল এই প্রথম হাসলেন এবং হাত বাড়িয়ে তার করমর্দন করলেন। রাউল চলে যাবার পর কটার্ড বললেন : পরের দিন দুপুরে তিনি তাদের সঙ্গে যেতে পারবেন না, কারণ সেই সময় অপর একজনের সঙ্গে দেখা করবেন বলে আগেই কথা দিয়েছিলেন। তবে তার আর র‍্যাঁবেয়ারের সঙ্গে থাকার প্রয়োজনও নেই হয়তো।

পরের দিন দুপুরে র‍্যাঁবেয়ার যখন স্প্যানিশ রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলেন, সবাই কৌতূহলভরে তার দিকে তাকিয়ে রইল। হলুদ বর্ণের ছোট একটা রাস্তা। রাস্তার সমতল থেকেও কিছুটা নিচে ধূসর অন্ধকার একটা ঘরে এই রেস্তোরাঁ। এখানে যারা নিয়মিত খরিদ্দার তাদের অধিকাংশই স্পেনের অধিবাসী, তাদের চোখের দিকে চাইলে অন্তত তাই মনে হয়। রাউল ভেতর থেকে তাকে ইশারা করতেই র‍্যাঁবেয়ার যখন তার দিকে এগিয়ে গেলেন, আশেপাশের সবার কৌতূহল যেন নিমেষে উবে গেল। প্রত্যেকেই আবার নিজের নিজের প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়ল। রাউলের সঙ্গী হিসাবে তার পাশে বসেছিল লম্বাটে রোগা পাতলা গোছের একজন লোক, তার দাড়ি-গোঁফ

তেমন মসৃণ করে কামানো নয়। ক্রাঁদ দুখানা অসম্ভব বকমের চওড়া; মুখখানা ঘোড়ার মুখের মতো লম্বা; মাথার চুল ইতিমধ্যেই পাতলা হয়ে আসতে শুরু করেছে। জামার দুহাত কনুই পর্যন্ত গোটানো, হাত দুখানা হাড়-চামড়া সার, কিন্তু কন পুরু লোমে ঢাকা। রাউল যখন র‍্যাঁবেয়ারকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ভদ্রলোক ধীরে ধীরে পরপর তিনবার তার দিকে মাথা নোয়ালেন মাত্র। তার নামটা যে কী সেটা কিন্তু কেউই বলল না এবং রাউল যখন তার সম্পর্কে বলছিলেন, 'আমাদের এই বন্ধু' এই বলে তার সম্পর্কে উল্লেখ করছিলেন।

—আমাদের বন্ধুর ধারণা তিনি হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। উনি যাচ্ছেন..., রাউল হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেলেন। র‍্যাঁবেয়ার কী খাবেন তার অর্ডার নেবার জন্যে একজন ওয়েটার এসে দাঁড়িয়েছিল টেবিলের সামনে।

—উনি আমাদের অপর দুজন বন্ধুর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবেন, যারা আবার কয়েকজন গেটের পাহারাদারদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করিয়ে দেবে, পাহারাদারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক করে রাখা হয়েছে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে এক্ষুনি আপনি যাত্রার আয়োজন করতে পারবেন। পালিয়ে যাবার সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষণ কোন্‌টা সেটা স্থির করার ভার হয়তো আপনাকে পাহারাদারদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। কাজটা আপনার জন্যে অনেক সহজ হবে যদি ওদের একজনের বাসায় গিয়ে কয়েক রাত থাকতে পারেন, ওদের বাসা অবশ্য গেটের খুব নিকটেই। এখন আমাদের বন্ধুর প্রথম কাজ হবে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ চটপট করিয়ে দেয়া—এসব কাজ সারা হয়ে গেলে পর তখন আপনি ওর সঙ্গে টাকাপয়সার লেনদেন সম্পর্কে কথাবার্তা পাকাপাকি করে ফেলবেন।

এবার বন্ধু তার ঘোড়ার মতো লম্বা মুখটা কয়েকবার ধীরে ধীরে ওঠালেন এবং নামালেন। এর মধ্যে একটা মুহূর্তের জন্যেও তার মুখ নাড়া বন্ধ রইল না। মুখের ভেতর তিনি যে একরাশ টমেটো এবং অন্য সালাদ ঠেসে ঢুকিয়েছিলেন, সেগুলোকে চিবোতে ব্যস্ত রইলেন। মুখের খাবারগুলো শেষ করে নিয়ে তারপর আবার তিনি কথা বলা শুরু করলেন। তার উচ্চারণের ভেতর দেখালেন একটা স্পেনদেশীয় টান। তার পরের দিন সকাল আটটা আন্দাজ তিনি র‍্যাঁবেয়ারকে শহরের গির্জার বারান্দায় দেখা করতে বললেন।

—তাহলে অন্তত আরো দুদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, র‍্যাঁবেয়ার মন্তব্য করলেন।

—দেখুন, জিনিসটা আপনি যেমন ভাবছেন ঠিক ততটা সহজ নয়, রাউল উত্তরে বললেন—ওদেরও চারদিকে কিছুটা খোঁজখবর দিতে হবে।

ঘোড়ামুখো বন্ধুটা আরেকবার আস্তে করে মাথা নেড়ে রাউলকে সমর্থন জানালেন। এরপর কী বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলা যায় সেটা হাতড়াতে আরো কিছুটা সময় পার হয়ে গেল। সমস্যাটার খুব একটা সহজ এবং দ্রুত সমাধান পাওয়া গেল, যখন র‍্যাঁবেয়ার আবিষ্কার করলেন, ঘোড়ামুখো একজন উৎসাহী ফুটবল খেলোয়াড়। র‍্যাঁবেয়ার নিজেও ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ভক্ত ছিলেন এবং ফুটবলের প্রতি তাঁরও

যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ফরাসিদের সেবারের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ, ইংরেজ পেশাদার টিমের গুণাগুণ এবং খেলার সময় বল একজনের পা থেকে অপরের কাছে পার করে দেবার বিভিন্ন কলাকৌশল নিয়েও অনেকক্ষণ ধরে তাঁরা আলাপ-আলোচনা করতে থাকলেন। খাওয়া যখন শেষ হল দেখা গেল ইতিমধ্যে ঘোড়ামুখের সঙ্গে বেশ একটা হৃদ্যতার ভাব জেগে উঠেছে। র‍্যাঁবেয়ারকে তিনি বেশ কিছুক্ষণ ধরে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, ফুটবলের মাঠে খেলা দেখাবার মতো সতিকারের সুযোগ যদি কারো থাকে তা হচ্ছে সেন্টার-হাফের। 'ওল্ডবয়' একটা জিনিস আপনি হয়তো অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন—গোটা মাঠে কে কোথায় দাঁড়াবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে সেন্টার-হাফের ওপর এবং খেলার সমস্ত আর্টটাই হচ্ছে বিন্যাসের মধ্যে, তাই নয় কি?

র‍্যাঁবেয়ারের সম্মতি জানাতে মোটেই আপত্তি ছিল না যদিও বরাবর তিনি সেন্টার ফরওয়ার্ড হিসাবেই খেলে এসেছেন। মোটামুটি একটা শান্ত পরিবেশের মধ্যেই এতক্ষণ তাঁদের কথাবার্তা, এমন সময় রেডিওটা আকস্মিক বেজে উঠল। খানকয়েক হালকা ধরনের গান শেষ হবার পরই ঘোষণা শুরু হল : আগের দিন প্লেগে মৃত্যুসংখ্যা ছিল ২০৭। উপস্থিত কারো মধ্যে এতটুকু বিচলিত ভাব দেখা গেল না। ঘোড়ামুখো শুধু নিজের কাঁধ দুখানায় একবার ঝাঁকানি দিয়ে ঝপ্ করে উঠে দাঁড়ালেন। রাউল এবং র‍্যাঁবেয়ারও দেখাদেখি উঠে পড়লেন।

রেস্তোরাঁ থেকে বার হয়ে যাবার মুখে ঘোড়ামুখো সেন্টার-হাফ র‍্যাঁবেয়ারের ডান হাতখানা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে ঝাঁকানি দিলেন; বললেন—আমার নাম গনজালেস।

পরের দুদিন র‍্যাঁবেয়ারের কাছে মনে হতে লাগল যেন অনন্তকালের সমান। ডাক্তার রিওকে খুঁজে বার করে এ ক'দিনের সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত তিনি তাকে শোনালেন এবং তারপর ডাক্তার যখন রোগী দেখতে যাবার জন্যে বাইরে গেলেন, তিনিও চললেন তার সঙ্গে। প্লেগে আক্রান্ত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এমন এক রোগীর বাসার কাছে এসে যখন পৌঁছালেন তারা, র‍্যাঁবেয়ার ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইলেন। রোগীর বাড়ির হলঘরে দ্রুত চলাফেরার শব্দ শোনা গেল এবং সেইসঙ্গে গলার আওয়াজও।

ডাক্তার এসে গেছেন সেটাই বোধ হয় পরিবারের সকলকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছিল।

—তারিউ সময়মতো পৌঁছালে হয়। ডাক্তার বললেন। তাঁকে বড় বেশি পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিল।

—মহামারী কি ক্রমেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে মনে হচ্ছে? র‍্যাঁবেয়ার প্রশ্ন করলেন।

ডাক্তার রিও জানালেন, ব্যাপারটা সঠিক নয়, বাস্তবিকই মৃত্যুর যে চার্ট প্রস্তুত করা হচ্ছিল তা দেখলে মনে হচ্ছিল যে রোগ যেন দ্রুত বাড়ছে। তবে কি মহামারীর সঙ্গে যুঝবার মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা বা উপায় তাদের আয়ত্তে ছিল না?

—আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব যন্ত্রপাতির। পৃথিবীর সব দেশেই সেনাবাহিনীতে

অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির যখন অভাব দেখা যায় তা পূরণ করা হয় সাধারণত জনবল দিয়ে; কিন্তু আমাদের এমনি অবস্থা যে সেরকম জনবলও নেই।

—বাইরের কোনো শহর থেকে ডাক্তার বা ট্রেড এ্যাসিস্টেন্ট পাঠাবার কোনোরকম ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয়নি বোধহয়?

—হ্যাঁ, কিছু লোক অবশ্য এসেছেন, ডাক্তার রিও বললেন—দশজন ডাক্তার এবং শ-খানেক ইঞ্জিনিয়ার। এখনি শুনলে অবশ্য মনে হবে, মন্দ কী, প্রচুর লোক এসেছে তো। কিন্তু বর্তমানে এখানকার যা অবস্থা তাকে কোনোরকমে শুধু সামাল দিতে চাইলেও আরো বহু লোকের প্রয়োজন। কাজেই বেশি খারাপ কিছু ঘটলে কী অবস্থা দাঁড়াবে সেটা কল্পনা করুন। রোগীর বাড়ির ভেতর যেসব কথাবার্তা চলছিল, র‍্যাঁবেয়ায় সেগুলো শুনছিলেন। মৃদু হেসে তিনি এবার ডাক্তারের দিকে চাইলেন।

—কেন, তিনি বললেন—তাহলে তাড়াতাড়ি যাতে যুদ্ধে জিততে পারেন, সেই ব্যবস্থাই এখন করতে হবে আপনাকে। তারপর আকস্মিক যেন একটা কালো ছায়া পড়ল র‍্যাঁবেয়ারের মুখের ওপর।—তবে কি জানেন, তিনি নিচুগলায় আবার বললেন—ঠিক এই ভয়েই কিন্তু আমি শহর ছেড়ে পালাতে চাইছি না।

ডাক্তার রিও বললেন, সেটা তিনি সহজেই অনুমান করতে পারবেন। র‍্যাঁবেয়ার কিন্তু আগের মতোই বলে চললেন :

—আমি যে কাপুরুষ তা ঠিক নয়। অন্তত এইজন্যই কতকটা জোর করেই বলতে পারি; তার কারণ সেটা পরীক্ষা করবার সুযোগ আমার ঘটেছে। তবে ব্যাপার হচ্ছে, কিছু কিছু চিন্তা আছে, যেগুলোকে আমি মোটেই সহ্যতে পারিনে।

ডাক্তার রিও র‍্যাঁবেয়ারের চোখের ওপর চোখ রাখলেন।

—চিন্তা করবেন না, আবার তার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হবে। ডাক্তার বললেন।

—জানি না, হয়তো হবে। কিন্তু এটা আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না যে, দীর্ঘদিন আমাদের সম্পর্ক এইভাবে ছেড়ে থাকতে হবে এবং এর মধ্যে তার বয়স বেড়ে চলবে, বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাবে সে। ত্রিশের কোঠায় পৌঁছবার পর জীবন তো ভাঁটির দিকে চলে, সুতরাং জীবনের যা-কিছু আস্বাদন তারই আগে নিংড়ে ভোগ করে নিতে হবে। অবশ্য আমি জানি না জীবন সম্পর্কে আপনার উপলব্ধিও ঠিক এইরকম কিনা।

ডাক্তার রিও জবাবে বলতে যাচ্ছিলেন—তারও উপলব্ধি অনেকটা অনুরূপ; এমন সময় তারিউ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। কেমন একটা উত্তেজিত ভাব তাঁর মুখে।

—ফাদার প্যানালুকে আমাদের কাজে যোগ দেবার কথা বলেছিলাম। কিছুক্ষণ আগেই কথা হল।

—বেশ তো, কী বললেন উনি?

তিনি প্রস্তাবটা শুনে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—বেশ রাজি আছি।

—বাহ্! সে তো খুব ভালো কথা, ডাক্তার বললেন—মুখে যাই বলুন, কাজের সময় যে তিনি এতখানি বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন এতে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

—আমার তো ধারণা বেশির ভাগ লোকের ক্ষেত্রেই এটা সত্য, তারিউ বললেন—এটা শুধু সুযোগের অপেক্ষা। সুযোগ দিলে সব মানুষই...তিনি হাসতে হাসতে ডাক্তার

রিওর দিকে চোখ মারলেন—আর জীবনে আমার কাজ তো তাই, মানুষের জন্যে উপযুক্ত সুযোগ করে দেয়া।

—মাফ করবেন, র‍্যাবেয়ার বললেন—এবার আমি বিদায় নিতে চাই।

বুধবার দিন, অর্থাৎ যেদিন তাদের সাক্ষাতের কথা ছিল, আটটা বাজতে তখনও পাঁচ মিনিট বাকি—র‍্যাবেয়ার শহরের গির্জায় গিয়ে ঢুকলেন। অন্য দিনের তুলনায় বাইরে বাতাস তখনও কিছুটা ঠাণ্ডাই ছিল। হালকা তুলোর মতো সাদামেঘ তখনও আকাশের গায়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল। সামান্য কিছুক্ষণ পরেই সূর্য হয়তো তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। সামনে আঙিনা যদিও তখন সম্পূর্ণ শুকনো, শিশিরের একটা মৃদু হালকা গন্ধ ভেসে আসছিল। সেখান থেকে সূর্য তখন পূর্বদিকে সামনের বাড়িঘরের কিছুটা আড়ালে, সূর্যকিরণ সবে জোয়ান অব আর্কের মূর্তির মুখটটাকে স্পর্শ করতে শুরু করেছে; গির্জার ঝোয়ারের সামান্য একটুখানি জায়গাও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল সূর্যকিরণের আলোর ছোঁয়াচ পেয়ে।

গির্জার ভেতরের একটা ঘড়িতে আটটা বাজল। গির্জার শূন্য বারান্দার ওপর র‍্যাবেয়ার কয়েকবার পায়চারি করলেন। ভেতর থেকে মিলিত কণ্ঠের সংগীতের শান্ত আওয়াজ ভেসে এল। আর ভেসে এল ভিতরের এক ঝলক বদ্ধ বাতাস এবং ধূপের সুন্দর সুবাস। তারপর সংগীতের সুর ক্রমেই স্তিমিত হতে হতে সম্পূর্ণ থেমে গেল।

কালো ছায়ার মতো খর্বাকার গোটাদশেক মানুষের আকৃতি গির্জার ভেতর থেকে বার হয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে শহরের ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল—একসময় মিলিয়ে গেল সেগুলো। র‍্যাবেয়ার অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। আবার কতকগুলো খর্বাকার কালো ছায়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে রাস্তায় এসে ঢুকল। র‍্যাবেয়ার একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিলেন এমন সময় খেয়াল হল সেখানে সিগারেট খাওয়াটা দৃষণীয় মনে হতে পারে।

ঠিক আটটা দশ মিনিটের সময় অর্গান বেজে উঠল। মন্থরগতিতে সুর উঠতে লাগল।

র‍্যাবেয়ার গির্জাঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলেন। ভেতরের অল্প আলোয় প্রথম তিনি কিছুই ঠাহর করতে পারলেন না। তার কিছু আগেই ছায়ার মতো যে কয়েকটা মূর্তি ভেতরে ঢুকেছিল, মিনিটখানেক পরে তিনি তাদের সামনে দেখতে পেলেন; এককোণে দল বেঁধে বসেছিল সবাই। তাদের সামনেই একটা কাজ-চলা-গোছের করে বানানো বেদি, তার ওপর দাঁড় করানো সেন্ট বচের একটা প্রতিমূর্তি, স্থানীয় কোনো স্থপতি হয়তো দ্রুত হাতে খোদাই করে দিয়েছেন। হাঁটুগেড়ে বসা অবস্থায় তাদেরকে আগের চেয়ে ক্ষুদ্র আকৃতির দেখাচ্ছিল, যেন চারপাশের ধূসর ধোঁয়াটে কুয়াশার মধ্যে ভাসছিল কালো জমাট-বাঁধা অন্ধকারের কতকগুলো ছোপ, সেগুলো ধূসর কুয়াশার আবরণ থেকে যে খুব একটা স্বচ্ছ তাও মনে হচ্ছিল না। তাদের মাথার উপর অর্গানে একটার-পর-একটা বিভিন্ন সুর বেজে চলেছিল।

র‍্যাবেয়ার আবার যখন বাইরে আসলেন, দেখলেন, গনজালেস শহরের দিকে যাবার পথে ইতিমধ্যে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছেন—এই যে ওল্ডবয়, দেখুন তো আমি ভেবেছিলাম আপনি এতক্ষণে নিশ্চয় চলে গেছেন, র‍্যাবেয়ারকে দেখতেই বললেন—কারণ আমার তো আর কম বিলম্ব হয়নি।

তাঁর নিজের পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কারণটা তিনি র‍্যাবেয়ারকে বুঝিয়ে বললেন। আটটা বাজতে ঠিক দশ মিনিটের সময় তিনি বাসা থেকে বেরিয়েছেন—তার বন্ধুদের সঙ্গে যেখানে দেখা করবার কথা ছিল—জায়গাটা অবশ্য খুব কাছেই—সেখানে গিয়ে তিনি তাদের খোঁজ নিলেন, কিন্তু বিশ মিনিট ধরে সেখানে অপেক্ষা করার পরও তিনি তাদের পাত্তা পাননি।

—নিশ্চয়, কিছু একটা ঘটেছে যার জন্যে তাঁরা হয়তো আটকে গেছেন। বুঝেন তো, আমাদের এই লাইনে কাজ করতে পদে পদে কত বাধা।

পরের দিন ঠিক একই সময়ে মেমোরিয়ালের কাছাকাছি আবার তারা সাক্ষাৎ করবেন বলে গনজালেস প্রস্তাব দিলেন। র‍্যাবেয়ার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মাথার টুপিটা পেছনের দিকে ঠেলে দিলেন।

—এত ভেঙে পড়বার কিছু নেই—গনজালেস হাসলেন। একটা গোল করতে চাইলে, কত আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে বাধা পেরিয়ে অপরের কাছে বল পাস করে দেবার পর তবেই হয়তো সেটা সম্ভব। সেটা ভাবুন একবার।

—ঠিকই বলেছেন হয়তো, র‍্যাবেয়ার উত্তরে বললেন—কিন্তু এটাও ভাবুন আবার সেখানে খেলা মাত্র দেড় ঘণ্টার।

ওরাও-এ ওয়ার মেমোরিয়ালটা এমন একস্থানে যেখানে থেকে সমুদ্র চোখে পড়ে। বন্দরের নিচে খাড়া উঠে গেছে যে পাহাড়ের চূড়া তারই কিছুদূরে অবস্থিত একটা পার্কের মতো দেখতে এই ওয়ার মেমোরিয়াল।

পরের দিনেও র‍্যাবেয়ারই সবার আগে এসে পৌঁছালেন সাক্ষাতের নির্দিষ্ট জায়গায়। সময় কাটাবার জন্য ওয়ার মেমোরিয়ালের সামনেই স্বদেশের জন্যে যারা আত্মোৎসর্গ করেছেন তাদের নামের যে তালিকা ঝুলছিল সেটা পড়া শুরু করলেন। মিনিট কয়েক পরে আরো দুজন লোক হাঁটতে হাঁটতে তাঁরই দিকে এগিয়ে এল। কেমন একটা নির্বিকারভাবে তার দিকে তাকাল দু-একবার। তারপর পার্কের দেয়ালের প্যারাপেটের ওপর হাত রেখে উৎসুকদৃষ্টিতে নিচে জনশূন্য প্রাণস্পন্দনহীন বন্দরের দিকে চেয়ে রইল। তাদের দুজনেরই পরনে ছিল একই ধরনের হাতখাটো জামা এবং নীল রঙের প্যান্ট। মাথায় তারা দুজনেই প্রায় একইরকম উঁচু। র‍্যাবেয়ার কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা পাথরের বেঞ্চের ওপর বসলেন। নিরিবিলি তাদের দুজনকে নিরীক্ষণ করতে থাকলেন—চেহারা দেখে অনুমান হয় দুজনেরই বয়স খুব অল্প—বিশের বেশি নয়; এমন সময় সামনের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই র‍্যাবেয়ার দেখলেন গনজালেসও তার দিকে এগিয়ে আসছেন।

—বাহ বেশ, গনজালেস বললেন—নিশ্চয় ইতিমধ্যে সবার আলাপ-পরিচয় হয়েছে। এখন আসল কথাটা সারা যেতে পারে তাহলে।

মার্সেল অথবা লুই তাদের ভেতর কেউ একজন বলল, দুদিনের মধ্যেই পোর্টে তাদের ডিউটি শুরু হবে, তারপর সপ্তাহ ধরে তারা সেখানে ডিউটিতে থাকবে। সে-সময় তারা লক্ষ্য রাখবে কোন্ রাতটা এই কাজের জন্য উপযুক্ত। একটা বিপদ অবশ্য আছে। পশ্চিমদিকের গেটে যেখানে তাদের পাহারা দেবার কথা সেখানে তারা ছাড়া

আরো দুজন পাহারা থাকবে এবং তাদের দুজনেই নিয়মিত সৈনিক। তবে তাদের হুকুম মতো একেবারে বাইরে রাখা ভালো। তাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা শক্ত। আর তাছাড়া তাদের সঙ্গে থাকতে গেলে শুধু-শুধু খরচের পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকবে। কোনো কোনো দিন সন্ধ্যায় অবশ্য কাছেই একটা মদের দোকানে যায় ওরা, সেখানে একটা পেয়ালার ধারে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা জমিয়ে আবার ফিরে আসে।

যাবার অথবা দুই একজন বলল, যদি রাঁবেয়ার এই সময়টায় তাদের বাসায় তাদের সঙ্গে থাকতে পারেন—তাদের বাসা অবশ্য গেট থেকে সামনা করে মিনিটের পথ—তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। যতক্ষণ-না তাদের কেউ এসে তাকে খবর দিচ্ছে যে সমুদ্র ঠিক চারদিকে পরিষ্কার, ততক্ষণ অবশ্য তাঁকে সেখানেই অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এরকম অবস্থায় পালিয়ে যাওয়াটা তার জন্যে আর শক্ত কাজ বলে মনে হবে না। কিন্তু সময় নষ্ট করা চলবে না মোটেই। যা-কিছু করবার চটপট সেরে ফেলতে হবে। কারণ তাদের গেট থেকে বাইরে সামনের দিকে কিছুদূরে আর একটা পাহারা দেবার পোস্ট বসানো হবে বলে কথাবার্তা চলছে।

রাঁবেয়ার তাদের কথায় সম্মত হলেন, তাঁর পকেটে যে-কয়টা সিগারেট ছিল সেগুলো সব বার করে তাদের দুজনের হাতে তুলে দিলেন। তাদের দুজনের ভেতর যে একজন পাতি খুব মোটেনি সে এবার গনজালেসকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল—টাকাপয়সার লেনদেন সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা ইতিমধ্যে হয়েছে কিনা।

—না, সেসব কিছু এখন স্থির হয়নি, গনজালেস বললেন—তবে তা নিয়ে তোমাদের চিন্তার কিছুই নেই। উনি আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু, টাকাপয়সা যা-কিছু দেবার উনি পার হয়ে যাবার সময় দিয়ে যাবেন।

আর একবার তাদের দেখাসাক্ষাৎ হবে বলে স্থির হল। তার পরের পরের দিন রাতে তারা সবাই স্প্যানিশ রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া করবেন বলে গনজালেস প্রস্তাব দিলেন। যুবক দুজনের বাসা যেখানে, সেখান থেকে স্প্যানিশ রেস্তোরাঁ খুব সহজ হাঁটা-পথ—ওর বয়, তেমন চিন্তার কিছু নেই, প্রথম রাতটা বরং অমিত আপনার সঙ্গে থাকব—গনজালেস বললেন।

ঠিক তার পরের দিন হোটেলে রাঁবেয়ার যখন তার শোবার ঘরে যাচ্ছিলেন, দেখলেন, তারিউ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন।

—আমার সঙ্গে যাবার মতো অবসর হবে কি আপনার? তারিউ বললেন—আমি ডাক্তার রিএ-র ওখানে যাচ্ছি।

রাঁবেয়ার ইতস্তত করতে লাগলেন।

—দেখুন আমি এখন ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, বারে বারে এইভাবে তাঁর ওখানে গিয়ে নিশ্চয় তাঁকে খুব বিরক্ত করছি।

—আমার তো মনে হয় সে-ব্যাপারে আপনার কোনোরকম উদ্বেগ থাকা উচিত নয়। আপনার সম্পর্কে অনেক কথাই তাঁকে বলতে শুনেছি।

রাঁবেয়ার আবার কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করলেন। তারপর বললেন—রাতের খাওয়া শেষ করে, তা সে যত রাতই হোক আপনারাই দুজনে হোটেলে আমার এখানে

আসেন, সবাই একত্রে মদ খাওয়া যাবে।

—সবকিছু নির্ভর করছে ডাক্তার রিএ-র ওপর। তারিউর কথায় কেমন সন্দেহের সুর বাজল—আর প্লেগের অবস্থার ওপর তো বটেই।

যাই হোক, সেদিন রাত এগারোটার কাছাকাছি সময় ডাক্তার রিএ এবং তারিউ হোটেলের ছোট সংকীর্ণ বারে এসে ঢুকলেন। খুব কম হলেও জনতিরিশেক লোক তখন সেখানে ভিড় জমিয়ে বসেছিল। সবাই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কথা বলছিল। বাইরে প্লেগ-আক্রান্ত শহরের চারদিকে তখন একটা থমথমে শান্তভাব বিরাজ করছিল। সুতরাং সেখান থেকে এসে আকস্মিক ভেতরের এই চিৎকার শুনে তাঁরা দুজনে যেন কিছুটা থমকে গেলেন। ঢোকার মুখ পর্যন্ত থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু যখন দেখলেন এখনও এই বারে মদিরাই মদ পাওয়া যায় তখন অবশ্য চেঁচা-এর কারণটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। রাঁবেয়ার বারের এককোণে একটা টুলের উপর বসেছিলেন, তাঁদের ওপর দৃষ্টি পড়তেই সামনে তার দিকে এগিয়ে আসার জন্যে ইশারা করলেন। তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে চেঁচা করছিল এমন একজন লোককে কনুই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তিনি বন্ধুদের জন্যে জায়গা করে দিলেন।

—জোরালো কিছু-একটা দু-এক ফোঁটা দিলে আপনাদের কারো আপত্তি নেই নিশ্চয়। রাঁবেয়ার বললেন।

—না, তারিউ বললেন—তার উল্টোটাই বরং হতে দিতে পারেন।

রাঁবেয়ার তাঁর হাতে যে গ্লাসটা তুলে দিয়েছিলেন, তার ভেতরে তিক্ত লতাগুল্মের যে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল, ডাক্তার রিএ তাই শুঁকছিলেন। চারদিকের চিৎকারের ভেতর কারো কথা শোনার উপায় ছিল না। কিন্তু রাঁবেয়ারকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি তখন মদ-খাওয়া নিয়েই সম্পূর্ণ ব্যস্ত। মদিরাই তিনি ইতিমধ্যেই মাতাল হয়ে পড়েছেন কিনা, ডাক্তার সেটা নিশ্চিত অনুমান করতে পারলেন না। বারের চারপাশের অর্ধবৃত্তাকার যেখানে বাইরে অবশিষ্ট যে-জায়গাটুকু, সেখানে দুখানা মাত্র টেবিল পাতা। তার একটাতে দুপাশে দুজন সুন্দরী পরিবৃত হয়ে বসেছিলেন নৌবাহিনীর একজন অফিসার। লালচে মুখ মোটাসোটা চেহারার এক ভদ্রলোককে কায়রোর এক টাইফয়েডের মহামারীর কথা গল্প করে শোনাচ্ছিলেন।—আপনি বিশ্বাস করবেন, তিনি বলে চললেন—নেটিভদের ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে সেখানে ছাউনি ফেলা হয়েছিল। রোগীদের রাখা হয়েছিল তাঁবুর ভেতর আর তার চারপাশে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল বন্দুকধারী পাহারা। রোগীদের আত্মীয়স্বজন কেউ দেশী হাতুড়ে ঔষধ নিয়ে গোপনে রোগীদের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছে এটা চোখে পড়তে যেটুকু বিলম্ব—অমনি তাদের ওপর গুলি চালানো হত। আপনি বলবেন, কেন? আমি নিজেও বুঝি ব্যবস্থাটা একটু কঠোর হয়েছিল, কিন্তু সেই অবস্থায় এছাড়া অন্যকিছু করার উপায়ও ছিল না।

বারের ভেতরের অপর যে টেবিলখানা তার চারপাশে গোল হয়ে ভিড় জমাচ্ছিল উজ্জ্বল চকচকে চেহারার একদল যুবক। তাদের কথাবার্তা শোনবার কোনো উপায় ছিল না। একঘেয়ে সংগীতের অবিরাম যে গর্জন তাদের ঠিক মাথার উপরেই লাউডস্পিকার থেকে

ভেসে আসছিল তাতেই অর্ধেক ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল তাদের কথাবার্তা।

—কোনোরকম সুরাহা হল? ডাক্তার স্বর চড়িয়ে র‍্যাবেয়ারকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—কিছুটা এগুচ্ছে বলে মনে হয়, র‍্যাবেয়ার বললেন—সম্ভবত এই সপ্তাহের মধ্যেই একটা কিছু হবে।

—বড় দুর্ভাগ্যের কথা! তারিউ চিৎকার করে উঠলেন।

—কেন, আপনি অমন ভাবছেন কেন?

—না, না, ডাক্তার রিও বললেন—ওটা এমন কিছু নয়। তারিউর ধারণা আপনি এখানে থেকে গেলে আমাদের অনেক সাহায্য হত এই যা। কিন্তু আমি তো বুঝি কেন আপনার এই ব্যাকুল ইচ্ছা। কেন আপনি পালাবার জন্যে এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

আর এক দফা মদ খাওয়া শুরু হল তাদের। এবারে খরচটা তারিউর। র‍্যাবেয়ার টুল থেকে নেমে পড়লেন, এই প্রথম তিনি সোজা তারিউর চোখের দিকে তাকালেন—কীভাবে আমি সাহায্য করতে পারি বলে আপনাদের ধারণা?

—কেন, আপনি নিশ্চয়, তারিউ তার মদের গ্লাসটার দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে শান্ত গলায় বললেন—আমাদের যে-কোনো একটা স্যানিটারি স্কোয়াডের সঙ্গে কাজ শুরু করতে পারেন।

তাঁর চোখেমুখে মাঝে মাঝে যে একটা চিন্তান্বিত একগুঁয়েমিভাব ফুটে উঠত সেটা আবার যেন মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এল র‍্যাবেয়ারের চেহারায়। তিনি আবার টুলের উপর উঠে বসলেন।

—আপনার কী ধারণা, স্কোয়াডগুলো মোটেই কোনো ভালো কাজ করছে না?

তারিউ সংক্ষেপে তার মদের গ্লাসে চুমুক দিয়েছিলেন, এবার কটমট করে র‍্যাবেয়ারের দিকে তাকালেন তিনি।

—অবশ্য, তারা-যে কোনো ভালো কাজ করছে না এমন কথা কে বলবে—র‍্যাবেয়ার তার মদের গ্লাসটা শেষ করলেন।

ডাক্তার লক্ষ্য করলেন র‍্যাবেয়ারের হাত কাঁপছে, তাঁর এবার নিশ্চিত ধারণা হল লোকটা অতিরিক্ত মাতাল হয়ে পড়েছে।

পরের দিন দ্বিতীয়বার র‍্যাবেয়ার যখন স্প্যানিশ রেস্তোরাঁয় গিয়ে পৌঁছলেন, দেখলেন রেস্তোরাঁর সামনে বাঁধানো ফুটপাতের উপর বিস্তর লোক চেয়ার পেতে বসে গেছে। সন্ধ্যাবেলার ঝিরঝিরে ঠান্ডা বাতাসে বসে আরাম করছে তারা, তাদের চারপাশে সোনালি ও সবুজ আলো ঝিকমিক করছে। কড়া ঝাঁঝালো গন্ধের চুরুট অনেকের মুখে। তাদের ভিড় ঠেলে পথ করে নিয়ে র‍্যাবেয়ার রেস্তোরাঁর ভেতর গিয়ে ঢুকলেন। ভেতরটা দেখলেন প্রায় সম্পূর্ণ শূন্য। প্রথমবার সাক্ষাতের সময় গনজালেস পেছনের যে টেবিলটাতে বসেছিলেন, র‍্যাবেয়ার সেদিকে গেলেন। ওয়েট্রেসকে জানালেন তাঁর অর্ডার দিতে একটু বিলম্ব হবে। ঘড়িতে দেখলেন সবে সাড়ে সাতটা।

বাইরে বসে যারা হাওয়া খাচ্ছিলেন তারা দুজন-তিনজন করে একত্রে উঠে এসে ভেতরের বিভিন্ন টেবিলের চারপাশে ঘিরে বসতে শুরু করলেন। ওয়েট্রেসও টেবিলে টেবিলে ঘুরে খাবার দিতে লাগল। দেখতে দেখতে ছুরি-কাঁটার টুংটাং শব্দ এবং

মৃদুস্বরে কথাবার্তার গুনগুনানিতে ভাঁড়ারের মতো ছোট ঘরটা ভরে উঠল।

আটটা বাজল। র‍্যাবেয়ার তেমনি অন্যদের আসার পথ চেয়ে রইলেন। একে একে রেস্তোরাঁর ভেতরের সবগুলো আলো জ্বেলে দেয়া হল। অপরিচিত একদল লোক এসে তাঁর টেবিলের চারপাশের চেয়ারগুলো দখল করে বসে গেল। র‍্যাবেয়ার ডিনারের অর্ডার দিলেন। সাড়ে আটটায় যখন তিনি খাওয়া শেষ করলেন তখনও গনজালেস বা সেই যুবক দুজনের কারো দেখা নেই। রেস্তোরাঁ আস্তে আস্তে খালি হতে শুরু হল।

বাইরে রাতের অন্ধকার দ্রুত গাঢ় হয়ে উঠছিল। দরজার সামনে টাঙানো পর্দাগুলো সমুদ্র-থেকে-আসা উষ্ণ বাতাসে ঢেউয়ের মতো ফুলে ফুলে উঠছিল। তখন ন'টা। র‍্যাবেয়ার সচেতন হতেই দেখলেন রেস্তোরাঁ প্রায় শূন্য হয়ে গেছে। ওয়েট্রেস অদ্ভুতভাবে তার দিকে যেন তাকিয়ে দেখছে। তিনি বিল মিটিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসলেন; রাস্তার অপর পারে একটা কাফে দেখলেন তখনও খোলা। সেখানে গিয়ে এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসলেন যেখান থেকে রেস্তোরাঁর দরজার ওপর সম্পূর্ণ নজর রাখা যায়। রাত সাড়ে ন'টার দিকে তিনি সেখান থেকে উঠে পড়লেন। ধীরে ধীরে নিজের হোটেলের দিকে ফিরলেন। গনজালেসের ঠিকানা তিনি রাখেননি; সুতরাং তাঁকে আবার কীভাবে খুঁজে বের করবেন সেটাই এখন আবার তার কাছে মহাচিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। হয়তো এই ক্লান্তিকর অনুসন্ধানের কাজ আবার গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে, এইরকম একটা অনিশ্চিত সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে তিনি ভীষণভাবে মুষড়ে পড়লেন।

এইভাবে যখন তিনি হেঁটে চলছিলেন আর তাঁর চারপাশ দিয়ে এ্যাম্বুলেন্স ছুটাছুটি করছিল, আকস্মিক তিনি উপলব্ধি করলেন—পরে সেইরকমই তিনি ডাক্তার রিও-র কাছে বলেছিলেন—যে দেয়ালের অন্তরালে আটকা পড়ে তিনি তার প্রিয়ার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, কীভাবে আবার তার ভেতর থেকে বের হয়ে যেতে পারেন তার জন্যে সেই দেয়ালের ভেতর কোথাও একটু ভাঙা বা ছিদ্র আছে সেটা অনুসন্ধানের কাজে তিনি এমনি গভীরভাবে ডুবেছিলেন যে ইতিমধ্যে নিজের সেই প্রিয়ার চিন্তাই সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে বসেছিলেন। কিন্তু সেই একই মুহূর্তে যখন আবার অনুভব করলেন যে এই দেয়ালের বাইরে যাবার সমস্ত পথই তার জন্যে রুদ্ধ, প্রিয়াসঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষা এমন আকস্মিক এবং এমন প্রবলভাবে তার হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল যে, তিনি হোটেলের দিকে ছুটতে বাধ্য হলেন। তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভেতর যেন একটা কঠিন জ্বালা শুরু হয়েছিল যা দাবানলের মতো মাথা শিরা-উপশিরা বেয়ে রক্তপ্রবাহের সঙ্গে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল, যদিও এই জ্বালা উপশমের জন্যেই তিনি ছুটতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু জ্বালা ক্রমেই বেড়ে চলছিল যেন। ঠিক পরের দিনই খুব প্রত্যুষে তিনি ডাক্তার রিও-র ওখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং কটার্ডকে কোথায় পেতে পারেন জানতে চাইলেন।

—মনে হচ্ছে অনুসন্ধানের সূত্র যেখানে ছেড়ে দিয়েছিলাম সেখান থেকেই আবার শুরু করতে হবে আমাকে।

—কাল রাতে একবার আসুন দেখি, ডাক্তার রিও বললেন—কটার্ডকে আগামীকাল রাতে এখানে আসার জন্যে তারিউ-ও আমাকে বলতে বলেছিল তাকে। কীজন্য অবশ্য

জানায়নি। কাল রাত দশটায় কটার্ডের এখানে আসার কথা। আপনি সাড়ে দশটার দিকে আসুন।

পরের দিন রাতে কটার্ড যখন ডাক্তার রিউ-র ওখানে পৌঁছুলেন, দেখলেন ডাক্তার রিও ও তারিউ এক রোগী সম্পর্কে আলোচনায় ব্যস্ত। তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন লোকটা নিশ্চিত মারা যাবে। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে সে সেরে উঠেছে।

—তার মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল দশ আর বাঁচার সম্ভাবনা ছিল মাত্র এক।

—সত্যিই লোকটার ভাগ্য বলতে হবে, মিছামিছি এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে লাভ কী? কটার্ড বললেন।

—আসলে লোকটাকে প্লেগে ধরেনি, এটাই সত্য।

তারিউ এবং ডাক্তার জোর দিয়ে বলল—লোকটাকে যে প্লেগে ধরেছিল সে-ব্যাপারে তারিউ নিশ্চিত যেখানে, সেখানে সন্দেহের কোনোরকম অবকাশ ছিল না।

—সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। তাহলে লোকটা সেরে উঠল কীভাবে? প্লেগে একবার কাউকে ছুঁলে যে তার আর নিস্তার নেই সেটা অবধারিত আপনিও জানেন, আর আমিও।

—সাধারণ নিয়ম হিসাবে আপনি যা বলেছেন তা যদিও সত্য, ডাক্তার রিও বললেন—কিন্তু ধরুন আপনি যদি কিছুতেই এই রোগের কাছে হার মানতে না চান তখন যা দেখে বিস্মিত হতে পারেন এমন একটা বিস্ময়ের কিছু ঘটতেও পারে!

কটার্ড এবার সজোরে হেসে উঠলেন : কিন্তু তেমন ঘটনা ক'টা ঘটে? মৃত্যুর সংখ্যা কতই দাঁড়িয়েছে, আজ সন্ধ্যায় তো দেখলেন।

তারিউ একটা হৃদ্যতাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে এতক্ষণ কটার্ডের হাবভাব লক্ষ্য করছিলেন। তিনি বললেন—মৃত্যুর সর্বশেষ সংখ্যা তিনি দেখে এসেছেন। অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। কিন্তু তাতে কী প্রমাণিত হয়? আরো কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। বিধিনিষেধ আরও বিশেষভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

—তা কীভাবে সম্ভব? ইতিমধ্যেই যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেগুলো কি যথেষ্ট কঠোর নয় ভাবছেন?

—নতুন কোনো ব্যবস্থার কথা বলছিনে। কিন্তু যেসব বিধিনিষেধ ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে, শহরের প্রত্যেকটা লোক সেগুলোকে কঠোরভাবে নিজের ওপর প্রয়োগ করে সেটা অবশ্যই করা দরকার।

কটার্ড যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন এমনভাবে অপলক চোখে তারিউর দিকে চেয়ে রইলেন। আর তারিউ বলে গেলেন—শহরের অধিবাসীদের ভেতরে এইসব বিধিনিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে প্রচুর শৈথিল্য রয়েছে। তাছাড়া প্লেগটা হচ্ছে এমন একটা দুর্যোগ, যার জন্যে প্রত্যেকেরই উৎকণ্ঠা বোধ করা উচিত। এখন প্রত্যেকেরই উচিত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কর্তব্য পালন করা। যেমন যাদের দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য আছে, তাদের সবারই উচিত স্যানিটারি স্কোয়াডে যোগ দেয়া।

—কারো কারো ধারণা হয়তো তাই, কটার্ড বললেন—কিন্তু তাতেই যে অবস্থার তেমন একটা উন্নতি হবে, তা ভাবা হয়তো ভুল। অবস্থা যা দেখছি, তা সবই এখন

প্লেগের নিয়ন্ত্রণাধীন। সেখানে অপর কারো কিছু করার আছে বলে তো মনে হয় না।

—সেটা আমরা তখনই বলতে পারি, তারিউ বললেন, তার গলার স্বর বেশ সংযত—যখন দেখব আমাদের পক্ষ থেকে যা করার দরকার সেগুলো সব করতে পেরেছি।

ডাক্তার রিও এতক্ষণ তার টেবিলে বসে একমনে বিভিন্ন রিপোর্টের কাজ তৈরি করছিলেন। তারিউ তখন রাগত দৃষ্টিতে এই খুদে ব্যবসায়ীটিকে নিরীক্ষণ করছিলেন। কটার্ড যেন খুব অস্বস্তিবোধ করছিলেন এমনিভাবে তার চেয়ারে নড়াচড়া করতে লাগলেন।

—মঁসিয়ে কটার্ড, বলুন তো শুনি। আপনি এখনও আমাদের দলে যোগ দিচ্ছেন না কেন?

কটার্ড তার দামি হ্যাটটা হাতে তুলে নিলেন—যেন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন এমনটি একটা মুখের ভাব নিয়ে তিনি আকস্মিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।—এগুলো আমার কাজ বলে মনে করি না, তিনি বললেন। তারপর খুব যেন একটা বাহাদুরি করছেন এমনি ভাব দেখিয়ে আবার যোগ করলেন—আর তাছাড়া জেনে রাখুন, প্লেগের ফলে আমার বরং অনেক সুবিধাই হয়েছে। সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তাকে বাধা দেয়ার জন্যে মাথা-ঘামানোর সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না।

আকস্মিক যেন একটা অভাবিত প্রসঙ্গ এসে গেছে তারিউ এমনিভাবে নিজের কপালে করাঘাত করলেন।—হ্যাঁ, নিশ্চয়, তা তো বটেই। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম প্লেগ যদি-না বন্ধুর মতো ঠিক সময়ে এসে আপনাকে সাহায্য করত, তাহলে তো অনেক আগেই হাজতে যেতে হত।

কটার্ড আকস্মিক ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। যেন উল্টে পড়ে যাবেন তা থেকে নিজেকে সামলাবার জন্য ঝপ করে পেছনটি ধরে ফেললেন। ডাক্তার রিও ইতিমধ্যে তার লেখা শুটিয়ে ফেলেছিলেন। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গম্ভীরমুখে কটার্ডকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

—কে বলেছে একথা আপনাকে? কটার্ড তীক্ষ্ণগলায় চিৎকার করে উঠলেন।

—কেন আপনি নিজেই তো বলেছিলেন, ভুলে যাচ্ছেন এখন? তারিউর চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।—অন্তত আপনি নিজের সম্পর্কে যেসব কথাবার্তা বলছেন, তা থেকে এটাই আমরা অনুমান করেছি।

কটার্ড নিজের ওপর সংযম হারিয়ে ফেললেন যেন। মিনিটে মিনিটে নানারকমের শপথ করতে থাকলেন।

—দেখুন অত উত্তেজিত হবার দরকার নেই আপনার, তারিউ শান্তগলায় বললেন—আমি বা ডাক্তার কেউ যে পুলিশের কাছে গিয়ে আপনার কথা জানিয়ে দেব, সেটা ভাববেন না। আপনি করেন আর না করেন তা নিয়ে আমাদের মোটেই মাথাব্যথা নেই। আর তাছাড়া দারোগা-পুলিশের কোনো ব্যাপারের মধ্যে আমরা কোনো সময় ঢুকতে চাই না। আপনি শান্ত হোন, বসুন।

কটার্ড চেয়ারটার দিকে বারকয়েক তাকালেন। তারপর কিছুটা ইতস্তত করে ঝপ করে বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা।

—এইরকম একটা কিছু বহুবছর আগে অবশ্য ঘটেছিল, তিনি বললেন—যা হোক
সেই পুরোনো ব্যাপারটা আবার খুঁচিয়ে তোলা হয়েছে। আমার নিজের কিন্তু ধারণা
ছিল সেটা সবাই এতদিনে ভুলে গেছে। কে একজন হঠাৎ সেটা নিয়ে আবার
কথাবার্তা শুরু করে। গোল্লায় যায় যেন বাটা। তারপর থানা থেকে একদিন আমাকে
ডেকে পাঠানো হয়। আমাকে জানিয়ে দেয়া হয় যতদিন পর্যন্ত না ব্যাপারটা সম্পর্কে
তদন্ত শেষ হচ্ছে, শহর থেকে আমাকে এক পা নড়া চলবে না। অবশ্য আমি ধরে
নিয়েছি শেষপর্যন্ত হয়তো তারা আমাকে বাঁধবে।

—গুরুতর তেমন কিছু ঘটেছিল? তারিউ জিজ্ঞাসা করলেন।

—এখন গুরুতর বলতে আপনি কী বুঝলেন সেটা সঠিক না-জানা অবধি কী জবাব
দেবো তবে এটুকু মনে রাখুন ব্যাপারটা খুন বা ঐ-ধরনের কিছু নয়।
এ মুহূর্তে কটার্ডকে দেখে মনে হতে লাগল তিনি সম্পূর্ণ করুণার পাত্র।

—দেখুন ভাগ্য ভালো হলে শুধু জেলের ওপর দিয়েই বেঁচে যেতে পারি।

—তবে কি ব্যাপারটা
কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তিনি আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।
ঘটেছিল শুধু একটা ভুলের জন্যে, আর সবাই তো ভুল করে, করে না? কিন্তু তার
জন্যে শাস্তি পেতে হবে? শুধু তারই জন্যে বাড়িঘর, চিরদিনের পুরোনো অভ্যাস,
এমনকি আত্মীয়স্বজনদের পর্যন্ত ছাড়তে হবে, এটা আমি চিন্তাই করতে পারি না।

—তাহলে কি শুধুমাত্র এই কারণেই; তারিউ আবার জিজ্ঞাসা করলেন—গলায় দড়ি
দেবার অমন চমৎকার চিন্তাটা শুধু এই কারণেই আপনার মাথায় ঢুকেছিল?

—হ্যাঁ, তবে সেটা হয়তো একটু মহা-আহাম্মকের কাজ হয়েছিল, আমি স্বীকার
করছি।

এতক্ষণে ডাক্তার রিও কথা বললেন। কটার্ডকে আশ্বাস দেবার মতো করে
বললেন, তিনি তার উৎকণ্ঠার কারণ সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পেরেছেন, তার বিশ্বাস
এ থেকে কটার্ডের কোনো বিপদ ঘটবে না।

—তা আমিও জানি, ঠিক এই মুহূর্তে আমার আশঙ্কা করার কিছু নেই।

—এতক্ষণে বুঝলাম, তারিউ বললেন—তাহলে আপনি আমার সঙ্গে এই কাজে
আসছেন না?

কটার্ড তার টুপিটা নিয়ে কেমন একটা অনিশ্চিতভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন,
আর তারিউর দিকে তাকাতে থাকলেন।

—মঁসিয়ে তারিউ, এটুকু অন্তত আশা করতে পারি কি যে, এর জন্যে আমার
বিরুদ্ধে কোনোরকম আক্রোশ পোষণ করবেন না?

—অবশ্যই না। তবে ... , তারিউ হাসলেন—আপনার কাছেও একটা অনুরোধ
আছে। অন্তত চেষ্টা করে চারিদিকে এই রোগের বীজাণু ছড়িয়ে বেড়াবেন না যেন।

কটার্ড প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, তিনি নিজে কোনোদিন এটা চাননি, প্লেগের
আবির্ভাব যে এখানে হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ দৈবের ব্যাপার এবং তার জন্যে
ব্যক্তিগতভাবে তাঁর যদি কিছু সুবিধা হয়েও থাকে সেটাও তাঁর ভাগ্য। প্লেগের জন্যে
তাকে দোষী সাব্যস্ত করাটা বোধ হয় কোনোক্রমেই উচিত হবে না।

হঠাৎ ইতিমধ্যে যেন আবার তিনি কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে ফেলেছিলেন।
র‍্যাবেয়ার যখন এসে ঢুকলেন কটার্ড তখন বেশ রুখে উঠেছেন আবার, রীতিমতো
চিৎকার করে বলছেন :

—আর তাছাড়া আমার এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস আপনারা যেসব ব্যবস্থা করতে
চাচ্ছেন তাতে কোনোই ফল হবে না।

র‍্যাবেয়ার যখন শুনলেন, গনজালেসের ঠিকানা কটার্ডের জানা নেই, যুগপৎ বিরক্তি
ও নৈরাশ্যে তাঁর মন ভরে উঠল। কটার্ডকে বললেন, সেই ছোট কাফেটাতে আর-
একবার তাঁরা দুজনে গেলে কেমন হয়।

পরের দিনই যাওয়াটা স্থির হল। ডাক্তার রিও যখন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে
র‍্যাবেয়ার সত্যিই সফল হলেন কিনা সে-ব্যাপারে তিনি সময়মতো খবর পেতে চান।

র‍্যাবেয়ার উত্তরে বললেন—ডাক্তার রিও এবং তারিউ যদি সপ্তাহের শেষের দিকে
হোটেলে গিয়ে তাঁর খোঁজ নেবার চেষ্টা করেন, তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। যদি
তাঁরা খুব রাত করেও যান তাতেও তেমন ক্ষতি নেই, তিনি সবসময় তার ঘরে
থাকবেন, সেখানেই পাবেন তাঁরা তাকে।

পরের দিন সকালবেলা র‍্যাবেয়ার এবং কটার্ড আবার সেই ছোট কাফেতে গিয়ে
হাজির হলেন। গ্রাসিয়াকে বলতে বলে আসলেন সে যেন সেদিন সন্ধ্যায়, আর একান্তই
তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে তার পরের দিন সকালে, এসে কাফেতে তাদের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করে।

সেদিন সন্ধ্যায় তাদের অপেক্ষা করাটা বিফলে গেল। পরের দিন অবশ্য গ্রাসিয়া
আসল। র‍্যাবেয়ারের বক্তব্য সে মনোযোগ দিয়ে শুনল। তারপর বলল, সত্যিই কী
ঘটেছে সে-ব্যাপারে সে নিজে কিছুই জানে না, তবে সে শুনেছে যে শহরের কয়েকটা
অঞ্চল চব্বিশঘণ্টার জন্যে সম্পূর্ণ ঘেরাও করে ফেলা হয়েছিল এবং সেখানে প্রত্যেকটা
বাড়িতে খানাতল্লাশি হয়েছে। তার ধারণা গনজালেস বা এই ছোকরা দুজনে তাদের
কেউই সময়মতো এই ঘেরাও থেকে পালাতে পারেনি। উপস্থিত সে যেটুকু সাহায্য
করতে পারে তা হচ্ছে রাউলের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারে তাদের এবং
স্বভাবতই সেটাও কালকের দিনটা বাদ দিয়ে আগামী পরশু ছাড়া সম্ভব নয়।

—আচ্ছা বুঝলাম, র‍্যাবেয়ার বললেন—সমস্তটাই আবার গোড়া থেকে শুরু করতে
হবে আমাকে—একেবারে প্রথম থেকে।

তবে ঠিক পরের দিন এক রাস্তার মোড়ে রাউলের সঙ্গে র‍্যাবেয়ারের আকস্মিক দেখা
হয়ে যেতেই সে বলল গ্রাসিয়ার অনুমানটা সত্যিই। বাস্তবিকই শহরের যেদিকটা ঢালু
অঞ্চল সেখানকার বেশকিছু জেলা ঘেরাও করে পাহারাদার মোতায়েন করা হয়েছে এবং
বাইরের সঙ্গে সেখানকার আপাতত কোনো যোগাযোগ নেই। এর পরে যেটুকু বাকি
রইল সেটা হচ্ছে, গনজালেসের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করা।

দুদিন পরে র‍্যাবেয়ার গনজালেসের সঙ্গে আবার সেই আগের রেস্তোরাঁয় দুপুরে
খেতে বললেন।

—না! সত্যি এটা বড় রকমের বোকামি হয়ে গেছে, গনজালেস বললেন—পরস্পরের

সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করবার একটা কিছু ব্যবস্থা আপনাদের করে নেয়া উচিত ছিল।

র‍্যাঁবেয়ার নিজেও সেটা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার করলেন।

—যেভাবেই হোক কাল সকালে—গনজালেস বলে চললেন—ছোকরা দুজনকে খুঁজে বার করব, তারপর দেখতে হবে কতদূর অগ্রসর হওয়া যায়।

যা হোক, পরের দিন যখন গনজালেস এবং র‍্যাঁবেয়ার ওদের বাসায় গেলেন, দেখলেন ছোকরা দুজনই ইতিমধ্যে বার হয়ে গেছে। পরের দিন দুপুরবেলা হাইস্কুলের মাঠে দেখা করবে বলে শুধু একটা চিরকুট রেখে গেছে। র‍্যাঁবেয়ার যখন সেদিন হোটেলে ফিরে আসলেন তারিউ তাঁর চেহারা দেখে বিস্ময়ে সম্পূর্ণ হতবাক হয়ে গেলেন।

—আপনার শরীর ভালো তো? তারিউ জিজ্ঞাসা করলেন।

—না, শারীরিক কোনো অসুস্থতা নেই। কাজটা আবার সম্পূর্ণ গোড়া থেকে শুরু করতে হবে, সেটা চিন্তা করায় মনটা বড় মুষড়ে গেছে। কিন্তু কাল রাতে আপনারা দুজনে আসছেন তো, তাই না?

সেদিন রাতে দুই বন্ধু যখন র‍্যাঁবেয়ারের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, দেখলেন র‍্যাঁবেয়ার বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁদের দেখতেই তিনি তক্ষুনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন এবং সামনেই যে মদের গ্লাসগুলো সাজিয়ে রেখেছিলেন, সেগুলো টপাটপ ভর্তি করে ফেললেন। ডাক্তার রিও নিজের গ্লাসটা মুখে তুলবার আগেই র‍্যাঁবেয়ারকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার কাজ কতদূর এগিয়েছে! সাংবাদিক তাঁকে জানালেন যে পুনরায় তিনি গোড়া থেকে শুরু করেছেন এবং সেই আগের জায়গাতে এসে পৌঁছেছেন। দু-এক দিনের মধ্যে তাদের শেষপর্যায়ে দেখাসাক্ষাৎ হবে। তারপর নিজের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বিমর্ষভাবে মন্তব্য করলেন : নিশ্চয় রাতেও দেখা যাবে হয়তো ঠিক সময়ে তারা অনুপস্থিত।

—ভাবছেন কেন, গেলবারে ওরা আসতে পারেনি বলে এ রাতেও যে অনুপস্থিত থাকবে এমন তো কোনো কথা নয়।

—তাহলে দেখছি আপনি এখনও অনুধাবন করতে পারেননি, যেন কঠিন ঘৃণার সঙ্গেই র‍্যাঁবেয়ার তার কাঁধজোড়াটায় একবার ঝাঁকানি দিলেন।

—কী ধরনের কথা বলছেন?

—প্লেগ, প্লেগের কথা বলছি।

—আচ্ছা তাই নাকি? ডাক্তার রিও চিৎকার করে উঠলেন।

—হ্যাঁ, সত্যিই আপনি এর চরিত্র এখনও সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। এর অর্থই হচ্ছে ঠিক তাই, সেই একই জিনিসের বারবার পুনরাবৃত্তি হওয়া।

র‍্যাঁবেয়ার উঠে গিয়ে ঘরের এককোণে একটা ছোট গ্রামোফোন চালিয়ে দিলেন।

—রেকর্ডখানা কী বলুন তো? তারিউ জিজ্ঞাসা করলেন—আগে কোথাও শুনেছি মনে হচ্ছে।

—গানটা হচ্ছে দুঃস্থ নিবাসে সেন্ট জেমস।

গ্রামোফোনটা তখনও বেজে চলেছিল। এমন সময় বাইরে রাস্তায় দুবার গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

—কুকুর মারা পড়ল, না কেউ পালিয়ে যাচ্ছে?

আরও কয়েক মিনিট পরে রেকর্ডটা বাজা শেষ হয়ে গেল। রাস্তায় জনসাধারণ ঠিক নিচেই এ্যাম্বুলেন্সের শব্দ শোনা গেল। আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল শব্দটা।

—কেমন একটা বিরক্তিকর বলে মনে হয় রেকর্ডখানা, র‍্যাঁবেয়ার মন্তব্য করলেন—তবুও এই নিয়ে আজ দশবার বাজালুম।

—সত্যি তাহলে আপনার এত ভালো লাগে রেকর্ডটা?

—কী জানি, ভালো লাগার তো কথা নয়। তবে কী, মাত্র এই একখানা রেকর্ডই আছে আমার কাছে।

তারিউ মিনিটখানেক চুপ করে থেকে আবার বললেন—এটা যে তাই, সেই কথাই বলছিলাম অর্থাৎ একই জিনিস বারবার ঘটে।

স্যানিটারি স্কোয়াডগুলো কীভাবে কাজ করছে, র‍্যাঁবেয়ার ডাক্তার রিও-র কাছে তা জানতে চাইলেন। ডাক্তার রিও জানালেন গোটা-পাঁচেক দল আপাতত কাজ করছে, তবে খুব শীঘ্রই তাদের সংখ্যা বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে। র‍্যাঁবেয়ারকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে হাতের নখগুলো পরীক্ষা করছেন। বিছানার ধারেই জেঁকে বসেছিলেন তিনি। ডাক্তার রিও স্থিরদৃষ্টিতে তার বলিষ্ঠ গঠন ও দেহকাঠামো লক্ষ্য করছিলেন। হঠাৎ ডাক্তার রিও-র চোখে পড়ল র‍্যাঁবেয়ারও তাঁর দিকে চাইছেন—দুজনেরই চোখাচোখি হয়ে গেল।

—দেখুন ডাক্তার, আপনাদের এই স্যানিটারি স্কোয়াডগুলো সম্পর্কে আমি অনেক ভেবে দেখেছি। এখনও যে আপনাদের সঙ্গে যোগ দিইনি, আমার দিক থেকে তারও কিছুটা কারণ অবশ্য আছে। আমার মনে হয় না, নিজের জীবনকে আবার বিপন্ন করতে চাই না বলেই এইভাবে পিছিয়ে আছি। স্পেনের গৃহযুদ্ধে আমি যোগ দিয়েছিলাম।

—কোন পক্ষে? তারিউ জিজ্ঞাসা করলেন।

—যে-পক্ষকে শেষপর্যন্ত পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল। তারপর থেকে এসব নিয়ে আমি নিজেও ভাবনাচিন্তা করছি।

—কী নিয়ে এত ভাবনাচিন্তা করছেন?

—সাহস, বীরত্ব এগুলো নিয়ে আমি এখন অনুভব করি যে মহৎ কিছু-না-কিছু করার ক্ষমতা সব মানুষেরই আছে। কিন্তু দেখুন, মহৎ কোনো অনুভূতি যার নেই তার সান্নিধ্যে গেলে আমার মন যেন আর কোনোকিছুতেই সাড়া দিতে চায় না।

—কিন্তু আমি তো অনেক সময় ভাবি যে সবকিছুই বুঝি আমাদের পক্ষে সম্ভব, তারিউ মন্তব্য করলেন।

—দেখুন আমি কিছুতেই রাজি নই। মানুষ যেমন দীর্ঘ সময় একটানা দুঃখভোগ করতে পারে না, তেমনই একটানা সুখভোগও তার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার কাছে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, সত্যিকারের যা-কিছু মহৎ বা মূল্যবান তা করবার সাধ্য মানুষের নেই।

র‍্যাঁবেয়ার একবার ডাক্তার ও তারিউর দিকে চাইলেন, তারপর বললেন— আচ্ছা তারিউ, সত্যি বলুন তো, আপনি ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারবেন?

—অবশ্য আমার পক্ষে বলা শক্ত, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তের কথা যদি বলেন তাহলে হয়তো স্বীকার করতে পারব না।

—দেখুন তাহলে যে-কোনো একটা বিশ্বাস বা ধারণার জন্যে প্রাণ দেবার সাহস আপনার সত্যিই আছে। সেটা যে-কেউ দেখলেই বলবে। কিন্তু আপনার মতো যারা বিশ্বাসের জন্যে আত্মদান করতে প্রস্তুত, এমন মানুষ আমার জীবনে আমি প্রচুর দেখেছি। ব্যক্তিগতভাবে তাদের অনেকের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যেও এসেছি। মানুষ যাকে বীরত্ব বলে, তার ওপর আর আমার তেমন আস্থা নেই। এই বীরত্ব দেখানোটা যে অতি সহজ কাজ, সে উপলব্ধি এখন আমার হয়েছে এবং সেইসঙ্গে আরো একটা উপলব্ধি হয়েছে যে, এই বীরত্ব অনেক সময় মানুষের জন্যে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। মানুষ একান্তভাবে ভালোবাসার জন্যেই বেঁচে থাকবে বা প্রয়োজন হলে তারই জন্যে মৃত্যুবরণ করবে—এটাই দেখতে চাই আমি। এখন এতেই আমার যতকিছু আগ্রহ।

ডাক্তার রিও এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে র‍্যাঁবেয়ারকে লক্ষ্য করছিলেন, তাঁর দৃষ্টি তেমনি নিবদ্ধ রেখেই তিনি নরম সুরে বললেন : শুধু ভাবনা, চিন্তা বা ধারণাই মানুষের জীবনে সবখানি নয়।

র‍্যাঁবেয়ার এবার তার বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে পড়লেন। আবেগে উত্তেজনায় তার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল—স্নেহ-ভালোবাসা আকর্ষণ যে মানুষের কাছে তুচ্ছ, তার জীবন শুধুমাত্র কতকগুলো ধ্যান-ধারণা নিয়েই বটে। সামান্য কিছু চিন্তাকে ঘিরেই হচ্ছে তার সমস্ত অস্তিত্ব এবং আমার নিজের বক্তব্য হচ্ছে তাই : মানুষ আমরা, সমগ্র মানবতাই যেন ভালোবাসার ক্ষমতাকে হারিয়ে ফেলেছি। এই বাস্তব সত্যকে এখন আমাকে উপলব্ধি করতে হবে ডাক্তার। সুতরাং সেই ক্ষমতা আমরা যতদিন-না আবার অর্জন করতে পারছি ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আর যদি সেটা একান্তই আমাদের সাধ্যের অতীত কিছু হয়, তাহলে যতদিন-না আমাদের সেই অক্ষমতা থেকে মুক্তির সময় আসছে, ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কেননা মুক্তির সময় আমাদের একদিন-না-একদিন ঘটবেই এবং তার জন্যে হয়তো আমাদের কারো কারো বীর সাজবারও প্রয়োজন নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি এর বাইরে কিছু চিন্তা করিনে।

ডাক্তার রিও এবার উঠে দাঁড়ালেন। আকস্মিক যেন তাঁকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বলে মনে হল।

—আপনি ঠিকই ধরেছেন র‍্যাঁবেয়ার, আপনার কথাই ঠিক। পৃথিবীতে মূল্যবান এমন কিছু নেই যার জন্য আপনি নিজে যে-পথ বেছে নিয়েছেন তা থেকে আপনাকে ফেরাবার জন্যে আমি অনুপ্রাণিত করতে পারি। আপনার চিন্তা এবং কাজ আমি সম্পূর্ণ সঙ্গত বলে মনে করি। তার সামান্য একটা কথা এই প্রসঙ্গে আমি আপনাকে বলতে চাই। আমরা এখন যা-কিছু করছি সেসবের ভেতর সত্যি কোনো বীরত্ব নেই। অন্তত আমরা সেভাবে চিন্তা করিনে। আমাদের এসব কাজের পেছনে আছে শুধুমাত্র একটা সাধারণ শালীনতাবোধ। তার অধিক কিছু নেই। হয়তো এমনও হতে পারে আমাদের এই ধরনের চিন্তা অনেকেরই মনে হাসির উদ্রেক করবে। কিন্তু এটাও অবশ্যই সত্য যে, প্লেগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার এর চেয়ে ভালো হাতিয়ার আপাতত আমাদের

সামনে নেই, এই সাধারণ শালীনতাবোধটুকু ছাড়া।

—কিন্তু আপনার এই সাধারণ শালীনতাবোধটা আসলে কী? কী বোঝাতে চান আপনি এর দ্বারা? র‍্যাঁবেয়ারের গলার স্বর অত্যন্ত গম্ভীর মনে হল এবার।

—অপরে এর দ্বারা কী বুঝে তা অবশ্য আমি জানি না। তবে আমার নিজের কাছে এর অর্থ হচ্ছে নিজের যেটুকু দায়িত্ব সেটাকে সঠিকভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাওয়া।

—আপনার নিজের দায়িত্ব, কিন্তু হায়! আমার নিজের দায়িত্ব যে কোনটা সেটা যদি সঠিকভাবে জানতে পারতাম! র‍্যাঁবেয়ারের গলার স্বরে এবার যেন কিছুটা বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পেল।—জানি না, শুধুমাত্র ভালোবাসাকে মানুষের জীবনে এইরকম একটা গুরুত্ব দিয়ে আমি হয়তো সবটাই ভুল করছি।

ডাক্তার রিও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে র‍্যাঁবেয়ারের চোখের দিকে তাকালেন।

—না না, তা কেন ভাবছেন? তিনি বেশ জোর দিয়ে বললেন—আপনি একটুও ভুল করেননি, মোটেই ভুল করেননি আপনি।

র‍্যাঁবেয়ার আবার কিছুটা চিন্তান্বিতভাবে তাঁদের দুজনের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন।

—আমার ধারণা আপনারা যে দায়িত্বের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়েছেন তাতে আপনাদের দুজনের কারো সত্যিকারের হারাবার মতো কিছু নেই—এরকম যেখানে অবস্থা, সেখানে ন্যায্য বা সত্যের অনুসারী হতে মানুষের জন্যে প্রতিবন্ধকতা আসে খুব অল্প।

ডাক্তার রিও তার গ্লাসের বাকি সবটুকু এক চুমুকে শূন্য করে ফেললেন।

—চলুন, চলুন, দেখি—তিনি তারিউকে লক্ষ্য করে বললেন—আমাদের আবার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

তারিউ ডাক্তারের পেছন পেছন তাঁকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছে হঠাৎ যেন তাঁর মনে নতুন চিন্তার উদয় হল। তিনি র‍্যাঁবেয়ারের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন।

—আপনি হয়তো জানেন না, ডাক্তার রিও-র স্ত্রী এখন স্বাস্থ্যনিবাসে চিকিৎসাধীন। এখান থেকে শ-খানেক মাইল দূরে এক স্বাস্থ্যনিবাসে আছেন তিনি।

র‍্যাঁবেয়ার এবার সত্যি হঠাৎ খুব বিস্মিত বোধ করলেন, কী যেন বলতে চাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু তারিউ ততক্ষণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন।

পরের দিন খুব প্রত্যুষে র‍্যাঁবেয়ার ডাক্তারকে টেলিফোন করলেন—শহর ছেড়ে যাবার কোনো উপায় বের করতে না-পারা অবধি যদি আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই, তাতে আপনাদের সম্মতি আছে?

একটা মিনিটকাল সময় নীরবে কেটে গেল, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে ডাক্তার রিও-র উত্তর এল : নিশ্চয়ই আপনাকে অভিবাদন জানাব আমরা। অশেষ ধন্যবাদ, র‍্যাঁবেয়ার।

তৃতীয় পর্ব

এইভাবে সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ ধরে প্লেগের রোগীরা সাধ্যমতো রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলল। তাদের ভিতর কেউ কেউ, যেমন র‍্যাঁবেয়ার একজন, মাঝে মাঝে এমন কল্পনাও করত যেন তারা তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন মানুষের মতোই আচার-আচরণ করে চলেছে। স্বাধীনভাবে যা-খুশি করবার মতো ক্ষমতাও আছে তাদের।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে এটা বললেই বরং অধিক সত্য বলা হত যে প্লেগ ততদিনে, আগস্টের মাঝামাঝি সেটা, আশেপাশের সবকিছু এমনকি শহরের প্রত্যেকটা মানুষের জীবন পর্যন্ত গ্রাস করে ফেলেছিল। তখন আর ব্যক্তিগত নিয়তি বলে তাদের কারো কিছু ছিল না। মিলিতভাবে তাদের সবার জন্যে ছিল একটাই এবং সে নিয়তি হচ্ছে প্লেগ আর তারই সঙ্গে যেসব অনুভূতিতে তারা সবাই শরিক হতে পারত, সেই অনুভূতিগুলো। এই সময় তাদের ভেতর সবচেয়ে তীক্ষ্ণ সাধারণ অনুভূতি ছিল একধরনের নির্বাসিত বোধ এবং বঞ্চিতবোধ এবং তাদের থেকে শঙ্কা এবং বিদ্রোহের যেসব পরস্পরবিরোধী চেতনার সৃষ্টি হত সেগুলো। কাজেই কাহিনীকার এই সময়টাতে যখন শহরের ওপর প্লেগের প্রকোপ দুই-ই ছিল চরম, কিছুটা সাধারণভাবেও আবার কিছুটা দৃষ্টান্ত দেয়ার জন্যেও শহরের জীবন ও ব্যক্তিদের উচ্ছৃঙ্খলতার, বিরহকাতর প্রেমিক-প্রেমিকাদের দুঃখ-বেদনার বর্ণনা দেবার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় বলে বিবেচনা করেছেন।

এই সময় বরাবর আকস্মিক একদিন একটা প্রবল দমকা ঝড় উঠল এবং প্লেগ-উপদ্রুত শহরের ওপর দিয়ে বইল সেই ঝড়। ঝড়কে ওরাও শহরের অধিবাসীরা বিশেষ করে ভয় করত, কারণ যে-অধিত্যকার ওপর শহরটার অবস্থান সেখানে ঝড়ের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা ছিল না। কাজেই এখানে একবার ঝড় উঠলেই শহরের সর্বত্র তার প্রচণ্ড দাপট শুরু হয়ে যেত। কোথাও তা কোনোরকম বাধা পেত না, যার ফলে শহরে আবার কিছুটা স্থবিরতা ফিরে আসত। গেল কয়েক মাস ধরে এমন একফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি সেখানে এবং সবকিছুর ওপরে একটা ধূসর পুরু আবরণের মতো গড়ে উঠেছিল। এখন ঝড়ের বেগে সেগুলো হালকা মেঘের মতো উঠে গিয়ে বাতাসের সঙ্গে উড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল সেগুলো গুঁড়িয়ে রেণু রেণু হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে গেছে এবং তার ফলে সমস্ত আকাশ ধুলার মেঘে ছেয়ে গেছে। কিছুটা চারপাশের এই ধুলার জন্যে, আবার কিছুটা অসংখ্য কাগজের টুকরা ঝড়ের সর্বক্ষণ যা মানুষের পায়ের চারপাশে ঘুরতে থাকত, তার জন্যে রাস্তাঘাট ক্রমেই জনশূন্য হয়ে উঠতে থাকল।

কদাচিৎ কোথাও কেউ বের হলেও দেখা যেত রুমাল বা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ত্রস্তপায়ে এগিয়ে চলেছে। রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে আগে যেমন চারিদিকে লোকজনের সমাগম দেখা যেত, মনে হত প্রত্যেকেই যেন সেই দিনটাকেই তার জীবনের শেষদিন ভেবে নিয়ে তাকে যতদূর সম্ভব দীর্ঘায়িত করবার ব্যর্থ চেষ্টায় নিজেকে চরম আনন্দ-ফূর্তির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে, এখন আর তেমন কিছু চোখেও পড়ে না। তার পরিবর্তে দেখা যেত অল্প কিছু কিছু লোকের ছোট ছোট দল, হয় গৃহঅভিমুখে চলেছে অথবা তাদের নিজেদের কোনো কাজের দিকে। এরপরে বেশ কিছুদিন ধরে গোধূলি সময়টায়, বছরের এই সময়টায়ই গোধূলি নামত সাধারণত বেশ দ্রুত, দেখা যেত চারিদিকের রাস্তাঘাট যেমন জনশূন্য আবার তেমন নিস্তব্ধ ঝড়ের একটানা ক্রুদ্ধ গোঙানি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না এবং ঝড়ে আন্দোলিত এবং বিক্ষুব্ধ অদৃশ্য সমুদ্র থেকে লবণাক্ত জল এবং সামুদ্রিক আগাছার গন্ধ ভেসে আসত চারপাশে; সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের প্রবল চাপ বাড়ছে থেকে থেকে আর ঝড়ের একটানা গোঙানি, এই সবকিছু মিলিয়ে ক্রমেই সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের ভেতর জনশূন্য এই শহরটাকে মনে হত জীবনে যারা অভিশপ্ত তাদের জন্য বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপ।

এতদিন প্লেগ তার বেশির ভাগ শিকার খুঁজত শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ততটা নয় যতটা আশেপাশের ঘিঞ্জি অঞ্চলে, যেখানে উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া সবসময় সম্ভব হত না। যাহোক, সম্পূর্ণ ব্যবসা-এলাকাগুলোর ওপর হামলা শুরু করল এবং সেখানে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে একেবারে জাঁকিয়ে বসল যেন। শহরের অধিবাসীরা সবাই বলতে লাগল বাতাস রোগের সংক্রমণ ছড়াচ্ছে, হোটেলের ম্যানেজার যেমন অভিযোগ করলেন একদিন। যে কারণেই হোক প্লেগের কেমন একটা বিষণ্ণ ভাবলেশহীন বিপদ-সঙ্কেত বাজাতে বাজাতে বিকট ঝনঝন শব্দ তুলে এ্যাম্বুলেন্সগুলো প্রতিদিন যতই শহরবাসীদের জানালার নিচে দিয়ে মন ঘন ছুটাছুটি করতে লাগল, ততই তারা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে থাকল এবার তাদের পালা শুরু হয়েছে।

কাজেই শহরের এই-যে মধ্যবর্তী অঞ্চলের, বিশেষ করে যেসব জায়গায় প্লেগের প্রকোপ খুব বেশি, এমন কিছু কিছু এলাকা সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলা হবে এবং যাদের সাহায্য এবং কাজ একান্ত অপরিহার্য এমন লোক ছাড়া অন্য কাউকে আর সেই এলাকার বাইরে যাতায়াতের অনুমতি দেয়া হবে না—এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কর্তৃপক্ষ চিন্তা করতে লাগলেন। যখন সত্যিই তা কার্যকর করা হল, এইসব এলাকার লোকেরা এই ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র তাদেরই ওপর প্রযোজ্য কতগুলি বিধিনিষেধ বলে ধরে নিল এবং তুলনামূলকভাবে শহরের অপর অঞ্চলের অধিবাসীরা তখন পর্যন্ত যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত তার জন্য তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। অন্যদিকে আবার যখন সত্যিই তাদের সামনে নৈরাশ্য এসে উপস্থিত হল, মুক্ত এলাকার লোকেরা অপেক্ষাকৃত অধিক বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ এই অঞ্চলের লোকেদের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে নিজেদের প্রফুল্ল এবং উৎসাহিত করে তোলবার চেষ্টা করত। যা হোক, আমার চেয়ে দূরবস্থার লোকেরাও আছে—তখনকার সেই অবস্থার ভেতর সান্ত্বনা পাবার মতো যা-কিছু ছিল, তা এই মন্তব্যে সম্পূর্ণ বর্ণিত হয়েছে।

ঠিক এই সময় থেকে বিশেষ করে পশ্চিম গেট সংলগ্ন বসতি অঞ্চলগুলোয় তখন আগুন লাগাটা যেন অসম্ভব রকমের বেড়ে গেল। অনুসন্ধানের পর দেখা গেল রোগ-সংক্রমণের বাইরে পৃথক এলাকায় রাখা হয়েছিল যেসব লোকদের, তাদের ভেতর পালিয়ে শহরে ফিরে এসেছিল যারা, তারাই সাধারণত এই অগ্নিসংযোগ করে বেড়াত। প্রিয়জন বিয়োগের শোকে এবং উদ্বেগে অস্থিরচিত্ত এইসব লোকদের মনে একটা অদ্ভুত ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছিল যে, এইভাবে আগুন লাগিয়ে সাধারণ ধ্বংস সাধন করে তারা প্লেগের বীজাণু নির্মূল করতে সক্ষম হবে। এই আগুন নেভাবার জন্যে কর্তৃপক্ষকে শুধু-যে রীতিমতো বেগ পেতে হত তা নয়, এখন এত ঘন ঘন এবং এত অধিক সংখ্যক চারিদিকে আগুন লাগানো হত যে, শহরে তখন ঝড় বইতে থাকা কোনো-কোনো স্থানে গোটা অঞ্চলের লোকেদের নিয়ত কঠিন বিপদের আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাতে হত। সরকারের তরফ থেকে প্রতিদিন বাড়িতে বাড়িতে ধোঁয়া দেবার যে নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছিল, প্লেগের সংক্রমণ বন্ধ করার জন্যে সেটাই যে যথেষ্ট কার্যকর ব্যবস্থা, শত চেষ্টার পরেও মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই অগ্নি-সংযোগকারীদের যখন কিছুই তা বিশ্বাস করানো সম্ভব হল না এবং তাদের বিশ্বস্ত করাবার অন্য সব উদ্যোগই যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, তখন এ-ধরনের কার্যে কঠিন শাস্তির বিধান করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেষপর্যন্ত এইসব অপ্রকৃতিস্থ লোকেরা যখন শান্ত হয়ে আসল, তারা যে শুধু জেলের ভয়ে এই কাজ থেকে বিরত হল তা নয় এবং এই সময় শহরের জেলখানাগুলোয় মৃত্যুর হার অকস্মাৎ বাড়তে থাকায় সাধারণ লোকেদের মধ্যে যে একটা ভীতিপ্রদ ধারণা জন্মেছিল তা তাদের সংখ্যা কমাবার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক। অবশ্য এটাও স্বীকার করা দরকার যে তাদের এই বিশ্বাসের মূলে অনেকখানি সত্য ছিল। কারণ দেখা যেত, হয়তো সুস্পষ্ট কারণেই প্লেগের সবচেয়ে প্রবল আক্রমণের লক্ষ্য হত তারাই, যারা প্রয়োজনেই হোক অথবা স্বেচ্ছায়ই হোক দলবদ্ধ হয়ে বাস করত; যেমন সৈনিক, কয়েদি, যাজক এবং নানদের দল। কদাচিৎ কোনো-কোনো কয়েদিকে নিঃসঙ্গ এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখা হলেও জেলখানাগুলোও যে অতীতে একধরনের সংঘবদ্ধ সমাজের মতোই এটা প্রমাণিত হল এই ঘটনা থেকে যে, শহরের জেলখানাগুলোয় সাধারণ কয়েদিরা মারা পড়ত যে-পরিমাণে, ওয়ার্ডাররা মারা পড়ত সেই একই হারে। বাস্তবিকই প্লেগের কাছে কেন ছোট বড় কোনোরকম ভেদাভেদ ছিল না। তার স্বেচ্ছাচারী শাসনের অধীনে গভর্নর থেকে শুরু করে সাধারণ অপরাধী পর্যন্ত সবাইকে একই দণ্ডাদেশ ভোগ করতে হত, সম্ভবত জেলখানাগুলোয় এই প্রথম পক্ষপাতশূন্য ন্যায়ের বিধান চালু হয়েছিল।

প্লেগ যে সবাইকে এইভাবে সমপর্যায়ে নামিয়ে আনছিল তার প্রতিবিধানের জন্যে সরকারের তরফ থেকে প্লেগের শিকারদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য সৃষ্টির একটা উদ্যোগ নেয়া হয়। উদ্যোগটা ছিল, ওয়ার্ডারদের ভেতর যারা কর্তব্য সম্পাদনকালে মৃত্যুবরণ করবে তাদের কিছু কিছু সম্মাননাতে ভূষিত করা। কিন্তু শেষপর্যন্ত সুফল হয়নি। যেহেতু তখন দেশে সামরিক আইন চালু ছিল এবং একদিক থেকে বিচার করলে ওয়ার্ডারদের তখনকার চাকুরিকে সামরিক হিসেবে গণ্য করা চলত, সেই

কারণেই কর্তব্য-সম্পাদনকালে তাদের কারো মৃত্যু ঘটলে মৃত্যুর পর তাদের সামরিক মেডেল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কয়েদিদের তরফ থেকে যদিও এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনোরকম প্রতিবাদ আসতে দেওয়া হয়নি, সামরিক সার্কেলের কেউ কেউ একে কেন্দ্র করে প্রবল আপত্তি তুললেন। তারা বিশেষ করে যুক্তি দেখান—যা হয়তো কিছুটা সঙ্গত বটে যে—এই ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের ভেতর একটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। বেসামরিক কর্তৃপক্ষ এই যুক্তি মেনে নেন, তখন থেকে স্থির হয় ওয়ার্ডারদের ভেতর কর্তব্য-সম্পাদনকালে যারা মারা পড়বে, তাদের সম্মানসূচক প্লেগ-মেডেল দেওয়া হবে। কিন্তু আগেই কিছু কিছু লোককে সামরিক মেডেল দেবার ফলে সামরিক কর্তৃপক্ষের যা ক্ষতি হবার ইতিমধ্যেই হয়েছিল। এবং এই সম্মান যাদের দেওয়া হয়েছিল তা আবার তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেবার প্রস্তাব দেয়াও সম্ভব ছিল না। এই নতুন ব্যবস্থার পরিবর্তন তাই সামরিক সার্কেলের লোকেদের তেমন খুশি করতে পারল না। তবে প্লেগ-মেডেল দেয়ার অন্য একটা মস্ত অসুবিধা ছিল। সম্মানসূচক সামরিক মেডেলের সঙ্গে যে সাধারণের নৈতিক প্রভাব বাড়তে থাকে, প্লেগের মেডেলের সঙ্গে সেরকম কিছুরই সংযোগ করতে চাইত না, কারণ এইরকম একটা দুর্বিপাকের সময় যে-কেউ প্লেগের মেডেল পেতে পারত।

এই সময় আরও একটা অসুবিধা দেখা দেয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ এবং তাদের চেয়ে কিছু ভিন্ন হলেও সামরিক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ব্যাপারে যেসব নিয়ম বা পদ্ধতি মেনে চলতেন, জেল শাসন কর্তৃপক্ষের সেগুলো অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। শহরের দুটো মঠের যাজকদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্মানুগত কিছু কিছু পরিবারের সঙ্গে সাময়িকভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। ঠিক সেই একই নিয়মে যেখানে যেখানে তা সম্ভব ছোট ছোট দলে বিভক্ত কিছু কিছু সৈনিকদের সাময়িকভাবে ব্যারাক থেকে স্থানান্তর করে ছেলেমেয়েদের স্কুলে বা সরকারি ভবনে থাকতে দেয়া হয়। এইভাবে প্লেগ যেমন বাহ্যত একদিকে আমাদের ভেতর অবরুদ্ধ শহরের অধিবাসীদের মতো একধরনের ঐক্য এনে দিয়েছিল, তেমনি আবার অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত সমাজের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে অনেককেই সমাজের বাইরে নিঃসঙ্গ এবং অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছিল। এর ফলে আমাদের বরাবর যে একটা সাধারণ বিক্ষোভের মনোভাব ছিল সেটা আরো কিছুটা প্রবল হয়ে ওঠে।

বাস্তবিকই এখন এটা কল্পনা করা কিছুটা সহজ যে এইরকম নানা পরিবর্তন এবং তখনকার সেই একটানা ঝড়ো হাওয়া কারো কারো মধ্যে একটা কলহের মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল। তখন প্রায়ই দেখা যেত শহরের বিভিন্ন গেটের ওপর হামলা হয়েছে এবং এই আক্রমণ পরিচালনা করত যারা তারা বেশির ভাগ সময় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে আসত। কারণ এই দুই পক্ষের ভেতর রীতিমতো গুলি বিনিময় হত, ফলে হতাহত যেমন হত তেমনই আবার অনেকেই অক্ষত অবস্থায় পালাতেও সক্ষম হত। এর পর থেকে গেট পাহারা দেবার গোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং তার ফলে আক্রমণও আস্তে আস্তে থেমে যায়।

গেটের ওপর আক্রমণ এখন থেকে বন্ধ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু এই আক্রমণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কিছুদিন পর থেকে ছোট আকারে হলেও অসংখ্য বিপ্লবাত্মক বলপ্রয়োগের ঘটনার সূত্রপাত হয়। যেসব বাড়ি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল, সেসব বাড়ি এখন থেকে নিয়মিত লুট হওয়া শুরু হল।

যাহোক এসব বাড়াবাড়ির ঘটনা যে পূর্ব-পরিকল্পিত, ঠিক তেমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যেত না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যেত স্বাভাবিক অবস্থায় যাদের আচার-আচরণ বেশ সংযত ও ভদ্র এমন লোকে সাময়িক উত্তেজনার বশে অনেক সময় এইরকম কাজ করে বসত। আর একবার কেউ এই ধরনের একটা কিছু করে বসলে তার সাহায্যকারী জুটতে কোনো সময় বিলম্ব হত না। এইভাবে অনেক সময় এমন দৃশ্যও চোখে পড়ত যে একটা বাড়ি হয়তো তখনও দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলছে, বাড়ির মালিকও কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, শোকে-দুঃখে মুহ্যমান, আগুনের লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি, এমন সময় আকস্মিক একটা উন্মত্ত উত্তেজনার বশে কেউ হয়তো ছুটে গিয়ে সেই জ্বলন্ত আগুনের ভেতর ঢুকে পড়ল। সম্ভাব্য বিপদ-আপদের প্রতি তার এই সম্পূর্ণ উদাসীন মনোভাব দেখে আশেপাশের দর্শকদের অনেকেই তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আগুনের ভেতর ঢুকতে শুরু করত। অল্পসময়ের ভেতর দেখা যেত সমস্ত অন্ধকার রাস্তাটা জুড়ে অসংখ্য লোক দাপাদাপি ছুটাছুটি করছে, প্রত্যেকের মাথার ওপর অথবা কাঁধে গহনা কিংবা অন্য আসবাবপত্রের বোঝা আর নির্বাণোন্মুখ আগুনের কম্পমান শিখায় তাদের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে তাদের দেখতে হয়েছে কুঁজো বামনের মতো।

এই ধরনের নানা ঘটনা অনবরত ঘটতে থাকায় কর্তৃপক্ষ সামরিক আইন জারি করতে বাধ্য হলেন এবং আরও বাধ্য হলেন সামরিক শাসনের ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন বাধা-নিষেধ কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে। একদিন লুণ্ঠনে ব্যস্ত দুজন শহরবাসীকে দেখামাত্র গুলি করে হত্যা করা হল, তবে সত্যি অন্যদের ওপর এই ঘটনার কোনো প্রভাব পড়েছিল কিনা সে-ব্যাপারে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কারণ প্রতিদিন যেখানে প্লেগে শত শত লোকের মৃত্যু হত, সেখানে সামান্য দুজন লোককে যে এইভাবে গুলি করে মারা হল, সে ঘটনা কারো চোখে না-পড়ারই কথা। এই দুটো মৃত্যু ছিল সেখানে সমুদ্রের মাঝে বারিবিন্দুর মতো।

প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের ঘটনা এখন প্রায়ই ঘটতে থাকল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাকে বাধা দেয়ার জন্যে যে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করা হবে, লোক-দেখানো হলেও তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা গেল না। প্রতিদিন কারফিউ জারির জন্যে যে একটা সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল, শুধুমাত্র সেই নিয়মটার কিছুটা প্রভাব দেখা যেত সাধারণের ওপর। রাত এগারোটার পর থেকে অন্ধকারে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত ওরাও শহরকে মনে হত যেন একটা বিরাট সমাধিক্ষেত্র।

ভরা জ্যোৎস্নার রাতে যখন আলোর প্লাবন নেমে আসত, আর চারিদিকে কোথাও একটু পায়ের শব্দ বা কুকুরের ডাক শোনা যেত না—চারিদিকে বিরাজ করত শুধু একটা থমথমে পরিবেশ, তখন শহরের দীর্ঘ ঋজু রাস্তা আর তাদের দুপাশের আধা

মলিন সাদা দেয়াল—যাদের ওপর কোথাও এতটুকু গাছের কালো ছায়ার স্পর্শ পর্যন্ত দেখা যেত না, মনে হত যেন যতই সামনের দিকে এগিয়ে গেছে ততই তাদের উজ্জ্বলতা হ্রাস হতে হতে একসময় হঠাৎ যেন অস্বচ্ছতার মাঝে মিলিয়ে গেছে। চারপাশের এই অগাধ মৌনতার মাঝে নিমজ্জিত ওরাও শহরকে তখন মনে হত যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নিশ্চল কিউবের সমষ্টি আর তাদের মাঝে মাঝে ব্রোঞ্জের আবরণ এবং পাথর বা ধাতুর ভাবলেশহীন মুখবিশিষ্ট মহাপুরুষ ব্যক্তিদের যে মৌন প্রতিমূর্তিগুলো দেখা যেত, শুধুমাত্র সেগুলোকেই মনে হত এইসব মৃতব্যক্তিদের ক্ষমতাপূর্ণ প্রতিকৃতি হিসাবে—যেখানে উপস্থিত নিচু আকাশ আর প্রাণস্পন্দনহীন বিভিন্ন পার্ক বা এ্যাভিনিউর পটভূমিকায় দাঁড় করানো জীবন্তের প্রতিমূর্তিগুলোকেই।

তখনকার সেই পরিবেশের মধ্যেই মনে হত সবচেয়ে প্রত্যক্ষ উপস্থিতি তখন আমাদের সবার জন্য যে একটা সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, দৈত্যের মতো সেই নির্জীব প্রতিমূর্তিগুলো ছিল তারই একটা মূর্ত প্রকাশ; আর তারই শেষপর্যায় অর্থাৎ একটা মৃত শহর—যেখানে প্লেগ, যা পাথরের আকারে নির্মিত যার নিষ্পেষণে প্রতি কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। এই প্রতিমূর্তিগুলো ছিল যেন জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। প্রতিটা মানুষের অন্তর এখন মনে হত যেন নৈরাশ্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কারণ কবরখানার আশপাশ থেকে যেসব গুজব ছড়াত, তাদের ভেতর আশান্বিত বোধ করবার মতো কিছুই থাকত না। যেমন থাকত না প্রতিদিন সত্যিকারের যেসব ব্যাপার ঘটত তাদের ভেতর কবরখানার বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ না করে কাহিনীকারের উপায় ছিল না। কাজেই নিজের সমর্থনে এখানে দু-চার কথা বলাটাও তার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই তাঁর ধারণা। কিন্তু এ-ব্যাপার নিয়ে তার ওপর যে নিশ্চিত দোষারোপ আমার, সে-সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। এ-ব্যাপারে তার নিজের সমর্থনে যেটুকু বলার তা বলা হবেই। এই-যে এখন নিয়তই দেখা যেত কোথাও-না-কোথাও মৃতের দাফন এবং তারই সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে, কাজেই শহরের অন্য সবার মতো বাস্তবিকই এগুলো লক্ষ্য না করে আর উপায় ছিল না।

যাহোক, এই ধরনের সামাজিক ক্রিয়ার প্রতিভার কোনো বিকৃত মানসিক রুচি ছিল তা ভাবাটা সঙ্গত হত না। বরং তার উল্টোটাই তার ক্ষেত্রে সত্য, কারণ জীবনের লক্ষণ যেখানে সবচেয়ে সুস্পষ্ট, সেইসব জিনিসের সংস্পর্শে থাকতেই তিনি বেশি ভালোবাসেন। তার একটা প্রত্যক্ষ উদাহরণ হচ্ছে সমুদ্রস্নান তার কাছে বরাবরই একান্ত প্রিয়। কিন্তু সমুদ্রসৈকতে যেখানে সাধারণত শহরের অধিবাসীরা স্নানে যেত সেগুলো এখন নিষিদ্ধ এলাকা বলে গণ্য হয়েছিল। আর তখন জীবিত মানুষের সাহচর্যে থাকতে চাইলে এইরকম একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে হত যে, সে সাহচর্য যে-কোনো মুহূর্তে মৃতদের সাহচর্যে রূপান্তরিত হতে পারে। তখন যতই দিন যাচ্ছিল এই ঝুঁকি ক্রমেই বাড়ছিল। বাস্তবিকই এটা ছিল তখনকার জন্যে স্বতঃপ্রতীয়মান ব্যাপারের মতো। এটাও অবশ্য সত্য যে, এমন নয় যে তখন চাইলেও কেউ এই প্রিয় বাস্তবের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারত না অথবা এইসব বিষয়ের চিন্তাকে একেবারে মন থেকে দূরে রাখতে পারত না। তাতে কি যেসব জিনিস স্বতঃপ্রতীয়মান

তাদের ভেতরও মুক্তির এমন একটা অকাট্য গরমিল থাকতে দেখা যায় যাকে কোনো প্রতিবন্ধকতা দিয়েই রোধ করা সম্ভব নয়? উদাহরণস্বরূপ প্রিয়জনের দাফন বা অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়ার সময় উপস্থিত না-থেকে কি কেউ পারে? মৃতব্যক্তিদের কেন্দ্র করে এমন সময় যেসব সামাজিক ক্রিয়াকলাপ নিষ্পন্ন হত তাদের ভেতর লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল সেখানে প্রত্যেকটা কাজ অত্যন্ত দ্রুত সেরে ফেলা হতো। বাহ্যিক অনুষ্ঠান যেগুলো, সেগুলোকে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে ফেলা হয়েছিল। তখনকার যে-অবস্থা তাতে সাধারণভাবে বলতে গেলে সময়সাপেক্ষ বা শ্রমসাধ্য যেসব সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সেগুলো অনেকটা জোর করেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। তখনকার যে অবস্থা তাতে প্লেগে কারো মৃত্যু হওয়ার অর্থ ছিল সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে পরিবারের সবার সবরকম সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। মৃতব্যক্তিদের শবের পাশে দিনে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। তার ফলে সন্ধের সময় এখন কারো মৃত্যু ঘটলে, সারারাত সেই মৃতদেহের শিয়রে বসে কেউ জেগে থাকত না। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ পড়ে থাকত সে শব। আর রাতের বেলায় হলে দ্রুত তার দাফনের ব্যবস্থা করে ফেলা হত। বলাবাহুল্য, প্রতিটি মৃত্যুর খবর মৃতব্যক্তিদের পরিবার-পরিজনদের জানানো হত, কিন্তু যেহেতু রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা সাধারণত নিজের নিজের পরিবারের মধ্যে থাকাকালেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মারা যেত, সেহেতু এসব পরিবারকে অন্যান্য সাধারণের সঙ্গে থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করতে বাধ্য করা হত। কাজেই দেখা যেত তখন তাদের সম্পূর্ণ নিষ্কল অবস্থা। কিন্তু যেসব রোগী নিজের আত্মীয়স্বজনদের থেকে দূরে কোথাও মারা যেত, সেসব ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময়ে তাদের পরিবার-পরিজনদের তাদের মৃতদেহ দেখবার সুযোগ দেওয়া হত অর্থাৎ মৃতব্যক্তিদের গোসল করানো, কাফন পরানো সারা এবং লাশ কবরস্থানে নিয়ে যাবার অন্যান্য প্রস্তুতিও সম্পূর্ণ, তখন তাদের পরিবারদের অনুমতি দেয়া হত তাদের দেখবার।

ডাক্তার রিও-র ওপর যেসব অকজিলিয়ারি হাসপাতাল তদারক করবার দায়িত্ব ছিল তারই ভেতরের একটা হাসপাতালে যেন এই ধরনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হচ্ছে বলে আমরা ধরে নিচ্ছি। যে স্কুল-বিল্ডিংটাকে এই হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, তার প্রধান অংশের শেষের দিকে বাইরে বের হবার একটা পথ ছিল। কাফনে ঢাকা লাশটা রাখা হয়েছিল একটা বড় ভাঁড়ারঘরে। বাইরে যাবার এই গলিপথটার উপরেই ছিল তার খোলা দরজা। মৃতব্যক্তির পরিবারের লোকজন যখন এসে পৌঁছালেন, দেখলেন কাফনের ভেতর পেরেক এঁটে বন্ধ করা একটা লাশ সরুপথটার উপর নামানো রয়েছে। সারাটা অনুষ্ঠানের ভেতর সবচেয়ে দরকারি কতগুলো সরকারি ফর্মে সই দিলেন। তারপর কাফনটাকে একটা মোটরগাড়ির ওপর তুলে দেয়া হল। গাড়িটা হয়তো একটা সত্যিকারের শবযান অথবা এ্যাম্বুলেন্সকে তখনকার মতো এই কাজের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল। তখনও শহরের রাস্তায় চলাচল করার অনুমতি ছিল যে সামান্য কয়েকখানা ট্যাক্সির, তারই একটাতে ঢুকে গিয়ে বসলেন শোকাচ্ছন্ন পরিবারের লোকজন। দেখতে দেখতে শহরের মধ্যবর্তী

অঞ্চলকে পাশ কাটিয়ে ভিন্নপথ ধরে কবরস্থানের দিকে ছুটে চলল শবযান। শহরের বাইরে যাবার গেটের মুখে পৌঁছে সবাই থামল। একজন পুলিশ অফিসার এসব যাত্রীদের কাছে বাইরে যাবার যে অনুমতিপত্র ছিল তাতে সিলমোহর লাগিয়ে দিলেন। এই অনুমতিপত্র সারা শহরবাসীদের জন্য শেষ আশ্রয়ভূমি, যেখানে পৌঁছানোর অন্য কোনো উপায় ছিল না। পুলিশ কর্মচারীরা তার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াবার পর আর কিছুক্ষণ গিয়ে শবযান এবং তার সঙ্গের ট্যাক্সি যেখানে গিয়ে থামল, তার আশেপাশে লাশ দাফনের জায়গা আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। তাদের দেখতেই একজন ধর্মযাজক এগিয়ে এলেন; শবের সঙ্গে এসেছিলেন যারা তাদের শবযানে গিয়ে দাঁড়ালেন। কারণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় শব গির্জায় নিয়ে যাবার যে একটা চিরন্তন রীতি ছিল সেটা এখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কফিন শবযান থেকে নামিয়ে কবরের পাশে রাখা হল। দড়িগুলো খুলে দিতেই কফিন সশব্দে কবরের ভেতর নেমে গেল। ধর্মযাজক এগিয়ে গিয়ে কবরের উপর পড়া-পানি ছিটিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে মাটির ঢেলা লাফিয়ে উঠতে থাকল। কফিনের ওপর থেকে শবটাকে ইতিমধ্যেই দূরে সরিয়ে নিয়ে রাখা হয়েছিল। ওধুধ ছিটিয়ে সেটাকে বীজাণুমুক্ত করা হচ্ছিল। কবর যতই বড় হয়ে উঠতে থাকল, কোদাল-ভর্তি মাটি ততই ধপাস ধপাস শব্দ করে তার উপর পড়তে থাকল। পরিবারের যারা সঙ্গে এসেছিল তারা ততক্ষণে নিজেদের সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠা শুরু করে দিলেন এবং পনেরো মিনিটের ভেতর বাসায় পৌঁছে গেলেন।

আগাগোড়া সমস্ত অনুষ্ঠানগুলোই যতদূর সম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সেরে নেওয়া হত, তাতে কোনোরকম বিপদ বা ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকত কম। এইভাবে প্রায় বিদ্যুৎগতিতে সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেরে ফেলার ব্যবস্থা চালু হতে দেখে গোড়ার দিকে মৃতব্যক্তির পরিবারের অনেকেই অন্তরে অন্তরে ব্যথিত বোধ করতেন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এটাও সত্য যে প্লেগের মহামারীর মতো এরকম একটা দুর্যোগের মাঝে এই ধরনের কোনো অনুভূতির প্রশ্রয় সম্ভব ছিল না। জরুরি কাজ যেগুলো, সেগুলো যাতে দ্রুত সমাধা করা সম্ভব হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে অনেক কিছুই পরিহার করাটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন।

মৃতের দাফনের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা এইভাবে সংক্ষিপ্ত করে ফেলার ফলে যদিও প্রথম প্রথম শহরের অধিবাসীদের মনোবল কিছুটা ভেঙে পড়ে, কারণ প্রিয়জনদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যাতে ঠিকভাবে সম্পূর্ণ হয় সেটা নিশ্চিত করার ইচ্ছাটা যতখানি মনে করে থাকি, তার চেয়ে অনেক বেশি সাধারণ। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়টায়ই দেখা গেল, যত দিন যাচ্ছে খাদ্যসমস্যাটা ক্রমেই যেন একটা সংকটের আকার নিচ্ছে। তখন স্বাভাবিকভাবেই শহরের অধিবাসীদের সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল এই জরুরি অবস্থার দিকে। বিভিন্ন রকমের ফর্ম পূরণ করা, কোথায় কোন জিনিস পাওয়া যেতে পারে তা অনুসন্ধান করে বেড়ানো, প্রতিদিন বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যে দোকানের সামনে সামনে লাইনে গিয়ে দাঁড়ানো—এইসব কাজে প্রত্যেককে এত সময় এবং শক্তি ব্যয় করতে হত যে, তারপরে আর আশেপাশে কে

কোথায় কীভাবে মরছে বা নিজেদেরও একদিন কীভাবে মরতে হতে পারে—এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করবার মতো অবকাশই থাকত না। এইভাবে জনসাধারণের জীবনধারণের জটিলতা নিত্য এমনি বেড়ে চলেছিল যে, অন্য সময় হলে হয়তো সেটাই আমাদের কাছে দুর্বিপাকের মতো মনে হত। কিন্তু এখন যেন তা আমাদের জন্য শাপে বর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাস্তবিকই প্লেগের সংহারের রূপটা যদি দিনে দিনে এইভাবে প্রকট হয়ে না উঠত তাহলে তখনকার সেই অবস্থায় সবকিছুকেই মোটামুটি কল্যাণমুখী বলে ভাবা যেতে পারত!

কারণ যতই দিন যেতে থাকল, কবর দেবার বাক্স ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠতে লাগল, যেমন পাওয়া কঠিন হয়ে উঠতে লাগল কাফনের কাপড় এবং গোরস্থানে কবর দেবার জায়গা। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে তক্ষুনি কিছু একটা করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। প্রথমেই যে-ব্যবস্থাটা সবার নজরে পড়ল এবং কাজের ক্ষেত্রে যার অনেক সুবিধা থাকায় যা গ্রহণ করাটাও সঙ্গত বলে মনে হল তা হচ্ছে, যতদূর পারা যায় অনেকগুলো লাশ একত্র করে একই গর্তে কবর দেয়া এবং তার জন্যে হাসপাতাল থেকে লাশ আনা-নেয়ার ব্যাপারে যদি এ্যাম্বুলেন্সগুলোর হাসপাতাল ও কবরস্থানের মধ্যে ঘন ঘন যাতায়াতের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়, তারও ব্যবস্থা করা।

ডাক্তার রিও-র হাসপাতালে কবর দেবার বাক্সের যে স্টক রাখা হয়েছিল এ-সময়ে তার সংখ্যা নেমে এল পাঁচে। যখন সেগুলো সব ভর্তি হয়ে গেল, পাঁচটা বাক্সই একসঙ্গে এ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেয়া হল। কবরস্থানে পৌছার পর লাশগুলো বাক্স থেকে বের করে আনা হল, মরচে-ধরা লোহার রঙের মতো ধূসর চেহারা প্রত্যেকটার! পাশেই শেভের নিচে আগে থেকেই তাদের জন্যে যেখানে জায়গা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল, লাশগুলোকে ট্রেঁচারে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে রাখা হল সেখানে। আরো কিছু লাশ এসে পৌছাবার পর একসঙ্গে কবর দেয়া হবে। ইতিমধ্যেই শূন্য শবাধারগুলোর ওপর জীবাণুনাশক ঔষধ ছিটিয়ে দিয়ে আবার সেগুলোকে পাঠিয়ে দেয়া হল হাসপাতালে। প্রয়োজনমতো বেশ কয়েকবারই এই একই ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি করা হল। দেখা গেল এই ব্যবস্থা সত্যিই চমৎকার কাজ দিচ্ছে। ফলে প্রিফেক্টও এটাকে অনুমোদন করলেন। ডাক্তার রিওকে তিনি এমন বললেন যে, আগের আর এক প্লেগের মহামারীর সময় নিম্নোরা ঠেলাগাড়িতে করে লাশ বয়ে নিয়ে যেত বলে যে-বিবরণ দেখা যায় বর্তমান ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে তার চেয়ে অনেক উন্নত।

—হ্যাঁ, কিছুটা সত্যি তো বটেই। ডাক্তার রিও জবাবে বললেন—কারণ কবর দেবার ধরনটা কিছুটা আগের মতো হলেও এবারে প্রত্যেকটা কাজের লিখিত বিবরণ আমরা রাখার চেষ্টা করছি। এটা অবশ্যই অগ্রগতি বলে গণ্য করার মতো!

যাহোক, কার্যক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত সফল প্রমাণিত হল বটে কিন্তু এখন যেভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হত তার ভেতর এমন কিছু কিছু অপ্রিয় ব্যাপার ছিল, যার জন্যে কবর দেবার সময় যাতে মৃতব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনদের কেউ সেখানে উপস্থিত না থাকতে পারেন, প্রিফেক্ট আইন করে সেটা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। এইসব আত্মীয়স্বজনের সাধারণত কবরখানার গেট পর্যন্ত যেতে দেয়া হত

এবং তাতেও সরকারি অনুমোদন থাকত না। কারণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শেষের পর্যায়ে সাধারণত যেসব জিনিস করা হত, সেগুলোর ভেতরও এখন অনেক রদবদল করা হয়েছিল। কবরখানার পেছনদিকে একটুকরো খোলা জায়গায়, যার চারপাশে ছিল গদ গাছের সারি, দুটো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত কাটা হয়েছিল। একটা বানা হয়েছিল পুরুষদের জন্যে, অপরটা মেয়েদের। তখনও পর্যন্ত এ-ব্যাপারে কোনটা উচিত আর কোনটি অনুচিত তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করবার মতো অবকাশ ছিল, কিন্তু আরো পরের দিকে গিয়ে অবস্থার চাপে এই শেষ শালীনতাটুকুও রক্ষা করা সম্ভব হত না। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে একই গর্তে নিক্ষেপ করা হত। শুধু এইটুকুই হয়তো সুখের বিষয় যে প্লেগের সর্বশেষ ধ্বংসলীলার শিকার যারা, শুধুমাত্র তাদেরই এইরকম নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছিল।

আমরা এখানে যে-সময়ের কথা আলোচনা করছি, তখনও পর্যন্ত স্ত্রী পুরুষকে পৃথকভাবে কবর দেবার ব্যবস্থা বলবৎ ছিল এবং ব্যবস্থা যাতে ঠিকভাবে মেনে চলা হয় কর্তৃপক্ষও সে-ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। প্রত্যেকটা গর্তের তলায় বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল চুনের একটা পাতলা আস্তরণ, সেখান থেকে সবসময় বাষ্প উঠতে থাকত, নিয়ত কাটতে থাকত কবরের তলদেশটা। গর্তের দুপাশেও চুনের দুটো লম্বা আলের মতো করে দেয়া হয়েছিল, সেখান থেকেও নিয়ত বাষ্পের বুদবুদ উঠতে থাকত এবং বাতাসের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফেটে যেত সেগুলো। যখন দেখা যেত এ্যাম্বুলেন্স লাশ বইবার কাজ শেষ করে ফেলেছে তখন মৃতদেহগুলোকে ট্রেঁচারের সাহায্যে গর্তের ধারে নিয়ে যাওয়া হত। তারপর নগ্ন বিকৃত দেহগুলোকে একটার-পর-একটা এমনভাবে গর্তের ভেতর নামিয়ে দেয়া হত, যেন সেগুলো পরপর পাশাপাশি থাকে। তখনকার মতো সব লাশ যখন গর্তের ভেতর নামানো শেষ হয়ে যেত, তখন তাদের ওপর হালকা আস্তরণের মতো প্রথম একপ্রস্ত কলিচুন এবং পরে একপ্রস্ত মাটি বিছিয়ে দেয়া হত, পরে আরও যেসব শব আসবার সম্ভাবনা আছে, সেগুলোরও যাতে এই একই গর্তে স্থান সংকুলান হয় তার জন্যে মাটির আস্তরণটা সাধারণত কোনো সময় হাঁফ-কয়েকের বেশি পুরু করা হত না। পরের দিন মৃতের আত্মীয়দের দিয়ে মৃতব্যক্তিদের যে রেজিস্টার ছিল সেটা সই করিয়ে নেয়া হত। এই রেজিস্টার থেকে মানুষ মরল না কুকুর মরল—এই তফাৎটাই শুধু নির্ণয় করা যেত, কারণ কোথাও কেউ মারা গেলে তার খুঁটিনাটি বিবরণ এই রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হত।

এতসব বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করবার জন্যে নিশ্চয় লোকের প্রয়োজন হত, কিন্তু বেশির ভাগ সময় দেখা যেত ডাক্তার রিওকে সাহায্য করবার মতো যথেষ্টসংখ্যক লোকজন নেই। কবর খোঁড়া, ট্রেঁচারে বয়ে নিয়ে যাওয়া—এই ধরনের কাজের জন্যে যেসব লোক আসত, প্রথমদিকে যাদের পাওয়া যেত তাদের বেশির ভাগই মাইনে-করা লোক। কিন্তু পরে যারা আসে তারা সবাই ছিল স্বেচ্ছাসেবক, তাদের বেশির ভাগই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত। যত কঠোর সাবধানতাই নেয়া হোক, দুদিন আগে বা পরে দেখা যেত সংক্রমণ নিশ্চিতভাবে তার কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু যত কিছুই বলা হোক না, সব-থেকে বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল এই যে যতদিন দুর্বিপাক ছিল,

এইসব কাজের জন্য লোকের সত্যিকারের অভাব হত না কোনোদিন। সবচেয়ে সংকট অবস্থা দেখা দেয় প্লেগের প্রকোপ চরম আকার ধারণ করবার ঠিক কিছু পূর্বে। এই সময়টায় ডাক্তার রিও-র উদ্বিগ্ন বোধ করবার কিছুটা কারণও ছিল। কিছুটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ এবং সাধারণ দৈহিক পরিশ্রমের কাজ—ডাক্তার রিও যেভাবে কাজগুলোর শ্রেণীবিভাগ করতেন, এই দুই কাজের জন্যেই তখন লোকের অভাব দেখা দেয়।

কিন্তু সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সমস্ত শহরটা যখন থেকে দুর্বিপাকের সম্পূর্ণ কবলে চলে যায় তখন রোগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার ফলে অবস্থাটা আবার যেন কিছুটা সহজ হয়ে ওঠে। কারণ তখন শহরের অর্থনৈতিক জীবনেও কিছুটা বিপর্যয় দেখা দেয়ার ফলে অনেককেই কর্মচ্যুত হয়ে পড়তে হয়। অফিস দেখাশুনার কাজের দায়িত্ব দেবার মতো উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক হয়তো এই বেকারদের ভেতর পাওয়া যেত না, কিন্তু সাধারণ খাটুনির কাজের জন্যে যথেষ্ট সংখ্যক লোক পেতে তখন আর কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত না। বিশেষ করে এসব কাজে বিপদের ঝুঁকি ছিল বলে মজুরিও দেয়া হত যথেষ্ট। কাজেই এখন থেকে দেখা যেত, আশঙ্কার জন্যে না হলেও অর্থের অনটনের জন্যে মানুষ সহজেই এসব কাজ করবার জন্যে এগিয়ে আসত। যারা দরখাস্ত করেছে অথচ সঙ্গে সঙ্গে কাজ দেয়া সম্ভব হয়নি, এইরকম দরখাস্তকারী লোকদের একটা তালিকা সবসময় স্যানিটারি কর্তৃপক্ষের কাছে থাকত। পরে যখনই কোথাও কোনো লোকের প্রয়োজন হত, তালিকার উপর দিক থেকে পরপর এইসব দরখাস্তকারীদের সংবাদ দেয়া হত। যদি এমন অবস্থা না ঘটত যে ইতিমধ্যেই তাদের কেউ হয়তো চিরতরে কর্মত্যাগ করে ইহলোক ছেড়ে গেছে তাহলে এই ভাগে পড়লে তাদের কাউকে বড় একটা অনুপস্থিত হতে দেখা যেত না। কাজেই প্রিফেক্টকে, যিনি এমনিতেই কয়েদিদের, তা সে অল্পদিনের জন্যে কারাবাসের নির্দেশ হয়েছে যার ওপর, এমন লোকই হোক আর যাবজ্জীবন দণ্ডভোগের সাজাপ্রাপ্ত লোকই হোক, সাধারণত এইসব কাজে নিয়োগ করতে কিছুটা অনিচ্ছার ভাব দেখাতেন। তাকে আর এই অপ্রিয় ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হত না।—যতদিন বেকার লোকের অভাব না দেখা দিচ্ছে, তিনি বলতেন—ততদিন আমরা অন্তত এই অপ্রিয় কাজটা না-করলেও পারব।

সুতরাং আগস্ট মাসটা পার না-হওয়া অবধি অন্তত শহরের মৃত অধিবাসীদের মানুষের চিরবিশ্রামভূমি কবরস্থানে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে কোনোরকম অসুবিধা দেখা দিত না। খুব একটা রুচিসম্মতভাবে না হলেও অন্তত ততটুকু শৃঙ্খলার সঙ্গে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজগুলো সমাধা করা হত যাতে করে কর্তৃপক্ষ সহজেই ভাবতে পারতেন যে মৃতব্যক্তি এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি তাদের যে সরকারি দায়িত্ব সেটা তাঁরা যথাযথ পালন করতে পেরেছেন।

যাই হোক, প্লেগের শেষপর্যায়ে গিয়ে আমাদের যে সংকটের ভেতর পড়তে হয়েছিল তা হয়তো আগে থেকে কিছুটা অনুমান করতে পারি এবং এখন বর্ণনা করতে পারি। আগস্ট মাস থেকে শুরু করে প্লেগে মৃত্যুর হার হঠাৎ ভয়ংকর রকম বেড়ে গেল এবং তারপর থেকে একটানা কিছুদিন সেইভাবেই চলতে থাকল। ফলে শহরের ছোট

কবরস্থানে এত বেশিসংখ্যক মৃতলোকের জন্য স্থান সংকুলান করাটা রীতিমতো একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কবরস্থানের চারপাশের দেয়ালগুলো ভেঙে দিয়ে আশেপাশের সংলগ্ন জমিতেও কবর দেয়ার যে সাময়িক ব্যবস্থা করা হল তাতেও সমস্যার কোনো সমাধান হল না, ভিন্ন একটা উপায় উদ্ভাবন করাটা জরুরি হয়ে পড়ল। প্রথমেই যে ব্যবস্থাটা নেয়া হল তা হচ্ছে, এখন থেকে মৃতব্যক্তিদের কবর দেয়া হত কেবল রাতের বেলায়। একটা জিনিস অবশ্য সুস্পষ্ট যে এর ফলে দাফনের জন্য যেসব শিষ্টাচার মেনে চলার দরকার সেগুলো যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে ফেলাটা সহজ হল। এখন থেকে যত অধিকসংখ্যায় পারা যেত মৃতদেহগুলোকে ঠেসে ঠেসে কয়েকটা এ্যাম্বুলেন্সে ভর্তি করা হত। যাদের আশ্রয়ে ফিরতে দেরি হয়ে গেছে এমন দু-একজন পথিক যারা সরকারি বিধান অমান্য করে সান্ধ্য-আইন শুরু হবার পরেও শহরের দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর বাইরে বের হত অথবা যারা হয়তো কোনো সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্যই রাতের বেলায় এইসব অঞ্চলে যেতে বাধ্য হত তারা প্রায়ই দেখতে পেত, দীর্ঘ সাদা এ্যাম্বুলেন্সগুলো বোঝার ভারে টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে। আশেপাশের রাস্তাগুলো তাদের ঘণ্টার একঘেয়ে ঢং ঢং আওয়াজে ভরে উঠত। কবরস্থানে পৌঁছানোর পর মৃতদেহগুলোকে কোনোরকমে গর্তের মধ্যে ঢেলে দেয়া হত। গর্তের নিচে সেগুলো ঠিকভাবে পাশাপাশি পড়ল কিনা তা দেখারও আর অবকাশ হত না এখন। তারপর কোদাল-কোদাল কলিচুন ছড়িয়ে দেয়া হত মৃতদেহগুলোর ওপর, সঙ্গে সঙ্গে মুখগুলো ঝলসে বিকৃত হয়ে যেত। পরে যে তাদের ওপর একপ্রস্থ মাটি ছড়িয়ে দেয়া হত, তাতে দেহগুলো অনেক সময় ঠিকভাবে ঢাকাও পড়ত না। যতই দিন যেতে লাগল ততই কবরগুলো আরো গভীর হতে থাকল।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাই নতুন একটা জায়গা ঠিক করে নেয়া এবং ভিন্ন কিছু একটা পথ বার করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। কবরের চিরস্থায়ী স্বত্বের অধিকারী ভাবা হত যাদের, বিশেষ এক জরুরি ব্যবস্থার বলে কবর থেকে তাদের জবরদস্তি বার করে দেয়া হল। তাদের দেহাবশেষ কবর থেকে তুলে ক্রিমেটোরিয়ামে পাঠানো হল। এখন থেকে প্লেগে মৃত্যু হত যাদের, তাদের সবারই এই একই পরিণতি ঘটত, ক্রিমেটোরিয়ামে অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া অর্থাৎ শহরের পূর্বসীমানায় গেটের বাইরে যে পুরোনো ক্রিমেটোরিয়ামটা ছিল, সেটাকে এখন থেকে এই কাজের জন্য ব্যবহার করা হত। কাজেই শহরের পূর্বগেটে পাহারা দেয়ার যে পোস্টটা ছিল সেটাকে বাইরে আরো কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

এমন সময় এক মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীর মাথায় আকস্মিক এক বুদ্ধি জোগাল যার ফলে কর্তৃপক্ষ, ইতিমধ্যেই যারা নানা সমস্যার চাপে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, বেশ কিছুটা হাঁপ ফেলবার সুযোগ পেলেন। সমুদ্রের উপকূলবর্তী রাস্তা বরাবর যে ট্রামলাইনটা এতদিন অকেজো অবস্থায় পড়েছিল তিনি সেটাকে আবার ব্যবহার করার পরামর্শ দিলেন। সুতরাং এই নতুন উদ্দেশ্যে ব্যবহার-উপযোগী করবার জন্য ট্রামগাড়িগুলোর ভেতরেও কিছু কিছু রদবদল করা হল, যেমন রদবদল করা হল ছোট ছোট ট্রলিগুলোর। সেগুলো যাতে সোজা ক্রিমেটোরিয়ামে যেতে পারে তার জন্য

একটা নতুন ব্রাঞ্চ লাইনও খোলা হল। এখন থেকে ট্রাম এবং ট্রলিগুলোর শেষ থামবার স্থান হল এই ক্রিমেটোরিয়াম।

সেবার গ্রীষ্মের শেষভাগে এবং সারাটা শরৎকাল ধরে প্রতিদিন এই একই দৃশ্য সবার চোখে পড়তে লাগল। সমুদ্রের উপকূল থেকে খাড়া উঠে গেছে যে পাহাড়ের চূড়া আর তার চারপাশ বেয়ে যে রাস্তা চলে গেছে, সেই রাস্তা ধরে অবিরাম ঝাঁকানি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে অদ্ভুত সব যাত্রীশূন্য ট্রামের সারি; আর দূরে শূন্য দিগন্ত যেন তাদের পটভূমি রচনা করেছে। সত্যিই যে কী ঘটছিল তা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের ভেতর জানাজানি হয়ে গেল। পাহাড়ের চূড়ার চারপাশে দিনরাত চব্বিশঘণ্টা সতর্ক পাহারা থাকা সত্ত্বেও ছোট ছোট দলে বিভক্ত কিছু কিছু লোক চুপিসারে গিয়ে পাহাড়ের আশেপাশে লুকিয়ে বসে থাকতে লাগল। ট্রামগুলো যখন পাহাড়ের গা ঘেঁষে এগুতে থাকত, আড়াল থেকে তারা ফুলের গুচ্ছ ছুড়ে দিত খোলা ট্রামগুলোর ওপর। এইভাবে মৃতদেহ আর ফুলে ভর্তি গাড়িগুলো গ্রীষ্মের রাতের উত্তপ্ত অন্ধকারের ভেতর দিয়ে একটানা ঝপঝপ শব্দ তুলে একটার-পর-একটা অবিরাম এগিয়ে যেতে থাকত।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন দেখা যেত ত্যালতেলে ধোঁয়াটে বিশ্রী গন্ধযুক্ত একটা মেঘ অনুক্ষণ শহরের পূর্ব-অঞ্চলে আকাশের খুব নিচে মাথার উপর ভেসে থাকত। ডাক্তাররা সবাই মিলে অভিমত প্রকাশ করলেন গন্ধটা একটু বিশ্রী হলেও আসলে এই ধোঁয়াটে মেঘটা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে তেমন ক্ষতিকর কিছু নয়। কিন্তু এই অঞ্চলের অধিবাসীদের ভেতর ইতিমধ্যেই একটা বিশ্বাস জন্মেছিল যে এই মেঘ নিশ্চয় সারাক্ষণ তাদের ভেতর রোগের বীজাণু ছড়াচ্ছে। কাজেই তারা কর্তৃপক্ষকে ভয় দেখাতে লাগল যে তারা সবাই সেই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবে। তাদের শান্ত করবার জন্যে কর্তৃপক্ষ তখন বাধ্য হয়ে মেঘটাকে যাতে অন্যদিকে দূরে সরিয়ে দেয়া যায় তার উপযোগী নানা যন্ত্রপাতি বসাবার আয়োজন করলেন। এরপর থেকে শুধুমাত্র যখন জোরে বাতাস বইতে থাকত তখন পূর্বদিক থেকে একটা আঠালো জিনিসের গন্ধ ভেসে আসত, যা থেকে শহরের অধিবাসীদের মনে পড়ে যেত যে, তারা একটা নতুন বিধানের অধীনে বাস করছে এবং এখনও আগের মতোই প্রতিরাতে প্লেগাগ্নিতে নিয়মিত আহুতি দেয়া চলেছে।

প্লেগের প্রকোপ যখন চরমে উঠল তখন এইসব জিনিসই ঘটতে দেখা যেত। ভাগ্যিস অবস্থা আরো খারাপের দিকে গড়ায়নি, নইলে আমাদের প্রশাসনযন্ত্রের উদ্ভাবন-নিপুণতা, সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা, অবশ্য ক্রিমেটোরিয়ামের দাহ করবার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথাটা এখানে উল্লেখ নাই বা করলাম—সবকিছুই দেখা যেত এই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে অপারগ হয়ে পড়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রাখবার জন্যে কিছু কিছু চরম ব্যবস্থা নেয়ার সম্পর্কে যে ভাবনাচিন্তা হচ্ছিল, ডাক্তার রিও সে-খবর রাখতেন। এখন থেকে মৃতদেহগুলোকে সোজা সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবার কথা অনেকে আলোচনা করছিলেন। কথাটা ভাবতেই পাহাড়ের কোলে কোলে অল্প পানিতে বীভৎস চেহারার শব ভেসে-বেড়ানোর দৃশ্য

ডাক্তার রিও-র চোখের সামনে ফুটে উঠত। অবশ্য এটাও তার অগোচর ছিল না যে মৃত্যুর হার আর সামান্য কিছু যদি বাড়ে তাহলে সেই অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করা কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না। তখন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যত কিছুই করা হোক না কেন, গাদা-গাদা মানুষ মরে রাস্তায় পচতে থাকবে, তখন হয়তো শহরের পার্কে পার্কে এমন দৃশ্যও চোখে পড়বে যে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ কঠিন ঘৃণা এবং উন্মত্ত আশার বশবর্তী হয়ে জীবিত মানুষদের জড়িয়ে ধরবার জন্য অধীর আগ্রহে ছুটছে।

এইসব দৃশ্য এবং নানারকমের আশঙ্কা তখনও আমাদের শহরের অধিবাসীদের অন্তরে এই অনুভূতিকে জাগিয়ে রেখেছিল যে তারা সবাই নির্বাসিত—তাদের জীবন বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অইতের ঘটনাপঞ্জিতে বর্ণিত অসীম সাহসিকতার যেসব কাজ বা স্মরণীয় ঘটনা আমাদের অন্তরে আনন্দের শিহরণ জাগায়, তাদের অনুরূপ লক্ষণীয় কোনো ঘটনা কাহিনীকার যে এখানে লিপিবদ্ধ করতে পারছেন না এবং তার সেই অক্ষমতা যে কতখানি আক্ষেপের ব্যাপার, সে-সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। আসল কারণ এই মহামারী বা দুর্বিপাক জাতীয় ঘটনার চেয়ে কম চাঞ্চল্যকর কিছুই তো আর ঘটতে দেখা যায় না। আর তাছাড়া দুর্বিপাক বা এই ধরনের কোনো বড় দুর্ঘটনা একটানা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় বলে মানুষের কাছে একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ায়। প্লেগের দুর্বিপাক যাদের ভোগ করতে হয়েছিল, প্লেগের সেই সবচেয়ে ভয়াবহ দিনগুলো তাদের স্মৃতি, যা আকাশে প্রবল ঝঞ্ঝার সংকেত বয়ে আনে এমন সর্বগ্রাসী, অনির্বাণ উজ্জ্বল শিখার মতো ফুটে উঠত না, বরং প্লেগের সংহার-মূর্তিটা তাদের কাছে ছিল ভয়াবহ এবং বিশাল এমন একটা জন্তুর মতো যার গতি মন্থর ও সুচিন্তিত, যে তার সামনে পথের ওপর যা-কিছু পায় তার অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত পিষে মুছে দিতে চায়।

প্লেগের প্রথম আবির্ভাবের সময় তার সম্পর্কে যেসব অতিরঞ্জিত আশঙ্কা এবং কল্পনা নিয়ত ডাক্তার রিও-র মনের চারপাশে ঘুরত, প্লেগের বাস্তব রূপের সঙ্গে তাদের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। সর্বোপরি প্লেগের বাস্তব মূর্তিটা ছিল অনেকটা এমন এক সুচতুর প্রতিপক্ষের মতো, যার কাছে অবসাদ বলে কিছু নেই, যার সংগঠনক্ষমতা এমনই নিপুণ যে, সে যা-কিছু করতে চায় তাই-ই অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে পারে। এই প্রসঙ্গে এখানে বলা প্রয়োজন যে শুধুমাত্র এই কারণে, প্রতিটা ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি নিজের কাছে যাতে তাকে মিথ্যার অভিনয় করতে না হয় সেইজন্য, কাহিনীকারের বরাবর লক্ষ্য ছিল যতদূর সম্ভব নিজেকে কোনোকিছুর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে না-দেয়া এবং যতদূর সম্ভব নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করে চলা। ঘটনাগুলোকে পরস্পর সংলগ্ন আকারে প্রকাশ করতে গেলে তাদের ভেতর যতটুকু বিন্যাস সাধন প্রয়োজন, তাছাড়া এমনকি শিল্পগত প্রভাব সৃষ্টির খাতিরেও ঘটনার উপস্থাপনায় তিনি কোথাও তাদের রদবদল করেননি। এইরকম একটা সন্তোষবোধ বরাবর তার মনের মধ্যে ছিল বলেই কাহিনীকারকে স্বীকার করতে হবে যে, যদিও আমাদের তখনকার দুঃখ-দুর্দশার, তা সে যত গভীরই হোক আর ব্যাপকই হোক, প্রধান কারণ ছিল আমাদের তখনকার সেই বিচ্ছিন্ন অবস্থা এবং যদিও তিনি অনুভব

কারণ যে এই দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে বিশেষ করে প্লেগের শেষপর্যায়ে এগুলো যে রূপ নিয়েছিল সে-সম্পর্কে বিস্তারিত আলো কিছু বলাটা তার কর্তব্য; কিন্তু সেইসঙ্গে আবার এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, যতই দিন যাচ্ছিল সেই দুঃখ-দুর্দশাজনিত যে-যন্ত্রণার অনুভূতি তার তীক্ষ্ণতা যেন ক্রমেই কমে আসছিল।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহলে কি শহরের অধিবাসীরা, বিশেষ করে তাদের ভেতর যারা নিজেদের প্রিয়জনদের বাদ দিয়েই নিজেদের জীবনকে মেনে নিতে করত তারাও কি এখন প্রিয়জনদের বাদ দিয়েই নিজেদের জীবনকে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল? সেটা সঠিক বলে ধরে নিলে কিছুটা সত্যের অপলাপ করা হবে। কারণ এটাই বরং সত্যি যে, তখন তাদের দৈহিক শক্তি বলো, মানসিক অনুভূতি বলো, সবকিছুর মধ্যেই একটা নেতিয়ে পড়া ভাব দেখা দিতে শুরু করেছিল। প্লেগের গোড়ার দিকে তখনও পর্যন্ত অনুপস্থিত প্রিয়জনদের স্মৃতি প্রত্যেকের মনেই অত্যন্ত সজীব ছিল। তাই বিচ্ছেদের বেদনাও তখন প্রত্যেকের প্রাণে বাজত অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে। এবং যদিও তখনও সবাই নিজের নিজের প্রিয়জনের মুখ, তার হাসি, কণ্ঠস্বর, এমনকি কোনো কোনো বিশেষ উপলক্ষে তারা সবচেয়ে সুখী বোধ করেছিল, অবশ্য তখন পেছনের কথা ভেবে যতটুকু বিচার করা সম্ভব তারই ওপর ভিত্তি করে সবকিছু বলা—এসবই পরিষ্কার স্মরণ করতে পারত, কেবল বিপদ বাধত তখনই যখন সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন পরিবেশের মধ্য থেকে এইসব কথা স্মরণ করে প্রত্যেকে কল্পনা করতে চাইত সেই মুহূর্তে তার প্রিয়জন কী করছে। সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে স্মৃতি এই মুহূর্তগুলোয় ঠিকই কাজ করে যেত। কিন্তু কল্পনা আর পেরে উঠত না। প্লেগের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবার পর থেকে এই স্মৃতিও আর কাজ করত না। অবশ্য এমন নয় যে, প্রিয়জনের মুখটাও তখন আর কেউ মনে আনতে পারত না। কিন্তু কার্যত যা ঘটত সেটা তাই-ই। তখন মনে হত মুখ ঠিকই আছে কিন্তু কোথাও যেন তার মাংস বলে কিছু নেই এবং তখন আর আগের মতো মুখটাকে স্মৃতির পটে উজ্জ্বল ছবির মতন ফুটে উঠতেও দেখা যেত না।

সুতরাং প্লেগের প্রথম কয়েক সপ্তাহ যেমন লোকে বারবার বলত যে, যে ভালোবাসা প্রত্যেকে গড়ে তুলেছিল তাদের অন্তরে এবং একদিন তার যা মূল্য ছিল নিজের নিজের কাছে, এখন শুধু তার ছায়াটুকুর অস্তিত্বই বজায় ছিল মাত্র; আর এখন প্রত্যেকেই অনুভব করতে শুরু করেছিল যে কল্পনার সাহায্যে তাতে আর জীবনের সেই হালকা রঙ ছড়ানো সম্ভব না-হওয়ায় সেই ছায়াটুকুর অস্তিত্বও বিলীন হতে চলেছিল। দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, একদিন যে পরস্পরের মাঝে সত্যিই একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছিল তা কল্পনা করা বা একদিন নিজের জীবন যার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল বলে জানত তার সঙ্গে একত্রে বাস করাটাই বা সত্যিই কেমন হতে পারত সেটুকু অনুধাবন করাটাও আর এখন কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এ-ব্যাপারে প্রত্যেককেই নিজেকে প্লেগের তখনকার অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিল এবং বর্তমান প্লেগ তেমন অসাধারণ কিছু ছিল না বলেই হয়তো তার

প্রভাব ছিল এতটা শক্তিশালী। খুব বড় বা মহৎ কিছু অনুভব করার ক্ষমতা এখন আমরা সবাই হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমাদের এখনকার যা-কিছু অনুভূতি তা ছিল অত্যন্ত তুচ্ছ এবং একঘেয়ে ধরনের। আর নয়, এবার দুর্বিপাকের হাত থেকে রেহাই পেলে বাঁচি—লোকে বলত, তার কারণ যে-কোনো বড় দুর্বিপাকের সময় এটা খুবই স্বাভাবিক যে মানুষ চাইবে দ্রুত তার অবসান হোক, আর বাস্তবিকই যাতে দ্রুত প্লেগের উপশম হয় সেটা সবাই তখন চাইতও। এখনও আমরা এই কথাগুলোই মুখে বলতাম বটে, কিন্তু প্লেগের প্রথমপর্যায়ে আমাদের চাওয়ার পেছনে যে একটা প্রগাঢ় ইচ্ছা প্রকাশ পেত, দুর্বিপাকের উপস্থিতির জন্য আমাদের ভেতর যে একটা কঠিন বিরক্তি বা উষ্মা বোধ ছিল, এখন আর সেসবের কিছুই দেখা যেত না। আমাদের মনের সেই গোধূলি অবস্থার মাঝে যে দু-একটা স্বচ্ছ চিন্তা ঘোরাফেরা করত তারই একটাকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতাম এই যা। প্রথম কয়েক সপ্তাহের সেই একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহের মনোভাবের পরিবর্তে এখন সবার মনে দেখা দিয়েছিল একটা বিরাট নৈরাশ্য, এই নৈরাশ্য যে তখনকার সেই অবস্থার কাছে নতি স্বীকার তা ঠিক নয়, যদিও এ ছিল বিনা-প্রতিরোধে সাময়িকভাবে হলেও তখনকার সেই অবস্থাকে একধরনের মেনে নেওয়ার শামিল।

শহরের অধিবাসীরা তখনকার সেই অবস্থাকে ইতিমধ্যে কতকটা মেনে নিয়েছিল। অর্থাৎ লোকে যেমন বলত, তখন সবাই মোটামুটি নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল সেই অবস্থার সঙ্গে। কারণ তখন আর অন্যকিছু করার উপায়ও ছিল না তাদের সামনে। একটা গভীর দুঃখবোধ, একটা গভীর বিষণ্ণতাবোধ স্বাভাবিকভাবেই তখনও তাদের ভেতর রয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই দুঃখ বা বিষণ্ণতাবোধের যে একটা যন্ত্রণা, তার আর কোনো অনুভূতিই ছিল না তাদের ভেতর। বাস্তবিকই অনেকের কাছেই, ডাক্তার রিও ছিলেন তাদেরই একজন, এই অবস্থাটা অত্যন্ত হতাশাজনক বলে মনে হত। সত্যিকারের নৈরাশ্যবোধ এক জিনিস, কিন্তু নৈরাশ্যবোধটা যখন এইরকম একটা নিছক মানসিক অভ্যাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তখন সেটা নৈরাশ্যের চেয়েও ভয়ংকর। প্রিয়জনদের কাছ থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন তারা যে এতদিন সম্পূর্ণ অসুখীবোধ করতেন তা ঠিক নয়, দুঃখ-দুর্দশার সেই অন্ধকারের ভেতর তারা তখনও আশার কিছুটা আলো দেখতে পেতেন; কিন্তু এখন যেন সেই আলোর অস্তিত্বও তাদের সামনে থেকে মুছে গিয়েছিল। বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে, কাফেতে, বন্ধুবান্ধবের বাসায়, সবখানেই যেন তাদের মধ্যে কেমন একটা অলস উদাসীন ভাব, সবকিছুর প্রতি তারা এমনই বিরক্তির ভাব দেখাত যে তাদের দিকে কেউ চাইলে সমস্ত শহরটাকেই মনে হত যেন স্টেশনের একটা ওয়েটিংরুম।

প্লেগের ওঠানামার সঙ্গে তাল রেখে প্রত্যেকেই নিজের নিজের হাতের কাজ করে যেত। অর্থাৎ একটা উৎসাহহীন নিরানন্দ অধ্যবসায়ের ভাব নিয়ে প্রত্যেকেই কোনোরকমে আঁকড়ে থাকত নিজের নিজের কাজে। তাদের প্রত্যেকের আচার-আচরণ দেখা যেত অত্যন্ত বিনীত। এবং যারা প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, এই প্রথম তারা খোলাখুলিভাবে নিজেদের বিচ্ছেদ সম্পর্কে গল্প করত,

কোনোরকম দ্বিধা বা সঙ্কোচ দেখা যেত না তাদের ভেতর, কিন্তু তাদের সবার কথা মনে হত একই রকম। দুর্বিপাক সম্পর্কে প্রতিদিন প্রচারিত পরিসংখ্যানকে যে-দৃষ্টিতে বিচার করত সবাই; মনে হত প্রত্যেকে বিচ্ছেদের দুঃখ-বঞ্চনাকেও সেই একই দৃষ্টিতে দেখত। তাদের ভেতর হঠাৎ এই পরিবর্তনের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। কারণ এর আগে পর্যন্ত প্রত্যেকেই নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সাধারণ দুর্দশা থেকে আলাদা করে রাখতে চাইত, কিন্তু এখন যেন প্রত্যেকেই নিজের নিজের দুঃখকে সাধারণ দুঃখ-বেদনার সঙ্গে এক করে দেখত। এখন তাদের কাছে অতীতের স্মৃতি বলে কিছু ছিল না, কোনোরকম আশা যেন ছিল না তাদের সামনে। শুধুমাত্র মুহূর্তের জীবনটাই ছিল তাদের একমাত্র সম্বল। বাস্তবিকই 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক্'—এটাই যেন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের এখনকার জীবন-দর্শন। কারণ এটা তো সত্যি যে, প্লেগ যে শুধু আমাদের ভালোবাসার ক্ষমতাকে হনন করেছিল তাই নয়, মানুষের মধ্যে সখ্য গড়বার যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা থাকে তারও টুঁটি চেপে মেরেছিল সে। মানুষের মধ্যে ভালোবাসা আছে বলেই সে ভবিষ্যতের কথা ভাবে, ভবিষ্যৎকে কামনা করে। এখন যেহেতু আমাদের ভেতর ভালোবাসার মৃত্যু হয়েছিল, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই জীবন বলতে আমরা এখন বুঝতাম শুধু বাঁচার ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলো মুহূর্তকে।

যে দুঃখ-দুর্দশা, যে সংকটের ভেতর এখন আমরা বাস করছিলাম, এসব বর্ণনা থেকে তাদের সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে মাত্র। প্রিয়জনদের কাছ থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল তাদের সবাইকে যে শেষপর্যন্ত এইরকম একটা অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেটা যেমন সত্যি, তেমন আবার এটাও সমানভাবে সত্য যে, সবার ক্ষেত্রেই তা একসঙ্গে ঘটেনি। তাছাড়া এইরকম একটা সম্পূর্ণ অনীহার মনোভাব তাদের ভেতর গড়ে-ওঠা সত্ত্বেও কখনো কখনো তাদের ভেতর চিন্তার স্বচ্ছতা দেখা যেত, টুকরো টুকরো স্মৃতি। ভিড় করে আসত তাদের মনের ভেতর; আর তখন তা থেকে নতুন সতেজ আর তীক্ষ্ণ অনুভূতি জন্ম নিত তাদের ভেতর। এগুলো সাধারণত ঘটত তখনই, যখন প্লেগের সম্পূর্ণ উপশম হয়েছে এরকম ভেবে নিয়ে তারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নতুন পরিকল্পনা রচনা করতে যেত। অথবা যখন সম্পূর্ণ আশাতীতভাবে, কতকটা দৈবের করুণার মতো তাদের ভেতর হঠাৎ একধরনের ঈর্ষা জেগে উঠত, সেই ঈর্ষার নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য থাকত না হয়তো, কিন্তু তাই বলে তার যন্ত্রণা কোনো সময় কম বলে মনে হত না। আবার মাঝে মাঝে এমনও ঘটত যে, কারো কারো মধ্যে আকস্মিক কাজকর্মের উদ্দীপনা জেগে উঠত, তখন সপ্তাহের বিশেষ কতকগুলো দিনে তারা মনের সমস্ত নিরুৎসাহকে ঝেড়ে ফেলে দিত। অত্যন্ত সুস্পষ্ট কারণে শনিবার আর রবিবারের বিকেলগুলোতেই ঘটত এসব, কারণ স্বাভাবিক সময়ে যখন প্রিয়জনদের সঙ্গলাভের অবাধ সুযোগ ছিল তখন এই দিনদুটো সাধারণত আলাদা থাকত নিয়ম-বাঁধা একধরনের আনন্দফুর্তির জন্যে। রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে যে বিষণ্ণতা ছাপিয়ে উঠত, তার ফলে কখনোওকখনো ভয় হত যে পুরোনো জীবনের সব স্মৃতি বুঝি আবার মনের মধ্যে

ভিড় করে আসবে, আর এই বিষণ্ণতা হচ্ছে তারই সংকেত, কিন্তু সবসময় সত্যই তা ঘটত না। আর এই সন্ধ্যার সময়টা যখন, যাদের ধর্মবিশ্বাস আছে তারা সাধারণত নিজের নিজের বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার অবকাশ পায়, নিজের নিজের বিবেক হাতড়াবার চেষ্টা করে। এই সময়টা কয়েদির জন্যে, যারা নির্বাসিত জীবন কাটাত তাদের জন্যে, সত্যিই সবচেয়ে কঠিন সময়, কারণ একটা শূন্যতা ছাড়া তাদের সামনে চাইবার তো কিছু থাকে না। এই সময় কিছুক্ষণের জন্য তাদের মন খানিকটা সংশয় এবং অনিশ্চয়তার ভেতর থাকে, তারপর অলস উদাসীনতা আবার একটু একটু করে আচ্ছন্ন করে ফেলে তাদের মনকে। না, সেদিনও জেলের গেট আর একবার তাদের চোখের সামনে বন্ধ হয়ে গেল।

স্পষ্টত এসবের অর্থ ছিল এই যে, যেগুলো মানুষের কাছে একান্তভাবে ব্যক্তিগত কামনার জিনিস, সেসবের প্রতি আগ্রহ দেখানোর অভ্যাসটা ক্রমেই ছাড়তে হয়েছিল তাদের। প্লেগের গোড়ার দিকে যেমন এমন অজস্র খুঁটিনাটি জিনিস তাদের নজরে পড়ত, সেগুলো ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছে গুরুত্ব ছিল প্রচুর, যদিও অপরের দৃষ্টিতে সেগুলোর কোনো মূল্যই ছিল না এবং প্রত্যেকটা ব্যক্তিসত্তাই যে স্বতন্ত্র, অনন্য; এইভাবে এই প্রথম তারা তা উপলব্ধি করবার সুযোগ পায়। অপরপক্ষে, এখন তারা কেবল সেইসব জিনিসের প্রতি আগ্রহ দেখাত, যেগুলো সাধারণভাবে সবার আগ্রহের বস্তু। সবকিছু সম্পর্কে এখন তাদের মনে কতকগুলো সাধারণ ধারণা ছিল মাত্র, এমনকি তাদের অন্তরের স্নেহানুভূতিকেও মনে হত কতকগুলো বিমূর্ত ভাব মাত্র, যা আর পাঁচটা সাধারণ চিন্তাভাবনার মতোই।

প্লেগ এখন প্রত্যেকের জীবনকে এমনই প্রভাবিত করে ফেলেছিল যে, কেউ প্লেগে আক্রান্ত হলে তার মধ্যে যে একটা দীর্ঘ হতচেতন অবস্থা দেখা যেত, প্রত্যেকে মনে-মনে এখন যেন সেই মানসিক অবস্থাটাকেই নিজের মধ্যে কামনা করত এবং অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতসারেই ভাবতে শুরু করত : প্লেগে যদি ধরত আর যদি তাতেই মারা যেতাম সেটাই বরং ভালো ছিল। কিন্তু সত্য কথা বলতে কী, ইতিমধ্যেই তাদের জীবন যেন কতকটা নিদ্রার ঘোরের মধ্যে কাটছিল, প্লেগের শুরু থেকে এই দীর্ঘ সময়টা তাদের কাছে গোটা একটা রাত নিদ্রার মধ্যে কাটবার মতোই ছিল। সারা শহরের লোকগুলোকে এখন মনে হত যেন স্বপ্নচারী, একটা সম্মোহনের মধ্যে বাস করছে সবাই, তাদের সম্মোহন কাটত শুধুমাত্র সেইসব দুর্লভ মুহূর্তে যখন তাদের হৃদয়ের ক্ষত আকস্মিক আবার উন্মুক্ত হয়ে যেত, অথচ এই ধরনের ক্ষত তাদের অন্তরে যে এখনও আছে, বাইরে থেকে তা অনুমান করা সম্ভব ছিল না। এই সময়গুলোয় মাঝে মাঝে ঘুমের ভেতর চমকে জেগে উঠত তারা, কেমন একটা আনমনা ঔৎসুক্যের সঙ্গে যেন নিজের নিজের ক্ষতের ওপর আঙুল বুলাতে থাকত। যন্ত্রণায় ঠোঁটজোড়া বেঁকে উঠত প্রত্যেকের। দেখতে দেখতে বেদনার জ্বালা শুরু হয়ে যেত প্রত্যেকের অন্তরে এবং মুহূর্তের মধ্যে ভালোবাসার বিষাদময় করুণ চেহারা যেন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত প্রত্যেকের সামনে। অবশ্য সকালে আবার যখন ঘুম থেকে জেগে উঠত তখন সবকিছুই মনে হত স্বাভাবিক, আগের মতন অর্থাৎ আবার জীবন শুরু হত

সেই প্লেগ-আক্রান্ত পরিবেশের ভেতর।

এমন একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে বাইরের কোনো পর্যবেক্ষকের মনে এই প্লেগের বন্দিদের সম্পর্কে কী ধারণা জন্মাত? প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত সহজ : তেমন কোনো ধারণাই জন্মাত না সাধারণত তাদের সম্পর্কে। সেটা ভিন্নভাবে প্রকাশ করতে চাইলে বলা যায় যে, সাধারণ আর-পাঁচজনের মতোই মনে হত তাদেরকেও; অর্থাৎ যাদের না দেয়া যেত কোনো সঠিক বর্ণনা, না ফেলা যেত কোনো বিশেষ শ্রেণীতে। শহরের চারিদিকে তখন যে একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থা বিরাজ করত বা সামান্য যে একধরনের অসহায় বিক্ষোভ দেখা যেত, এ সবকিছুরই শরিক ছিল তারা, শুধু কোনোকিছু সম্পর্কে জানবার, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করবার কৌতূহল বা ইচ্ছা যে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে থাকে সেটাকে তারা যেন এখন হারিয়ে ফেলেছিল। তার পরিবর্তে কেমন একটা নিশ্চিত মানসিক প্রশান্তির ভাব দেখা যেত সবার ভেতর। যাদের সবচেয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল বলে মনে হত, তাদেরও দেখা যেত সংবাদপত্রের পাতা উল্টে যাবার বা মনোযোগের সঙ্গে রেডিও শুনবার এমন একটা ভান করতে, যেন সাধারণ আর সবার মতো তারাও আশা করত যে, প্লেগের যে সত্বর উপশম হতে যাচ্ছে তা বিশ্বাস করবার মতো সুস্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত পাবে খবরের কাগজ বা রেডিও থেকে। ক্লান্তিতে বিরক্তিতে চেয়ারে বসে হাই তুলছে আর যখন যা খেয়ালে আসছে অনিচ্ছার সঙ্গে লিখে চলছে, এমনি কোনো সাংবাদিকের রচিত সংবাদপত্রের ছত্রের ভেতর যেন অসম্ভব এক আশার বা তেমনি অতিরঞ্জিত আশঙ্কার কারণ খুঁজে পেত তারা। আবার এই সবকিছুর মধ্যেই তারা বিয়ার খেত, দুঃস্থদের সেবা-শুশ্রূষা করত, আলসো সময় কাটাত, কখনো-বা কাজকর্মের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে দিয়ে সবকিছু ভোলবার চেষ্টা করত, বিভিন্ন অফিসে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করে আসত আর নইলে বাসায় বসে খানিকক্ষণ গ্রামোফোন বাজাত। তাদের দেখে একমুহূর্তের জন্যও মনে হত না যে, শহরের আর সব লোকদের থেকে তারা একটুও ভিন্ন। অর্থাৎ কোনটা তাদের করা উচিত আর কোনটা করা উচিত নয়, তা নির্বাচন করবার ক্ষমতা তারা সবাই তখন হারিয়ে ফেলেছিল, প্লেগের প্রভাবে যেন তাদের বিচারবুদ্ধির শক্তি লোপ পেয়েছিল। কে ভালো খেল না মন্দ খেল, কে ভালো পরল না মন্দ পরল—এসব নিয়ে এখন যে আর বড় একটা কেউ মাথা ঘামাত না তা থেকেই এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যেত। যখন যা সামনে পেত তা নিয়েই সবাই খুশি থাকত।

এবং পরিশেষে আরো একটা লক্ষ্য করবার ব্যাপার ছিল এই যে, প্লেগের গোড়ার দিকে বিরহকাতর প্রেমিক-প্রেমিকেরা যে একটা অদ্ভুত ধরনের সুবিধা ভোগ করত, এখন আর সেটা ছিল না তাদের জন্য। ভালোবাসার অহমিকা যখন ছিল না তাদের ভেতর, তেমনি তার কল্যাণকর প্রভাবও ছিল না এখন আর তাদের ওপর। আর যাই হোক, সত্যিকারের অবস্থাটা এখন সবার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল; দুর্বিপাকে সবার জন্য সবাইকেই মাথা ব্যথা করতে হবে। একদিকে তখনকার সেই গেটে গেটে গোলাগুলির শব্দের প্রতিধ্বনি, অন্যদিকে কাগজপত্রে সিলমোহর মারার নিয়মিত থপথপ শব্দ, যা জীবন-মৃত্যুর ছন্দকে চিহ্নিত করত; একদিকে সারি সারি লোকের ভিড়, অন্যদিকে ঘন

ঘন অগ্নিকাণ্ড; একদিকে নিদারুণ আতঙ্ক, অন্যদিকে নিয়মকানুনের অতিশয্য—এ সবকিছুই তখন মনে হত যেন একটা মাত্র উদ্দেশ্যে সমর্পিত, তা হচ্ছে মৃত্যু, যে মৃত্যু হয়তো বিশ্রী কদাকার, কিন্তু তবুও তা লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। আর বিশ্রী গন্ধযুক্ত ধোঁয়া এবং এ্যাম্বুলেন্সের চাপা যান্ত্রিক শব্দে ভরা সেই বিচ্ছিন্ন পরিবেশের ভেতর আমাদের তখনকার যা অভিজ্ঞতা, তা ছিল নির্বাসিত জীবনের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আমরা সবাই অপেক্ষা করতাম একই পুনর্মিলনের জন্য, শান্তি ফিরে পাবার সেই একই অলৌকিক বিস্ময়ের জন্য।

একথা নিঃসন্দেহে সত্যি যে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে ভালোবাসা তখনও পর্যন্ত বেঁচে ছিল, শুধু কার্যক্ষেত্রে তার আর কোনো মূল্যই ছিল না। একতাল জড়পিণ্ডের অস্তিত্ব যেমন নিষ্ফল, আমাদের মধ্যে ভালোবাসার তখনকার অস্তিত্বও ছিল অনেকটা তেমনি নিষ্ফল। কোনো গুরুতর অপরাধ বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যেমন নিষ্ফল, এই ভালোবাসাও ছিল তেমনি নিষ্ফল। ভালোবাসা তখন নেমে এসেছিল এমন এক ধৈর্যের পর্যায়ে যার কোনো লক্ষ্য ছিল না কিন্তু প্রত্যাশা ছিল অনমনীয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমাদের শহরের অধিবাসীদের তখনকার কারো কারো মনোভাবকে খাদ্যের দোকানের সামনে অপেক্ষমাণ লোকদের মনোভাবের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারত। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যেত নিয়তির কাছে সেই একই রকমের আত্মসমর্পণ, সেই একই রকমের দীর্ঘ সহনশীলতা, যার যেমন শেষ ছিল না, তেমনি আবার কোনো অলীক প্রত্যাশাও ছিল না। এই দুয়ের ভেতর যে পার্থক্য ছিল তা হচ্ছে এই যে বিরহকাতর নরনারীর তখনকার সেই অন্তর্দাহকে, নিছক ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্যের অনুসন্ধান করে ফিরত যারা, তাদের মানসিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করতে চাইলে শুধু তাদের সেই ক্ষুধার যন্ত্রণাকে বহুগুণ বাড়িয়ে কল্পনা করার দরকার ছিল এই যা, কারণ প্রত্যেকটা বিরহী হৃদয়ের অন্তরের যে দাহ তার নিবৃত্তি ছিল প্রায় অসম্ভব।

যাই হোক, শহরের নির্বাসিত মানুষদের তখনকার মনোভাব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে চাইলে পাঠকবর্গকে আবার কল্পনা করতে হবে সেসব নিরানন্দ সন্ধ্যায়, যা ধূলার অস্বচ্ছ হালকা আবরণ আর অস্তগামী সূর্যের সোনালি আভার ভেতর দিয়ে যেন ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে নেমে আসত স্ত্রীপুরুষের সমাগমে মুখর শহরের রাস্তায় রাস্তায়। কারণ মোটরগাড়ি এবং অন্যান্য যানবাহনের শব্দ, সাধারণ সময়ে যাকে মনে হত শহরের কণ্ঠস্বর স্বরূপ, এখন সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাওয়ায় দিবাশেষের উজ্জ্বল আভায় সিক্ত হয়ে এখন প্রতিদিন ঊর্ধ্বে শূন্যের দিকে উত্থিত হত যে মিলিত গর্জন, তার ভেতর থাকত অসংখ্য নিচুকণ্ঠের মিলিত কোলাহল, অবিরাম চলাফেরার শব্দ, শূন্যে গুমোট আবহাওয়ার অন্তরাল থেকে উত্থিত প্লেগের ভূতুড়ে ফিসফিসানির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে পা ফেলার বুটের শব্দ, রাস্তায় এবং পার্কে অপেক্ষমাণ বিরাট জনসমুদ্রের মাঝ থেকে উত্থিত প্রবল ধ্বনি। অর্থাৎ সবটা মিলিয়ে একটা চাপা অবিরাম গমগম শব্দ যেন ঢেউয়ের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে সমস্ত শহরটার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ভরিয়ে রাখত এবং আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে ভালোবাসার স্থান দখল করেছিল যে অন্ধ সহিষ্ণুতা, প্রতি সন্ধ্যায় তার সবচেয়ে বিষাদময় রূপটাকে ফুটিয়ে তুলত যেন।

চতুর্থ পর্ব

সারাটা সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর শহরের দিকে তাকালে মনে হত শহরটা যেন পরাভূত, অসহায় শিকারের মতো প্লেগের পায়ের সামনে লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে; প্লেগের দয়া এবং করুণাই তার একমাত্র নির্ভর। যেমনতেন প্রকারের সময় পার করে দেয়ার ভান করা ছাড়া তখন আর করার মতো কিছুই ছিল না কারো সামনে। শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে মানুষ সপ্তাহর-পর-সপ্তাহ যা তাদের কাছে মনে হত অনন্তকালের মতো, এইভাবে সময় পার করে দিতে লাগল। কুয়াশা, রোদ আর বৃষ্টিতে প্রতিবছর নিয়মিত ধারায় শহরের রাস্তাঘাটে যেসব পরিবর্তন ঘটে এবারও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। দক্ষিণদিক থেকে পাখি উড়ে এল ঝাঁকে ঝাঁকে, গায়ক পাখি আর খুদে কিচকিচে পাখি, শূন্যে অনেক উঁচুতে উড়তে লাগল নিঃশব্দে, শহরের ছোঁয়াচ এড়িয়ে যাবার জন্যে যেন সবসময় দূরে দূরে থাকতে লাগল পাখিগুলো। প্লেগের সেই-যে অদ্ভুত অস্ত্রের কথা ফাদার প্যানালু বর্ণনা করেছিলেন, হিসহিস শব্দে নিয়ত শূন্যে ঘুরত সেই-যে বিরাট শস্য-মাড়াইয়ের দণ্ড, সেই দণ্ড যেন আগে থাকতেই পাখিগুলোকে এই শহর সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিল। অক্টোবরের গোড়ার দিকে প্রবল একটা বর্ষণের ফলে শহরের রাস্তাঘাট ধুয়েমুছে আবার ঝকঝক করতে থাকল। আর সেই একইভাবে মুহূর্ত গুনে গুনে সময় পার করে দেয়া ছাড়া এর ভেতর তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই ঘটতে দেখা গেল না।

তারা যে সত্যিই কতখানি পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন, ডাক্তার রিও এবং তাঁর সহযোগী বন্ধুরা এতদিনে সেটা এই প্রথম উপলব্ধি করলেন। বাস্তবিকই, নিজেদের দৈহিক এবং মানসিক অবসাদ যে ঝেড়ে ফেলে দেবে, সে কষ্টটুকুও যেন স্যানিটারি স্কোয়াডের লোকেরা ছেড়ে দিয়েছিল। তার নিজের এবং তার সহকর্মীদের ভেতর যে একটা পরিবর্তন এসেছিল ডাক্তার রিও নিজেও সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। সবকিছুর প্রতিই তারা যেন কেমন উদাসীন হয়ে উঠেছিলেন। কিছুদিন আগেও যেসব লোককে দেখা যেত প্লেগের সম্পর্কে সামান্য একটুকরো খবর পাবার জন্যে সবসময় উন্মুখ, তারাও এখন যেন এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল।

প্লেগের সংক্রমণ যাতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেইজন্যে সুস্থ লোকদেরও পৃথক করে রাখবার জন্যে যেসব কেন্দ্র খোলা হয়েছিল, তার একটার দেখাশুনার ভার দেয়া হয়েছিল র‍্যাঁবেয়ারের ওপর। র‍্যাঁবেয়ার নিজে যে হোটেলে থাকতেন, সেটাকেও ইতিমধ্যে দখল নেয়া হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে। তার নিজের তত্ত্বাবধানে কতজন লোক ছিল, হঠাৎ তাদের ভেতর কেউ অসুস্থ হওয়ার লক্ষণ দেখা দিলে তাকে দ্রুত অন্যত্র অপসারণের জন্যে কী কী ব্যবস্থা নেয়া দরকার—এগুলো সম্পর্কে খুঁটিনাটি খবর যে-কোনো সময় তিনি দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনা

ছিল অত্যন্ত ধরাবাঁধা। তিনি যেসব কেন্দ্র দেখাশুনা করতেন সেখানকার লোকদের প্লেগের বীজাণুনাশক টিকা দিতে শুরু করলে তার ফলাফল কী দাঁড়াতে পারে তার পরিসংখ্যান জোগানোর ব্যাপারেও তাঁর চিন্তাভাবনা দেখা যেত অনুরূপ। কিন্তু সেই সপ্তাহে প্লেগে কতজনের মৃত্যু হয়েছে বা প্লেগের মৃত্যুর হার সর্বোচ্চ বাড়ল না কমার দিকে, এসব নিয়ে যদি কেউ তাকে প্রশ্ন করত তিনি তার জবাব দিতে পারতেন না। এবং যতকিছুই ঘটুক না কেন এরই ভেতর একদিন না-একদিন যে তিনি শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারবেন, সে-আশাও তিনি ছাড়েননি তখনও।

অন্য যারা ছিলেন তাঁরাও দিনরাত একইভাবে কাজ করার পর এমনই ক্লান্ত এবং অবসন্ন বোধ করতেন যে, তারপর বাসায় ফিরে আবার যে দৈনন্দিন সংবাদপত্রের পাতা ওল্টাবেন বা রেডিওটা খুলে দেবেন, তেমন অবস্থা থাকত না। কোনোরকম দেখাশুনা বা যত্ন না-পেয়েও কোথাও কেউ প্লেগ থেকে সেরে উঠছে, এই ধরনের খবর পেলে তারা অবশ্যই কিছুটা আগ্রহ দেখাবার ভান করতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এই সংবাদ এমন এক আবেগহীন উদাসীনতার সঙ্গে গ্রহণ করতেন যাকে শুধুমাত্র সংগ্রামরত এমন একজন সৈনিকের অনুভূতির সঙ্গে অনুরূপ বলে কল্পনা করা যেতে পারত—যিনি অবিরাম কাজের চাপে এবং নিজের দৈনন্দিন দায়িত্বের মাঝে অনুক্ষণ এমনই ডুবে থাকেন যে একটা চূড়ান্ত সংগ্রাম বা সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা যে সম্ভব, সে-চিন্তাও এখন আর তার মনে স্থান পায় না।

প্লেগের নানারকম পরিসংখ্যান রাখার কাজ গ্রাঁদ যদিও তখনও সুশৃঙ্খলভাবে নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাদের থেকে প্লেগের ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্পর্কে যে কী ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সে-ব্যাপারে নিশ্চয়তার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ডাক্তার রিও বা র‍্যাঁবেয়ার বা তারিউ-এর যেমন দীর্ঘ সময় ধরে কষ্ট সহ্য করবার মতো দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য ছিল, গ্রাঁদের তেমন স্বাস্থ্য কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু এখন মিউনিসিপ্যাল অফিসে তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব ছাড়াও প্রতি রাতের জন্যে ছিল তার সাহিত্যকর্ম এবং ডাক্তার রিও-র অধীনে সেক্রেটারির কাজ। এই ধরনের নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে তার শরীর-স্বাস্থ্য যে ক্রমেই ভেঙে পড়ছিল তা যে-কোনো লোকের চোখেই ধরা পড়ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে-কোনোরকমে সেই পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন, সে শুধু তার মনের ভেতর নির্দিষ্ট যে গোটা দুইতিন চিন্তা অনুক্ষণ ঘোরাফেরা করত তারই ফল। যেমন তিনি সবসময় ভাবতেন যে, মুহূর্তে প্লেগের উপশম হবে, তারপর থেকে অন্তত পুরো এক সপ্তাহ ছুটি নেবেন এবং সেই সময়টা তাঁর এই লেখার কাজ যতদূর এগিয়েছে তারপর থেকে বাকিটুকু সম্পূর্ণ করবার জন্যে ব্যয় করবেন। এখন গ্রাঁদ যেন বড় বেশি ভাবপ্রবণ হয়ে উঠছিলেন বিশেষ করে এই সময়গুলোয় তিনি ডাক্তার রিও-র কাছে জেনির সম্পর্কে নানারকম গল্প করতেন। না-জানি কোথায় আছে সে এখন! তিনি ভাববার চেষ্টা করতেন—জানি না, কখনো জানি কোথায় আছে সে এখন! তিনি ভাববার চেষ্টা করতেন—জানি না, কখনো কাগজের পাতা ওল্টাবার সময় আমার কথা তার মনে পড়ে কি না! এমনকি ডাক্তার রিও একদিন লক্ষ্য করলেন, ব্যাপারটা তার নিজের কাছেও বেশ বিস্ময়কর ঠেকল যে, তিনি নিজেও গ্রাঁদের কাছে তার স্ত্রীর সম্পর্কে গল্প করছেন, আর তাও আবার এমন

সব অতি সাধারণ কথাবার্তার মাধ্যমে যা কখনও কারো কাছে করা তাঁর অভ্যাস নয়।

স্ত্রীর কাছ থেকে তার শরীরের অবস্থা জানিয়ে বরাবর যেসব টেলিগ্রাম তিনি পেতেন, সেগুলোর ওপর ডাক্তার রিও মোটেই ভরসা করতে পারতেন না। পরপর যে টেলিগ্রামগুলো আসত, সেগুলো দেখে তাঁর মনে হত একটা থেকে পরের টেলিগ্রামটায়ই স্ত্রী যেন তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পর্কে তাঁকে আরো বেশি করে আশ্বস্ত করতে চেয়েছেন। কাজেই তিনি স্থির করলেন, স্বাস্থ্যনিবাসের ডাক্তারের কাছে তার পাঠিয়ে সঠিক খবর নেবেন। উত্তরে তাকে জানানো হল, তাঁর স্ত্রীর শরীরের অবস্থা ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা খারাপের দিকে গেছে, তবে রোগ যাতে আর বাড়বার সুযোগ না পায় তার জন্যে তাঁরা সাধ্যমতো চেষ্টা করে চলেছেন। এতদিন খবরটা তিনি নিজের মধ্যে গোপন রেখেছিলেন এবং আজ যে সেটা গ্রাঁদের কাছে প্রকাশ করলেন, তার একমাত্র কারণ হয়তো তখনকার তাঁর মানসিক অবস্থা। জেনির সম্পর্কে দু-চার কথা গল্প করার পর গ্রাঁদ সেদিন ডাক্তারের স্ত্রীর কথা জানতে চাইলেন। ডাক্তার রিও-র উত্তর শুনে গ্রাঁদ বললেন—আজকাল যেভাবে তারা এসব রোগীকে আরোগ্য করে তোলে সত্যিই তা বড় বিস্ময়কর। ডাক্তার রিও তাতে সায় দিলেন এবং পরে বললেন, তাদের স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের কিছু কিছু খারাপ প্রভাব এবার তাঁর ওপর শুরু হয়েছে। আর তাছাড়া তাঁর স্ত্রী যাতে দ্রুত সেরে উঠতে পারেন, কাছে থাকলে হয়তো সে-ব্যাপারেও তিনি অনেক সাহায্য করতে পারতেন। অথচ এখন যা অবস্থা তাতে তাঁর স্ত্রী নিশ্চয় ভীষণ নিঃসঙ্গ বোধ করেন। কথাগুলো বলার পর ডাক্তার হঠাৎ কেমন যেন চুপ করে গেলেন। এরপর থেকে গ্রাঁদ তাঁকে যেসব কথা জিজ্ঞাসা করলেন, সেগুলোর জবাব তিনি এড়িয়ে গেলেন।

বাকি সবার অবস্থাও দাঁড়িয়েছিল কতকটা এই একই রকম। অন্যদের তুলনায় তারিউ-ই বরং এই অবস্থার ভেতরেও কতকটা আগের মতোই রয়ে গিয়েছিলেন। তবুও এই সময়কার তাঁর ডাইরি থেকে অনুমান করা যায় যে, তখনও অনেক ব্যাপারেই তাঁর গভীর কৌতূহল ছিল সত্যি, কিন্তু আগের মতো ব্যাপকভাবে সবকিছুর প্রতি আগ্রহ তিনিও তখন আর দেখাতে পারতেন না। বাস্তবিকই, এই সারা সময়টাই যার সম্পর্কে তারিউ-র মনে সত্যিকারের কৌতূহল ছিল তিনি হচ্ছেন কটার্ড। সাধারণ লোকজনদের রোগের ছোঁয়াচ থেকে পৃথক রাখবার জন্য তখন যেসব কেন্দ্র খোলা হচ্ছিল, সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্যে তারিউ যে-হোটেলে থাকতেন সেই হোটেলটাকেও সরকারিভাবে দখল করে নেয়া হয় এবং তারপর থেকেই তারিউ ডাক্তার রিও-র বাসায় এসে উঠেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে হয়তো কর্মহীন অবস্থায় চুপচাপ বসে আছেন, অথচ পাশেই যে গ্রাঁদ এবং ডাক্তার রিও দৈনন্দিন মৃত্যুর পরিসংখ্যান প্রস্তুতের কাজ নিয়ে হিমশিম খেয়ে উঠছেন, সেদিকে তিনি বিন্দুমাত্র নজর দিতেন না। বরং সামান্য একটু সুযোগ পেলেই কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে যেতেন তাঁর নিজের প্রিয় বিষয়বস্তু সেই ওরাঁও শহরের দৈনন্দিন জীবনধারার খুঁটিনাটি আলোচনার দিকে।

তাদের ভেতর সবচেয়ে ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত মনে হত ডাক্তার ক্যাসলকে। এরই ভেতর একদিন এসে তিনি ডাক্তার রিওকে জানালেন যে প্লেগের বীজাণুনাশক সিরাম

প্রস্তুত করে ফেলেছেন। তারপর স্থির হল যে, মঁসিয়ে অথনের ছেলেটির ওপর সিরামটা তাঁরা প্রথম পরীক্ষা করে দেখবেন, কারণ তখন তার জীবনের আশা ছিল অল্প। এরই মাঝে ডাক্তার রিও যখন মৃত্যুর দৈনন্দিন পরিসংখ্যান সম্পর্কে কথা বলছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ডাক্তার ক্যাসলের দিকে চোখ পড়তেই দেখলেন কথাবার্তার ফাঁকে কখন তিনি নিজের চেয়ারে কেমন একটা জড়সড় অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। নিদ্রিত অবস্থায় ডাক্তার ক্যাসলের চেহারার মধ্যে যে বিপর্যয়ের ছাপ ফুটে উঠেছিল, তা লক্ষ্য করতেই ডাক্তার রিও যেন মর্মাহত বোধ করলেন। বরাবর দেখে এসেছেন ডাক্তার ক্যাসলের মুখের ওপর অনুক্ষণ কেমন একটা ব্যঙ্গাত্মক পরিহাসের হাসি খেলত এবং তার ফলে তার চেহারায় চিরন্তন যৌবনের একটা আভাস ফুটে থাকত যেন। আর এখন নিয়ন্ত্রণহীন এই অসতর্ক মুহূর্তে ঈষৎস্ফুরিত তাঁর দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছিল, তার বয়স এবং দৈহিক ক্ষয় অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। এই দৃশ্য দেখার পর ডাক্তার রিও-র মনে হল দলার মতো কী একটা যেন তার গলার ভেতর থেকে ঠেলে উঠছে।

তিনি নিজেও যে কতখানি ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, ডাক্তার রিও তা অনুমান করতে পারতেন এইসব সামান্য সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে। নিজের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে চাপা দিয়ে রাখবার শক্তি যেন তার ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসছিল। অনুক্ষণ কঠিন নিয়ন্ত্রণের ভেতর রাখবার ফলেই হয়তো অনুভূতিগুলোর স্বাভাবিক নমনীয়তা লোপ পেয়েছিল, অনুভূতিগুলোকে এখন মনে হত অত্যন্ত ভঙ্গুর, মাঝে মাঝে সেগুলো যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে চাইত। তাই সামান্য যে-কোনো আবেগ তাকে অভিভূত করে ফেলত। অথচ অনুভূতিগুলোর ওপর আরো কঠিন নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেয়া এবং নিজের হৃদয়কে যতদূর সম্ভব কঠিন করে ফেলা ভিন্ন কোনো উপায়ও ছিল না তখন আর তার সামনে। কারণ তিনি পরিষ্কার উপলব্ধি করতেন, এই অবস্থার ভেতর কোনোরকমে টিকে থাকতে চাইলে এটাই একমাত্র পথ।

যাই হোক, কোনোরকম মানসিক বিভ্রম বা ভ্রান্ত আশা তখন আর ছিল না তাঁর মধ্যে। আর এই ধরনের কিছু মনের কোণে কোথাও টিকে থাকলেও, এখনকার দৈহিক ক্লান্তি আর অবসাদের চাপে তাদের সেই অস্তিত্ব অনুভব করাটা সহজ ছিল না। এখন তিনি পরিষ্কার অনুভব করতে পারতেন, সামনে দীর্ঘদিন ধরে, ঠিক কতদিন যে তা-ও নির্ণয় করাটা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তার দায়িত্ব হবে শুধু রোগ পরীক্ষা করে বেড়ানো; রোগ নিরাময় করা নয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের খুঁজে বার করা, তাদের দেখে বেড়ানো, রোগের বর্ণনা দেয়া, রোগীদের তালিকাভুক্ত করা আর তারপর সম্পূর্ণ ভাগ্যের ওপর তাদের নিরাময়ের ভার ছেড়ে দেয়া—এখন থেকে এই-ই হবে তাঁর কাজ।

মাঝে মাঝে অবশ্য এমনও ঘটত যে কোনো মেয়েছেলে হঠাৎ তার কোটের পেছনটা চেপে ধরে তীক্ষ্ণগলায় চিৎকার করে উঠতেন—ডাক্তার সাহেব তাকে প্রাণে বাঁচান, পারবেন না তাকে বাঁচাতে? কিন্তু কারো জীবন রক্ষা করাটা তো আর এখন তাঁর দায়িত্বের মধ্যে ছিল না বরং অসুস্থ ব্যক্তিকে অন্যত্র অপসারণের কঠিন নির্দেশ দেয়াই ছিল তাঁর কাজ। সুতরাং তার পরেই কী অসহায় ঘৃণা ফুটে উঠতে দেখতেন এই

অনুনয়কারীদের মুখে।—ডাক্তার সাহেব, সত্যিই হৃদয় বলে কি কিছুই নেই আপনার!—একবার এক মহিলা তার মুখের ওপর মন্তব্য করেছিলেন। মনে হয় ভুল বুঝেছিলেন মহিলা, হৃদয় সত্যিই ডাক্তার রিও-র ছিল। জীবনকে ভোগ করবার জন্যই যারা পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে, সেইসব মানুষকে প্রতি ঘন্টায় যে তাঁকে চোখের সামনে মরতে দেখতে হত, প্রতিদিন অবিরাম বিশ ঘন্টা ধরে এই একই দৃশ্য দেখবার শক্তি যে তিনি পেতেন, সে শুধু তাঁর হৃদয় ছিল বলেই। তাঁর হৃদয় ছিল বলেই তো প্রতিদিন সকালে উঠে এই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি দেখবার জন্যে আবার এত সহজে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারতেন। তখনকার যা অবস্থা তার ভেতরেও এতকিছু করবার মতো হৃদয়ের বল তাঁর ছিল বই কি! কিন্তু শুধু তা দিয়ে তো আর মানুষের জীবন রক্ষা করা যেত না।

না, তখনকার সেই ব্যস্ততার দিনে তিনি আর চিকিৎসা করতেন না কারো, তাঁর কাজ ছিল শুধু সংবাদ সরবরাহ করা। কিন্তু যতকিছুই বলা হোক না কেন, এটাও সত্য যে তখনকার সেই ত্রাসের রাজত্বে, শহরের লোকসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছিল যেখানে, সেখানে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির উপযুক্ত দায়িত্ব পালনের সুযোগসুবিধা কারো ছিল কি? বাস্তবিক, ডাক্তার রিও-র তখনকার সেই দৈহিক অবসাদ ছিল তাঁর জন্য একধরনের প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদ। যদি দৈহিকভাবে তখন তিনি অতখানি পরিশ্রান্ত হয়ে না পড়তেন, যদি তাঁর মানসিক বৃত্তিগুলো সম্পূর্ণ সজাগ থাকত, তাহলে চারিদিকে মৃত্যুর এই পূতিগন্ধময় পরিবেশে তাঁকে আরো দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়তে হত।

কিন্তু প্রতিদিন নিদ্রার সুযোগ যার মাত্র চার ঘন্টা; তার দুর্বলচিত্ত হবার মতো অবকাশ কোথায়? জীবনের বাস্তব রূপটাই তখন তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, ন্যায়ের ঝলমলে আলোর মাঝে তখন তাঁকে জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে হয়, তা একদিকে যেমন বীভৎস, তেমনি মানুষের যুক্তিবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিহীন। তাঁর আশপাশে অপর যারা ছিলেন, সেইসব স্ত্রী-পুরুষ, মৃত্যুদণ্ড ছিল যাদের ভাগ্যলিপি, তারাও ছিলেন শূন্যগর্ভ এই একই জীবনবোধের শরিক। প্লেগ শুরু হবার আগে তিনি ছিলেন একজন ত্রাণকর্তা, সেইভাবেই লোকে বাসায় অভ্যর্থনা জানাত তাঁকে। কয়েকটা বড়ি বা একটা ইনজেকশন দিয়ে তিনি রোগীকে আবার আরোগ্য করে তুলবেন, তাই রোগীর ঘরে ঢোকবার সময় তার বাহু জড়িয়ে ধরে সমাদর করে লোকে তাঁকে ভেতরে নিয়ে যেত। এর ভেতর যেমন তোষামোদ থাকত তেমন আবার বিপদের আশঙ্কাও থাকত। আর এখন ছিল ঠিক তার বিপরীত, ডাক্তার রোগীদের বাসায় যেতেন সৈনিক সঙ্গে নিয়ে, বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তারা দরজায় আঘাত করার পরই রোগীর পরিবারের লোকেরা তাদের দরজা খুলে দিত। আর এখন এইসব মানুষ শুধু ডাক্তারকে কেন, পারলে পৃথিবীসুদ্ধ সবাইকে তাদের সঙ্গে টেনে কবরে নিয়ে যেতে চাইত যেন। এটা খুবই সত্যি যে পৃথিবীতে কোনো মানুষই অপরের ওপর নির্ভর করা ছাড়া বাঁচতে পারে না। ডাক্তার রিও নিজেও এইসব অসুস্থ মানুষদের মতো সমান অসহায় বোধ করতেন, প্রত্যেকটা রোগীকে দেখার পর তার জন্যে তাঁর নিজের অন্তরে যে সামান্য করুণাবোধ জাগত, সে করুণাটুকু ছিল হয়তো তখন তাঁর নিজেরও কামনার বস্তু।

যাদের মনে হত অন্তহীন এমনি সপ্তাহর-পর-সপ্তাহ ধরে তখন ডাক্তার রিও-র মনের মধ্যে এইসব চিন্তাভাবনাই অনুক্ষণ ঘুরত, আর ঘুরত নিজের স্ত্রীকে দূরে ছেড়ে থাকার চিন্তা। আর এই একই ধরনের চিন্তাভাবনা ছিল তার বন্ধুবান্ধবদেরও, অন্তত তাদের চোখমুখের চেহারা দেখে তাই মনে হত। এই দুর্বিপাককে প্রতিরোধ করবার সংগ্রামে যারা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন, তাদের ভেতর দৈহিক অবসাদ এবং ক্লান্তির যেসব ক্ষতিকর প্রভাব ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, সেগুলো এই নয় যে, তারা ক্রমেই নিজেদের চারপাশের ঘটনাবলি বা অপরের অনুভূতির প্রতি উদাসীন হয়ে উঠেছিলেন বরং তারা যে ব্যক্তিগত জীবনে শৈথিল্য এবং নিষ্ক্রিয়তাকে বড়বেশি প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছিলেন সেটাই ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। যেটুকু একেবারেই না করলে নয়, সেটুকু ছাড়া অন্যসব কাজ, বিশেষ করে যেখানে মনে হত বিষয়টা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয় যার জন্যে এত পরিশ্রমের সার্থকতা আছে, এমন সব ব্যাপারে পারতপক্ষে তাঁরা নড়াচড়া করতে চাইতেন না। এইভাবে স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের যেসব বিধিবিধান একদিন তাঁরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে চালু করেছিলেন, সেগুলোকে এখন তাঁরা নিজেরাই ঘন ঘন লঙ্ঘন করতে বাধ্য হতেন। নিজেদের ব্যবহারের জিনিসপত্র রোগবীজাণুশূন্য করবার যেসব হাজারো নিয়মকানুন তাঁদের মেনে চলা উচিত ছিল, সেগুলো প্রায়ই উপেক্ষা করে যেতেন এবং অনেক সময় এমনও দেখা যেত যে নিজেদের ভেতর যাতে রোগ সংক্রামিত হতে না পারে তার জন্যে কোনোরকম ব্যবস্থা না নিয়েই নিউমোনিয়া প্লেগের রোগীর বাসায় গিয়ে হাজির হতেন, কারণ এমন এক চরম সময়ে তাদেরকে এ-ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল, যখন আর কেউই, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দূরে অবস্থিত, স্যানিটারি সার্ভিস স্টেশনে গিয়ে সংক্রমণ এড়াবার জন্যে ইনজেকশন নেবার ঝামেলার ভেতর যেতে চাইত না। সুতরাং সত্যিকারের বিপদের আশঙ্কা ছিল এখানেই, কারণ দুর্বিপাকের প্রতিরোধের জন্য তারা এতবেশি পরিমাণ শক্তি ব্যয় করতেন, যার ফলে সহজেই তারা প্লেগের শিকার হয়ে পড়তেন। অর্থাৎ নিজেদের জীবন নিয়ে তখন তারা ভাগ্যের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছিলেন। নিয়তিকে তারা যেন বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনতে চাইতেন, কিন্তু তা তো সম্ভব নয়।

সারা শহরে তখন একটাই মাত্র লোক ছিল, যার ভেতর না ছিল কোনোরকমের ক্লান্তি, না ছিল হতাশা। বাস্তবিকই তিনি ছিলেন যেন সবরকম মানসিক প্রশান্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। লোকটা আর কেউ নয়, কটার্ড। ডাক্তার রিও এবং ব্যারেয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা সত্ত্বেও তিনি যেন তাদের থেকে দূরে দূরে থাকবার চেষ্টা করতেন, অন্যদিকে আবার কিছুটা জোর করেই তিনি তারিউ-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছিলেন। তারিউ-র স্বল্প অবকাশের মাঝে যখনই সুযোগ পেতেন, কটার্ড গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতেন। কটার্ডের এই আচরণের অবশ্য দুটো কারণ ছিল : প্রথমত তারিউ তার ব্যাপারটা পুরোপুরি সব জানতেন, দ্বিতীয়ত তারিউ-র কাছে গেলে তিনি কটার্ডকে যথেষ্ট সমাদর করতেন। যার ফলে কটার্ড তাঁর সাহচর্যে বেশ আশ্বস্তবোধ করতেন। এখানেই ছিল তারিউ-র চরিত্রের উল্লেখযোগ্য একটা বৈশিষ্ট্য। তিনি যত পরিশ্রান্তই বোধ করুন-না কেন, কটার্ড গেলে সবসময় অগ্রহভারে তার কথাবার্তা

শুনতেন, আর কটার্ডেরও তারিউ-র সাহচর্য কেমন যেন ভালো লাগত। এমনকি যখন তিনি সম্পূর্ণ ক্লান্ত বোধ করতেন, কোনো-কোনো সন্ধ্যায় যেটা ঘটত, তখনও পরের দিন সকালেই আবার দেখা যেত তিনি নতুন শক্তি ফিরে পেয়েছেন।—তারিউ-র সঙ্গে কথাবার্তা বলে সত্যিই মানুষ আরাম পায়, কটার্ড একবার র‍্যাবেয়ারকে বলছিলেন—কারণ ওর ভেতর সত্যিকারের মনুষ্যত্ব আছে, কী বলতে চাইছি নিশ্চয় বুঝেন। মানুষের প্রতি ওর সত্যিকারের দরদবোধ আছে।

এটাও হয়তো তারই একটা কারণ যে, তারিউ তাঁর ডাইরিতে এই সময়কার যেসব ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তার বেশির ভাগই কটার্ডকে কেন্দ্র করে। একটা জিনিস অবশ্য সুস্পষ্ট যে, সেখানে তিনি কটার্ডের ব্যক্তিত্বের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। কটার্ড সম্পর্কে তাঁর নিজের প্রত্যেকটা মানসিক প্রতিক্রিয়া, তাঁর ভাবনাচিন্তা তিনি ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন, সে প্রতিক্রিয়া কটার্ডের নিজের দ্বারা সঞ্চারিত হোক আর তা তারিউ-র নিজের বিশ্লেষণের ফলই হোক। 'কটার্ড এবং প্লেগের সঙ্গে তার সম্পর্ক' এই শিরোনামের নিচে তারিউ-র ডাইরিতে দীর্ঘ কয়েক পাতা জুড়ে কটার্ড সম্পর্কে বেশকিছু মন্তব্য দেখতে পাওয়া যায়। কাহিনীকারের মতে সেগুলো এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করার মতো।

তারিউ তার ডাইরিতে কটার্ড সম্পর্কে যেসব বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন, তার প্রথমটাতে তিনি কটার্ড সম্পর্কে তাঁর তখনকার সাধারণ ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন : স্বাস্থ্য এবং লাবণ্যে ফেটে পড়ছে মনে হয় লোকটা, আচার-আচরণের ভেতর অমায়িক ভবটা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে তার হাসিঠাট্টা। কারণ ঘটনাগুলো যখন যেদিকে মোড় নিতে শুরু করেছিল, তাতে কটার্ড আর যাই হোক বিচলিত হননি এতটুকু। তারিউ-র সঙ্গে কথাবার্তা বলার ফাঁকে ফাঁকে এই ধরনের মন্তব্যের ভেতর দিয়ে কটার্ড মাঝে মাঝে তাঁর সত্যিকারের অনুভূতিকে প্রকাশ করতেন : অবস্থা প্রতিদিনই খারাপের দিকে যাচ্ছে, তাই না? তবে কী দেখুন, আমরা সবাই এখন এক-নৌকার যাত্রী।

—সেটা তো অবশ্যই সত্যি, তারিউ ডাইরিতে নিজের মন্তব্য যোগ করেছেন—মৃত্যুর আশঙ্কাটা আর পাঁচজনের জন্যে যেমন, তার জন্যেও হয়তো ঠিক তেমনি। আর সেটাই হচ্ছে একমাত্র লক্ষ্য করবার বিষয় : আর পাঁচজনের সঙ্গে একই বিপদের মাঝে বাস করতে হচ্ছে তাঁকেও। অথচ এটাও সুনিশ্চিত যে নিজের বিপদের কথাটা তিনি মোটেই গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করেন না। স্পষ্টত এইরকম একটা ধারণা তার মাথায় ঢুকেছে যে যে-লোক আগে থাকতেই কোনো আশঙ্কাজনক রোগে ভুগছে বা গুরু মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, অপর কোনো রোগ বা নতুন কোনো দুশ্চিন্তা সহসা আর তাকে ছোঁয় না এবং আপাতত যতটা অবাস্তব বলে মনে হয় ততটা অবাস্তব হয়তো নয় তাঁর এই ধারণা।

—আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, কোনো লোক একই সময় দুটো কঠিন রোগে ভুগছে, এমন কখনও ঘটে না। ধরুন, আপনি দুরারোগ্য ক্যান্সার বা রক্তবমন রোগে ভুগছেন, তাহলে নিশ্চিত জানবেন, প্লেগ বা টাইফয়েড আপনাকে ছোঁবে না। দৈহিক কারণেই সেটা অসম্ভব। সত্যি বলতে কী, এ-ব্যাপারে আমরা আরো খানিকটা

সামনের কথাও চিন্তা করতে পারি : কোনো ক্যান্সারের রোগী মোটর-চাপা পড়ে মারা গেছে, এমন শুনেছেন কখনও? এই-যে মতবাদ, প্রকৃতপক্ষে এর মূল্য যাই হোক না কেন, এটাই কটার্ডকে প্রফুল্ল রেখেছিল। যে জিনিসটাকে কটার্ড কঠিনভাবে ঘৃণা করতেন তা হচ্ছে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে একা একা বাস করতে বাধ্য হওয়া; অবরুদ্ধ শহরে বিপুল জনসমষ্টির মধ্যে বাস করতে তিনি প্রস্তুত, কিন্তু জেলে নিঃসঙ্গ দিন কাটাতে সম্মত নন। প্লেগ যেদিন থেকে শুরু হয়েছে সেদিন থেকে তাঁর পিছনে পুলিশের অনুসন্ধান, কুকুরের দৌড়ানো, তাকে বাঁধবার জন্যে ওয়ারেন্ট নিয়ে ঘুরে বেড়ানো—এ সবই বন্ধ হয়েছে। বর্তমানে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিল এইরকম : পুলিশ বলে আমাদের ভেতর কেউ ছিল না, অতীত বা বর্তমান অপরাধ বলেও কিছু ছিল না, যেমন ছিল না কোনো অপরাধ। এখানে শুধু অভিশপ্ত একদল মানুষ কবে কার খেয়ালের বশে হয়তো ত্রাণ পাবে, এইরকম একটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের আশায় বর্তমান অভিশাপ বয়ে চলেছিল আর পুলিশরাও ছিল এই দলে।

সুতরাং (অবশ্য তারিউ-র বিশ্লেষণকে যদি আমরা মেনে নিই) তার চারপাশের অন্য সবার মানসিক বিভ্রম বা দুঃখ-দুর্দশার লক্ষণকে কিছুটা সহৃদয়তার সঙ্গে দেখবার এবং প্রশ্রয় দেবার মতো মানসিক প্রশান্তি কটার্ডের ছিল এবং সেটা হয়তো কটার্ডের এই মন্তব্যের ভেতর প্রকাশ পেয়ে থাকতে পারে : এখন সবাই যত পারে বকবক করুক, কিন্তু এ রোগে প্রথমে আমাকেই ধরেছিল।

—যখন তাকে বুঝিয়ে বলতে গেলাম, তারিউ ডাইরিতে লিখেছেন—সবার সঙ্গে যদি সৌহার্দ্য বজায় রাখতে চান, ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সম্পর্ক বজায় রাখতে চান, তার নিশ্চিত উপায় হচ্ছে যতদূর সম্ভব নিজের বিবেককে পরিষ্কার রাখা। কটার্ড সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে জবাব দিলেন—তাই যদি সত্যি হত তাহলে তো প্রতিমুহূর্তেই আমাদের একের অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবার কথা। তারপর কয়েক মিনিট চুপ করে থাকার পর আবার বললেন—আপনি যা-খুশি বলতে পারেন তারিউ, কিন্তু শুধু একটা কথা আপনাকে বলে রাখতে চাই, যদি সত্যি চান মানুষ একত্রে বাস করুক, তাহলে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে যাতে তাদের ভেতর মাঝে মাঝে প্লেগের আবির্ভাব হয় তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। আপনার চারপাশে একটু চাইলে আপনি নিজেও সেটা অনুধাবন করতে পারবেন হয়তো—।

অবশ্য তিনি যা বলতে চাইছিলেন তা বুঝেছিলাম, আমাদের এখানকার এই জীবনধারা যে কতখানি তাঁর মনোমতো তা-ও অনুমান করতে পেরেছিলাম। একসঙ্গে পথচলার সময় সঙ্গীর দক্ষিণপার্শ্বে থাকবার জন্য প্রত্যেকের প্রাণান্তকর চেষ্টা, আকস্মিক পথ হারিয়ে ফেলেছে এমন কোনো লোককে সাহায্য করবার জন্যে কখনো-বা সত্যিকারের আগ্রহ দেখানো, আবার কখনো-বা চোখ-রাঙানো, দলে দলে গিয়ে বিলাসী রেস্তোরাঁয় ভিড় জমানো, সেখানে থাকতে পারাটা তাদের কাছে আনন্দের মনে হওয়া, রেস্তোরাঁ ছেড়ে আসতে তাদের অনিচ্ছা প্রকাশ, দলে দলে সিনেমাহলের সামনে গিয়ে লাইনে দাঁড়ানো, থিয়েটার এবং সংগীতের হল, এমনকি নাচের হলগুলোকে পর্যন্ত প্রতিদিন ভরিয়ে তোলা; বিরাট হৈহুল্লোড়ের সঙ্গে বিভিন্ন পার্কে

শুনতেন, আর কটার্ডেরও তারিউ-র সাহচর্য কেমন যেন ভালো লাগত। এমনকি যখন তিনি সম্পূর্ণ ক্লান্ত বোধ করতেন, কোনো-কোনো সন্ধ্যায় যেটা ঘটত, তখনও পরের দিন সকালেই আবার দেখা যেত তিনি নতুন শক্তি ফিরে পেয়েছেন।—তারিউ-র সঙ্গে কথাবার্তা বলে সত্যিই মানুষ আরাম পায়, কটার্ড একবার র‍্যাঁবোয়ারকে বলছিলেন—কারণ ওর ভেতর সত্যিকারের মনুষ্যত্ব আছে, কী বলতে চাইছি নিশ্চয় বুঝেন। মানুষের প্রতি ওর সত্যিকারের দরদবোধ আছে।

এটাও হয়তো তারই একটা কারণ যে, তারিউ তাঁর ডাইরিতে এই সময়কার যেসব ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তার বেশির ভাগই কটার্ডকে কেন্দ্র করে। একটা জিনিস অবশ্য সুস্পষ্ট যে, সেখানে তিনি কটার্ডের ব্যক্তিত্বের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। কটার্ড সম্পর্কে তাঁর নিজের প্রত্যেকটা মানসিক প্রতিক্রিয়া, তাঁর ভাবনাচিন্তা তিনি ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন, সে প্রতিক্রিয়া কটার্ডের নিজের দ্বারা সঞ্চারিত হোক আর তা তারিউ-র নিজের বিশ্লেষণের ফলই হোক। 'কটার্ড এবং প্লেগের সঙ্গে তার সম্পর্ক' এই শিরোনামের নিচে তারিউ-র ডাইরিতে দীর্ঘ কয়েক পাতা জুড়ে কটার্ড সম্পর্কে বেশকিছু মন্তব্য দেখতে পাওয়া যায়। কাহিনীকারের মতে সেগুলো এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করার মতো।

তারিউ তার ডাইরিতে কটার্ড সম্পর্কে যেসব বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন, তার প্রথমটাতে তিনি কটার্ড সম্পর্কে তাঁর তখনকার সাধারণ ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন : স্বাস্থ্য এবং লাবণ্যে ফেটে পড়ছে মনে হয় লোকটা, আচার-আচরণের ভেতর অমায়িক ভাবটা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে তার হাসিঠাট্টা। কারণ ঘটনাগুলো যখন যেদিকে মোড় নিতে শুরু করেছিল, তাতে কটার্ড আর যাই হোক বিচলিত হননি এতটুকু। তারিউ-র সঙ্গে কথাবার্তা বলার ফাঁকে ফাঁকে এই ধরনের মন্তব্যের ভেতর দিয়ে কটার্ড মাঝে মাঝে তাঁর সত্যিকারের অনুভূতিকে প্রকাশ করতেন : অবস্থা প্রতিদিনই খারাপের দিকে যাচ্ছে, তাই না? তবে কী দেখুন, আমরা সবাই এখন এক-নৌকার যাত্রী।

—সেটা তো অবশ্যই সত্যি, তারিউ ডাইরিতে নিজের মন্তব্য যোগ করেছেন—মৃত্যুর আশঙ্কাটা আর পাঁচজনের জন্যে যেমন, তার জন্যেও হয়তো ঠিক তেমনি। আর সেটাই হচ্ছে একমাত্র লক্ষ্য করবার বিষয় : আর পাঁচজনের সঙ্গে একই বিপদের মাঝে বাস করতে হচ্ছে তাঁকেও। অথচ এটাও সুনিশ্চিত যে নিজের বিপদের কথাটা তিনি মোটেই গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করেন না। স্পষ্টত এইরকম একটা ধারণা তার মাথায় ঢুকেছে যে-লোক আগে থাকতেই কোনো আশঙ্কাজনক রোগে ভুগছে বা খুব মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, অপর কোনো রোগ বা নতুন কোনো দুশ্চিন্তা সহসা আর তাকে ছোঁয় না এবং আপাতত যতটা অবাস্তব বলে মনে হয় ততটা অবাস্তব হয়তো নয় তাঁর এই ধারণা।

—আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, কোনো লোক একই সময় দুটো কঠিন রোগে ভুগছে, এমন কখনও ঘটে না। ধরুন, আপনি দুরারোগ্য ক্যান্সার বা রক্তবমন রোগে ভুগছেন, তাহলে নিশ্চিত জানবেন, প্লেগ বা টাইফয়েড আপনাকে ছোঁবে না। দৈহিক কারণেই সেটা অসম্ভব। সত্যি বলতে কী, এ-ব্যাপারে আমরা আরো খানিকটা

সামনের কথাও চিন্তা করতে পারি : কোনো ক্যান্সারের রোগী মোটর-অ্যাপে পড়ে মারা গেছে, এমন শুনেছেন কখনও? এই-যে মতবাদ, প্রকৃতপক্ষে এর মূল্য যাই হোক না কেন, এটাই কটার্ডকে প্রফুল্ল রেখেছিল। যে জিনিসটাকে কটার্ড কঠিনভাবে ঘৃণা করতেন তা হচ্ছে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে একা একা বাস করতে বাধ্য হওয়া; অবরুদ্ধ শহরে বিপুল জনসমষ্টির মধ্যে বাস করতে তিনি প্রস্তুত, কিন্তু জেলে নিঃসঙ্গ দিন কাটাতে সম্মত নন। প্লেগ যেদিন থেকে শুরু হয়েছে সেদিন থেকে তাঁর পিছনে পুলিশের অনুসন্ধান, কুকুরের দৌড়ানো, তাকে বাঁধবার জন্যে ওয়ারেন্ট নিয়ে ঘুরে বেড়ানো—এ সবই বন্ধ হয়েছে। বর্তমানে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিল এইরকম : পুলিশ বলে আমাদের ভেতর কেউ ছিল না, অতীত বা বর্তমান অপরাধ বলেও কিছু ছিল না, যেমন ছিল না কোনো অপরাধ। এখানে শুধু অভিশপ্ত একদল মানুষ করে কার খেয়ালের বশে হয়তো ত্রাণ পাবে, এইরকম একটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের আশায় বর্তমান অভিশাপ বয়ে চলেছিল আর পুলিশরাও ছিল এই দলে।

সুতরাং (অবশ্য তারিউ-র বিশ্লেষণকে যদি আমরা মেনে নিই) তার চারপাশের অন্য সবার মানসিক বিভ্রম বা দুঃখ-দুর্দশার লক্ষণকে কিছুটা সহৃদয়তার সঙ্গে দেখবার এবং প্রশ্রয় দেবার মতো মানসিক প্রশান্তি কটার্ডের ছিল এবং সেটা হয়তো কটার্ডের এই মন্তব্যের ভেতর প্রকাশ পেয়ে থাকতে পারে : এখন সবাই যত পারে বকবক করুক, কিন্তু এ রোগে প্রথমে আমাকেই ধরেছিল।

—যখন তাকে বুঝিয়ে বলতে গেলাম, তারিউ ডাইরিতে লিখেছেন—সবার সঙ্গে যদি সৌহার্দ্য বজায় রাখতে চান, ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সম্পর্ক বজায় রাখতে চান, তার নিশ্চিত উপায় হচ্ছে যতদূর সম্ভব নিজের বিবেককে পরিষ্কার রাখা। কটার্ড সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে জবাব দিলেন—তাই যদি সত্যি হত তাহলে তো প্রতিমুহূর্তেই আমাদের একের অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবার কথা। তারপর কয়েক মিনিট চুপ করে থাকার পর আবার বললেন—আপনি যা-খুশি বলতে পারেন তারিউ, কিন্তু শুধু একটা কথা আপনাকে বলে রাখতে চাই, যদি সত্যি চান মানুষ একত্রে বাস করুক, তাহলে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে যাতে তাদের ভেতর মাঝে মাঝে প্লেগের আবির্ভাব হয় তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। আপনার চারপাশে একটু চাইলে আপনি নিজেও সেটা অনুধাবন করতে পারবেন হয়তো—।

অবশ্য তিনি যা বলতে চাইছিলেন তা বুঝেছিলাম, আমাদের এখানকার এই জীবনধারা যে কতখানি তাঁর মনোমতো তা-ও অনুমান করতে পেরেছিলাম। একসঙ্গে পথচলার সময় সঙ্গীর দক্ষিণপার্শ্বে থাকবার জন্য প্রত্যেকের প্রাণান্তকর চেষ্টা, আকস্মিক পথ হারিয়ে ফেলেছে এমন কোনো লোককে সাহায্য করবার জন্যে কখনো-বা সত্যিকারের আগ্রহ দেখানো, আবার কখনো-বা চোখ-রাঙানো, দলে দলে গিয়ে বিলাসী রেস্তোরাঁয় ভিড় জমানো, সেখানে থাকতে পারাটা তাদের কাছে আনন্দের মনে হওয়া, রেস্তোরাঁ ছেড়ে আসতে তাদের অনিচ্ছা প্রকাশ, দলে দলে সিনেমাহলের সামনে গিয়ে লাইনে দাঁড়ানো, থিয়েটার এবং সংগীতের হল, এমনকি ন্যাচের হলগুলোকে পর্যন্ত প্রতিদিন ভরিয়ে তোলা; বিরাট হৈহুল্লোড়ের সঙ্গে বিভিন্ন পার্কে

এবং এক্সিবিশনে গিয়ে ভিড় জমানো, মানুষের সান্নিধ্যের উষ্ণতা লাভের যে প্রবল
এবং এটিকিনিউতে গিয়ে ভিড় জমাতো, মানুষের সান্নিধ্যের উষ্ণতা লাভের যে প্রবল
আকাঙ্ক্ষা পরস্পরের দৈহিক মিলনের বা স্ত্রী-পুরুষের যৌনমিলনের উত্তেজনা জোগায়,
তার তাড়না অনুভব করা সত্ত্বেও শহরের লোকদের পরস্পরের সঙ্গে সবরকমের
সম্পর্ক এড়িয়ে যাবার জন্যে নিয়ত চেষ্টা—প্রতি পদে তাকে এই-যে সব মানসিক
দ্বিধাদ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হত, সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য না দিয়ে তারও উপায় ছিল না।
স্পষ্টত এসবই ছিল কটার্ডের তখনকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অঙ্গ। শুধু মেয়ে-ছেলে
প্রসঙ্গটা তার অভিজ্ঞতার আওতা থেকে বাদ দেয়া যেতে পারত, তার মুখের ঐ ভাব
সত্ত্বেও। অবশ্য বেশ্যালয়ে যাবার প্রলোভন দেখালে কটার্ড নিজেকে সামলে রাখবার
চেষ্টা করবেন, কারণ তাতে বদনামের সৃষ্টি হতে পারে, ভবিষ্যতে এটা নিয়ে কেউ
তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে।
—সংক্ষেপে এই দুর্বিপাক তার ভেতর একটা গর্ববোধের জন্ম দিয়েছিল। একজন
নিঃসঙ্গ মানুষ যে নিজের নিঃসঙ্গতাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করত, সেই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছিল
কেমন অসৎ কর্মের সহযোগী। হ্যাঁ, 'অসৎ কর্মের সহযোগী' এই বিশেষণ সঙ্গতভাবেই
তার প্রতি প্রযোজ্য। আর তিনি নিজেও কি এর জন্যে গর্ববোধ করেন না? এটা মস্ত
সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, তাঁর চারপাশের সবার সঙ্গেই এখন তার ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক।
তার চারপাশের সবার সঙ্গে যাদের ভেতর ছিল কুসংস্কার, অহেতুক শঙ্কা,
স্বার্থিক উত্তেজনায় আক্রান্ত মানুষের মতো নিয়ত অনুভূতি-প্রবণতা, যারা প্লেগের
সম্পর্কে যে-কোনো কথাবার্তাকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলবে—এইরকম একটা বদ্ধ
ধারণার বশবর্তী হয়েও নিয়ত প্লেগের কথাই বলত, যারা একটুখানি মাথা ধরলে
সেগুলো অমঙ্গলের মতো ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠত, কারণ তারা এখন জানত যে এই
মাথাধরাটা প্লেগের প্রথম লক্ষণ, মেজাজ বিগড়ে থাকার দরুন, অতিরিক্ত খিটখিটে
হওয়ার দরুন কোথাও কারো ভেতর সামান্য দোষত্রুটি দেখলে যারা ক্ষেপে উঠত,
অপমান নিত এবং যাদের এমন অবস্থা যে সামান্য প্যান্টের বোতাম হারিয়ে গেলেও
চোখে পানি এসে যেত।
তারিউ সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে কটার্ডের সঙ্গে বাইরে যেতেন। সন্ধ্যার সময়
রাস্তায় রাস্তায় মানুষের যে ভিড় জমত, কীভাবে তারা দুজনে সেই ভিড়ের ভেতর
নিজেদেরকে ছেড়ে দিতেন তা তিনি তার ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বর্ণনা
করেছেন কীভাবে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেই চলমান জনসমুদ্রের ভেতর মিশে
যেতেন, রাস্তার ধারের লাইটপোস্ট থেকে মাঝে মাঝে আলো এসে পড়ত সেই
জনসমুদ্রের ওপর, সাদা আর কালোর আলপনার চিত্র ফুটে উঠত যেন। আর তারপর
সেই জনসমুদ্র তাদের ঠেলে নিয়ে যেত বিভিন্ন আনন্দস্ফূর্তির কেন্দ্রের দিকে যেখানে
মানুষের উষ্ণ সান্নিধ্য মনে হত তাদেরকে প্লেগের শীতল নিশ্বাস থেকে দূরে আড়াল
করে রাখছে। এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও কটার্ড একটি বিশিষ্ট হোটেল এবং
রেস্তোরাঁয় যা খুঁজে ফিরতেন সেই বিলাসিতা এবং প্রাচুর্যময় জীবন, সেই পানোন্মত্ত
এবং বল্গাহীন লাম্পট্য যা ছিল তার কাছে তখন স্বপ্নের বস্তু, এখন সারা শহরের
লোককে যেন সেই একই জিনিসের পেছনে ছুটতে দেখা যেত। জিনিসপত্রের দাম

বেড়ে চলেছিল ঠিকই, তবুও এর আগে আর কোনোদিন মানুষকে এমন অর্থের
অপব্যয় করতে দেখা যায়নি। যদিও অনেক সময় প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব দেখা
যেত, কিন্তু তুচ্ছ অপ্রয়োজনীয় জিনিসের পেছনে মানুষ অঢেল অর্থ ব্যয় করত। অবসর
মুহূর্তের, যদিও সেই আলস্যের কারণ ছিল এমন উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব, যেসব
আমোদপ্রমোদ সেগুলো এখন যেন শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।
কখনো কখনো হয়তোবা কয়েক মুহূর্তের জন্যে তারিউ এবং কটার্ড প্রেমাতুর
কোনো স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গ নেবার চেষ্টা করতেন। আগের দিনে এদের সাধারণত দেখা
যেত নিজেদের হৃদয়াবেগ গোপন রাখার চেষ্টা করতে। কিন্তু যখন তারা গা-ঘেঁষাঘেঁষি
করে রাস্তার সেই বিরাট জনসমুদ্রের ভেতর দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে চলতেন, যখন
কোনো প্রেমিক-প্রেমিকার ভেতর যেমন একটা গভীর আত্মনিমগ্ন ভাব দেখা যায়,
তাদেরও দেখা যেত যেন ঠিক তেমনি মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থা, আশেপাশের কোনোকিছুর
প্রতিই যেন ভ্রুক্ষেপ নেই। কটার্ড লোলুপদৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে থাকতেন আর
থেকে-থেকে চিৎকার করে উঠতেন—এমনই তো চাই। চালিয়ে যাও। এমনকি তার
গলার স্বর পর্যন্ত পাল্টে গেছে, অনেক ভারী হয়েছে।
তারিউ কটার্ড সম্পর্কে তার ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেন : চারদিকে জনসমুদ্রের
মাঝে এই-যে উৎসাহ-উদ্দীপনা, কাফের টেবিলে টেবিলে বখশিশের ছড়াছড়ি আর
চোখের ওপর স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাসা গড়ে-ওঠার এই-যে মনোমতো পরিবেশ, এর
ভেতর কটার্ড যেন রীতিমতো কাঁপতে শুরু করেছে।
যাহোক, কটার্ডের মনোভাবের মধ্যে তারিউ কোনোরকম ঈর্ষাপরায়ণতার চিহ্ন
দেখতে পেতেন না।—আর আমাকেও একদিন এই যন্ত্রণার মধ্যে কাটাতে হয়েছে,
এই মন্তব্যের ভেতর বিজয়ের গর্বের চেয়ে দয়া এবং সহৃদয়তার ভাবই ছিল অধিক
স্পষ্ট।—আমার ধারণা, তারিউ কটার্ডের সম্পর্কে লিখেছেন।
এতগুলো লোক যে শহরের চার দেয়ালের মাঝে সামান্য একচিলতে আকাশের
নিচে, এই আবদ্ধ জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের প্রতি কটার্ডের অনুরাগ ক্রমেই
বাড়ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কটার্ড সুযোগ পেলেই সবাইকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করতেন
যে বর্তমান অবস্থা প্রকৃতপক্ষে ততখানি আতঙ্কিত হবার মতো কিছু নয়। আপনি তো
দেখেছেন, কটার্ড একদিন আমাকে বলেছিলেন, এখনও তারা কীভাবে নিজেদের
ভেতর বলাবলি করে, প্লেগের উপশম হলে অমুক অমুক জিনিসটা করবে।
নীরবে কিছুদিন সহ্য করে যাবে তা নয়, তবে মরে যাচ্ছে যেন। আর তা ছাড়া এই
অবস্থায় নিজেদের সুযোগসুবিধাগুলোও যেন ওরা বোঝে না, এমনি একটা ভাব সবার
মধ্যে।—এই আমার ব্যাপারটাই ধরুন না, আমি কি কখনও বলতে পারি যে পুলিশ
আমাকে আটক করার পর এটা-ওটা করব? কোনো মানুষকে পুলিশ যখন ধরে নিয়ে
যায় সেটা হচ্ছে তার মামলার শুরু, শেষ নয়। প্লেগের বেলায়... আপনি নিশ্চয়
অনুমান করতে পেরেছেন আমি কী ভাবছি? ওদের এত যে বিরক্তি তার একমাত্র কারণ
হচ্ছে ওরা কখনও সহজ হতে পারে না। আমি জানি আমি কী বলতে চাই।
—হ্যাঁ, কটার্ড কী বলতে চান সে-ব্যাপারে তিনি সত্যিই সচেতন, তারিউ কটার্ডের

বক্তব্যের ওপর মন্তব্য করেছেন—শহরের অধিবাসীদের এখানকার জীবনের যেসব অস্বাভাবিকতা তার সম্পর্কে কটার্ডের একধরনের অন্তর্দৃষ্টি জন্মেছে। পরস্পরের সাহচর্য, সান্নিধ্য লাভের জন্যে প্রত্যেকের অন্তরে সহজাত আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের দরুন কেউই সেই আকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয় দিতে চায় না। দূরে দূরে রাখে নিজেদেরকে। কারণ এটা তো আর কারো অজানা ছিল না যে এখন নিজের প্রতিবেশীর ওপরও বিশ্বাস রাখা সম্ভব ছিল না। তুমি হয়তো জানতেও পারবে না কখন তার দেহের রোগ তোমার দেহে সংক্রামিত হয়ে যাবে। তোমার একমুহূর্তের অসাবধানতার ফাঁকেই হয়তো রোগের বীজাণু তোমার দেহে সংক্রামিত হবে। কটার্ড যিনি প্রত্যেক লোককে, এমনকি যাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বোধ ছিল, তাদেরও সম্ভাব্য গুপ্তচর হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত, তার পক্ষে প্লেগের সম্পর্কে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করাটা অত্যন্ত সহজ। যে-সময় তার আক্রমণের কথা কেউ চিন্তাই করতে পারে না, এমন কোনো মুহূর্তেই প্লেগ হয়তো নিঃসাড়ে তার তুষার-শীতল হাতখানা কারো কাঁধের ওপর রাখবে অথবা যে-মুহূর্তে কেউ তখনও যে সুস্থ এবং সবল থাকতে পেরেছে বলে মনে-মনে নিজেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে, সেই মুহূর্তেই হয়তো প্লেগের বীজাণু তার শরীরে প্রবেশ করতে থাকবে—এইরকম অনিশ্চিত আশঙ্কার প্রতিনিয়ত শিকার যারা, তাদের প্রতি সহানুভূতি বোধ করাটা সত্যিই সহজ।

এই সন্ত্রাসের রাজত্বে যতটা সম্ভব কটার্ড নিজে বেশ স্বস্তিতে আছেন। আগে তার এইধরনের কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে বলেই যে এই অনিশ্চিত আশঙ্কার দরুন শহরের অধিবাসীদের তখন প্রতিমুহূর্তে যে মানসিক অশান্তি ভোগ করতে হত কটার্ড তার পুরোপুরি শরিক হতে পারতেন, সে-ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এইরকম দাঁড়াতে পারে : আমরা যারা তখনও পর্যন্ত নিজেদেরকে প্লেগের সেই লোলুপ থাবা থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলাম, তাদের সবার মতো কটার্ড নিজেও উপলব্ধি করেন যে, যে-কোনো মুহূর্তে প্লেগ আমাদের এই স্বাধীনতা এবং জীবন ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু নিয়ত শঙ্কার মধ্যে বাস করার অবস্থাটা যে কী তা তিনি আগেই জেনেছেন, যিনি মনে করেন অন্য সবাই সেটা জানুক এবং সেটাই স্বাভাবিক। অথবা ব্যাপারটাকে এইভাবেও প্রকাশ করা যায় : এই অনিশ্চিত আশঙ্কার বোঝাটা যখন তাকে সম্পূর্ণ একাই বহন করতে হত তখন সেটা তার কাছে যেরকম মনে হত তার তুলনায় বর্তমান অবস্থায় বোঝাটা অনেকখানি সহনীয় বলে মনে হয়। এ-ব্যাপারে কটার্ডের উপলব্ধি হয়তো সঠিক নয় এবং এই কারণেই অন্যদের তুলনায় কটার্ডকে বোঝা অনেকখানি শক্ত। সেই কারণেই হয়তো তাকে বোঝবার চেষ্টা করার ভেতর গুরুত্ব আছে!

শুধু কটার্ড একা নন, প্লেগ-উপদ্রুত শহরের অন্য অধিবাসীরাও যে কী এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থার মধ্যে এসে পৌঁছেছিল, তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এক গল্প দিয়ে তারিউ তার মন্তব্য শেষ করেছেন। এই গল্পের ভেতর, শহরের সেই সময়কার যে বিশেষ অসুস্থ পরিবেশ তা যতদূর সম্ভব সঠিকভাবে ফুটে উঠেছে। কাজেই কাহিনীকারের দৃষ্টিতে তার এতখানি গুরুত্ব।

কটার্ড এবং তারিউ দুজনে একদিন শহরের মিউনিসিপ্যাল থিয়েটার এবং অপেরা-হাউসে যান। সেখানে তখন গ্লাকের 'অরফিয়স' দেখানো হচ্ছিল। কটার্ডই তারিউকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। একটা ভ্রাম্যমাণ অপেরা দল শহরে অল্প কিছুদিন এই নাটকটা দেখাবার জন্যে বসন্তের গোড়ার দিকে ওরাও এসেছিল। তারপর হঠাৎ শহরে প্লেগ দেখা দেয়াতে তারা এখানে আটকা পড়ে যায়, ফলে কিছুটা অসুবিধার মধ্যেও পড়তে হয় তাদের। সেই অবস্থায় এই দল অপেরা-হাউসের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয় যে পুনরায় নির্দেশ না-পাওয়া অবধি প্রতি সপ্তাহে একটা করে শো তারা দেখাবে। এভাবে গত কয়েক মাস ধরে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় আমাদের শহরের সেই থিয়েটারহল অরফিয়সের হৃদয়-আকুতির সুরেলা মূর্ছনায় এবং ইউরিডাইসের ব্যর্থ অনুনয়-বিনয়ে ভরে উঠত। সে যাই হোক, অপেরাদল শহরের বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রতি শুক্রবারেই থিয়েটারহল দর্শকে ভরে উঠত। হলে উপরের সবচেয়ে মূল্যবান আসনে বসেছিলেন তারিউ এবং কটার্ড। তাদের নিচের স্টলগুলোয় যাঁরা বসেছিলেন, তাদের বেশির ভাগই ছিলেন ওরাও শহরের উঁচুসমাজের বাছাবাছা লোক। তারিউ এবং কটার্ডের দৃষ্টি ছিল এঁদের দিকে। নিজের নিজের আসনের দিকে এগিয়ে যাবার সময় ভদ্রতা বজায় রাখবার জন্যে তাঁরা যে সচেতনতা দেখাচ্ছিলেন সেটাই ছিল সবচেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয়। একদিকে অর্কেস্ট্রা তাদের বাজনার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা নিয়ে ব্যস্ত, আর তারই মাঝে সান্ধ্য-পোশাকে সজ্জিত দর্শকদের দল এক সারি থেকে অন্য সারির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পরিচিত জন বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে অত্যন্ত শোভনভাবে অভিবাদন বিনিময় করেছিলেন, চারপাশ থেকে অজস্র ধারায় আলো এসে পড়ছিল তাঁদের ওপর। শৌখিন সমাজের আদব-কায়দায় অভ্যস্ত লোকদের নিচুকণ্ঠের আলাপের গুনগুনানিতে আবার যেন সবার মনে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছিল, অথচ কিছুক্ষণ আগেও শহরের অন্ধকার রাস্তায় চলবার সময় তারা কীরকম হতাশাই না বোধ করছিলেন! সান্ধ্য-পোশাকের সত্যিই এমন মন্ত্রশক্তি আছে যা প্লেগকেও পরাভূত করতে পারে!

সারাটা প্রথম অঙ্ক জুড়ে দেখা গেল, অরফিয়স হৃত ইউরিডাইসের জন্য কোমলস্বরে শোক প্রকাশ করতে লাগলেন। গ্রিকদেশীয় পোশাকে সজ্জিত মেয়ের দল সুললিত কণ্ঠে তার গভীর হৃদয়বেদনা সম্পর্কে সংগীতের সুরে মন্তব্য করে যেতে থাকল। পরিমিত হাততালি দিয়ে দর্শকরা তাদের তারিফ করলেন। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয়ের সময় অল্প দু-একজন লক্ষ্য করলেন, অরফিয়সের জন্যে নির্দিষ্ট যে সংগীত, তার ভেতর তিনি কিছু কিছু বাইরের জিনিস ঢুকিয়েছেন এবং পাতালের রাজা হেড্‌সকে তার প্রতি সদয় হবার জন্যে অশ্রুজড়িত কণ্ঠে অনুনয় জানাবার সময় তিনি যেন মাত্রাতিরিক্ত ভাবাবেগের পরিচয় দিলেন। স্টেজের উপরে চলাফেরার সময় তিনি যে মাঝে মাঝে ঝাঁকি দিয়ে উঠেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল তার সংগীতের অন্তর্নিহিত বেদনা-অনুভূতিকে দৈহিকভাবে ফুটিয়ে তোলা, সেক্ষেত্রেও দর্শকদের ভেতর যারা সত্যিকারের অভিনয়-সমজদার ব্যক্তি ছিলেন তাদের অনেকের অভিমত হল, কিছুটা বাড়াবাড়ির ভাব থাকলেও, অভিনেতা বাহবা

পাবার মতো কলাচাতুর্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন।

তৃতীয় অঙ্কে যেখানে অরফিয়াস এবং ইউরিডাইস দুজনে আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় সংগীতের মাধ্যমে পরস্পরকে নিজেদের হৃদয়বেদনা জানাচ্ছিলেন অর্থাৎ ঠিক সেই মুহূর্তে যখন ইউরিডাইসকে তার প্রিয়তমের কাছ থেকে নিষ্ঠুরভাবে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছিল, তখন আবার আর-এক দফা দর্শকদের বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখা গেল। এবং তারপর যেন সেইরকম একটা কিছু ইঙ্গিতের অপেক্ষা করছিলেন তিনি অথবা সম্ভবত সামনের ঝিল এবং অর্কেস্ট্রা দলের মাঝ থেকে যে একটা ক্ষীণ শব্দ তার কানে এল তার থেকেই তিনি ভেবে নিলেন যে সবাই তার তখনকার অনভূতি অনুমান করতে পেরেছে। অরফিয়স হাস্যকর একটা ভঙ্গি করে টলতে টলতে মঞ্চের পাদপ্রদীপের দিকে এগিয়ে গেলেন। ব্যাপারটা কোনো সময়েই খুব একটা সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হত না, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় দর্শকদের চোখে তার অসঙ্গতি যেন আরো জঘন্য অর্থপূর্ণভাবে ফুটে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অর্কেস্ট্রা হঠাৎ থেমে গেল, দর্শকরাও উঠে দাঁড়াল, হল ছেড়ে বাইরে যাবার জন্য অগ্রসর হল সবাই। প্রথমে ধীরে ধীরে নীরবে এগুতে থাকল সবাই যেন প্রার্থনার শেষে গির্জা ছেড়ে বাইরে যাচ্ছে, অথবা কোনো মৃতের কক্ষে মৃতব্যক্তিকে শেষ বিদায় জানিয়ে বার হয়ে যাচ্ছে। মেয়েরা স্কার্ট তুলে ধরেছে, মাথা হেঁট করে এগিয়ে যাচ্ছে, সারির শেষে গিয়ে যাতে চেয়ারে ধাক্কা না খায় তার জন্য পুরুষের দল হাত বাড়িয়ে কনুই চেপে ধরে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর চলাচল ক্রমেই দ্রুত হল, ফিসফিসানি হৈচৈ-এ রূপান্তরিত হল, এবং শেষ অবধি হুড়োহুড়ি করে সবাই বাইরের দরজার দিকে অগ্রসর হতে থাকল। মাঝপথে বাধা পেতে পেতে যখন তারা বাইরে রাস্তায় এসে নামল তখন সবার দিশেহারা অবস্থা, আশঙ্কায় উত্তেজনায় তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে থাকল সবাই।

কটার্ড এবং তারিডি সরে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময়কার তাদের জীবনের সবচেয়ে নাটকীয় দৃশ্য চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন তাঁরা : মূক অভিনেতার ছদ্মবেশে প্লেগ এসে দাঁড়িয়েছে স্টেজের ওপর; আর দর্শকদের আসনে এখানে-ওখানে ছড়ানো শৌখিন খেলনা, সেগুলোকে মনে হচ্ছিল ব্যর্থতার প্রতীক, বিস্মৃত হাতপাখা আর ছিল লাল-আবরণে ঢাকা চেয়ারের ওপর পরিত্যক্ত লেসের কাজ-করা মূল্যবান শাল।

২

সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগটা র‍্যাঁবেয়ার নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ডাক্তার রিও-র পাশে থেকে কাজ করে গেলেন। শুধু একটা দিন যেদিন গনজালেস এবং সেই ছোকরা দুজনের সঙ্গে ছেলেদের স্কুলের ধারে তার সাক্ষাতের কথা ছিল, সেদিন মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে তিনি ছুটি নিলেন।

গনজালেস দুপুরের দিকে নির্দিষ্ট সময়েই তাদের সাক্ষাতের স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দুজনে সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন, এমন সময় কিছুদূরে দেখলেন ছোকরা দুজনও হাসতে হাসতে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ছোকরা দুজন জানাল গত সপ্তাহে তারা তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেনি, তবে সেটা কিছুটা মেনে নিতেই হবে। যাই হোক, এ সপ্তাহে তাদের ছিটকিনি দেবার পালা আসবে না। কাজে কাজেই র‍্যাঁবেয়ারকে একটু ধৈর্য ধরে আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়টায়ই তারা আর-একবার চেষ্টা করে দেখবে।

র‍্যাঁবেয়ার নিজে মন্তব্য করলেন : এসব কাজে অবশ্যই ধৈর্যের প্রয়োজন। গনজালেস এবার প্রস্তাব দিলেন সামনের সোমবারে তাদের সবার আর একবার সাক্ষাৎ হওয়া উচিত। এবং এও বললেন—এখন বরং র‍্যাঁবেয়ারের লুই মার্সেলের বাসায় গিয়েই অপেক্ষা করে থাকা কর্তব্য।

—ঠিক আছে, আমরা দুজনে একটা দিন স্থির করে নেব। কোনো কারণে আমি যদি নির্দিষ্ট দিনে আসতে নাও পারি, আপনি সোজা ওদের বাসায় চলে যাবেন। ওদের বাসার ঠিকানাটা আপনাকে দিয়ে দেব।

মার্সেল বা লুইয়ের একজন জবাবে বলল, বরং গনজালেস যদি এক্ষুনি তার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তাদের বাসায় যান, সবার জন্যে সেটাই হবে সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা। কারণ তাহলে সহজেই তারা বাসাটা খুঁজে বার করতে পারবেন। গনজালেসের যদি তেমন কোনো আপত্তি না থাকে, তাহলে তাদের চারজনের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থাও আজ তাদের ওখানেই হবে। কাজটা তিনি যেভাবে চাইছেন সেরকম সহজভাবে করতে গেলে এটাই তার উপায়। গনজালেস স্বীকার করলেন, তারা যে-কথাটা বলছে সেটা অনেকখানি সত্যি বটে। তারপর তারা চারজনে একত্রে বন্দরের দিকে রওনা হলেন।

মার্সেল এবং লুইদের বাসাটা ছিল ডকইয়ার্ডের একেবারে শেষপ্রান্তে, পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমে এসেছিল যে-রাস্তাটা, তারই সামনের গেটের কাছাকাছি ছিল তাদের বাসা। স্পেনদেশের অনুকরণে তৈরি ছোট্ট একটা বাড়ি, জানালার শার্সিগুলোয় উজ্জ্বল রঙের পালিশ লাগানো, কিন্তু ঘরের ভেতরটা সম্পূর্ণ আসবাবশূন্য, অন্ধকার। হাসিখুশি চেহারার এক বৃদ্ধা স্প্যানিশ মহিলা, ছোকরা দুজনের মা, তার মুখের চারপাশে পুরু পুরু বলিরেখা, খাবারের পাত্র এনে রাখলেন তাদের সামনে। খাবারের মধ্যে বেশির ভাগ অংশ দেখা গেল ভাত। সামনে ভাত দেখে গনজালেস বিস্ময় প্রকাশ করে উঠলেন, কারণ বেশ কিছুদিন থেকে শহরে চাল সংগ্রহ করাটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

—গেটেই ব্যবস্থা করি আমরা, মার্সেল বুঝিয়ে বলল। র‍্যাঁবেয়ার খাওয়া শেষ করলেন, তারপর প্রাণভরে খেলেন মদ।

গনজালেস মন্তব্য করলেন : মানুষ আপনি ভালোই দেখছি।

প্রকৃতপক্ষে, র‍্যাঁবেয়ার তখন শুধু সামনের সপ্তাহের কথা চিন্তা করছিলেন। পরে দেখা গেল র‍্যাঁবেয়ারকে পুরো দুসপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। পাহারাদারদের পর্যায়ক্রমিক পাহারার সংখ্যা কমিয়ে ফেলার জন্যে এক এক দলের জন্যে একটানা দুসপ্তাহ করে ডিউটির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সে দুসপ্তাহ র‍্যাঁবেয়ার যেন চোখকান বুজে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে গেলেন, তার দেহের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দিতে লাগলেন। বিছানায় যেতেন অনেক রাতে, অসাড় হয়ে পড়ে পড়ে ঘুমাতেন। একেবারে নিষ্কর্মা দীর্ঘদিন বসে থাকার পর হঠাৎ এই-যে অবিরাম

পরিশ্রম তার ফলে তার দেহে তখন যেন আর একটুও শক্তি ছিল না, চিন্তাও করতে পারতেন না যেন তিনি। দুসপ্তাহ পরেই যে তিনি এই শহর ছেড়ে পালিয়ে যাবেন, সে-ব্যাপারেও তাকে কোনোরকম উচ্চবাচ্য করতে দেখা যেত না। এই সময়কার তাঁর জীবনের শুধুমাত্র একটা ঘটনা কিছুটা উল্লেখ করবার মতো :

সপ্তাহখানিক পরে একদিন র‍্যাঁবেয়ার ডাক্তারের কাছে স্বীকার করলেন যে, সত্যিই তিনি মদ খেয়ে সম্পূর্ণ মাতাল হয়েছিলেন। সেটা ছিল তার আগের দিনের সন্ধ্যার ঘটনা। 'বার' থেকে বেরিয়ে এসেই তার মনে হল যৌনঅঙ্গটা যেন কেমন ফোলা ফোলা ঠেকছে এবং হাত নাড়বার সময় বগলেও যেন কেমন একটু ব্যথা অনুভব করছেন। এবার তাহলে আমার পালা—তিনি ভাবলেন। তক্ষুনি তার মনের ভেতর যে প্রতিক্রিয়া জাগে—সেটা যে আসলে খুবই হাস্যকর তাও পরে তিনি ডাক্তার রিও-র কাছে স্বীকার করেছিলেন—তা হচ্ছে এই যে, সেই মুহূর্তে ছুটে তিনি শহরের বাইরে যাবেন এবং সেখানে ছোট একটা পার্কে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে সমুদ্র চোখে না পড়ুক আকাশটাকে তো অন্তত বড় করে দেখা যাবে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে তাঁর স্ত্রীকে ডাকবেন যাতে তার গলার স্বর শহরের দেয়াল পেরিয়ে বাইরে গিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু বাসায় ফিরে যখন আবার দেখলেন দেহের কোথাও প্লেগের কোনোরকম লক্ষণ নেই তখন আগে হঠাৎ অমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন বলে তাঁর মনের ভেতর যে-অনুভূতিটা তা নিশ্চয় গর্বের নয়, ভাবলেন।

ডাক্তার রিও অবশ্য জবাবে বললেন, অমন অবস্থায় মানুষ সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে গিয়ে যে এইরকম কিছু-একটা আচরণ করতে চাইবে, সেটুকু তিনি অনুধাবন করতে পারেন। অথবা যেভাবেই হোক এরকম একটা প্রবণতা তাঁর মনের ভেতর জাগতে পারে।

রাতের বেলায় র‍্যাঁবেয়ার যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে আসলেন, ডাক্তার রিও হঠাৎ মন্তব্য করলেন : মঁসিয়ে অথন আজ সকালে অপনার কথা বলছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, আপনাকে চিনি কিনা। আমি বললাম, চিনি। তারপর তিনি বললেন, তিনি যদি সত্যি আপনার বন্ধু হন তাহলে তাকে সাবধান করে দেবেন, যেন চোরাচালানকারীদের সঙ্গে অত মেলামেশা না করেন। কারণ তা কর্তৃপক্ষের চোখে পড়বেই।

—আসলে কী বলতে চান উনি?

—আমার মনে হয় কাজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করুন।

—অশেষ ধন্যবাদ! র‍্যাঁবেয়ার ডাক্তারের হাত ধরে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিলেন। দরজা পর্যন্ত পৌঁছে আবার তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। ডাক্তার লক্ষ্য করলেন প্লেগ শুরু হবার পর থেকে এই দীর্ঘ সময়ের ভেতর আজ প্রথম র‍্যাঁবেয়ার প্রাণ খুলে হাসছিলেন।

—কিন্তু আপনি আমার যাওয়াটা বন্ধ করতে চান না কেন, বলুন তো? সেটা তো সহজেই করতে পারেন।

ডাক্তার তার বরাবরের অভ্যাসমতো চিন্তান্বিতভাবে মাথাটা নাড়তে থাকলেন। এর ভেতর মাথা গলাতে যাওয়া তার উচিত হবে না, তিনি বললেন। র‍্যাঁবেয়ার ব্যক্তিগত সুখকেই যখন জীবনের চরম কামনার বস্তু বলে বেছে নিয়েছেন, সেক্ষেত্রে তাঁর,

ডাক্তার রিও-র বলার কিছুই নেই। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁর অভিমত হচ্ছে, র‍্যাঁবেয়ারের মতো অবস্থায় পড়লে কোনটা যে সঠিক পথ আর কোনটা নয় তা তিনি স্থির করে উঠতে পারতেন না।

—তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে আমাকে তাড়াতাড়ি করবার জন্যে উপদেশ দিচ্ছেন কেন?

ডাক্তার রিও নিজেই এবার হেসে ফেললেন।

—কারণ হয়তো এই যে, আমি নিজেও এখন সুখের কথাটা কিছুটা চিন্তা করতে শুরু করেছি।

পরের দিন যদিও বেশির ভাগ সময় তারা দুজনে একসঙ্গে কাজ করলেন, এ বিষয়টা নিয়ে দুজনের কেউই কিন্তু আর কোনোরকম উচ্চবাচ্য করলেন না। পরের রবিবারে র‍্যাঁবেয়ার মার্সেল এবং লুইদের ছোট্ট বাসাটাতে গিয়ে উঠলেন। বাইরের বসবার ঘরে তাঁর জন্যে বিছানা করে দেয়া হল। র‍্যাঁবেয়ারকে আগে থাকতেই সাবধান করে দেয়া হয়েছিল—তিনি যেন বেশি বাইরে যাতায়াত না করেন। তার ওপর দুভাইয়ের কেউই বাসায় খেতে আসল না। কাজেই বেশির ভাগ সময় র‍্যাঁবেয়ারকে নিঃসঙ্গ কাটাতে হল। শুধু মার্সেল এবং লুইয়ের মা সেই বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে তাঁর মাঝে-মিশেলে সাক্ষাৎ হল। বৃদ্ধা মহিলার শুকনো ছোট্টখাট্ট চেহারা, পরনে সবসময় কালো পোশাক, ঘর-সংসারের কাজ নিয়ে তিনি নিয়ত ছুটোছুটি করছিলেন। তার মুখের চেহারাটা বিবর্ণ হলুদ, সারামুখে পুরু পুরু বলিরেখা আর মাথাভর্তি ধবধবে সাদা চুল। কথাবার্তা স্বভাবতই তিনি একটু কম বলেন। র‍্যাঁবেয়ারের সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হয়ে গেলে, শুধু সহানুভূতিসূচকভাবে মৃদু মৃদু হাসলেন তিনি। সামান্য যে দু-একবার র‍্যাঁবেয়ারের সঙ্গে তার কথাবার্তা হল তার ভেতর একবার তিনি র‍্যাঁবেয়ারকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি ফিরে যাবার পর তার স্ত্রীর দেহে প্লেগের বীজাণু সংক্রমিত হতে পারে সে-কথা ভেবে র‍্যাঁবেয়ার ভয় পাচ্ছেন কি না? র‍্যাঁবেয়ার উত্তরে বললেন, সেরকম বিপদের সম্ভাবনা হয়তো থাকতে পারে, তবে কী, সেটা খুবই কম। অন্যদিকে তিনি যদি বরাবর এখানেই থেকে যান তাহলে ভবিষ্যতে আর যে কোনোদিন তাদের দুজনের দেখা হবে সে-আশা মুছে যাবে।

বৃদ্ধা একটু হাসলেন, বললেন—আপনার স্ত্রী সত্যিই আপনার প্রতি ভালো ব্যবহার করেন?

—হ্যাঁ, সত্যিই তার ব্যবহার অত্যন্ত ভালো।

—দেখতে খুব সুন্দরী?

—আমার চোখে তো নিশ্চয়!

—বুঝলাম, এতক্ষণে বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন—সেইজন্যে আপনার ফিরে যেতে এত আগ্রহ।

র‍্যাঁবেয়ার কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তার স্ত্রী যে অত্যন্ত সুন্দরী এবং ভালো, সেটা অবশ্যই তার দেশে ফিরে যাবার জন্যে ব্যগ্রতা দেখানোর কারণ হতে পারে, কিন্তু সেটাই যে একমাত্র কারণ তা কীভাবে সম্ভব।

প্রতিদিন সকালে সমবেত প্রার্থনার সময় ভদ্রমহিলা গির্জায় যেতেন। একদিন সকালে গির্জা থেকে ফিরে তিনি র‍্যাঁবেয়ারকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? র‍্যাঁবেয়ার যখন উত্তরে জানালেন যে ঈশ্বরে তার বিশ্বাস নেই, ভদ্রমহিলা আবার মন্তব্য করলেন—বুঝলাম, সেইজন্যে। আর সত্যিই তো, ভদ্রমহিলা আবার যোগ করলেন—আপনি ঠিকই বলছেন, আপনার স্ত্রীর কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। কারণ আপনার জীবনে পাবার মতো আর কিছুই তো নেই।

র‍্যাঁবেয়ার দিনের বেশির ভাগ সময়টা কাটালেন ঘরময় পায়চারি করে। কিছুক্ষণ অর্ধশূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ঘরের রঙচঙ-করা দেয়ালগুলোর দিকে। কিছুক্ষণ দেয়ালের সঙ্গে লাগানো পাখাগুলোর ওপর অলসভাবে আঙুল বুলালেন। দেয়ালের গায়ে সাজসজ্জা বলতে ছিল ঐ পাখা দুখানাই। আবার কিছুক্ষণ ধরে টেবিলক্লথের ধারে যে উলের বলগুলো ছিল সেগুলো গুনলেন।

সন্ধ্যার সময় মার্সেল এবং লুই বাসায় ফিরল। তাদের বলার মতো তেমন কিছু ছিল না। পালাবার মতো উপযুক্ত সময় তখনও আসেনি। রাতের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে মার্সেল কিছুক্ষণ ধরে গিটার বাজাল। তারপর বসে বসে মদ খেল তারা তিনজনে। র‍্যাঁবেয়ারকে মনে হল তিনি যেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেছেন।

বুধবারের দিন মার্সেল হঠাৎ ঘোষণা করল : আগামী রাতের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। মাঝরাতে বেরুতে হবে। যেন সময়ের এদিক-ওদিক না হয়। মার্সেল বলল,তাদের সঙ্গে অপর যে দুজন লোক সেই একই পোস্টে পাহারা দিত তাদের একজনকে প্লেগে ধরেছে, আর অন্য যেজন, সেও তার সাথে একই ঘরে থাকত বলে তাকেও এখন পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। সুতরাং সামনে দুতিন দিনের জন্যে গেটে পাহারার সম্পূর্ণ ভার পড়েছে মার্সেল এবং লুইয়ের ওপর। খুঁটিনাটি কোথায় কী করতে হবে সেগুলো সেই রাতেই তারা ঠিক করে ফেলবে। এ-ব্যাপারে র‍্যাঁবেয়ার পুরোপুরি তাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন। র‍্যাঁবেয়ার তাদের ধন্যবাদ জানালেন।

—নিশ্চয় এবার খুশি হয়েছেন? বৃদ্ধা মহিলা বললেন। র‍্যাঁবেয়ার মুখে বললেন বটে যে—হ্যাঁ, সত্যিই তিনি খুশি হয়েছেন কিন্তু তার চিন্তা ছিল তখন অন্যত্র।

পরের দিন অসহ্য গরম পড়তে শুরু করল। আবহাওয়া বেশি আর্দ্র মনে হল। উত্তাপের দরুন কেমন একটা পাতলা আবরণ যেন সারাটা দিন সূর্যটাকে ঢেকে রাখল। মৃত্যুর সংখ্যাও আকস্মিক অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্পেনদেশীয় এই বৃদ্ধা মহিলার মানসিক প্রশান্তি তাতে একটুও চিড় খেতে দেখা গেল না।

—পৃথিবীতে এত পাপ জমেছে, তিনি শুধু একবার মন্তব্য করলেন—এই অবস্থায় আর কী আশা করতে পারেন?

মার্সেল এবং লুইয়ের মতো র‍্যাঁবেয়ারও জামাকাপড় খুলে কোমর পর্যন্ত আলগা করে বসেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বুক আর কাঁধের দুপাশ বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল। দরজা-জানালায় পর্দা টাঙানো ঘরের অল্প আলোয় তাদের সবার দেহ পলিশ-করা মেহগিনি কাঠের মতো চকচক করছিল। র‍্যাঁবেয়ার খাঁচার আবদ্ধ প্রাণীর মতো নীরবে সবসময় ঘরময় পায়চারি করছিলেন। বিকেল চারটার দিকে তিনি হঠাৎ

ঘোষণা করলেন, একবার বাইরে যাবেন।

—মনে রাখবেন, মার্সেল বলে—ঠিক রাত বারোটার সময় আপনাকে হাজির থাকতে হবে। সবকিছুর আয়োজন কিন্তু সারা।

র‍্যাঁবেয়ার সোজা ডাক্তারের ফ্লাটে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ডাক্তার রিও-র মা জানালেন, ডাক্তার বেরিয়ে গেছেন, শহরের বাইরের হাসপাতালে পাওয়া যাবে তাঁকে। সবসময় যেমন দেখা যায়, বেশকিছু সংখ্যক লোক হাসপাতালের গেটের সামনে ঘোরাফিরা করছিল।

—এখানে ভিড় করছ কেন? একজন পুলিশ সার্জেন্ট চোখ বড় বড় করে কয়েক মিনিট পর পর চিৎকার করছিল তাদের দিকে লক্ষ্য করে। তাড়া খেয়ে উপস্থিত জনতা এদিক-ওদিক নড়াচড়া করছিল বটে, কিন্তু আসলে তারা সেখানেই চক্রাকারে ঘুরছিল।

এখানে ভিড় জমিয়ে লাভটা কী? নিজের নিজর বাসায় যান না? পুলিশ সার্জেন্ট আবার হাঁকল, তার গায়ের কোট ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছিল।

ভিড়ের সবাই জানত সেখানে অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে রইল সবাই, সেই রোদ এবং গরমের মধ্যেও। র‍্যাঁবেয়ার পুলিশ সার্জেন্টকে তার প্রবেশপত্র দেখালেন। সে তাকে তারিউ-র অফিসে যেতে বলল। হাসপাতালের সদর আঙিনার ঠিক উপরেই ছিল তারিউ-র অফিসঘরের দরজা। ঢোকার পথে ফাদার প্যানালুর সঙ্গে র‍্যাঁবেয়ারের আকস্মিক সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি তারিউ-র অফিস থেকেই বার হয়ে আসছিলেন।

তারিউ একটা কালো কাঠের টেবিলের সামনে বসেছিলেন। তার জামার হাতা কনুই পর্যন্ত গুটানো। রুমাল দিয়ে কনুইয়ের ফাঁক থেকে একফোঁটা ঘাম মুছে ফেললেন তারিউ। অফিসঘরটা আকারে খুব ছোট, দেয়ালগুলো সাদা গোলা ফেরানো, চারপাশ থেকে ওষুধ আর ভেজা-কাপড়ের গন্ধ বেরুচ্ছিল।

—এখনও যাননি? তারিউ বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন।

—কই আর গেলাম। ডাক্তার রিও-র সাথে দু-একটা কথা বলব ভাবছি।

—ডাক্তার এখন ওয়ার্ডে। আচ্ছা দেখুন, ডাক্তারের সঙ্গে দেখা না-করলেই কি নয়, যে প্রয়োজনে এসেছেন তাকে ছাড়া তা মিটবে না?

—কেন বলুন তো?

—এমনিই তার বড়বেশি পরিশ্রম হচ্ছে। সেইজন্যে যতটুকু সম্ভব তাঁকে বিশ্রাম দিতে চাই।

র‍্যাঁবেয়ার চিন্তান্বিতভাবে কিছুক্ষণ তারিউ-র দিকে চেয়ে রইলেন। তার শরীর আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে, চোখে এবং চেহারার সবখানে ক্লান্তির মলিন ছাপ, চওড়া কাঁধজোড়াও যেন ঝুলে ঝুলে পড়েছে। হঠাৎ বাইরের দরজায় কে টোকা দিল। মুখে সাদা-মুখোশ-পরা একজন পুরুষ-নার্স ভেতরে এসে ঢুকল। সে তারিউ-র টেবিলের ওপর একগোছা ছোট ছোট কার্ড রাখল, বলল—ছ'খানা। মুখোশের ভেতর থেকে তার গলার অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে আবার বার হয়ে গেল। তারিউ

একবার র‍্যাবেয়ারের দিকে তাকালেন,কার্ডগুলো তাকে দেখিয়ে পাখার মতো করে টেবিলের ওপর বিছিয়ে ধরলেন।

—দেখুন, কেমন চমৎকার ছোট ছোট কতকগুলো যন্ত্র, তাই না? কিন্তু এগুলোই হচ্ছে মৃত্যু। গতরাতে ক'জন মারা গেছে তার হিসাব আছে এখানে। কেমন একটা ভ্রূকুটির ভাব দেখিয়ে তারিউ কার্ডগুলোকে আবার গুছিয়ে ফেললেন।—এখন আমাদের যা-কিছু করার তা হচ্ছে, এই হিসাব রাখা।

টেবিলের ওপর অন্যান্য যেসব জিনিসপত্র ছড়ানো ছিল সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে তারিউ উঠে দাঁড়ালেন।

—খুব শীঘ্র তাহলে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তাই না?

—হ্যাঁ, আজ রাত বারোটায় যাব বলে স্থির হয়েছে।

তারিউ জানালেন যে খবর শুনে তিনি খুশি হয়েছেন। র‍্যাঁবেয়ারের এখন উচিত নিজের দিকে কিছুটা নজর দেয়া।

—আপনি সত্যিই আন্তরিকভাবে তাই বলছেন? তারিউ তার কাঁধ দুখানায় শুধু একবার ঝাঁকানি দিলেন।

—আমার যা বয়স তাতে যা-কিছু করি বা বলি তার ভেতর আন্তরিকতা থাকাটাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া মিথ্যাকথা বলতে যাওয়াটা অনেক ঝামেলার।

—মাফ করবেন তারিউ, আমি কিন্তু একবার ডাক্তার রিও-র সঙ্গে দেখা করতে চাই, র‍্যাবেয়ার বললেন।

—জানি, ডাক্তারের মানবতাবোধ হয়তো আমার চেয়ে অনেক বেশি। চলুন, দেখি।

—আমি কিন্তু ঠিক এইরকম কিছু..., র‍্যাবেয়ার যা বলতে যাচ্ছিলেন তা যেন তার মুখের ভেতর জড়িয়ে গেল, তিনি মাঝপথে থেমে গেলেন।

তারিউ কয়েক মুহূর্তের জন্যে র‍্যাবেয়ারের দিকে একদৃষ্টে তাকালেন, কিন্তু পরক্ষণেই তার চোখমুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

একটা সরু বারান্দা ধরে তারা এগিয়ে চললেন। দুপ্যাশে হালকা সবুজ রঙের দেয়াল। রাঁধুনি মাছ রাখবার কাচের পাত্রের মধ্যে যেমন দেখায়, চারপাশের সূর্যের আলো মনে হচ্ছিল সমুদ্রের জলের মতো সবুজ। বারান্দার শেষপ্রান্তে গিয়ে দু-পাল্লা-বিশিষ্ট ঘষা কাচের দরজা। দরজার ওপারে ঘরের ভেতর লোকজন নড়াচড়া করছে, আবছা দেখা যাচ্ছিল। সেখানে যাবার আগে তারিউ র‍্যাঁবেয়ারকে নিয়ে পাশের একটা ছোট ঘরে ঢুকলেন। ঘরটার চারপাশের দেয়ালে শুধু আলমারি। একটা আলমারি খুলে তারিউ জীবাণুনাশক ঔষধ ভর্তি একটা পাত্র থেকে মসলিনের আবরণে ঢাকা দুটো তুলোর মুখোশ বার করে নিলেন। একটা মুখোশ র‍্যাবেয়ারের দিকে এগিয়ে দিয়ে তাকে পরতে বললেন।

র‍্যাবেয়ার তারিউকে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যিই মুখোশ পরার প্রয়োজন আছে কিনা।

তারিউ জবাবে বললেন, না, সত্যিই হয়তো কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেটা মুখে থাকলে আশপাশে অন্য যাঁরা থাকবেন,তাঁরা হয়তো মনে সাহস পাবেন।

এবার দুজনে ঘষা কাচের দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। ভেতরে প্রকাণ্ড একটা

ঘর। এত গরমের মধ্যেও তার দরজা-জানালা সম্পূর্ণ বন্ধ। মাথার উপর জোঁ জোঁ করে বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরছিল। পাখার বাতাসে ঘরের ভেতরের বদ্ধ উষ্ণ বাতাস উপর-নিচ হচ্ছিল। দুপাশে দুসারি ময়লা বিছানা। চারপাশে শুধু একটানা যন্ত্রণার কাতরধ্বনি, কোনোটা তীক্ষ্ণ কোনোটা চাপা, সবটা মিলিয়ে মনে হচ্ছিল যেন মৃত্যুর পাশে একঘেয়ে সুরে স্তোত্র পাঠ করা হচ্ছে। উপরের বন্ধ-জানালার ভেতর দিয়ে তীব্র আলোর ভেতর সাদা-পোশাক-পরা নার্সরা ধীরপায়ে এক বিছানা থেকে আর-এক বিছানায় রোগী দেখে বেড়াচ্ছিল।

ঘরের ভেতর অসহ্য গরমের জন্যে র‍্যাঁবেয়ার অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। সমানেই ডাক্তার রিও, যন্ত্রণায় গোঙরাচ্ছে এমন একটা দেহ-কাঠামোর ওপর ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করছিলেন, কিন্তু তাঁকে চিনতে র‍্যাঁবেয়ারের বেশ কষ্ট হল। ডাক্তার রোগীর যৌনঅঙ্গটা ছুরি দিয়ে চিরে দিচ্ছিলেন। দু-পাশে দাঁড়ানো দুজন নার্স তার পা দুখানা টেনে ফাঁক করে ধরেছিল। কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তার মাথা তুললেন। একজন সাহায্যকারী একটা ট্রে এগিয়ে ধরতেই ডাক্তার হাতের যন্ত্রপাতিগুলো তাতে রাখলেন এবং বেশ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রোগীর দিকে চেয়ে একভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। রোগীর ক্ষত ব্যান্ডেজ করে দেয়া হচ্ছিল।

—কোনো খবর আছে? ডাক্তার তারিউকে জিজ্ঞাসা করলেন। তারিউ ততক্ষণে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

—ফাদার প্যানালু কোয়ারেনটাইন স্টেশনে র‍্যাঁবেয়ারের জায়গায় কাজ করতে রাজি হয়েছেন। ইতিমধ্যেই বেশকিছু দরকারি কাজ তিনি সেখানে করেছেন। যেহেতু র‍্যাঁবেয়ার চলে যাচ্ছেন, এখন বাকি কাজ হচ্ছে তিন নম্বর দলটিকে স্বীকৃতি দেয়া।

ডাক্তার রিও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

—ডাক্তার ক্যাসল বেশ কিছুসংখ্যক টিকা প্রস্তুত করে ফেলেছেন, তারিউ বলে চললেন—তিনি বলছিলেন, টিকাগুলো এখন পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

—বেশ তো, ডাক্তার রিও বললেন—একটা মস্ত সুসংবাদ।

—আর র‍্যাঁবেয়ার এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

ডাক্তার রিও ঘুরে দাঁড়ালেন। র‍্যাঁবেয়ারকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মুখোশের ওপর তার চোখজোড়া সঙ্কুচিত হয়ে আসল।

—আপনি এখানে কেন? ডাক্তার রিও জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার তো এখন অন্যত্র থাকার কথা, তাই না?

তারিউ ডাক্তারকে বুঝিয়ে বললেন, র‍্যাঁবেয়ারের শহর ছেড়ে যাবার সময় স্থির হয়ে গেছে। আজ মাঝরাতেই চলে যাচ্ছেন তিনি।

তার কথার জের টেনে র‍্যাঁবেয়ার বললেন—হ্যাঁ, অন্তত সেইরকম একটা ভেবে রেখেছি।

যখনই তাঁরা কেউ মুখোশের ভেতর দিয়ে কথা বলছিলেন, মুখোশের মসলিনের ঢাকনাটা ফুলে ফুলে উঠছিল, আর ঠোঁটের ওপরের অংশটা বাষ্পে ভিজে যাচ্ছিল। এর ফলে তাদের কথাবার্তা মনে হচ্ছিল অবাস্তব, মনে হচ্ছিল কতকগুলো মূর্তি যেন

নিজেদের ভেতর কথাবার্তা বলাবলি করছে।

—আপনার সঙ্গে আমার দু-একটা কথা আছে, র‍্যাঁবেয়ার ডাক্তারকে উদ্দেশ করে বললেন।

—আচ্ছা, আমি এক্ষুনি আসছি। আপনি তারিউর অফিসে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

মিনিটখানিক পরে দেখা গেল ডাক্তারের গাড়ির পেছনের সিটে বসে আছেন ডাক্তার রিও এবং র‍্যাঁবেয়ার। তারিউ স্টিয়ারিং ধরে সামনে বসেছিলেন। গাড়ি ছাড়বার আগে মুখ ঘুরিয়ে একবার পিছনের দিকে তাকালেন।

—পেট্রল শেষ হয়ে এসেছে, তারিউ বললেন—মনে হচ্ছে কাল থেকে পায়ে হাঁটা শুরু করতে হবে।

—দেখুন ডাক্তার, র‍্যাঁবেয়ার বললেন—আমার হয়তো আর যাওয়া হল না। আপনাদের সঙ্গে থেকে গেলাম।

তারিউকে কোনোরকম নড়াচড়া করতে দেখা গেল না। তিনি ঠিকভাবে গাড়ি চালিয়ে চললেন। ডাক্তার রিওকে মনে হচ্ছিল—তিনি যেন কিছুতেই দৈহিক অবসাদ কাটিয়ে উঠতে পারছেন না।

—কিন্তু আপনার স্ত্রীর কী হবে? ডাক্তার রিও প্রায় অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

র‍্যাঁবেয়ার বললেন, ব্যাপারটা তিনি বেশ ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করে দেখেছেন এবং তাঁর আগের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে যদি তিনি পালিয়ে যান, তাহলে ব্যাপারটা তাঁর নিজের কাছেও লজ্জাকর বলে মনে হবে। আর তার ফলে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর নিজের সম্পর্কও কিছুটা ব্যাহত হবে।

ডাক্তার রিও-র মধ্যে এবার যেন কিছুটা সতেজভাব ফিরে এল। বললেন—এরকম চিন্তা করাটা অর্থহীন। যদি কেউ ব্যক্তিগত সুখকেই জীবনের পরম কাম্য বলে মনে করে তাতে তার লজ্জা পাবার কিছু নেই।

—তা অবশ্যই সত্যি, র‍্যাঁবেয়ার উত্তরে বললেন—কিন্তু শুধু নিজেকে নিয়েই সুখী হওয়া, কেবল নিজের সুখের কথাটাই চিন্তা করা, সেটা নিশ্চয় লজ্জার।

তারিউ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কথাবার্তা বলেননি। গাড়ি চালাতে চালাতে সামনের দিকে চেয়েই এবার তিনি মন্তব্য করলেন—র‍্যাঁবেয়ার যদি সত্যিই অপরের দুঃখ-দুর্দশার শরিক হতে চান তাহলে শীঘ্রি দেখবেন তাঁর নিজের সুখভোগের আর অবকাশ নেই। সুতরাং এ দুটোর মধ্যে যে-কোনো একটাকে তাঁকে বেছে নিতেই হবে।

—ব্যাপারটা আমার মনে হয় ঠিক সেরকম কিছু নয়, র‍্যাঁবেয়ার উত্তরে বললেন—এতদিন পর্যন্ত আমি নিজেকে এই শহরে একজন সাধারণ আগন্তুক বলে ভাবতাম। এগুলো আপনাদের ব্যাপার, এতে আমার মাথাব্যথা করবার মতো কিছু নেই। কিন্তু এই ক'দিন আমি যা দেখেছি, তাতে আমার এই উপলব্ধি হয়েছে যে, আমি চাই বা না চাই, আমি এখানকারই একজন। যে দায়িত্ব আপনারা স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছেন সেটা আমারও দায়িত্ব, আর পাঁচজনেরও দায়িত্ব।

তারিউ বা ডাক্তার রিও কেউই তার কথার জবাব দিচ্ছেন না দেখে র‍্যাঁবেয়ার যেন কিছুটা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—আর এটা আমার মতো আপনারাও পরিষ্কার

বুঝেন। কিন্তু যাকগে সে-কথা! তা না হলে এই হাসপাতাল নিয়ে নিজেরা এত পরিশ্রম করছেন কিসের জন্যে? আপনারা কি বলতে চান এই নির্বাসনের কাছটা সেরে ফেলেছেন? ব্যক্তিগত সুখের প্রতি আর কোনো আকর্ষণ নেই আপনাদের?

এবারেও কিন্তু তারিউ বা ডাক্তারের দিক থেকে কোনোরকম জবাব এল না। ডাক্তারের বাসার কাছাকাছি না-পৌঁছানো পর্যন্ত তারা সবাই সেইভাবে নীরব রইলেন। র‍্যাঁবেয়ার এবার তার শেষের প্রশ্নটা আরো জোরের সঙ্গে পুনরুক্তি করলেন।

এতক্ষণে ডাক্তার রিও তার দিকে ফিরলেন, বেশ একটু চেষ্টা করেই যেন সেইটাকে সোজা করলেন তিনি—মাফ করবেন র‍্যাঁবেয়ার, কী জানি, হয়তো এ-ব্যাপারে আমার বলার মতো তেমন কিছু নেই। এখানে থেকে যাওয়াটাকে যদি শ্রেয় বলে ভাবেন, আপনি অবশ্যই থেকে যেতে পারেন।

হঠাৎ গাড়িটা মোড় নিয়ে ঝাঁকানি খেতেই তাঁর কথা যেন মাঝপথে বাধা পেল। তারপর সোজা সামনের দিকে চেয়ে আবার তিনি বলতে শুরু করলেন—আমার বিশ্বাস, হয়তো পৃথিবীর এমন কিছুই মূল্যবান নেই যার আকর্ষণ ভালোবাসার আকর্ষণের চেয়ে বড়—যার জন্যে ভালোবাসার আহ্বান ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব।

—অথচ ব্যক্তিগতভাবে সেটাই আমি করে যাচ্ছি। কিন্তু কেন তা করছি, সে-প্রশ্নের সঠিক জবাবও হয়তো দিতে পারব না, আবার তার দেহ যেন ভেঙে পড়ল।—আসলে ব্যাপারটা হয়তো এইরকমই, তিনি ক্লান্ত-কণ্ঠে বলে গেলেন—আর তার জন্যে করারও কিছু নেই। সুতরাং এই বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে প্রত্যেকের নিজের নিজের মতো সিদ্ধান্ত নেয়াই ভালো।

—কিন্তু সেই সিদ্ধান্তগুলো কী?

—হ্যাঁ, তাও বটে, ডাক্তার রিও বললেন—তবে কি আপনি অপরের রোগ নিরাময়ও করতে চান, আবার এসব প্রশ্নের জবাবও পেতে চান। এ দুটোই একসঙ্গে সম্ভব নয়। সুতরাং আসুন, দেখা যাক, রোগ নিরাময়ের কাজটা কতটা দ্রুত সেরে ফেলা যায়। সেটাই এখন আমাদের সামনে বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন মাঝরাতে ডাক্তার রিও র‍্যাঁবেয়ারের হাতে একখানা ম্যাপ দিলেন। তারিউ ছিলেন তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে। শহরের যে-অঞ্চলটা তদারকের ভার দেয়া হয়েছিল র‍্যাঁবেয়ারের ওপর, ম্যাপটা ছিল সেই অঞ্চলের। তারিউ চকিতে নিজের হাতঘড়ির দিকে চেয়ে নিলেন একবার। তিনি মুখ তুলতেই র‍্যাঁবেয়ারের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি-বিনিময় হল।

—আপনার শেষ সিদ্ধান্ত তাদের জানিয়েছেন?

—আপনার শেষ সিদ্ধান্ত তাদের জানিয়েছেন?—ছোট একটা চিরকুট র‍্যাঁবেয়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে চেয়ে রইলেন।—ছোট একটা চিরকুট পাঠিয়েছি তাদের কাছে—র‍্যাঁবেয়ার বেশ কষ্টের সাথে কথাগুলো বলে গেলেন যেন—এখানে আসার আগেই এটা করেছি।

ডাক্তার ক্যাসল প্লেগের বীজাণুনাশক যে টিকা প্রস্তুত করেছিলেন, অক্টোবরে শেষের দিকে তা প্রথম ব্যবহার করা হল।

প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল ডাক্তার রিও-র শেষ অস্ত্র। তিনি জানতেন, এতে যদি কোনো ফল না-পাওয়া যায় তাহলে সমগ্র শহরটাকে দুর্বিপাকের করুণার ওপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে। সেই অবস্থায় হয় একটা অনির্দিষ্টকাল ধরে প্লেগ তার ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাবে অথবা হয়তো আকস্মিক আপনা থেকে তার উপশম হবে।

ডাক্তার ক্যাসল যেদিন ডাক্তার রিও-র সঙ্গে দেখা করলেন তার ঠিক আগের দিন মঁসিয়ে অথনের ছোটছেলেটা হঠাৎ প্লেগে আক্রান্ত হয়। তার ফলে পরিবারের সবাইকে রোগীদের জন্যে নির্দিষ্ট বিভিন্ন কোয়ারেনটাইন ক্যাম্পে যেতে হয়। মঁসিয়ে অথনের স্ত্রী দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আটক থাকার পর সবে পরিবারের সবার সঙ্গে মেলামেশা শুরু করছিলেন। তাঁকেও আবার কোয়ারেনটাইন ক্যাম্পে যেতে হল। সরকারি বিধানের প্রতি অনুগত্যবশত ছেলের দেহে রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে তা লক্ষ্য করার পরপরই মঁসিয়ে অথন ডাক্তার রিওকে সংবাদ দিলেন। ডাক্তার রিও রোগীর ঘরে ঢুকে দেখলেন—বাবা-মা দুজনেই ছেলের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলেটার তখন চরম বিপন্ন অবস্থা—কোনোদিকে চাইবার বা কোনোকিছু অনুভব করার মতো শক্তি বোধহয় তখন তার আর ছিল না। ডাক্তার নিজের ইচ্ছামতো তার দেহ পরীক্ষা করে গেলেন। ছেলেটা কোনোরকম প্রতিবাদ করল না। পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার রিও যখন মাথা তুললেন, দেখলেন, মঁসিয়ে অথনের একাগ্র দৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ, আর মঁসিয়ে অথনের পেছনেই চোখে পড়ল ছেলেটার মায়ের মুখ, সে মুখ রক্তশূন্য বিবর্ণ। মাদাম অথন মুখে একটা রুমাল চেপে রেখেছিলেন। তার বিস্ফারিত বড় বড় চোখজোড়া যেন ডাক্তারের প্রতিটি গতিবিধি অধীর আগ্রহে অনুসরণ করে ফিরছিল।

—মনে হয় নিশ্চিত তাকে প্লেগে ধরেছে, সন্দেহ করবার আর কোনোরকম অবকাশ নেই। মঁসিয়ে অথন এমন অনুচ্চস্বরে কথাগুলো বললেন, মনে হল যেন তাঁর গলার স্বর ছিল না।

—হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে। ডাক্তার রিও দৃষ্টি নামিয়ে আবার ছেলেটার দিকে তাকালেন। এবার মাদাম অথনের চোখদুটো আরো খানিক বিস্ফারিত হল। কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনোরকম শব্দ বার হতে দেখা গেল না। মঁসিয়ে অথনও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আগের চেয়ে আরো ক্ষীণস্বরে বললেন—দেখুন ডাক্তার, সিরিবিরাম যা-কিছু আছে মেনে চলতে হবে।

ডাক্তার রিও যতদূর সম্ভব মাদাম অথনের দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি তখনও মুখের সামনে একটা রুমাল চেপে ধরে রেখেছিলেন।

—না, যা-কিছু করার এক্ষুনি সেরে ফেলতে হবে, ডাক্তার রিও কেমন অপ্রতিভভাবে জবাব দিলেন—আপনার টেলিফোনটা একটু ব্যবহার করতে চাই।

মঁসিয়ে অথন ডাক্তারকে টেলিফোনের কাছে নিয়ে যেতে চাইলেন। যাবার আগে

ডাক্তার মাদাম অথনের দিকে ফিরে বললেন—দেখুন, সত্যিই আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু কী করতে পারি বলুন। বুঝতেই পারছেন, আপনাকেও সাথে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে। সবকিছুই তো জানেন।

মনে হল মাদাম অথন অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তিনি মাথাটা নিচু করে মেঝের দিকে চেয়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়তে নাড়তে বললেন—হ্যাঁ, বুঝেছি, এক্ষুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

ফিরবার আগে ডাক্তার রিও আকস্মিক একটা ভাবাবেগের মাথায় অথন-দম্পতির দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি তাদের কোনো সাহায্য করতে পারেন কিনা। মাদাম অথন নীরবে ডাক্তারের দিকে চেয়ে রইলেন। আর ম্যাজিস্ট্রেট অথন যেন ডাক্তারের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে চাইলেন।

—না, তিনি বললেন, তারপর ঢোক গিললেন—কিন্তু আমার ছেলেটাকে একটু দেখবেন।

গোড়ার দিকে যা ছিল রোগের সংক্রমণকে বাধা দেবার জন্যে নামমাত্র কতকগুলো আনুষ্ঠানিকতা পালনের একটা উদ্যোগ মাত্র, এখন ডাক্তার রিও এবং তারিউ দুজনে মিলে সেই উদ্যোগকেই নির্দিষ্ট আইনকানুনের ভেতর পুরোপুরি সংগঠিত করে কোয়ারেনটাইনে রূপান্তরিত করেছিলেন। বিশেষ করে রোগীর সঙ্গে রোগীর পরিবারের লোকদেরও পৃথক করে ফেলার ওপর তাঁরা বিশেষ জোর দিলেন। অসাবধানতাবশত পরিবারের আরো কেউ হয়তো ইতিমধ্যেই রোগাক্রান্ত হয়েছেন, সুতরাং কোনোক্রমেই রোগের অধিক সংক্রমণের ঝুঁকি নেয়া চলবে না। ডাক্তার প্রকৃত অবস্থাটা ম্যাজিস্ট্রেট অথনকে বুঝিয়ে বললেন। তিনিও তা অনুমোদন করলেন। তবুও স্বামী-স্ত্রী তারা দুজনের পরস্পরের ভেতর এমন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন যাতে করে ডাক্তার সহজেই অনুমান করতে পারলেন যে এই অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ গভীরভাবে তাদের অন্তরকে স্পর্শ করছে।

র‍্যাঁবেয়ারের তত্ত্বাবধানে যে কোয়ারেনটাইন হাসপাতালটা ছিল, সেখানে সহজেই মাদাম অথন এবং তার ছোটমেয়েটার থাকার ব্যবস্থা করা চলত, কিন্তু সমস্যা দাঁড়িয়েছিল মঁসিয়ে অথনকে নিয়ে। হাইওয়ে ডিপার্টমেন্টের সরবরাহ-করা তাঁবুর সাহায্যে মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস গ্রাউন্ডে রোগীর পরিবারবর্গকে পৃথক করে রাখার যে ক্যাম্প খোলা হয়েছিল, তাঁর থাকার জন্যে সেখানেই কিছু একটা ব্যবস্থা করা ছাড়া ভিন্ন উপায় ছিল না। মঁসিয়ে অথনের জন্যে ভালো কোনো থাকার ব্যবস্থা না-করতে পারার অক্ষমতা জানিয়ে ডাক্তার রিও যখন তার কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে গেলেন, মঁসিয়ে অথন জবাবে বললেন—আইন সবার জন্যে এক, সবারই তা মেনে চলা উচিত।

রোগাক্রান্ত ছেলেটাকে অকজিলিয়ারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে একটা ওয়ার্ডে রাখা হল। প্লেগ শুরু হবার আগে এটা ছিল বাচ্চাছেলেদের স্কুলের একটা ক্লাসরুম। মণ্টা বিশেক পার হয়ে যাবার পর ডাক্তার রিও-র মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাল ছেলেটাকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় নেই। সংক্রমণ দ্রুত তার দেহে ছড়িয়ে পড়েছিল, অথচ ছেলেটার দেহে প্রতিরোধের শক্তি ছিল না একটুকু। সম্পূর্ণ ফুটে বার হতে পারেনি

অথচ কঠিন যন্ত্রণাদায়ক, এমন ছোট ছোট শুটি ছেলেটার অপুষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন যেন বন্ধ করে আনছিল। ডাক্তার স্পষ্ট দেখতে পেলেন, এ সংগ্রামে তার জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই।

এরকম অবস্থায় ডাক্তার ক্যাসলের সদাপ্রস্তুত টিকা ছেলেটার ওপর পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করবেন কিনা সে-ব্যাপারে ডাক্তার রিও-র মনে আর কোনোরকম দ্বিধা ছিল না। সেদিন রাতে সবার খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পর তারা ছেলেটার দেহে সেই টিকা দেয়া শুরু করলেন। সময় লাগল অনেক, কিন্তু তক্ষুনি তার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। পরের দিন ভোরবেলা এই টিকা ব্যবহারের ফলাফল কী দাঁড়িয়েছে তা পরখ করে দেখবার জন্যে আবার তাঁরা সবাই ছেলেটার বিছানার পাশে জড়ো হলেন। তখনকার অবস্থায় অনেক কিছু নির্ভর করছিল এই ফলাফলের ওপর।

আগের দিনের তার সেই-যে চরম বিপন্ন অবস্থা যেন ছেলেটা কীভাবে কাটিয়ে উঠেছিল। এখন নিয়ত হাত-পাগুলো নাড়ছিল আর বিছানার ওপর এপাশ-ওপাশ করছিল। ভোর চারটে থেকে ডাক্তার ক্যাসল এবং তারিউ ছেলেটার ওপর নজর রেখেছিলেন। কখন তার রোগ বাড়ছিল, কখন তার অবস্থা উপশমের দিকে যাচ্ছিল—সেগুলো তাঁরা খেয়াল রেখেছিলেন। তারিউ তার বলিষ্ঠ দেহকাণ্ড নিয়ে সামান্য ঝুঁকে রোগীর শিয়রে দাঁড়িয়েছিলেন ; ডাক্তার রিও এবং পায়ের দিকে একটা চেয়ারে বসেছিলেন ডাক্তার ক্যাসল। বাহ্যত, অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে চামড়ায় বাঁধানো একখানা বই পড়ছিলেন তিনি।

রাতের অন্ধকারকে সরিয়ে ক্রমেই যেন প্রত্যূষের আলো ফুটে উঠতে থাকল ক্লাসরুমের ভেতর। একে একে অন্যেরাও এসে জমতে থাকলেন সেখানে। ফাদার প্যানালুই আসলেন প্রথম। তারিউ বিছানার যে-পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তার বিপরীত পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর মুখের চেহারা দুঃখ-ভারাক্রান্ত। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অবিরাম পরিশ্রমের ফলে ক্লান্তির রেখা ফুটে উঠেছিল তাঁর প্রশস্ত কপালে।

এরপর গ্রাঁদ যখন এসে পৌঁছালেন, তখন বেলা সাতটা। তিনি তাঁর শারীরিক দুর্বলতার জন্যে সবার কাছে ক্ষমা চাইলেন, তাঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্যে এসেছিলেন তিনি, এক্ষুনি চলে যাবেন। জানতে এসেছিলেন ডাক্তার ক্যাসলের টিকায় সত্যিই কোনো ভালো ফল পাওয়া গেছে কিনা। ডাক্তার রিও কোনো কথা না বলে, শুধু ছোটছেলেটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। তার চোখদুটো সম্পূর্ণ বন্ধ, দাঁতে দাঁতে লাগা, মুখের চেহারাটা যন্ত্রণায় এমনই খিঁচিয়ে গেছে যে দেখলে মনে হয় সে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। ছেলেটা একটা গোল বালিশের ওপর রাখা তার মাথাটা বারেবারে এপাশ-ওপাশ নাড়ছিল। র‍্যাঁবেয়ার যখন এসে ঢুকলেন, তখন ঘরটার চারপাশের অন্ধকার আরো স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। ঘরের এককোণে একটা ব্ল্যাকবোর্ড ঝুলানো। সাদা খড়ি দিয়ে তার ওপর যে-সমীকরণ অঙ্কটা কষা হয়েছিল তার প্রায় মুছে যাওয়া সংখ্যাগুলো এখন পরিষ্কার চোখে পড়ছিল। পরে বেডের পায়ের দিকে বসে র‍্যাঁবেয়ার পকেট থেকে একপ্যাকেট সিগারেট বার করলেন, কিন্তু চকিতে

একবার ছেলেটার মুখের দিকে তাকাবার পর সেটাকে আবার পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন।

চেয়ারে বসা ডাক্তার ক্যাসল চশমার ফাঁক দিয়ে একবার ডাক্তার রিও-র দিকে তাকালেন।

—ছেলেটার বাবার কোনো সংবাদ পেয়েছ?

—না, পাইনি। রোগীর পরিবারের লোকদের পৃথক করে রাখবার জন্যে নির্দিষ্ট যে ক্যাম্প আছে সেখানেই আছেন তিনি।

ডাক্তার রিও দুহাতে ছেলেটার খাটের রেলিং আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন, তার চোখের দৃষ্টি তখনও নিবদ্ধ ছিল যন্ত্রণাকাতর ছেলেটার ক্ষুদ্র দেহের ওপর। হঠাৎ ছেলেটার দেহটা কেমন শক্ত হয়ে উঠল, কোমরের কাছটায় বেঁকে গেল যেন, হাত-পাগুলো ধীরে ধীরে ইংরাজি 'এক্স' অক্ষরের আকারে দুপাশে ছড়িয়ে গেল। ছেলেটার গায়ে পোশাক-পরিচ্ছদ বলতে কিছুই ছিল না। শুধু একটা আর্মি-কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল তার দেহটাকে। তার দেহ থেকে শুকনো ঘাম আর ভিজে উলের গন্ধ আসছিল। সে আবার দাঁতে দাঁত রাখল। তারপর আবার খুব ধীরে ধীরে যেন একটা শান্তভাব ফিরে আসতে থাকল। সে হাত-পাগুলোকে আবার ঠিকভাবে গুটিয়ে বিছানার মাঝখানে এনে রাখল। কিন্তু তার মুখ দিয়ে একটা শব্দও বার হচ্ছিল না, চোখদুটো তখনও আগের মতো বন্ধই ছিল। হঠাৎ সে জোরেজোরে শ্বাস নিতে লাগল। ডাক্তার রিও তারিউ-র দিকে তাকালেন, কিন্তু তারিউ তড়াতাড়ি দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন।

ইতিমধ্যে অনেক শিশুকেই তাঁরা চোখের ওপর মরতে দেখেছেন। গত বেশ কয়েক মাস ধরে এই শহরে মৃত্যুর কাছে যেন কোনোরকম বাছবিচার ছিল না, আনুকূল্য ছিল না তার কারো প্রতি। কিন্তু আজ প্রত্যূষ থেকে যেভাবে তারা একটা শিশুর মৃত্যুযন্ত্রণাকে প্রতিমুহূর্তে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন, এমনটা আর পূর্বে কোনোদিন ঘটেনি। বলাবাহুল্য, নিরপরাধ শিশুদের ওপর এই শাস্তিবিধানকে যেভাবে দেখা উচিত সেইভাবেই এতদিন দেখে এসেছিলেন তাঁরা; তাঁদের দৃষ্টিতে এটা ছিল বীভৎস। কিন্তু এতদিন এই বীভৎস অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব ছিল শুধু চিন্তার ক্ষেত্রে, কারণ একটা নিরপরাধ শিশুর মৃত্যুযন্ত্রণাকে এইভাবে দীর্ঘ সময় ধরে চোখের ওপর দেখার মতো অবস্থা পূর্বে কোনোদিন ঘটেনি।

এবং ঠিক সেই মুহূর্তে ছেলেটার সমস্ত শরীর অকস্মাৎ যেন কুঁকড়ে উঠল। মনে হল তার পেটে কিসে যেন কামড়েছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে একটানা চিৎকার করে কাঁদতে থাকল সে। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত ধরে, যা উপস্থিত সবার কাছে মনে হতে লাগল অনন্তকালের মতো, ছেলেটা অদ্ভুতভাবে বেঁকে কুঁকড়ে পড়ে রইল, প্রবল খিঁচুনির যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপতে থাকল তার সারাদেহ, যেন প্লেগের প্রবল উষ্ণ নিশ্বাসের সামনে তার ভঙ্গুর দেহটা বেঁকে দুমড়ে যাবার মতো হচ্ছিল, প্রবল জ্বরের উত্তাপে একটার-পর-একটা ঝাপটায় দেহটা যেন ভেঙে যেতে চাইছিল। তারপর প্রবল ঝড়ের সেই দমকা বেগটা যেন ক্রমে শান্ত হয়ে এল, সম্পূর্ণ থেমে গেল সেটা, ছেলেটা কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম নেবার অবকাশ পেল। জ্বরের সেই প্রবল উত্তাপটাও যেন

ক্রমেই নেমে যেতে থাকল, জ্বরের প্রকোপ কমে যাবার পর যেন ছেলেটার বিধ্বস্ত দেহটাকে একটা প্লেগ-উপদ্রুত স্যাঁতসেঁতে উপকূলে ফেলে রেখে গেল। বহুকষ্টে শ্বাস নিতে হচ্ছিল তাকে, তার সমস্ত দেহ ক্লান্তিতে অবসন্নদে এমনই নির্জীব দেখাচ্ছিল যে, সেটা যেন মৃতদেহের শামিল।

তৃতীয়বারের মতো আবার যখন সেই উত্তাপের ঝাপটা এসে লাগতে থাকল ছেলেটার দেহে, তা যেন উঁচু করে কিছুটা তুলে ফেলল দেহটাকে, ছেলেটা তার হাতপা ভাঁজ করে যেন গুটিয়ে ফেলল, বিছানার ধারের দিকে গড়িয়ে গেল তার দেহটা, আগুনের যে শিখা তার দিকে এগিয়ে আসছিল, তার স্পর্শ থেকে সে যেন বাঁচাতে চাইছিল। নিজের দেহটাকে মিনিটখানেক পরে মাথাটা ভীষণ জোরে জোরে কয়েকবার বালিশের ওপর এপাশ-ওপাশ করার পর সে আকস্মিক কম্বলটা তার গা থেকে ছুড়ে ফেলে দিল। চোখের উত্তপ্ত মণিদুটো ফেটে যেন পানি বেরিয়ে আসতে থাকল, দু চোখ ভরে গেল পানিতে, রক্তহীন বসা দুইগণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকল পানি। আবার যখন দেহের প্রবল কাঁপুনিটা থেমে গেল, ছেলেটা তার রুগ্ণ হাত-পাগুলোকে লম্বাভাবে ছড়িয়ে দিয়ে দলা পাকিয়ে যাওয়া বিছানার ওপর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ক্লান্ত অবস্থায় পড়ে রইল। গত চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর তার হাত-পা শুকিয়ে অস্থিসার হয়ে উঠেছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল ক্রুশে বিদ্ধ যিশুর এক অদ্ভুত ব্যঙ্গরূপ।

তারিউ ছেলেটার দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার হাতের বড় থাবা দিয়ে ছেলেটার ঘাম এবং অশ্রুভেজা ছোট মুখের দুপাশে স্নেহভরে ধীরে ধীরে টোকা দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ আগেই ডাক্তার ক্যাসল তার বইখানা গুটিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁরও দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তখন ছেলেটার দেহের ওপর। ডাক্তার ক্যাসল এবার কথা বলতে শুরু করলেন, কিন্তু প্রতিবার কথা বলার সময় তিনি জোরে জোরে কেশে নিচ্ছিলেন, কারণ তার গলার স্বর অত্যন্ত কর্কশ শোনাচ্ছিল।

—আজ সকালে তার জ্বর নামেনি, তাই না, রিও?

ডাক্তার রিও মাথা নেড়ে সায় দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ছেলেটার প্রতিরোধ করবার শক্তি যেন সেদিন সকাল থেকে কিছুটা বেড়েছে বলে মনে হচ্ছিল, যেটা সেই অবস্থায় তার কাছ থেকে আশা করা মোটেই সম্ভব ছিল না।

ফাদার প্যানালু এতক্ষণ দেয়ালের একপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলেন, এবার তিনি নিচুগলায় বললেন—তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, তাকে যদি শেষপর্যন্ত মরতেই হয়, আরো কিছুটা দীর্ঘ সময় ধরে কষ্ট পেতে হবে।

ওয়ার্ডের ভেতরটায় ক্রমেই অধিক আলো এসে পড়ছিল। ওয়ার্ডের বাকি ন'টা বেডে যেসব রোগী ছিল তারাও নিয়ত বালিশের ওপর মাথা নাড়ছিল আর যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল, কিন্তু তাদের গলার স্বর মনে হচ্ছিল অনেক নিচু, যেন ইচ্ছা করেই তারা গলার স্বর এমনি নিচু করে রেখেছিল। শুধু ওয়ার্ডের শেষপ্রান্তের বেডের রোগীটা একটু চিৎকার করছিল, তাও মনে হচ্ছিল, ক্ষীণ স্বরে, থেকে থেকে আহা-উহ করার মতো, যেগুলোকে যন্ত্রণার কাতরধ্বনির পরিবর্তে বিস্ময়সূচক ধ্বনি বললেই ভালো হত। বাস্তবিক তখনও যারা এইভাবে যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যে

রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রথমদিককার সেই-যে একটা উদ্ভট আতঙ্ক সেটা যেন তারা কোনোরকমে মোটামুটি কাটিয়ে উঠেছিল। রোগের প্রতি এমনকার তাদের যে মনোভাব তা হচ্ছে অন্তরে একটা গভীর বিষণ্ণতা বোধ থাকলেও, রোগকে তারা যেন মেনে নিয়েছিল। একমাত্র এই শিশুটাই তার ক্ষুদশক্তি দিয়ে তখনও প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল।

ডাক্তার রিও ঘন ঘন ছেলেটার নাড়ি দেখছিলেন। এতে যে ছেলেটার কোনো উপকার হচ্ছিল তার জন্যে ঠিক নয়, তবে তার নিজের অসহায় অবস্থাকে এড়াবার জন্যে এটাই হয়তো ডাক্তার রিও-র সামনে ছিল একমাত্র পথ। আর ছেলেটার নাড়ি টিপে ধরে যখন তিনি চোখ বুজছিলেন, তখন তিনি যেন অনুভব করছিলেন ছেলেটার নাড়ির উদ্দাম ভাবটা তার নিজের রক্তের উত্তাপের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। এইভাবে ছেলেটার সঙ্গে একাত্মবোধ করার পর তাকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে তিনি যেন তাঁর নিজের দেহের অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকলেন। কিন্তু তাদের দুজনের হৃদস্পন্দন ক্ষণিকের জন্যে মিলে এক হয়ে গেলেও পরমুহূর্তেই আবার তা কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ছেলেটা যেন তার নাগালের বাইরে সরে গেল। ডাক্তার আবার আগের মতো অসহায় বোধ করতে থাকলেন। এবার তিনি ছেলেটার ছোট পাতলা কব্জিটা নিজের হাত থেকে নামিয়ে দিলেন, নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লেন।

চারপাশের সাদা গোলা ফেরানো দেয়ালে যে রোদ এসে পড়েছিল, তার লালচে আভা ইতিমধ্যেই হলুদ হতে শুরু করেছিল। আর একটা উত্তপ্ত দিন শুরু হতে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যেই তার উত্তাপের ঢেউ এসে আঘাত করতে শুরু করেছিল জানালার ওপর। গ্রাঁদ ঘর থেকে বার হয়ে যাবার পথে যখন বলে গেলেন তিনি আবার ফিরে আসবেন তা যেন কারো কানেই গেল না। সবাই নীরবে বসে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তার চোখজোড়া তখনও সম্পূর্ণ বোজা, ছেলেটা মনে হল যেন আগের চেয়ে অনেকটা শান্ত হয়ে উঠল। নখরের মতো তার ছোট ছোট আঙুলগুলো দিয়ে সে যেন বিছানার ধারগুলো ধরবার চেষ্টা করছিল। আবার আঙুলগুলো নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল, তার হাঁটুর উপর যে-জায়গাটা কম্বল-ঢাকা ছিল সেখানটায় চুলকাল কিছুক্ষণ। তারপর আকস্মিক পা-দুখানাকে গুটিয়ে উরুদুটোকে পেটের ওপর এনে রাখল, সেইভাবে স্থির হয়ে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। এবার এই প্রথম সে চোখ খুলল।

তার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে ডাক্তার রিও। ছেলেটা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। ছোট্ট একখানা মুখ মনে হয় যেন ধূসর মাটির মুখোশ পরে আছে, দেখতে তেমনি ভাবলেশহীন। ধীরে ধীরে তার ঠোঁটজোড়া একটু ফাঁক হল, তারপর ঠোঁটের সেই ফাঁক দিয়ে বার হওয়া শুরু হল দীর্ঘ একটানা চিৎকার, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাঝেও যেন তার বিরাম ছিল না, মনে হচ্ছিল একটা ক্রুদ্ধ প্রতিবাদে সমস্ত ওয়ার্ডটা ভরিয়ে তুলছিল সেই চিৎকার। প্রতিবাদের ভেতর শিশুসুলভ কিছুই ছিল না। মনে হচ্ছিল সমস্ত ওয়ার্ডের যন্ত্রণাকাতর প্রত্যেকটা রোগীর কণ্ঠস্বর এসে মিলিত হয়েছে তার পেছনে।

ডাক্তার রিও-র চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। তারিউ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। র‍্যাঁবেয়ার সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ডাক্তার ক্যাসলের পাশে দাঁড়ালেন।

ডাক্তার ক্যাসলের হাতের সেই বন্ধ-বইখানা তখনও তার হাঁটুর ওপর রাখাই ছিল। ফাদার প্যানালু ছেলেটার ছোট মুখখানার দিকে একভাবে তাকিয়েছিলেন। মুখের চারপাশে প্লেগের ময়লা জমেছিল, আর মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল মৃত্যুর সেই ক্রুদ্ধ কাতরধ্বনি, মানবতার ঊষাকাল থেকে যা আমরা শুনে আসছি। ফাদার প্যানালু এবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। ছেলেটার সেই নামহীন অবিশ্রান্ত চিৎকারকে ছাপিয়ে তার চাপা অথচ পরিষ্কার কণ্ঠস্বর সবার কানে গেল :

—ঈশ্বর! এই ছোট শিশুটিকে তুমি রক্ষা করো।

ছেলেটা কিন্তু তেমনি একভাবে চিৎকার করে চলল। ওয়ার্ডে আর যেসব রোগী ছিল, যারা নিজেরাও যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল, তারাও এবার যেন অধৈর্য হয়ে উঠল। ওয়ার্ডের শেষপ্রান্তে কোণের বেড়ে ছিল যে-রোগীটা, এতক্ষণ ধরে যার নিচুগলায় ভাঙা-ভাঙা কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল, সেও এবার তার স্বর চড়িয়ে দিল, কান্নার গতিও যেন তার বাড়ল, বেশ চিৎকার করে একটানা ভেবে কেঁদে চলল সে। আশেপাশে অপর যারা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল, তাদের আর্তনাদও যেন ক্রমেই বাড়তে থাকল। দমকা হাওয়ার মতো আর্তনাদের ঝড় বইতে থাকল যেন সারা ওয়ার্ডটা জুড়ে।

ফাদার প্যানালুর প্রার্থনার শব্দও যেন চাপা পড়ে গেল। ডাক্তার রিও ছেলেটার খাটের রেলিং ধরে তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন। অবসাদে বিরক্তিতে এবার তার চোখজোড়া বুজে এল, তার সারাটা শরীরও যেন ঘুরতে থাকল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার রিও আবার যখন চোখ খুললেন, দেখলেন তারিউ এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে।

—আর নয়, বাইরে যেতে চাই। ডাক্তার রিও বললেন—আর দেখা যায় না এ-দৃশ্য।

কিন্তু পরমুহূর্তেই আকস্মিক অন্য সবার আর্তনাদ থেমে গেল। ডাক্তার রিও লক্ষ্য করলেন, ছোটছেলেটার কাতরানিও ক্ষীণ হতে হতে একসময় নিস্তব্ধতার মাঝে মিলিয়ে গেল। ছেলেটার চারপাশে আবার যন্ত্রণার আর্তনাদ শুরু হল বটে কিন্তু এখনকার আর্তনাদ ছিল আগের তুলনায় অনেক ক্ষীণ। যুদ্ধক্ষেত্রে কঠিন সংগ্রামের সমাপ্তির পর তার যে একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ভেসে বেড়ায়, এ যেন ছিল তারই অনুরূপ। সংগ্রাম সত্যিই তখন শেষ হয়ে এসেছিল। ডাক্তার ক্যাসল ইতিমধ্যেই তার নির্দিষ্ট আসন ছেড়ে ছেলেটার বিছানার অপরপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি সবাইকে জানিয়ে দিলেন—সব শেষ।

ছেলেটার মুখটা তখনও হাঁ করে খোলাই ছিল। শুধু কোনো চিৎকার বেরুচ্ছিল না এখন আর সেখান থেকে। তার ছোট শীর্ণ দেহটা দলা-মোচড়ানো একরাশ কম্বলের ভেতর পড়েছিল। তার গণ্ডে তখনও অশ্রুর ফোঁটা চিকচিক করছিল।

ফাদার প্যানালুও এবার উঠে ছেলেটার বেডের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। মৃত ছেলেটাকে আশীর্বাদ করার ভঙ্গি করলেন একটা, তারপর নিজের পোশাক গুছিয়ে নিয়ে দুপাশের রোগীদের বেডের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

—আবার সবটাই তাহলে নতুন করে শুরু করতে হবে আপনাকে, তাই না? —তারিউ ডাক্তার ক্যাসলকে জিজ্ঞাসা করলেন।

বৃদ্ধ ডাক্তার ক্যাসল ধীরে ধীরে সম্মতিসূচকভাবে তাঁর মাথাটা নাড়লেন, তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে বাঁকা একটুকরো হাসি ফুটে উঠল।

—তাইতো দেখছি। তবে এটাও ঠিক এই টিকা ব্যবহার করার ফলে ছেলেটা আশ্চর্যজনক দীর্ঘ সময় ধরে প্রতিরোধ করবার শক্তি পেয়েছিল।

ডাক্তার রিও ইতিমধ্যেই বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্যে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। দরজার সামনে ফাদার প্যানালুর সঙ্গে তার মুখোমুখি হয়ে গেল। ডাক্তারের চোখের অদ্ভুত চাউনি এবং তার চলার গতি লক্ষ্য করে ফাদার প্যানালু হাত বাড়িয়ে তাকে থামাতে গেলেন।

—আসুন ডাক্তার সাহেব—ফাদার প্যানালু শুরু করতে যাচ্ছিলেন।

ডাক্তার রিও ভীষণ একটা মূর্তি নিয়ে ফাদার প্যানালুর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

—হ্যাঁ, কী বলার আছে আপনার? এই বাচ্চাছেলেটা অন্তত কোনো অপরাধ করেনি। বলতে পারেন কোনো অপরাধ ছিল কি তার?

ডাক্তার রিও যেমন দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, ফাদার প্যানালুকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তেমনি লম্বা লম্বা পা ফেলে, বাইরে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে ছেলেদের খেলার মাঠের অপর পাড়ে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে ছোট ছোট ডুমুরগাছগুলোর তলায় অনেকগুলো কাঠের বেঞ্চ পাতা ছিল। ডাক্তার রিও একটা বেঞ্চের উপর গিয়ে বসলেন। তার সর্বাঙ্গ বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছিল, চোখমুখ বন্ধ হয়ে আসছিল ঘামে। বেঞ্চে বসে তিনি চোখমুখের ঘাম মুছে ফেললেন। মনে হচ্ছিল তিনি যদি গলা ফাটিয়ে অভিসম্পাত করতে পারতেন, তাহলে হয়তো কিছুটা স্বস্তি পেতেন। অর্থাৎ তার মনে হচ্ছিল এমন একটা কিছু করতে পারতেন যাতে তখনকার তার যে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা তা থেকে নিষ্কৃতি পেতেন, নিষ্কৃতি পেতেন অন্তরে নিয়ত যে ইস্পাতের খোঁচা অনুভব করছিলেন, তা থেকে।

ডুমুরগাছের শাখা-প্রশাখার ভেতর দিয়ে যেন আগুনের ফোয়ারা নেমে আসছিল। সকালের নীল আকাশে দ্রুত যে একটা সাদা পর্দার মতো ছড়িয়ে পড়ছিল তাতে চারপাশের গুমোট ভাবটা যেন আরো বাড়ছিল। ডাক্তার রিও অবসন্ন দেহটাকে বেঞ্চের পেছনে এলিয়ে দিলেন। ওপরের দিকে চোখ তুলে ডুমুরগাছের ভাঙা শাখা-প্রশাখাগুলো চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকলেন, দেখতে থাকলেন রোদে ঝলমল করছে দূরের আকাশ। আস্তে আস্তে আবার তার শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে এল, ক্লান্তি নেমে গেল।

পেছনে কার গলা শুনতে পেলেন যেন।—হঠাৎ এক্ষুনি আপনার কণ্ঠে অমন রাগ দেখলাম কেন? যে-দৃশ্য এতক্ষণ ধরে চোখের ওপর ঘটতে দেখলাম তা আপনার কাছে অসহনীয় হলে আমার কাছেও নিশ্চয় সমান অসহনীয়!

ডাক্তার রিও ফাদার প্যানালুর দিকে মুখ ফেরালেন।

—তা আমিও জানি। আমার আচরণের জন্যে অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু জানেন দৈহিক ক্লান্তি অনেক সময় মানুষকে পাগল করে ফেলে। আর জানেন, উন্মাদের মতো

সবকিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার দুর্বার একটা ইচ্ছা মাঝে মাঝে আমাকে ভীষণভাবে পেয়ে বসে যেন।

—অবশ্যই, সেটা বুঝি—ফাদার প্যানালু কোমলস্বরে বললেন। এরকম দৃশ্য দেখলে স্বভাবতই মানুষের মন বিদ্রোহ করে ওঠে, কারণ কেন যে এমন ঘটে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তবে কী, যে-বিষয়টাকে আমরা বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে উঠতে পারি না, আমাদের উচিত হয়তো সেটাকে ভালোবাসার চেষ্টা করা।

ডাক্তার রিও এবার ধীরে ধীরে নিজের দেহটাকে সোজা করলেন। স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন ফাদার প্যানালুর দিকে, নিজের দৈহিক অবসাদকে কাটিয়ে ফেলে, সমস্ত শক্তি এবং উৎসাহকে কেন্দ্রীভূত করলেন যেন তার এই চোখের দৃষ্টিতে। তারপর তিনি মাথা নাড়তে থাকলেন।

—দেখুন, আপনার এই অভিমতকে মেনে নিতে পারলাম না। ভালোবাসা সম্পর্কে আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ এমন বিশ্ববিধান মেনে নিতে রাজি নয়, যেখানে নিষ্পাপ শিশুদের এইরকম নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

মুহূর্তের জন্যে ফাদার প্যানালুর চেহারায় একটা উৎকণ্ঠার ছায়া ফুটে উঠল। কয়েক মুহূর্ত তিনি নীরব রইলেন। তারপর তিনি বিষণ্নকণ্ঠে বললেন—ঈশ্বরের করুণার অর্থ যে কী তা এই মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করেছি।

ডাক্তার রিও ততক্ষণে আবার বেঞ্চের পেছনে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন। আবার ক্লান্তিতে-অবসাদে তার সর্বাঙ্গ ছেয়ে আসছিল। সেই ক্লান্তি আর অবসাদের গভীর থেকে যেন ভেসে আসতে লাগল তার আরো কোমল কণ্ঠস্বর :

আপনি যে করুণার কথা ইঙ্গিত করেছেন তা যে কী তা আজো আমার জানার সৌভাগ্য হয়নি। তা আমি জানি। তবে তা নিয়ে এখন আপনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় যোগ না-দেয়াটাই বোধ হয় ভালো। আমরা এমন একটা কিছুর জন্যে এখন পাশাপাশি কাজ করছি যা আমাদের ভেতর একটা যোগসূত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, যা হয়তো ঈশ্বরের নিন্দা বা প্রার্থনার অনেক উর্ধ্বে এবং যা হচ্ছে এমন একটা কিছু যার গুরুত্ব এখন আমাদের কাছে অপরিসীম।

ফাদার প্যানালু এবার ডাক্তার রিও-র পাশে বেডের ওপর বসে পড়লেন। সত্যি সত্যিই তিনি তখন কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

নিশ্চয়, নিশ্চয়—তিনি বলে গেলেন—আপনিও মানুষের আত্মার কল্যাণের জন্যে, মুক্তির জন্যে কাজ করে যাচ্ছেন।

ডাক্তার রিও এবার একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

—দেখুন মানুষের আত্মার মুক্তি-টুক্তি এগুলো হচ্ছে গালভরা কথা। আমার লক্ষ্য অত উঁচুতে নয়। মানুষের দেহকে কীভাবে সুস্থ রাখা যায় তা নিয়েই আমার যত মাথাব্যথা। কারণ দেহকেই আমি মূল্য দিই প্রথম।

ফাদার প্যানালু যেন কিছুটা ইতস্তত করতে থাকলেন।—দেখুন, ডাক্তার... কী একটা বলতে গিয়ে তিনি আবার হঠাৎ যেন থেমে গেলেন। তার গলার স্বর নেমে গেল। তার মুখের চারপাশ দিয়েও দরদর করে ঘাম ঝরছিল।—আচ্ছা এখন তাহলে

আসি। ...অস্ফুটভাবে কথাগুলো বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দুই চোখে পানি ছলছল করছিল। তিনি যখন যাবার জন্যে উদ্যত হয়েছেন এমন সময় ডাক্তার রিও, যাকে মনে হচ্ছিল সম্পূর্ণ চিন্তায় ডুবে গেছেন, হঠাৎ বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং ফাদার প্যানালুর দিকে এক পা এগিয়ে গেলেন।

—দেখুন আবার বলছি, কিছুক্ষণ আগের ব্যবহারের জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত। মাফ করে দেবেন নিশ্চয়। আপনাকে কথা দিচ্ছি এই ধরনের ক্রুদ্ধ আচরণ আর কোনোদিন পাবেন না আমার কাছ থেকে।

ফাদার প্যানালু ডাক্তারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন—যেন কিছুটা অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—সে যাই হোক, আপনার মনে তো আর বিশ্বাস জন্মাতে পারিনি এখনও।

—কিন্তু তার ওপর এত গুরুত্ব দিয়ে লাভ কী? আপনি ভালোভাবেই জানেন যেগুলোকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি তা হচ্ছে মৃত্যু-ব্যাধি! ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, একটা জায়গায় এসে আমাদের বন্ধুভাবে মিলতে হয়েছে—মিলিতভাবে আমরা এখন এসবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছি।

ডাক্তার রিও তখনও ফাদার প্যানালুর হাতখানা ধরেছিলেন। সুতরাং ডাক্তার যেন ফাদার প্যানালুর দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করলেন—বুঝতেই পারছেন, এই অবস্থায় স্বয়ং স্রষ্টারও সাধ্য নেই যে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে।

৪

ডাক্তার রিও সহকর্মীদের সঙ্গে যোগ দেবার পর থেকে ফাদার প্যানালুর বেশির ভাগ সময় কাটত হয় হাসপাতালে হাসপাতালে, নইলে এমন সব স্থানে যেখানে যেখানে তাকে প্লেগের রোগীদের সংস্পর্শে আসতে হত। তিনি তাঁর সহকর্মীদের ভেতর এমন একটা স্থান বেছে নিয়েছিলেন, তাঁর নিজের বিচারে যা ছিল তার দায়িত্ব পালনের জন্যে যথার্থ উপযোগী। অর্থাৎ প্রতিরোধ সংগ্রামের পুরোভাগে তিনি নিজের জন্যে স্থান করে নিয়েছিলেন। আর তারপর থেকে নিয়তই তাকে মৃত্যুর সংস্পর্শে আসতে হত। মাঝে মাঝে প্লেগের বীজাণুনাশক টিকা নেয়ার ফলে তত্ত্বগতভাবে যদিও তার প্লেগ-আক্রান্ত হবার তেমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তবুও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, যে-কোনো মুহূর্তে তাঁকে এই রোগের শিকার হতে হবে এবং মৃত্যু তাঁরও দরজায় এসে হানা দেবে এবং এ নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনাও করতেন। অবশ্য বাইরে থেকে দেখলে বুঝবার উপায় ছিল না যে তার মানসিক প্রশান্তির মাঝে কোথাও ফাটল ধরেছে। কিন্তু যেদিন তিনি একটা শিশুকে এইভাবে তার চোখের সামনে মারা যেতে দেখলেন, তারপর থেকে তাঁর ভেতর যেন একটা পরিবর্তনের সূচনা হল। তখন থেকে তাঁর মনের ভেতর দুর্ভাবনা এবং উদ্বেগ বেড়েছিল। তাঁর চোখেমুখেও তার চিহ্ন এখন পরিস্ফুট হতে থাকল। যেদিন তিনি হাসতে হাসতে ডাক্তার রিও-র কাছে প্রকাশ করলেন যে 'ধর্মযাজকের পক্ষে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা সঙ্গত কি?' এই শিরোনামায় ছোট্ট একটা প্রবন্ধ রচনার কাজে ব্যস্ত, ডাক্তার তখনই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে,

ফাদার প্যানালুর গলার স্বর যত সহজই মনে হোক, অনেক কঠিন কিছুরই ইঙ্গিত রয়ে গেছে তাঁর প্রবন্ধের শিরোনামার ঐ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের আড়ালে। ডাক্তার রিও যখন বললেন, প্রবন্ধটা এক নজর দেখার জন্যে তাঁর খুব ইচ্ছা হচ্ছে, ফাদার প্যানালু উত্তরে জানালেন, খুব শীঘ্রি তিনি আবার পুরুষদের এক সাধারণ ধর্মসভায় বক্তৃতা দেবেন বলে স্থির করেছেন। সেখানে তিনি যে ধর্মোপদেশ দান করবেন তাতে এ-প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁর নিজের সুচিন্তিত অভিমতের কিছু কিছু প্রতিফলন থাকবে।

—দেখুন ডাক্তার, আশা করি আপনিও এই ধর্মসভায় উপস্থিত থাকবেন। কারণ এই প্রশ্নের আলোচনায় আপনিও আনন্দ পাবেন বলে আমার ধারণা।

ফাদার প্যানালু যেদিন তার দ্বিতীয় ধর্মোপদেশ দান করলেন, সেদিন সকাল থেকেই জোরে জোরে বাতাস বইতে শুরু করেছিল। একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে প্রথমবারের তুলনায় এবারের জনসমাবেশ ছিল অনেক অল্প, সেটা হয়তো কতকটা এই কারণে যে এই ধরনের উৎসবের পেছনে-আগে যে একটা অভিনবত্বের আকর্ষণ ছিল এখন তা অনেকটা কমে এসেছিল। বাস্তবিকই, যেরকম প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তখন সবাইকে নিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছিল, তার ফলে 'অভিনব' এই শব্দটার যেন আর কোনোরকম তাৎপর্যই ছিল না কারো কাছে। তার ওপর শহরের বেশিরভাগ অধিবাসীরা তখন সাধারণ ধর্মীয় আচার-আচরণের বদলে উদ্ভট কুসংস্কারের দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়েছিল, অবশ্য যদি এটা বিশ্বাস করা সঙ্গত হয় যে তারা তখনও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ ত্যাগ করেনি অথবা চিন্তার বৈকল্যের দরুন সেই আচার-অনুষ্ঠানকে তখনকার সেই নৈতিকতাশূন্য জীবনধারার সঙ্গে এক করে ফেলেনি। শহরের লোকজন তখন রোগ-নিরাময়ের জন্যে সেন্টরচের মাদুলি ব্যবহার করত হয়তো, কিন্তু কোনো ধর্মসভায় যেতে চাইত না।

যে-কোনো রকমের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শুনলেই তার প্রতি তাদের যে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখা যেত, এটাই ছিল তার একটা দৃষ্টান্ত। অবশ্য এটাও সত্যি যে সেবার বসন্তে সবাই যখন এমনি একটা আশা করছিল যে আকস্মিক যে-কোনো মুহূর্তে দুর্বিপাকের উপশম হবে, তখনও কিন্তু কেউই সত্যিই দুর্বিপাকে আরো কতদিন থাকতে পারে সে-ব্যাপারে অন্যদের ধারণা যে কী তা জানবার কথা চিন্তা করত না, কারণ কেমন করে যেন সবাই ধরে নিয়েছিল যে দুর্বিপাকের অবসান হবেই। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, ততই সবার মনে এরকম একটা আশঙ্কা জাগতে থাকল যে দুর্দিন বোধ হয় অনির্দিষ্টকাল ধরেই চলতে থাকবে। তখন থেকে দ্রুত যাতে প্লেগের উপশম হয় সেটাই সবার কামনার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। ফলে অমুক ক্যাথলিক চার্চের ফাদার বা অমুক ভবিষ্যৎবক্তা বলেছেন—এই দোহাই দিয়ে নানা ধরনের লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী হাতবদল হয়ে হয়ে জনসাধারণের ভেতর প্রচারিত হতে থাকল। কিছুদিনের ভেতর স্থানীয় ছাপাখানার মালিকরা দেখল, জনসাধারণের ভেতর এই-যে নতুন উন্মত্ততা দেখা দিয়েছে তাকে কাজে লাগাতে পারলে সহজেই প্রচুর মুনাফা লোটা সম্ভব। সুতরাং যেসব দৈববাণী এতদিন হাতে-লেখা অবস্থায় প্রচারিত হচ্ছিল সেগুলোকে সংগ্রহ করে নিয়ে তারা প্রচুর সংখ্যায় ছাপতে শুরু করে দিলেন। যখন

দেখা গেল, জনসাধারণের ভেতর এই ধরনের প্রচারপত্র পাঠের আগ্রহ তাতেও নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না, তখন তারা জনসাধারণের মনের খোরাক জোগানোর জন্যে স্থানীয় লাইব্রেরিগুলোতে কোনো প্রাচীন ঘটনাপঞ্জি, স্মৃতিকথা বা অনুরূপ মাল-মশলা পাওয়া যায় কিনা তাই নিয়ে রীতিমতো গবেষণা শুরু করে দিলেন। এইসব উৎসও যখন প্রায় নিঃশেষ হবার উপক্রম হল, তখন এইধরনের ভবিষ্যদ্বাণী লিখে দেবার জন্যে সাংবাদিকদের নিয়োগ করা হল। দেখা গেল, তখনকার সাংবাদিকরা এ-ব্যাপারে তাদের পূর্বসূরীদের সঙ্গে তুলনায় কোনো অংশেই কম পারদর্শী নন।

এইসব ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু কিছু ধারাবাহিকভাবে স্থানীয় সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হত। যখন সুসময় ছিল তখন সংবাদপত্রের এইসব স্তম্ভে প্রেমের গল্প ছাপা হলে সাধারণ মানুষ তা যেমন গোগ্রাসে গিলত, এখন এগুলোকেও ঠিক তেমনি আগ্রহের সঙ্গেই পড়ত। এইসব ভবিষ্যদ্বাণীর বেশ কিছুসংখ্যক দেখা যেত কষ্টকল্পিত গাণিতিক হিসাব-নিকাশের ওপর ভিত্তি করে লেখা। সে বছর মোট কত লোকের মৃত্যু হয়েছে, ক'মাস ধরে এই প্লেগের প্রকোপ চলছে ইত্যাদি সবই থাকত তাদের ভেতর। আবার এমন সব ভবিষ্যদ্বাণীও প্রচলিত ছিল যাতে অতীতে যেসব বড় বড় মহামারীর আবির্ভাব হয়েছিল তাদের সঙ্গে বর্তমান দুর্বিপাকের তুলনা টানতে দেখা যেত। দেখা যেত অতীতের মহামারীর সঙ্গে বর্তমানে প্লেগের কোথায় কোথায় চরিত্রগত সাদৃশ্য আছে, সেগুলো তুলে ধরতে এবং তাদের থেকে এমন সব সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত করতে যেগুলো বর্তমান দুর্বিপাকের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। একটা ব্যাপার নিঃসন্দেহে সত্যি যে এইসব ভবিষ্যৎবক্তাদের ভেতর সবচেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তারাই, যাঁরা স্বর্গীয় কেতাবের অনুরূপ ভাষায়, আগে থাকতেই ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, অমুক অমুক ব্যাপার ঘটতে চলেছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হত এমন এমন ঘটনা সম্পর্কে যাদের যে-কোনো একটাকে দেখিয়ে বলা যেতে পারত যে শহরে যেসব ব্যাপার ঘটছে সেগুলো তো আগে থাকতেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। আবার এইসব ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষাও থাকত এমন জটিল এবং দুর্বোধ্য যে প্রয়োজনবোধে তার যে-কোনোরকম ব্যাখ্যা করা চলত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে তা জানবার জন্যে প্রায় প্রতিদিনই নট্রাডেমাস এবং সেন্ট অভিলিয়ার কাছে যাওয়া হত এবং প্রতিদিনই দেখা যেত তিনি যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সেগুলো প্রায় ঠিক ঠিক ফলেছে। বাস্তবিকই যে একটা জিনিস সব ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যেই দেখা যেত সাধারণত তা হচ্ছে এই যে তারা সবাই বলতেন, ভবিষ্যতে সবকিছুই আশাব্যঞ্জক বলে মনে হচ্ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, প্লেগের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আশা করবার মতো কিছুই ছিল না। এইভাবে এই সময়টায়ই শহরবাসীদের মনে ধর্মের আসন জুড়ে বসেছিল যতসব কুসংস্কার এবং এই কারণেই ফাদার প্যানালু যখন দ্বিতীয়বার ধর্মীয় বাণী শোনাবার আয়োজন করলেন, দেখা গেল, সাধারণ অবস্থায় গির্জায় যে জনসমাবেশ হয় তার তিনভাগের একভাগ মাত্র লোক উপস্থিত হয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যায় ডাক্তার রিও যখন গির্জায় এসে ঢুকলেন, দেখলেন, সামনের খোলা দরজা দিয়ে প্রবল বাতাসের ঝাপটা এসে ঢুকছে ভেতরে। এক এক ধমকে ভেতরে

দুপাশের আসনের শূন্যস্থানগুলো বাতাসে ভরে উঠেছে। গির্জার ভেতর চারিদিক ঠাণ্ডা নিঃশব্দ, শুধুমাত্র পুরুষদের সমাবেশ সেখানে। এইরকম একটা পরিবেশের ভেতর ফাদার প্যানালু ধীরে ধীরে প্রচারবেদির ওপর উঠে দাঁড়ালেন। আগেরবারের তুলনায় অনেক শান্তগলায় অনেক ভেবেচিন্তে তিনি কথা বলতে শুরু করলেন। কয়েকবারই মনে হল তার বক্তব্য আটকে যাচ্ছে। সবচেয়ে লক্ষ্য করবার মতো আরো যে একটা পরিবর্তন দেখা গেল তা হচ্ছে আগেরবারের মতো 'আপনারা' না বলে 'আমরা' বলে সম্বোধন শুরু করলেন তিনি।

যা হোক, বক্তৃতা যতই অগ্রসর হতে থাকল ততই তার গলার স্বর দৃঢ় হয়ে উঠল। ধর্ম-উপদেশের গোড়াতেই ফাদার প্যানালু শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকমাস কেটে গেছে, শহরে প্লেগ শুরু হয়েছে। টেবিলে টেবিলে বসে এবং প্রিয়জনদের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে প্লেগের চেহারা ঘন ঘন দেখার পর এখন আমরা তাকে আরো ভালোভাবে চিনেছি। সঙ্গীর মতো আমাদের পাশে পাশে চলাফেরা করতে দেখেছি তাকে, তাকে দেখেছি আমাদের কর্মস্থানে আমাদেরই আগমন অপেক্ষা করে বসে থাকতে। সুতরাং, সে অনুক্ষণ যা আমাদের বলতে চেয়েছে, তা জানবার অধিকতর সুযোগ এখন আমাদের হয়েছে। তার আক্রমণের প্রথম বিস্ময়ের ঘোরে তার সেই বাণীর প্রতি আমরা হয়তো ততটা সজাগ ছিলাম না।

ফাদার প্যানালু বলে চললেন, তার আগের ধর্ম-উপদেশে যেসব কথা তিনি বলেছিলেন এখনো সেগুলো সমানভাবে সত্যি—অন্তত তার নিজের বিশ্বাস তাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও যা সবার ক্ষেত্রেই ঘটা স্বাভাবিক—কথাগুলো বলার সময় ফাদার প্যানালু নিজের বুকে সজোরে একটা চাপড় মারলেন—আমার তখনকার সেই চিন্তার ভেতর, বক্তব্যের ভেতর সম্ভবত কোথায় যেন, ক্ষমা বা দাক্ষিণ্যগুণের অভাব ছিল। সে যাই হোক, একটা ব্যাপার এখানে স্বীকার না করে উপায় নেই এবং সেটা সবসময় সব অবস্থাতেই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। বাহ্যত যাই মনে হোক, সব পরীক্ষারই—তা সে যত নির্মমই হোক, মিলিত লক্ষ্য হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান ধর্মে যারা বিশ্বাসী তাদের হিতসাধন করা এবং বাস্তবিকই, যে-কোনো পরীক্ষার সামনে প্রত্যেক ক্রিশ্চিয়ান বিশ্বাসীর নিয়ত কর্তব্য হচ্ছে, এই মঙ্গলটা অনুধাবন করবার চেষ্টা করা, অনুধাবন করবার চেষ্টা করা মঙ্গলটা আসলে কী এবং কীভাবেই বা আমরা তার ফল লাভ করতে পারি।

ডাক্তার রিও লক্ষ্য করলেন এই সময় তাঁর চারপাশের সবাই যেন নিজের নিজের আসনের ঘেরার হাত রাখবার জায়গার ওপর ভর দিয়ে আরো আরাম করে বসলেন। গির্জার সামনের বড় বড় দরজাগুলোর একটা বাতাসে বারে বারে ধাক্কা খাচ্ছিল আর কেমন একটা ধপাস ধপাস শব্দ করছিল। কে একজন উঠে গিয়ে দরজা আটকে দিয়ে এল। কিছুক্ষণের জন্যে তার মনোযোগ সেদিকে যাওয়ায় এই সময় ফাদার প্যানালু যে কী বললেন, তা ডাক্তার রিও সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারলেন না। মোটামুটিভাবে তাঁর বক্তব্য মনে হল এই প্লেগের উদ্ভবের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি লক্ষ্য দিতে হবে প্লেগের কাছ থেকে আমাদের কী

শিক্ষা নেবার আছে তার ওপর। ডাক্তার অনুমানের ওপর যতটা ধরতে পারলেন তা হচ্ছে এই যে, ফাদার প্যানালুর ধারণা কারণ-অনুসন্ধানের তেমন প্রয়োজন নেই।

ডাক্তার রিও-র আগ্রহ আবার পুরোপুরি জেগে উঠল যখন ফাদার প্যানালু আরো বলিষ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, বিশ্বনিয়ন্তার বিধানের ভেতর অনেক কিছুই যেমন আমরা সহজে অনুধাবন করতে পারি, তেমনি সেইসঙ্গে আবার এমনকিছু ব্যাপার রয়ে গেছে যেগুলো আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সত্য এবং অসত্যের অস্তিত্ব যে পৃথিবীতে আছে সে-বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তাদের ভেতর তফাতটা যে কোথায় তাও সহজেই অনুধাবন করা যায়। বিপদ বাধে শুধু তখনই যখন আমরা অশুভের চরিত্র বা প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করতে যাই। ফাদার প্যানালুর মতে মানুষকে পৃথিবীতে যে দুঃখ-বেদনা সইতে হয় তাও এই অশুভের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং দেখা যায়, একদিকে যেমন এমন দুঃখ-বেদনা রয়েছে বাহ্যত যার সঙ্গত কারণ আছে, ঠিক তেমনি আবার এমন দুঃখ-বেদনা রয়েছে বাহ্যত যা সম্পূর্ণ অহেতুক। ডন জুয়ানকে নরকে নিক্ষেপের মতো ঘটনা যেমন আছে, তেমনি আছে নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যু। যে মানুষ একান্তভাবে ইন্দ্রিয়ের দাস, ন্যায়সঙ্গতভাবেই তার ওপর শাস্তির বিধান নেমে আসা উচিত, কিন্তু একটা নিষ্পাপ শিশুর দীর্ঘ সময় ধরে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগের সঙ্গত কারণ তো আমরা খুঁজে পাইনে। সত্যি কথা বলতে কী, নিষ্পাপ শিশুর এই-যে যন্ত্রণাভোগ—তা দেখে আমাদের মনের ভেতর যে ঘৃণা বা ভয়ের উদ্রেক হয় এবং তারপরে এই যন্ত্রণাভোগের পেছনে সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়ার জন্যে আমাদের যে অন্বেষা, এগুলোর চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেবার মতো বিষয় বোধ হয় পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। জীবনের অন্য যেসব প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি, সেখানে সবকিছুই সহজ, সঙ্গত, সুতরাং সেই অনুপাতে সেসব ক্ষেত্রে ধর্মের গুরুত্ব তেমন কিছু নেই। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিশ্ববিধাতা আমাদের এমন একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে ফেলেছেন যেখানে মনে হয় পরাজয় এড়াবার কোনো পথ নেই আমাদের সামনে, যেখানে আমরা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। বাস্তবিকই, প্লেগ আমাদের চারপাশে যে দেয়াল গড়ে তুলেছে, আমাদের এখনকার যা-কিছু সংগ্রাম তা শুধু তারই বিরুদ্ধে, সেই দেয়ালের মৃত্যু সমতুল্য ছায়ার অন্তরালে দাঁড়িয়েই এখন আমাদের মুক্তির পথ বার করতে হবে।

ফাদার প্যানালু বলে চললেন—সহজ কোনো উপায়ে যে আমাদের পক্ষে এই বাধার প্রাচীর অতিক্রম করা সম্ভব হবে, তা তিনি মানতে সম্মত নন। তিনি হয়তো সহজেই এই বলে আশ্বাস দিতে পারতেন যে নিষ্পাপ শিশুর এই অহেতুক মৃত্যুর পুরস্কারস্বরূপ পরকালে তার জন্যে চিরশান্তির জীবন অপেক্ষা করে রয়েছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, পরকালে কী ঘটবে না ঘটবে সে-সম্পর্কে তিনি নিজেই যখন কিছুই জানেন না, তখন সে-ব্যাপারে আর সবাইকে তিনি আশ্বস্ত করবেন কিসের ভরসায়? কারণ কার এমন সাধ্যি আছে যে জোরগলায় বলবে, একমুহূর্তে মানুষকে যে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, পরকালের এই চিরশান্তির জীবন তার সত্যিকারের পুরস্কার—তার যথেষ্ট পুরস্কার? যিনি জোরগলায় তা ঘোষণা করতে এগিয়ে আসবেন, তিনি সত্যিকারের ক্রিশ্চিয়ান বিশ্বাসী নন; তিনি ত্রাণকর্তা, যিশুর সত্যিকারের অনুসারী

নন, যে শিশু পৃথিবীতে মানুষকে যতকিছু দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তার সবই দৈহিকভাবে নিজের আত্মার মাঝে ভোগ করে গেছেন। ক্রুশে বিদ্ধ যিশুর যন্ত্রণাকাতর যে চেহারা যা পৃথিবীর সবকিছু দুঃখ-যন্ত্রণার মূর্ত প্রতীক—ফাদার প্যানালু বলে চললেন, কিছুতেই তার ওপর তিনি বিশ্বাস হারাতে চান না। কিন্তু তার ফলে যে বিপর্যস্ত অবস্থার ভেতর তিনি নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে আপাতত তার সামনে আর-কোনো পথই উন্মুক্ত নেই, সেই অবস্থার মধ্য থেকেই তিনি সততার সঙ্গে শিশুর মৃত্যুযন্ত্রণার মতো এই ভয়ংকর সমস্যার মোকাবেলা করতে চান। যারা তার উপদেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনবেন, তাদের তিনি সাহসের সঙ্গে এই কথাই বলবেন—ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সামনে এক কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় হয় আমাদের সবকিছুই নির্বিচারে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে হবে আর নইলে সবকিছুই ত্যাগ করতে হবে। এখন আমি জিজ্ঞাসা করব, আপনাদের ভেতর এমন কে আছেন যিনি এই সবকিছুই ত্যাগ করতে প্রস্তুত?

আকস্মিক একসময় ডাক্তার রিও মনে হল যে ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে কিছু বলবেন বলেই বোধহয় ফাদার প্যানালু এইসব বিষয়ের অবতারণা করেছেন। কিন্তু এসব যুক্তিতর্ক সঠিকভাবে অনুসরণ করবার মতো অবসর তখন ডাক্তার রিওর ছিল না। ডাক্তার শুধু শুনলেন, ফাদার প্যানালু প্রবল আবেগের সঙ্গে ঘোষণা করছেন—আপোসহীন এই-যে কর্তব্য ক্রিশ্চিয়ান বিশ্বাসীদের জন্যে নির্দেশ করে দেয়া হয়েছে তা একদিকে যেমন এমন একটা সহায়ক যা অনুক্ষণ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তেমনি তা আবার একধরনের সুবিধাও বটে। কিন্তু তিনি আবার এ-সম্পর্কেও সচেতন যে, যারা উদার এবং অধিকতর প্রশ্রয় দানের পক্ষপাতী তথাকথিত নৈতিকতা অনুসারে চিন্তাভাবনায় অভ্যস্ত, তাদের অনেকেই তিনি যে উচ্চমানের ক্রিশ্চিয়ান গুণাবলির কথা বলতে যাচ্ছেন, তার কথা শুনলে ভয়ে শিউরে উঠবেন, তাদের মন বিষিয়ে উঠবে সে-কথা নাইবা বললেন। কিন্তু যে ধর্মবিশ্বাস দিয়ে আমাদের সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটে সেই একই ধর্মবিশ্বাস প্লেগের মতো এইরকম কঠিন দুর্বিপাকের সময়ের উপযোগী নাও হতে পারে। এটাই হয়তো স্রষ্টার বিধান এবং ইচ্ছা যে সুসময়ে যেমন মানুষের আত্মা শান্তিতে থাকবে, আনন্দ উপভোগ করবে; কঠিন দুর্যোগের দিনে তাকে তেমনি দুঃখ-বেদনা ভোগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বিশ্বনিয়ন্তা তার সৃষ্টির জন্য এই অগ্নিপরীক্ষার বিধান করেছেন এই কারণে যে তার ফলে মানুষ শ্রেষ্ঠতম গুণাবলির অধিকারী হবার এবং তার আচরণ করবার সুযোগ লাভ করবে। যার অর্থ হচ্ছে, মানুষকে হয় সবকিছু গ্রহণ করতে হবে নইলে সবকিছুই ত্যাগ করতে হবে।

বহু শতাব্দী পূর্বে ক্রিশ্চিয়ান ধর্মে বিশ্বাসী নয় এমন একজন লেখক, মৃত্যুর পরপারে যেখানে যন্ত্রণাভোগের পর মানুষের আত্মা কলুষমুক্ত হতে পারে এমন কোনো নরক বা অবস্থার অস্তিত্ব নেই, একথা ঘোষণা করে দিয়ে দাবি করেছিলেন যে, তিনি ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ফেলেছেন। এর দ্বারা তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে এই যে, বিশ্বব্যবস্থার মাঝামাঝি কোনো অবস্থার স্থান থাকতে পারে না; স্বর্গ এবং নরক—এ দুটোর মধ্যে শুধুমাত্র একটার অস্তিত্বই সম্ভব, বিশ্বসৃষ্টির

জন্যে একটাই মাত্র বিধান সম্ভব, আমাদের নিয়তি হচ্ছে হয় শাশ্বত মুক্তির অধিকারী হওয়া, নইলে অনন্তকাল ধরে যন্ত্রণা ভোগ করে যাওয়া। ফাদার প্যানালু এবার মন্তব্য করলেন—যার আত্মা সম্পূর্ণ অন্ধ, বিপর্যয়গ্রস্ত; শুধুমাত্র তারই অন্তরে এইধরনের ধর্মবিরোধী চিন্তা স্থান পেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বলব মানুষের ইতিহাসে এমন একটা সময় হয়তো এসেছিল, যখন সেখানে আত্মার পাপ ক্ষালন হতে পারে এমন কিছুর কল্পনা যা প্রত্যাশা করা অসম্ভব মনে হত। এমন একসময় এসেছিল যখন যে পাপের মার্জনা হতে পারে এমন পাপের কথা চিন্তা করা সম্ভব ছিল না। তখন প্রত্যেকটা পাপের কাজকেই মারাত্মক বলে বিবেচনা করা হত যখন ধর্মের প্রতি সামান্য উপেক্ষা প্রদর্শন করাটা ছিল মস্ত অপরাধ। তখন সবটাই গ্রহণ অথবা সবটাই বর্জন করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না।

ফাদার প্যানালু এবার কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন। বাইরে থেকে ঝড়ের ফোঁসফোঁসানির শব্দ ভেসে আসছিল। বন্ধ দরজার নিচে দিয়ে বাতাসের যে ঝাপটা এসে ঢুকছিল তা থেকে ডাক্তার রিও অনুমান করলেন, বাইরে রীতিমতো ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। তারপর আবার ফাদার প্যানালুর বক্তা শুরু হল। তিনি বলে চললেন—সাধারণ সীমিত অর্থে পরিপূর্ণ গ্রহণ বলতে যা বোঝায় সেই অর্থে তিনি কথাগুলোকে ব্যবহার করছেন না, এমনকি স্রষ্টার ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ বা আরো কঠিন যে গুণ বিনয় বা আত্ম-অবমাননার কথাও তিনি চিন্তা করছেন না। এখানেও অবশ্য আত্ম-অবমাননার প্রশ্ন জড়িত, কিন্তু এ আত্ম-অবমাননার ভেতর কোনোরকম বাধ্যবাধকতা নেই। এ আত্ম-অবমাননা স্বেচ্ছাকৃত, ব্যক্তি-আত্মার সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে। একথা অবশ্যই সত্যি যে নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যুযন্ত্রণাকে সহজভাবে গ্রহণ করার মধ্যেও একধরনের আত্ম-অবমাননা আছে, যে আত্ম-অবমাননা অন্তরের অনুভূতির কাছে, নিজের বুদ্ধি বা চিন্তার কাছে। কিন্তু যেহেতু এই আত্ম-অবমাননা নিজের অনুভূতির বা নিজের বুদ্ধির কাছে, কাজেই তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা প্রয়োজন। এই কারণেই ফাদার প্যানালু উপস্থিত শ্রোতাদের আশ্বস্ত করলেন, তিনি যে-কথাটা বলতে চান তা বলাটা খুব সহজ নয় যে—যেহেতু এটাই স্রষ্টার ইচ্ছা, এটা আমাদেরও ইচ্ছা হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি ক্রিশ্চিয়ান ধর্মে বিশ্বাসী—সততার সঙ্গে এই সমস্যার মোকাবেলা করবার তার সামনে এই একমাত্র পথ। সবরকমের ছলনা এবং প্রতারণাকে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে প্রধান যে সমস্যা অপরিহার্য যে নির্বাচন, তারই মর্মভেদ করতে হবে তাকে এবং নিশ্চয় তার নির্বাচন হবে সবকিছুকে গ্রহণ করা, যাতে করে সবকিছুকে বর্জন করতে বাধ্য হতে না হয় তাকে। দেহের ভেতর থেকে রোগের সংক্রমণকে বার করে দেবার জন্যে গ্রন্থিক্ষীতিই হচ্ছে স্বাভাবিক পথ, একথা জানবার পর বাইবেলে বর্ণিত সেই যোগ্য রমণীবৃন্দ যেমন চার্চে গিয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—ভগবান তুমি তার প্রতি করুণা করো, তার দেহে গ্রন্থিক্ষীতি দাও—তেমনি প্রত্যেক ক্রিশ্চিয়ান বিশ্বাসীকে সব ব্যাপারেই বিশ্ববিধাতার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে, এমনকি যদি তা তার বুদ্ধির অগম্যও হয়। এটা বুঝি, কিন্তু ওটা গ্রহণ করতে পারি না—এই ধরনের উক্তি করাটা সম্পূর্ণ অন্যায়। বিষয়টা

আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। ক্রিশ্চিয়ান-বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের কর্তব্য হবে তার মর্মভেদের চেষ্টা করা—কারণ এইভাবেই তো আমরা চূড়ান্ত নির্বাচন করতে বাধ্য হব। শিশুর মৃত্যুযন্ত্রণা আমাদের কাছে ক্লেশজনিত পুষ্টিস্বরূপ, এই পুষ্টি না-পেলে আমাদের আত্মার পরমার্থিক ক্ষুধার মৃত্যু হবে।

প্রতিবারেই ফাদার প্যানালু বক্তৃতার মাঝে সাময়িক বিরতি দেবার সময় শ্রোতাদের ভেতর যেমন নড়াচড়ার শব্দ শোনা যায়, এবারেও তা শুরু হবার মুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে আবার তার কণ্ঠস্বর বেজে উঠল। তারপর নিজেকে শ্রোতাদের আসনে কল্পনা করেই যেন তিনি প্রশ্ন তুললেন—এই অবস্থায় সঠিক কর্তব্য কী হতে পারে? তিনি বললেন, তার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই যে এখন উত্তরে তিনি যাই বলুন-না কেন, তার প্রতি 'অদৃষ্টবাদ' এই ঘৃণ্য শব্দটা প্রয়োগ করা হবে। তবে কি শব্দের প্রয়োগ দেখে তার আঁতকে উঠবার মতো কিছুই থাকত না, শুধু যদি এই শব্দের আগে 'ক্রিয়' এই বিশেষণটা সংযুক্ত করা হত। বলা বাহুল্য, আবিসিনিয়ার যে ক্রিশ্চিয়ান অধিবাসীদের প্রসঙ্গে তিনি আগেই উল্লেখ করেছেন, এক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার প্রশ্ন অবান্তর। আবার পারস্যের অধিবাসীরা যারা প্লেগের সময় যেসব ক্রিশ্চিয়ান-বিশ্বাসী সমাজকর্মী তাদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিধিবিধান শিক্ষা দেবার জন্যে সেখানে গিয়েছিল, নিজেদের দেহের রোগজীবাণু-সংক্রমিত কাপড়চোপড় তাদের দিকে ছুড়ে দিয়ে যেমন বলত—ভগবানের পাঠানো এই দুর্বিপাককে যারা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে, ভগবান করুন সেই অবিশ্বাসীদের মধ্যে যেন প্লেগের আক্রমণ শুরু হয়—তাদের অনুরূপ কোনো আচরণের কথা চিন্তা করাও সম্ভব নয়। অন্যদিকে আবার কায়রোর মঠের অধিবাসীরা যেরকম শহরে প্লেগের প্রকোপ শুরু হবার পর, সিক্ত উষ্ণ মুখে রোগের বীজাণু লুকিয়ে থাকতে পারে, এই আশঙ্কায় যিশুর ভোজ-উৎসবের দিনে লম্বা লম্বা চিমটের সাহায্যে সেই ভোজের খাবার বিতরণ করত, তার অনুকরণ করতে যাওয়াটাও মারাত্মক ভুল হবে। প্লেগ-উপদ্রুত পারস্যের অধিবাসীরা এবং কায়রোর এই মঠের অধিবাসীরা এরা সবাই ছিলেন একই দোষে দোষী। পারস্যের অধিবাসীদের কাছে শিশুর মৃত্যুযন্ত্রণাটা যেমন কোনো সমস্যা হিসাবে গণ্য হত না, বিপরীতভাবে আবার দৈহিক যন্ত্রণাভোগের যে স্বাভাবিক ভীতি সেটা কায়রোর মঠের অধিবাসীদের আচরণের ভেতর অতিরিক্ত প্রাধান্য পেয়েছিল। এই উভয় ক্ষেত্রেই মূল সমস্যাটাকেই এড়িয়ে যাওয়া হয় : স্রষ্টার বাণীর প্রতি তারা কেউই কর্ণপাত করবার চেষ্টা করেননি।

কিন্তু এগুলো ছাড়াও আরো দৃষ্টান্ত আছে, যেগুলোকে এখন তিনি—ফাদার প্যানালু বলে চললেন—তাঁর শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান। মার্সাই শহরের কৃষ্ণমৃত্যুর ঘটনাপঞ্জি যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে সেই সময়কার মার্সি মঠের মোট একশিজন অধিবাসীর ভেতর যে চারজন এই দুর্বিপাকের পরে বেঁচেছিলেন তাদের ভেতর তিনজনই মহামারীর সময় মঠ ছেড়ে পালিয়েছিলেন। মার্সাইয়ের কৃষ্ণমৃত্যু সম্পর্কে এইটুক হচ্ছে ঘটনাপঞ্জির লেখকের দেয়া বিবরণ; নিছক যা ঘটেছিল, তার অধিক কিছু বলা তার কর্তব্য নয়ও। কিন্তু তিনি, ফাদার প্যানালু যখন এই ঘটনাপঞ্জি

পাঠ করেন, তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় মঠের একক সেই অধিবাসীটার আচরণের প্রতি তিনি তার সাতাত্তরজন সঙ্গীর মৃত্যু এবং বিশেষ করে তার তিনজন সহকর্মীর পলায়নের এই দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও একাই সেই মঠে রয়ে গিয়েছিলেন। এবার ফাদার প্যানালু প্রবল আবেগের সঙ্গে পাদপীঠের ওপর মুষ্ঠাঘাত করে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন : ভ্রাতৃবৃন্দ! এই-যে একজন মঠবাসী, এই অবস্থার ভেতরেও মঠে রয়ে গিয়েছিলেন, এখন আমাদের প্রত্যেককেই তার অনুগামী হবার চেষ্টা করতে হবে।

রোগ-সংক্রমণের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করবার জন্যে কোনোরকম সাবধানতা না-নেয়ার বা দুর্বিপাকের এই বিশৃঙ্খল সময়ের মাঝে সাধারণ কল্যাণের জন্যে বিচক্ষণতার সঙ্গে যেসব সরকারি নির্দেশ জারি করা হয়, সেগুলো না-মেনে চলার প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তেমনি আবার যেসব নীতিবাগীশ এই দুর্বিপাককে অনিবার্য হিসাবে মেনে নিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম ত্যাগ করবার জন্যে পরামর্শ দেন তাদের কথাও গুরুত্ব দেবার মতো নয়। না, বরং আমাদেরকে সবসময় সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে পথ হাতড়ে হাতড়ে, হয়তো বারে বারে হোঁচট খেতে খেতেই এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। নিজেদের সাধ্য যতটুকু কুলায়, কল্যাণসাধনের চেষ্টা করে যেতে হবে। আর বাকি যা-কিছু তা হচ্ছে, আমাদের কোনো সময় বিশ্বাস হারালে চলবে না, বিধাতার মহৎ উদ্দেশ্যের ওপর অনুক্ষণ আস্থা রাখতে হবে, এমনকি শিশুর মৃত্যুযন্ত্রণার প্রশ্ন যেখানে জড়িত সেক্ষেত্রেও। আর ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবলে চলবে না।

এবার ফাদার প্যানালু মার্সাই প্লেগের সময়কার সর্বজনমান্য বিশপ বেলজুন্সের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তিনি তাঁর শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, সাধ্যমতো সবকিছু করার পর দুর্বিপাকের শেষের দিকে গিয়ে এই বিশপ প্রাসাদের প্রাচীরের অন্তরালে আত্মগোপন করেছিলেন। আগে থেকেই তিনি নিজের প্রয়োজনের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য এবং পানীয় সেখানে সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। এইধরনের কঠিন পরীক্ষার মুহূর্তে যেমন ঘটে থাকে, এতদিন যারা তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে এসেছে সেই মার্সাই শহরের অধিবাসীদের মন এখন আক্রমিক তার প্রতি কঠিন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। তার বিরুদ্ধে খেপে উঠল তারা। যাতে তার এই আশ্রয়েও রোগ সংক্রামিত হয় তার জন্যে প্লেগে মৃতব্যক্তিদের শব ছড়িয়ে রাখা হল তার প্রাসাদের দেয়ালের চারপাশে। এমনকি যাতে তিনি কিছুতেই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে না পারেন সেটা নিশ্চিত করবার জন্যে দেয়াল টপকিয়ে তার প্রাসাদের ভেতরেও এই মৃতদেহ ছুড়ে ছুড়ে ফেলা হল। বিশেষ একটা দুর্বল মুহূর্তে তিনি নিজেকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চেয়েছিলেন, নিজের জীবনকে প্লেগের সংক্রমণ থেকে নিরাপদ করতে চেয়েছিলেন। আর তার ফল দাঁড়াল কী : প্রতিমুহূর্তে প্লেগে মৃতব্যক্তিদের শব এসে পড়তে থাকল তার প্রাসাদের ভেতর তার মাথার ওপর। এখন এই দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে : আমাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে যেখানে প্লেগ শুরু হয়েছে সেখানে গেলে প্লেগের মৃত্যুর ছোঁয়াচ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এমন কোনো স্থান নেই। না, এক্ষেত্রে কোনো মধ্যপথ নেই। এই উভয় সংকট

আমাদের মেনে নিতেই হবে : হয় স্রষ্টাকে ঘৃণা করতে হবে নইলে তাকে ভালোবাসতে হবে। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তাকে সত্যিই ঘৃণা করবার মতো সাহস আমাদের কারো আছে কি?

ভ্রাতৃবৃন্দ! ফাদার প্যানালুর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল এবার বোধহয় তিনি উপসংহার টানতে যাচ্ছেন—বিধাতার ভালোবাসা অত্যন্ত কঠিন এবং এর জন্যে চাই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, ব্যক্তিসত্তার প্রতি কঠিন অবজ্ঞা। আর একমাত্র স্রষ্টার প্রতি এই ভালোবাসাই দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে আমাদের জীবনের সমন্বয় বিধান করতে পারে, সমন্বয় বিধান করতে পারে নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যুযন্ত্রণার সঙ্গে—আমাদের জীবনের এগুলোকে আমাদের চোখে সঙ্গত করে তুলতে পারে। যেহেতু এগুলোকে আমরা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারি না, আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছাকে আমাদের নিজেদের ইচ্ছা হিসাবে গ্রহণ করা। আজকের এই বিশেষ দিনে শুধুমাত্র এই একটা শিক্ষাই আমি আপনাদের সঙ্গে সমভাবে ভাগ করে নিতে চাই। মানুষের দৃষ্টিতে যা নির্মম অথচ বিধাতার বিচারে যা চূড়ান্ত, প্রামাণিক—এই-যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাস অর্জনের জন্যেই আমাদের অনুক্ষণ প্রয়াস করে যেতে হবে। আমাদের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হতে হবে নিজেদের এই সীমাবদ্ধ অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠা, সুমহান এবং ভয়ংকর এক দিব্যজগতে পৌঁছানো। মানবিক সত্তাকে ছাড়িয়ে এই-যে সুউচ্চ অবস্থান, একমাত্র সেখানে পৌঁছাতে পারলেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হব, বিশ্ববিধানের সবকিছুর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছে, বিশৃঙ্খলার অবসান হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এখন যেখানে দেখছি অন্যায় এবং অসত্যের তমসা, তখন দেখব সেখান থেকেই সত্যের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হয়তো এই কারণেই দক্ষিণ ফ্রান্সে এমন অনেক গির্জা দেখা যায়, যেখানে গির্জার পূর্ব-অংশে যাজকদের জন্যে নির্দিষ্ট কক্ষের নিচে প্লেগে মৃত বহু ব্যক্তিকে শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে কবর দিয়ে রাখা হয়েছে। এখন সেখানে এই কবরের ওপর দাঁড়িয়ে যাজকরা ধর্ম-উপদেশ দান করেন। যাজকরা সেখানে যে ঐশীবাণী শোনান তাও উত্থিত হয় এই কক্ষ থেকেই। এই কক্ষে যাদের কবর দেওয়া হয়েছে তাদের ভেতর শিশুরাও আছে।

ডাক্তার রিও বাইরে যাবেন বলে সবে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এমন সময় গির্জার আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে বাতাসের প্রবল একটা ঝাপটা এসে ঢুকল ভেতরে। অন্য যারা বার হয়ে যাবার জন্যে ইতিমধ্যেই সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাদের সবার চোখেমুখেও এসে লাগল বাতাসের সেই ঝাপটা। সাথে সাথে বৃষ্টির গন্ধ ভেসে এল, ঝাঁঝালো গন্ধ ভেসে এল বৃষ্টির পানিতে ভেজা পাশের ছোট ছোট গলিপথের। সেই মুহূর্তে বাইরে গিয়ে তারা কী ধরনের আবহাওয়ার ভেতর পড়বেন এ যেন ছিল তারই সংকেত। ডাক্তার রিও-র ঠিক সামনেই এগুচ্ছিলেন একজন বৃদ্ধ যাজক এবং একজন তরুণ ডিকেন। বাতাসের ঝাপটায় বারে বারে মাথার টুপি উড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছিল বলে তাদের লক্ষ্য ছিল টুপি সামলানোর দিকে। কিন্তু এর মধ্যেও বৃদ্ধ যাজকটা ফাদার প্যানালুর ধর্ম-উপদেশের কথা তুললেন। প্রচারকের বাগ্মিতার প্রশংসা করলেন তিনি, কিন্তু চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে সেদিন ফাদার প্যানালুর যে সাহসিকতা প্রকাশ পেয়েছিল সে-কথা ভাবতেই তাকে থামতে হল। তার ধারণা ফাদার প্যানালুর সেদিনের বক্তৃতার

ভেতর বিশ্বাসের দৃঢ়তার চেয়ে দ্বিধার ভাবই প্রকাশ পেয়েছিল বেশি। ফাদার প্যানালুর মতো বয়সের কোনো ধর্মযাজকের পক্ষে এতখানি দ্বিধান্বিত ভাব দেখানো সঙ্গত না। সঙ্গী তরুণ ডিকনটা ঝড়ের ঝাপটা থেকে মুখ আড়াল করবার জন্যে মাথা নিচু করে হাঁটছিলেন। তিনি উত্তরে বললেন, ফাদার প্যানালুকে তিনি বেশ কিছুদিন থেকে দেখে আসছেন। তার চিন্তার বিকাশকেও তিনি বরাবর লক্ষ করে আসছেন। তাঁর ধারণা এরপরে ফাদার প্যানালু যে পুস্তিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছেন, তাতে তিনি আরো সাহসিকতার পরিচয় দেবেন। প্রকৃতপক্ষে, এমন অবস্থাও দাঁড়াতে পারে যে তিনি হঠাৎ এই পুস্তিকা প্রকাশের অনুমতিই পাবেন না।

—সত্যিই নাকি? কী বলতে চেয়েছেন তিনি তাতে?

—তারা ইতিমধ্যে ক্যাথাড্রল স্কোয়ারে এসে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ঝড়ের গর্জনের জন্যে তরুণ ডিকন কয়েক মিনিট কথা বলতে পারলেন না। ঝড়ের বেগ একটু শান্ত হলে তিনি সঙ্গীকে সংক্ষেপে জানালেন : কোনো ধর্মযাজকের পক্ষে ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করাটা যুক্তিসঙ্গত নয়, এটাই ফাদার প্যানালুর বক্তব্য।

ডাক্তার রিও যখন ফাদার প্যানালুর এই ধর্ম-উপদেশের কথা তারিউর কাছে গল্প করলেন, তারিউ মন্তব্য করলেন, তিনি এমন একজন ধর্মযাজককে চিনতেন যিনি যুদ্ধের সময় যার দুইচোখ নষ্ট হয়ে গেছে এমনি এক যুবকের মুখের চেহারা দেখে নিজের ধর্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। প্যানালু ঠিকই বলেছেন—তারিউ বললেন—একজন ক্রিশ্চিয়ান-বিশ্বাসী যখন একজন নিরপরাধ যুবক এইভাবে চোখ হারাতে দেখেন, তখন তার সামনে দুটো পথ খোলা থাকে— হয় নিজের বিশ্বাস হারানো আর নইলে নিজের চোখদুটোকেও নষ্ট হতে দেয়া।—ফাদার প্যানালু তার ধর্মবিশ্বাস হারাতে রাজি নন, সুতরাং যা-কিছু দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয় তার জন্যে তিনি প্রস্তুত। এই কথার ওপরই তিনি তার ধর্ম-উপদেশে জোর দিতে চেয়েছেন।

এবং এরপরেই শহরে কিছু কিছু দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। সেই সময় ফাদার প্যানালুর কোনো-কোনো আচরণ তার বন্ধুবান্ধবদের কাছেও কিছুটা দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। তবে তারিউ-র উপরোক্ত মন্তব্য হয়তো ফাদার প্যানালুর তখনকার সেই আচরণের ওপর কিছু আলোকপাত করতে পারে। সেটা অবশ্য পাঠককে নিজেকেই বিচার করতে হবে।

এই ধর্ম-উপদেশের অল্প কিছুদিন পরেই ফাদার প্যানালুকে গির্জায় তার থাকার ঘর ছেড়ে দিতে হয়। প্লেগের জন্যে তখন এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে অনেকেই নিজের বাসস্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তার হোটেল সরকারিভাবে দখল নেয়ার পর তারিউকে যেমন ডাক্তার রিও-র এখানে গিয়ে উঠতে হয়েছিল, তেমনি ফাদার প্যানালুকেও গির্জায় তার নিজের থাকার জায়গা ছেড়ে দিয়ে এক বর্ষীয়সী ধার্মিক মহিলার বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। এই মহিলা কোনোপ্রকারে তখনও বিপর্যস্ত প্লেগের ছোঁয়াচ এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। গৃহচ্যুত এইভাবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে যাবার সময় ফাদার প্যানালু যেন ক্রমেই বেশি দুর্বল বোধ করতে থাকলেন, দৈহিকভাবেও বটে আবার মানসিকভাবেও। এবং এর

জন্যে এই ভদ্রমহিলাও কেন যেন ফাদার প্যানালুর ওপর কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন। একদিন এই মহিলা সন্ধ্যায় যখন খুব উৎসাহের সঙ্গে সেন্ট ওডালিয়ার ভবিষ্যৎবাণীর গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করছিলেন, সেই সময় ফাদার প্যানালু যেন কিছুটা অধৈর্যের ভাব দেখালেন, তবে সেটা অবশ্য দৈহিক ক্লান্তির জন্যেও হতে পারে। পরের মুহূর্তেই আবার এই নিষ্ঠাবতী মহিলার মনোভাব বদলাবার জন্যে, অন্তত তার মনের মধ্যে যাতে একটা সদয় ভাবের উদয় হয় এমন একটা নিরপেক্ষ মনোভাব সৃষ্টির জন্যে শত চেষ্টা করেও ফাদার প্যানালু শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হলেন। তিনি হঠাৎ ভদ্রমহিলার মনে একটা খারাপ ধারণার সৃষ্টি করে ফেলেছেন, সেটা ফাদার প্যানালুর মনের ভেতর সবসময় খচখচ করতে থাকল। এখন থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিজের শোবার ঘরে ফিরে যাবার সময় তাকে দেখতে হত ভদ্রমহিলা তার দিকে পেছন ফিরিয়ে ড্রয়িংরুমের চেয়ারে বসে আছেন এবং তাকে লক্ষ্য করে অনিচ্ছার সঙ্গে তিনি যে বলতেন 'আপনার জন্যে শুভরাত্রি কামনা করি ফাদার!' তারই তিক্ত স্মৃতি বহন করে তাকে সন্তুষ্টচিত্তে নিজের ঘরে ফিরে যেতে হত। অথচ ঘরে গিয়েই আবার দেখতে হত সেখানকার প্রতিটা আসবাবপত্রের ঢাকনা ভদ্রমহিলার নিজের হাতের বোনা। এমনি এক সন্ধ্যায় তিনি তাঁর হাতের কবজি, বগল এবং কপালে হঠাৎ জ্বরের প্রবল উত্তাপ অনুভব করলেন। যে উত্তাপ বেশ কিছুদিন ধরে তার দেহের শোণিতের ভেতর চাপা ছিল, তাই যেন সেদিন আকস্মিক বাঁধভাঙা উদ্দাম বন্যাস্রোতের মতো তার সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ছিল।

এই ঘটনার পর থেকে ফাদার প্যানালুর সম্পর্কে যেসব বিবরণ পাওয়া যায় তার সবকিছুই এই বৃদ্ধ মহিলার কাছ থেকে পাওয়া। প্রতিদিনের নিয়মিত অভ্যাসমতো পরের দিনও খুব প্রত্যুষেই মহিলা ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। প্রায় একঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরও যখন তিনি দেখলেন ফাদার প্যানালু তার শোবার ঘর থেকে বার হলেন না, তখন তিনি কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন এবং আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর কিছুটা ইতস্তত করে ফাদার প্যানালুর দরজায় গিয়ে টোকা দিলেন। ভেতরে গিয়ে দেখলেন ফাদার প্যানালু তখনও নিজের বিছানাতেই শুয়ে পড়ে আছেন। মনে হল সারারাতের ভেতর একটুও নিদ্রা যেতে পারেননি তিনি। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল, খুব বেশিরকম উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাকে। ভদ্রমহিলা এবার খুব বিনীতভাবে ফাদার প্যানালুকে বললেন যে একজন ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো উচিত হবে। কিন্তু ফাদার প্যানালু তার প্রস্তাবকে এমন একটা সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে বাতিল করে দিলেন, সেটাকে পরে ভদ্রমহিলা অভদ্র বলে বর্ণনা করেন। সুতরাং সেই মুহূর্তে সেই ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসা ছাড়া ভদ্রমহিলার গত্যন্তর ছিল না। পরে আরো কিছুটা বেলা বাড়লে, ফাদার প্যানালু বেল বাজিয়ে বাসার পরিচারিকাকে ডেকে আনান এবং তার মারফত গৃহকর্ত্রীর কাছে সংবাদ পাঠান যে তিনি ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে চান। তার অসংযত আচরণের জন্যে তিনি ভদ্রমহিলার কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, সত্যিই তাকে প্লেগে ধরেনি, কারণ সেরকম কোনো লক্ষণই তার দেহে ছিল না। ফাদার প্যানালু আরো জানান, তার তখনকার যে দৈহিক অসুস্থতা তা সম্পূর্ণ সাময়িক। ভদ্রমহিলা উত্তরে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে ফাদার প্যানালুকে বুঝিয়ে

বলেন যে, তিনি কিন্তু প্লেগের কথা চিন্তা করে ভয় পেয়ে ডাক্তার ডাকার প্রস্তাব দেননি। আর ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তার কথা তিনি মোটেই চিন্তা করেন না। কারণ তা সম্পূর্ণ বিধাতার হাতে। তবে কী, ফাদার প্যানালু যতক্ষণ তার আশ্রয়ে থাকবেন, ততক্ষণ তার ভালোমন্দের দিকে লক্ষ্য রাখাটা তিনি তার একটা দায়িত্ব বলে মনে করেন। কিন্তু যখন ভদ্রমহিলা দেখলেন ফাদার প্যানালুর দিক থেকে তার কথার কোনো জবাব এল না, তিনি স্থির করলেন ফাদার প্যানালুর প্রতি তিনি তার দায়িত্ব পালন করে যাবেন। সুতরাং তিনি তার নিজের ডাক্তারকে ডেকে পাঠাবার জন্যে ফাদার প্যানালুর অনুমতি চাইলেন। জবাবে ফাদার প্যানালু তাকে বেশি উদ্বিগ্ন হতে বারণ করলেন। পরে তার কারণ হিসেবে এমন সব কথা বললেন, যেগুলো সম্পূর্ণ আবোল-তাবোল না হলেও কিছুটা অসংলগ্ন বলে মনে হল। ফাদার প্যানালুর এই কথাবার্তার ভেতর থেকে ভদ্রমহিলা অনুমানে যতটুকু ধরতে পারলেন এবং সত্যি বলতে কী, যা তার কাছে সবচেয়ে দুর্বোধ্য বলে মনে হল তা হচ্ছে এই যে, ডাক্তার তাকে দেখতে আসুক এরকম কোনো প্রস্তাব ফাদার প্যানালু শুনতে চান না এই কারণে যে, ডাক্তারকে দেখানো তার দৃষ্টিতে নীতিগর্হিত কাজ। এরপর ভদ্রমহিলার মনে এই ধারণা জন্মাল যে, নিশ্চয় অতিরিক্ত জ্বরের দরুন ফাদার প্যানালুর মাথায় কোনোরকম গোলমাল হয়েছে। এরপর ফাদার প্যানালুকে তিনি শুধু এক কাপ চা এনে দেন।

এইরকম একটা অবস্থায় তার নিজের কর্তব্য যে কী সে-সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকায় ভদ্রমহিলা প্রতি দুঘণ্টা অন্তর নিয়মিত ফাদার প্যানালুকে দেখে আসতে থাকলেন। যে-জিনিসটা সবচেয়ে বেশি করে তার চোখে পড়ল তা হচ্ছে, ফাদার প্যানালুর অস্থির অবস্থা সারাটা দিন তিনি এই একইভাবে কাটালেন। গায়ের ওপর থেকে কম্বলটা একবার ছুড়ে ফেলে দেন, আবার হয়তো কিছুক্ষণ পরেই সেটা গায়ে তুলে নেন, আর ঘন ঘন নিজের কপালে হাত বুলাতে থাকেন। তার সারাটা কপাল ঘামে ভিজে চকচক করছিল। আবার থেকে-থেকে বিছানার উপর উঠে বসে খুব জোরে জোরে কেশে গলাটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করতে থাকেন। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন ফুসফুসের ভেতর থেকে শক্তগোছের কোনোকিছু যা তার শ্বাসরোধ করে আনছিল, কেশে বার করে ফেলবার জন্যে বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। প্রত্যেকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর সম্পূর্ণ ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় আবার তিনি বালিশের ওপর এলিয়ে পড়ছিলেন। আবার কিছুক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে দেহটাকে তুলে ধরে এমন একটা স্থিরদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকছিলেন যে কিছুক্ষণ আগে তার সারাদেহে যখন খিঁচুনি হচ্ছিল তখনকার চেয়েও এখন তার চেহারা অনেক বেশি ভীতিজনক বলে মনে হচ্ছিল। পাছে ফাদার প্যানালু আবার বিরক্ত হন সেই ভয়ে এইরকম অবস্থার মধ্যেও ভদ্রমহিলা একজন ডাক্তারকে ডেকে আনবার জন্যে উৎসাহবোধ করেননি। তিনি ভেবেছিলেন বাইরে থেকে যাই মনে হোক, আসলে ফাদার প্যানালুর অসুস্থতা একটু বেশি রকমের জ্বর বৈ তো কিছু নয়।

যা হোক, সেদিন বিকালের দিকে ফাদার প্যানালুর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে তিনি আর একবার চেষ্টা করেন। এড়িয়ে যাওয়া কতকগুলো অসংলগ্ন শব্দ ছাড়া ফাদার

প্যানালুর মুখ দিয়ে তিনি আর কিছুই বার করতে পারেননি। ডাক্তার ডাকার প্রস্তাবটাও আর একবার পাড়েন তিনি। এই প্রস্তাব শুনে ফাদার প্যানালু আবার বিছানার ওপর উঠে বসেন। নির্বাক দৃঢ়কণ্ঠে এ-ব্যাপারে তার গভীর আপত্তি জানান। সমস্ত অবস্থাটা বিবেচনা করে বৃদ্ধা মহিলার মনে হল, পরের দিন সকাল অবধি অপেক্ষা করে দেখাটাই বোধহয় তার জন্যে সবচেয়ে সঙ্গত হবে, কিন্তু তার পরেও যদি ফাদার প্যানালুর অবস্থার কোনোরকম উন্নতি হতে দেখা না যায়, তাহলে ব্যাঙ্কসঁক ইনফরমেশন ব্যুরো থেকে দিনে অন্তত বার-দশেক করে যে টেলিফোন নাম্বারটা উল্লেখ করা হত, সেই নাম্বারে টেলিফোন করে ব্যাপারটা তাদের জানিয়ে দেবেন। কিন্তু এতেই তার তখনকার দায়িত্ব শেষ হল না—একথা স্মরণ রেখে তিনি স্থির করেন যে, রাতেও কয়েকবার ফাদার প্যানালুর ঘরে এসে তাকে দেখে যাবেন এবং তার কোনোকিছুর প্রয়োজন হয় কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। রাত এগারোটা নাগাদ ফাদার প্যানালুকে লতাগুল্মের এককাপ পাঁচন করে এনে দেবার পর ভদ্রমহিলা নিজে এমন ক্লান্ত বোধ করতে থাকেন যে তার মনে হয়, আধঘণ্টাটাক সময় দেহটাকে একটা সোফায় এলিয়ে দিয়ে কিছুটা বিশ্রাম নেয়াটা বোধহয় তার উচিত হবে। তার ঘুম ভাঙে পরের দিন সকালে এবং প্রথমেই তিনি ছুটে যান ফাদার প্যানালুর ঘরে।

ফাদার প্যানালু তখনও বিছানায় শুয়ে পড়ে ছিলেন। আগের দিনের মতো তার চেহারার সেই লালচে উত্তেজিত ভাবটা আর ছিল না। কেমন একটা মৃতের মতো পাণ্ডুর দেখাচ্ছিল তাকে। চোখমুখের ফোলা-ফোলা ভাবটা তখনও যায়নি বলেই হয়তো চেহারার মলিন ভাবটা যেন আরো বেশি করে ফুটে উঠেছিল। তার বিছানার ওপরেই যে একটা ল্যাম্প জ্বলছিল, তিনি একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে ছিলেন। ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকতেই তিনি তার দিকে মুখ ফেরালেন। বৃদ্ধার অদ্ভুত ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় তখন ফাদার প্যানালুকে দেখে মনে হল, যে, সমস্ত রাত ধরে কে যেন তাকে একটা মুগুর দিয়ে পিটিয়েছে। তখন তার যেন জীবন্মৃত অবস্থা। তিনি কেমন বোধ করছেন, বৃদ্ধার এই প্রশ্নের জবাবে, যখন ফাদার প্যানালু বললেন—তার শরীর অত্যন্ত খারাপ, তবে কোনো ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন নেই, শুধু সরকারি নির্দেশ অনুসারে তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন—তার উদাসীন কণ্ঠস্বর শুনে ভদ্রমহিলা যেন চমকে উঠলেন। আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় তিনি টেলিফোনের দিকে ছুটলেন।

দুপুরবেলা ডাক্তার রিও এসে উপস্থিত হলেন। বৃদ্ধা মহিলার সমস্ত বিবরণ শুনে তিনি মন্তব্য করলেন, ফাদার প্যানালু ঠিকই বলছেন, তবে সম্ভবত খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। সেই একইরকম উদাসীনভাবে ফাদার প্যানালু ডাক্তার রিওকে অভ্যর্থনা জানালেন। ডাক্তার রিও তার সমস্ত শরীর পরীক্ষা করে দেখলেন, কিন্তু ফুসফুসের কিছুটা অসুবিধা ছাড়া প্লেগের কোনো লক্ষণ খুঁজে পেলেন না তার দেহে। ব্যাপারটা তার কাছে খুব বিস্ময়কর বলে বলে মনে হল। ফাদার প্যানালুর নাড়ি দেখলেন খুব দুর্বল, তার শরীরের অবস্থাও তখন এমন খারাপ যে তাকে যে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন তেমন ভরসা হল না তার।

—রোগের কোনো সুস্পষ্ট লক্ষণ অবশ্য এখনও আপনার শরীরে দেখছিনে—

ডাক্তার রিও ফাদার প্যানালুকে আশ্বাস দিয়ে বললেন :—তবে এটাও আবার সত্যি যে নিশ্চিত করে কিছু বলা শক্ত। সুতরাং আপনাকে তফাত করবার ব্যবস্থা করতেই হবে।

ফাদার প্যানালু কেমন একটা অদ্ভুতভাবে হাসলেন। হয়তো নিছক ভদ্রতার খাতিরেই হাসলেন তিনি, কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। ডাক্তার রিও টেলিফোন করবার জন্যে ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন। ফিরে এসে আবার ফাদার প্যানালুর দিকে তাকালেন।

—আমিও আপনার সঙ্গে থাকব—ডাক্তার শান্ত গলায় বললেন।

ফাদার প্যানালুর চেহারায় এবার কিছুটা প্রাণবন্ত ভাব ফিরে এল। যখন চোখ তুলে ডাক্তারের দিকে চাইলেন মনে হল তার চোখের দৃষ্টিতে কিছুটা উষ্ণভাব ফিরে এসেছে। তারপর ধীরে ধীরে কষ্টের সঙ্গে এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে তার কণ্ঠে সত্যিই বিষাদ ছিল কিনা তাও বলা শক্ত ছিল : অশেষ ধন্যবাদ, আপনি তো জানেন ধর্মযাজকদের জন্যে বন্ধু বলে কেউ নেই। তাদের নিঃশেষে নিজেদেরকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করতে হয়।

বিছানায় তার মাথার ওপর একটা ক্রুশ ঝুলছিল। সেটাকে নামিয়ে তার হাতে দেবার জন্যে তিনি ডাক্তারকে অনুরোধ করলেন। ডাক্তার ক্রুশটা নামিয়ে তার হাতে দিতেই তিনি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে একভাবে ক্রুশটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হাসপাতালে পৌঁছানোর পর ফাদার প্যানালু আর একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না। তার চিকিৎসার জন্যে যা যা করা হল, সেগুলো তিনি নির্বিরোধে মেনে নিলেন, কিন্তু একটা মুহূর্তের জন্যেও ক্রুশটা হাতছাড়া করলেন না। যাই হোক, তার রোগটা যে সত্যিই কী তা তখনও সন্দেহের বিষয় রয়ে গেল। কীভাবে যে তা নির্ণয় করা যায় সে-ব্যাপারেও ডাক্তার রিও নিশ্চিত হতে পারলেন না। বাস্তবিকই, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এমনিই ঘটছিল, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই রোগ-নির্ণয়ের চেষ্টা দেখা যাচ্ছিল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য ফাদার প্যানালুর ব্যাপারে শেষপর্যন্ত যা ঘটল তাতে এটাই প্রমাণিত হল যে রোগ-নির্ণয় করতে পারা আর না-পারার ফলাফলের ভেতর তেমন কোনো তফাত ছিল না।

ফাদার প্যানালুর দেহের উত্তাপ ক্রমেই বেড়ে চলল। সারাটা দিন ধরে তার কাশির শব্দও ক্রমেই চড়তে থাকল। মনে হল কাশির চোটে তার দুর্বল দেহটা যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে খানখান হয়ে যাবে। অবশেষে সন্ধ্যার দিকে দলার মতো যে-জিনিসটা তার বুকের কাছে আটকে ছিল বলে তার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, সেটাকে তিনি কাশির সঙ্গে তুলে ফেললেন। পদার্থটার রং দেখতে লালচে। দেহের উত্তাপ বাড়তে বাড়তে যখন চরমে উঠল তখনও দেখা গেল তার চোখের শূন্যদৃষ্টি আগের মতোই শান্ত এবং নির্বিকার। পরের দিন সকালে দেখা গেল তিনি মারা গেছেন, দেহটা বিছানার একপ্রান্তে ঝুলে রয়েছে। তখনও কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি ছিল সেই আগের মতো শান্ত নির্বিকার। হাসপাতালের বেডে তার পরিচয়সূচক যে-কার্ডটা ঝুলছিল তার ওপর তার নামের পাশে লেখা ছিল : 'সন্দেহজনক কেস'।

সে-বছর যে 'অল সেলস ডে' পালন করা হল, অন্যান্য বছরের তুলনায় তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবশ্য এটা সত্যি যে, সেবারকার এই সময়কার আবহাওয়া মোটামুটি

ভালোই ছিল। শুধু আকস্মিক একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উত্তাপের বদলে শরতের মৃদু বাতাস বইতে শুরু করল হঠাৎ। অন্যান্য বছরের মতো এবারেও সারাদিন ধরে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকল। বড় বড় খণ্ডের জমাট মেঘ আকাশের এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত অবধি ছুটে বেড়াতে থাকল। মেঘের ছায়ায় নড়েচড়ে বেড়াতে থাকল বাড়ির ছাদের উপর। কিন্তু ছাদের উপর মেঘের ছায়া মেলাতে-না-মেলাতে আবার সেখানে নভেম্বরের আকাশের অনুজ্জ্বল সোনালি আলো ঝলকাতে থাকল।

মানুষের দেহে বর্ষাতি ওঠা শুরু হল। রাস্তার রাস্তায় রবারের তৈরি চকচকে পোশাকের সংখ্যা দেখে সবাই বিস্মিত বোধ করল। এত প্রচুর সংখ্যায় এই পোশাক ব্যবহারের কারণ হল, কিছুদিন থেকে সংবাদপত্রগুলোতে প্রচার করা হচ্ছিল যে দুশো বছর আগে দক্ষিণ ইউরোপে প্লেগের দুর্বিপাকের সময় সেখানকার ডাক্তাররা রোগ-সংক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষার জন্যে তৈলাক্ত পোশাক ব্যবহার করত। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে দোকানদারেরা তাদের গুদামে এখন আর প্রচলন নেই এমন বর্ষাতির যে স্টক ছিল সেগুলো বাজারে ছাড়তে শুরু করল। আর ক্রেতারাও নির্বোধের মতো আশা করতে লাগল যে, এই বর্ষাতি ব্যবহার করলে তারা রোগবীজাণুর সংক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে।

৫

আগের আগের বছরের 'অল সোলস ডে' উদযাপনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এ বছরের 'অল সোলস ডে' পালনের এত মিল থাকা সত্ত্বেও এ-বছর যে কবরস্থানে মৃত আত্মীয়দের দেখতে যাওয়া হয়নি, সে-কথাটা কিন্তু কেউ বিস্মৃত হল না। এর আগে প্রতিবছরই এই দিনটাতে দেখা যেত রাস্তার ভাড়াটে ট্যাক্সিগুলো ক্রিস্যানথামাসের মৃদু সুবাসে ভরে উঠেছে, দেখা যেত সারিবদ্ধ মেয়েছেলে নিজের নিজের আত্মীয়স্বজনের কবরস্থানের দিকে এগিয়ে চলেছে, কবরের ওপর পুষ্প-অঞ্জলি দিচ্ছে। মাসের-পর-মাস ধরে মৃত আত্মীয়-পরিজনেরা যে বিস্মৃত অবহেলিত অবস্থায় কবরে পড়ে থেকেছে তার অপরাধ ক্ষালনের জন্যে এটাই ধরে নেওয়া হত উপযুক্ত দিন। কিন্তু প্লেগের বছরটাতে কেউই যেন আর মৃত আত্মীয়স্বজনদের কথা স্মরণ করতে চাইত না। কারণ এ-বছরটাতে প্রমিনেই যেন বড় বেশি করে এসব আত্মীয়দের কথা স্মরণ করতে হত। সুতরাং মনের মধ্যে কিছুটা অনুতাপ এবং একটা গভীর বিষাদের ভার নিয়ে আবার নতুন করে তাদের কবরস্থানে দেখতে যাবার কোনো প্রশ্নই ছিল না এবারে আর। মৃত আত্মীয়দের এখন আর সেই পরিত্যক্ত অবস্থাও ছিল না। সুতরাং বছরের এই বিশেষ দিনটিতে তাদের কাছে গিয়ে নিজেদের অপরাধ ক্ষালনের চেষ্টারও আর প্রয়োজন ছিল না তেমন। বরং এখন তারাই এসে যেন প্রত্যেকের স্মৃতিতে ভিড় জমাত আর প্রত্যেকেই চাইত তাদেরকে স্মৃতির আলোকবলয় থেকে সরিয়ে রাখতে। আবার এই কারণেই এ-বছরের মৃতের দিনটাকে মৌনভাবে এবং কতকটা ইচ্ছাকৃতভাবে সবাই যেন ভুলে থাকতে চাইত। যেমন এইদিন কটার্ড বিরসভাবে মন্তব্য করলেন :

এখন সবদিনই আমাদের কাছে 'মৃতের দিন'। আর তারিউ লক্ষ্য করলেন, এই ধরনের করুণ পরিহাস করবার অভ্যাস যেন কটার্ডের বাড়ছিল।

আর প্রকৃতপক্ষে, ক্রিসেটোরিয়ামে দুর্বিপাকের অগ্ন্যুৎসবের বহ্নিশিখা প্রতিদিন যেন অধিকতর লেলিহান হয়ে উঠছিল। অবশ্য এটাও সত্যি যে, মৃতের সংখ্যা যে সত্যিই বাড়ছিল তার তেমন কোনো সুস্পষ্ট লক্ষণ তখন ছিল না। তবে একটা ব্যাপার মোটামুটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, প্লেগের প্রকোপ তখন চরমে পৌঁছেছে এবং সেই অবস্থায় সে হয়তো পাকাপাকিভাবে এখানে আস্তানা গেড়ে বসবে। সৎ কর্মচারী যেমন প্রচুর উৎসাহ নিয়ে প্রতিদিন তার কর্মস্থানে যায়, প্লেগও তেমনি যেন বেশ খানিকটা উৎসাহের সঙ্গে নিয়মিত তার শিকারদের দিকে থাবা উঁচিয়ে ধরত। তত্ত্বগতভাবে এবং শাসন-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে এটাকে একটা আশাপ্রদ লক্ষণ বলে বিবেচনা করা হত। মৃতের সংখ্যার নিয়মিত যে লেখচিত্র প্রস্তুত করা হত সেটা দীর্ঘদিন ঊর্ধ্বমুখী থাকার পর যে একটা সমতল গতি লাভ করেছিল, সে-ব্যাপারটাও অনেকের দৃষ্টিতে, বিশেষ করে ডাক্তার রিচার্ডের দৃষ্টিতে একটা আশার লক্ষণ বলে গণ্য হত। তিনি নিজের হাত কচলাতে কচলাতে একদিন মন্তব্য করলেন—আজকের লেখচিত্রটা দেখে অবস্থা ভালোই বলে মনে হচ্ছে। ডাক্তার রিচার্ডের মতে রোগের প্রকোপ যতটা বাড়ার সম্ভাবনা ছিল তা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই এরপর তার গতি হবে নিম্ন-অভিমুখে। তিনি মন্তব্য করলেন : অবস্থার যে কিছুটা উন্নতি হয়েছে তার জন্যে সমস্ত কৃতিত্ব হচ্ছে ডাক্তার ক্যাসলের প্রস্তুত সিরামের। আর বাস্তবিকই, ঠিক এই সময়টাই এই সিরাম ব্যবহারের ফলে, বেশ কিছুসংখ্যক রোগী অভাবিতভাবে নিরাময় লাভ করে। বৃদ্ধ ডাক্তার ক্যাসল অবশ্য এ নিয়ে ডাক্তার রিচার্ডের সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ না-করলেও শুধু তাকে এইটুকু স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন যে, ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত বলেই তার ধারণা। কারণ ইতিহাসে এমন বহু নজির আছে যেখানে দেখা গেছে যে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে রোগের প্রকোপ আবার হঠাৎ বেড়ে গেছে।

শাসন-কর্তৃপক্ষ যারা বেশ কিছুদিন থেকেই জনসাধারণের মনোবল কীভাবে শক্ত রাখা যায় তা নিয়ে চেষ্টা করে আসছিলেন, কিন্তু প্লেগের তখনকার অবস্থার দরুন কিছুই পেরে উঠছিলেন না, এবার ডাক্তার স্বেচ্ছাসেবকদের একটা মিটিং ডাকার প্রস্তাব দিলেন, যাতে করে সেখানে তারা তাদের মতামত প্রকাশ করবার সুযোগ পান। আর এমনই দুর্ভাগ্য যে এই মিটিং বসবার ঠিক আগের মুহূর্তে যখন প্লেগের প্রকোপ চরমে উঠল, ডাক্তার রিচার্ড আকস্মিক মারা গেলেন। কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেও এই দুর্ঘটনার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কিছুই প্রমাণিত হল না। এর ফলে শুধু প্রশাসন কর্তৃপক্ষ আবার হতাশবাদী হয়ে উঠলেন, অবশ্য তাদের পূর্বের আশাবাদের পেছনে যেমন কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না, এখনকার হতাশাও ছিল সেই একই রকমের। অন্যদিকে, ডাক্তার ক্যাসল এরপর থেকে যতটা সাধ্যে কুলায়, নিষ্ঠার সঙ্গে সিরাম প্রস্তুতের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। ইতিমধ্যে, প্রিফেক্টর অফিসগুলো ছাড়া শহরে এমন কোনো সরকারি আস্তানা বা ভবন ছিল না, যেটাকে হাসপাতাল বা রোগীদের পৃথক করে রাখবার ক্যাম্পে রূপান্তরিত করা হয়নি।

প্রিফেক্টর অফিসগুলোকে প্রশাসনিক কাজে এবং কমিটি-মিটিং-এর জন্যে ব্যবহার করা হত। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই সময়টায়ই দুর্বিপাক পরিস্থিতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে কিছুটা স্থিতিশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায়ই ডাক্তার রিও-র পরিচালনাধীন ত্রাণ-সংস্থাগুলো তখনও পর্যন্ত পরিস্থিতির সঙ্গে কোনোরকমে মোকাবিলা করে যাচ্ছিল, যদিও নিরত তাদেরকে গুরুতর চাপের মধ্যে কাজ করে যেতে হচ্ছিল। কিন্তু যে-অবস্থার মধ্যে পড়লে এইসব সংস্থার অধীন ডাক্তার এবং তাদের সাহায্যকারীদের আরো অধিক উদ্যোগ নেয়ার কথা চিন্তা করতে হত, তখনও তাদের সেইরকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি। এককথায় বলতে গেলে, অতিমানবিক দায়িত্বের কাছাকাছি যে একটা দায়িত্বভার তারা নিজেদের ওপর তুলে দিয়েছিলেন, সেটাকে যন্ত্রচালিতের মতো কোনোপ্রকারে সম্পন্ন করে যাওয়াটাই ছিল তাদের তখনকার কাজ। যেসব ক্ষেত্রে প্লেগ-আক্রমণের সাথে সাথে নিউমোনিয়া দেখা দেয়, এইধরনের রোগের সংক্রমণ তখন সারা শহরে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছিল। এই প্লেগে আক্রান্ত কিছু কিছু রোগী ইতিমধ্যেই শহরে এখানে-ওখানে পাওয়া যাচ্ছিল। তখন এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, যে-কেউ ভাবতে পারত যে শহরে তখন যে ঝড় বইতে শুরু করেছিল, সেই ঝড়ই বুঝি মানুষের বুকের ভেতর প্লেগের শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে ঝাপটায় ঝাপটায় তাকে প্রবল করে তুলছিল। এই নিউমোনিয়া প্লেগের শিকার হত যেসব মানুষ, তারা যখন কাশত, তখন কাশির সঙ্গে রক্ত আসতে দেখা যেত। এইসব রোগী মারাও পড়ত খুব তাড়াতাড়ি। এই-যে নতুন ধরনের প্লেগ শুরু হয়েছিল, তা ছিল যেমন অত্যন্ত ছোঁয়াচে তেমনি তাতে মানুষ মরতও অধিক সংখ্যায়। অবশ্য এ-ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের ভেতর বিভিন্ন রকমের মতামত চালু ছিল। যেসব স্বাস্থ্যকর্মী এইসব রোগীদের দেখাশোনা করত, তারা রোগের সংক্রমণ এড়াবার জন্যে রোগবীজাণুমুক্ত মসলিনের মুখোশ ব্যবহার করতেন। সমস্ত অবস্থানটা বিবেচনা করলে মনে হত এই সময় প্লেগের ধ্বংসলীলা বেড়ে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু গ্রন্থিস্ফীতি জাতীয় প্লেগের প্রকোপ কিছুটা কমে যাওয়ায়, প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি।

ইতিমধ্যে খাদ্যসরবরাহের ব্যাপারে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে একটা গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু প্রয়োজনীয় যেসব খাদ্যদ্রব্য সাধারণত দোকানে পাওয়া যেত না, মুনাফাখোরেরা সেগুলো সরবরাহ করবার সময় অত্যধিক মূল্য দাবি করত। ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, দরিদ্র জনসাধারণকে নিদারুণ সংকটের ভেতর দিন কাটাতে হত, যদিও বিত্তবান লোকেরা কোনো জিনিসের অভাব বোধ করত না। এইভাবে প্লেগের পক্ষপাতশূন্য ব্যবস্থার ফলে যেখানে অধিকতর সাম্য গড়ে ওঠার কথা সেখানে বরং তার বিপরীতটাই ঘটতে দেখা যেত। ধনলিপ্সার বিভিন্ন পর্যায়ের দ্বন্দ্বের ফলে অবিচার এবং অন্যায়ের যে উপলব্ধি মানুষের অন্তরকে নিয়ত পীড়া দেয়, সেটাই ক্রমে বেড়ে চলছিল। শহরের লোকদের জন্যে নির্ভুল সাম্যের আশ্বাস ছিল শুধুমাত্র একটা ক্ষেত্রে—তা হচ্ছে মৃত্যু, কিন্তু এই ধরনের সাম্য কেউ প্রত্যাশা করে না। দরিদ্র জনসাধারণ, নিত্যপ্রয়োজনীয়

দ্রব্যের অভাবের দংশনটা যাদের অধিক মাত্রায় সহ্য করতে হত, তারাই বেশি করে কাছাকাছি সেইসব শহর এবং গ্রামের কথা চিন্তা করে হা-হুতাশ করত—যেখানে খাবার পাওয়া যেত অল্পমূল্যে, আবার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্যে কোনোরকমের বাধা-নিষেধের ঝামেলাও পোয়াতে হত না। সম্পূর্ণ অসঙ্গত হলেও তাদের মনে স্বাভাবিকভাবে চিন্তা জাগত যে, এইসব শহর বা গ্রামে, জীবন যেখানে ছিল শান্ত এবং সুখময়, সেখানে যাবার জন্যে কর্তৃপক্ষের তাদেরকে অনুমতি দেয়া উচিত। 'খাবার আর মুক্ত বায়ু' এই ধরনের যেসব স্লোগান তখন দেয়ালে দেয়ালে উৎকীর্ণ দেখা যেত এবং মানুষ পথে-পথে হেঁকে বেড়াত, তারই ভেতর দিয়ে তাদের তখনকার দাবি সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে। যদিও সেগুলোকে খুব সহজেই দমন করে ফেলা হয়, কিন্তু তার কিছু পরেই যেসব বিক্ষোভ মিছিল বার হয়। এই আধা-ক্লেশপূর্ণ ঘনঘটার ছিল তারই পূর্বাভাস। এই বিক্ষোভ মিছিল দেখে সবাই সচেতন হয়ে ওঠে যে জনসাধারণের ভেতর একটা বেশি অসন্তোষের মনোভাব গড়ে উঠতে শুরু করছে।

বলা বাহুল্য, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সংবাদপত্রের প্রতি যেসব নির্দেশ দেয়া হত তারা সেগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করত। যে-কোনো মূল্যেই হোক আশাবাদী মনোভাব প্রচার করতে হবে, এই ছিল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য বিশ্বাস করলে মেনে নিতে হত শহরের অধিবাসীরা সাহস এবং ধৈর্যের চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন। কিন্তু যে-শহরের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, যাকে সম্পূর্ণ নিজের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং যেখানে কোনোকিছু গোপন রাখাও সম্ভব নয়, সেখানকার জনসাধারণের এই সাহস এবং ধৈর্যের চমৎকার দৃষ্টান্ত যে কী হতে পারে, সে-ব্যাপারেও কারো কোনোরকম ভ্রান্ত ধারণা ছিল না। আমাদের সাংবাদিকেরা যে সাহস এবং ধৈর্য সম্পর্কে এত প্রচারণা চালাচ্ছিলেন তার সত্যিকারের রূপটা যে কী তা জানবার জন্যে প্রয়োজন ছিল শুধু রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের পৃথক করে রাখবার জন্যে যেসব সরকারি ক্যাম্প এবং ডিপো খোলা হয়েছিল সেগুলো একবার দেখে আসা। অনেক ব্যাপারেই যেমন ঘটেছে, কাহিনীকার সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে এই ক্যাম্পগুলো দেখবার সুযোগ তার ঘটেনি। সুতরাং সেখানকার অবস্থার বিবরণ দিতে চাইলে তাকে তারিউ-র ডাইরির ওপর আবার নির্ভর করতে হবে।

শহরের মিউনিসিপাল স্টেডিয়ামে যে ক্যাম্পটা খোলা হয়েছিল, র‍্যাঁবেয়ারকে সঙ্গ নিয়ে তারিউ একদিন সেটা দেখতে যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে নিজের ডাইরিতে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। স্টেডিয়ামটা ছিল শহরের এক প্রান্তদেশে। তার একপাশে ছিল বড় এক সড়ক, যেখানে সারি সারি মোটরগাড়ি দাঁড় করানো থাকত, আর অপরপাশে ছিল যে মালভূমির উপর ওরাও শহরের অবস্থান তারই প্রান্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত একখণ্ড পোড়ো জমি। আগে থাকতেই স্টেডিয়ামের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছিল উঁচু কংক্রিটের দেয়াল। সুতরাং তার বাইরে যাবার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবার জন্যে প্রয়োজন ছিল শুধু চারপাশের চারটে গেটে সান্ত্রী বসিয়ে দেবার। দেয়ালগুলো থাকতে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যও সাধিত হত: রোগাক্রান্ত যেসব লোককে এখানে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল, পথচারী লোকদের কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে

দেয়ালগুলো তাদেরকে আড়াল করে রাখত যেন। একদিকে ছিল যেমন এই সুবিধা, অন্যদিকে যে-ব্যাপারটা ঘটত তা হচ্ছে এই যে, যদিও ভেতর থেকে বাইরের কিছুই দেখা যেত না, কিন্তু এখানে আটক অসুস্থ ব্যক্তিরা সারাদিন ধরে রাস্তায় যেসব মোটরগাড়ি চলাচল করত তার শব্দ শুনতে পেত এবং এই শব্দের কমবেশি হওয়া থেকে তারা অনুমান করে নিত শহরের লোকজন কখন কাজ ছেড়ে ঘরে ফিরছে আর কখনই বা তারা কর্মস্থানের দিকে যাত্রা করছে। এইসব থেকে তাদের মনে এই উপলব্ধি জাগত যে দেয়ালগুলোর মাত্র কয়েক গজের ভেতরেই শহরের সেই স্বাভাবিক জীবনধারা যা থেকে তারা এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, ঠিক আগের মতোই চলেছে। আরো উপলব্ধি জাগত যে এই দেয়ালগুলো তাদের সঙ্গে বাইরের জগতের যে ব্যবধান গড়ে তুলেছে তা দুটো ভিন্ন গ্রহের মধ্যের যে ব্যবধান প্রায় তারই সমতুল্য।

তারিউ এবং র‍্যাঁবেয়ার স্টেডিয়াম দেখতে যান এক রবিবারের বিকেলে। ফুটবল খেলোয়াড় গনজালেসও ছিল তাদের সঙ্গে। র‍্যাঁবেয়ার তার সাথে তখনও যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন। অন্যদের সাথে পালা করে ক্যাম্প দেখাশোনার কাজে সাহায্য করবার জন্যে র‍্যাঁবেয়ার আগেই গনজালেসকে সম্মত করিয়েছিলেন। সেদিন তাদের এই ক্যাম্প দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল গনজালেসকে ক্যাম্প-কমান্ডারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। সেদিন বিকেলে যখন তারা মিলিত হলেন, গনজালেস মন্তব্য করলেন, প্লেগ শুরু হবার আগে এই সময়টায়ই সাধারণত তিনি খেলার মাঠে যাবার জন্যে উদ্যোগ আয়োজন শুরু করতেন। খেলার মাঠ সরকার দখল নেবার পর থেকে খেলাধুলা যেন অতীতের স্মৃতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আকস্মিক এইরকম একটা অবস্থা ঘটাতে গনজালেস কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়েছিলেন, তার চোখমুখের চেহারা দেখলে সেটা অনুমান করা যেত। ক্যাম্প দেখাশোনার কাজে সাহায্য করবার জন্যে র‍্যাঁবেয়ারের প্রস্তাবে তিনি যে সম্মত হয়েছিলেন, তাও হয়তো এই কারণেই। কিন্তু গনজালেস একটা শর্ত দিয়েছিলেন, শুধু রবিবারের দিনটা তিনি এই কাজে সাহায্য করবেন বলে স্থির হয়েছিল।

সেদিন আকাশে ঘন মেঘ জমেছিল। গনজালেস ওপরের দিকে একবার তাকিয়ে যেন কিছুটা খেদের সাথে মন্তব্য করলেন : বৃষ্টিও নেই আবার তেমন গরমও পড়ছে না, বাইরে খেলাধুলার জন্যে এমন চমৎকার দিন আর হয় না। এবং তারপর গনজালেস শুরু করলেন পুরোনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন : খেলার মাঠে সাজঘরে বসে তেল মালিশ করার সেই পরিচিত গন্ধ, বাইরে চারপাশে স্ট্যান্ডের উপর দাঁড়ানো দর্শকদের ভিড়, খেলার মাঠের সেই পিঙ্গলবর্ণের মাটি আর তারই ওপর উজ্জ্বল বর্ণের পোশাক-পরা খেলোয়াড় দলের ছুটে বেড়ানো; দুটোই মিলে এক অদ্ভুত বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হত, বিরতির সময় আসত লেবুর টুকরো অথবা লেবোনেডের বোতল, মুখে দিলেই অমনি ঝাঁজে গলার ভেতরটায় কেমন যেন কোমলভাবে ফুটতে থাকত, চমৎকার একটা সোয়াস্তি লাগত, তৃষ্ণা দূর হত।

সেদিন স্টেডিয়ামে যাবার পথে তারা যখন শহরের আবর্জনা-ভর্তি রাস্তা ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন রাস্তার উপর এখানে-ওখানে পড়ে-থাকা পাথরের টুকরো সামনে

দেখলেই গনজালেস বলে লাথি মারার ভঙ্গিতে সেগুলোকে শট করছিলেন। তারিউ সে-ব্যাপারটাও তাঁর ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করেন। গনজালেস পাথরের টুকরোগুলোকে লাথি মেরে রাস্তার ড্রেনের খোলা মুখের ভেতর ফেলার চেষ্টা করছিলেন এবং যখনই সেগুলো গর্তের ভেতর গিয়ে পড়ছিল, তিনি চিৎকার করে উঠছিলেন, 'গোল'। মুখের সিগারেট শেষ হয়ে আসলে, শেষ অংশটা থুতু ফেলার মতো করে মুখ থেকে সামনের দিকে ছুড়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু সেটা মাটিতে পড়ার আগে আবার বুটের ডগা দিয়ে শট করবার চেষ্টা করছিলেন। স্টেডিয়ামের কাছাকাছি পৌঁছে দেখলেন, তাদের সামনেই কতকগুলো বাচ্চাছেলে ফুটবল খেলছে। তাদের একজন বলটা সামনের দিকে এগিয়ে দিতেই গনজালেস দল ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে পরিষ্কার একটা শট মেরে বলটাকে আবার ছেলেদের মাঝে ফিরিয়ে দিলেন।

স্টেডিয়ামের ভেতর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তারা দেখলেন, চারপাশের স্ট্যান্ডগুলো লোকে ভর্তি। ভেতরে মাঠের চারপাশে কয়েকশ ছোট ছোট লাল তাঁবু, তাঁবুর দরজার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে গুটানো কম্বল আর বিছানা এবং কাপড়চোপড়ের বান্ডিল। খুব গরম পড়লে বা বৃষ্টির দিনে সেগুলোকে যাতে ভেতরের রোগীরা ব্যবহার করতে পারে সেইজন্য বোধহয় স্ট্যান্ডগুলোকে খুলে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ক্যাম্পের নিয়ম হচ্ছে সূর্য ডোবার সাথে সাথে প্রত্যেককেই নিজের নিজের তাঁবুর ভেতর গিয়ে ঢুকতে হবে। স্ট্যান্ডগুলোর নিচে গোসলের ঝরনা বসানো হয়েছিল। আগে সেগুলোকে খেলোয়াড়দের কাপড়চোপড় ছাড়ার ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হত, এখন সেগুলো হয়েছিল অফিসঘর অথবা আঁতুড়শালা। ক্যাম্পের বেশিরভাগ লোকই বাইরে স্ট্যান্ডগুলোর ওপর এখানে-ওখানে বসেছিল। মাঠের দাগ-কাটা ঘরগুলোর মধ্যেও পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল অনেকেই। আবার কেউ কেউ বসেছিল নিজের নিজের তাঁবুর সামনে, কেমন একটা আনমনাভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। স্ট্যান্ডগুলোর ঘেরার ওপর ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়েছিল যারা, তাদের অনেকের চোখেই ছিল একটা শূন্য হতাশার দৃষ্টি।

—সারাটা দিন ধরে কী করে? তারিউ র‍্যাঁবেয়ারকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—কী আর করবে, ওদের করার মতো তেমন কিছুই তো নেই।

—বাস্তবিকই, সবাই শূন্যহাত অলসভাবে দুপাশে ঝুলিয়ে চুপচাপ বসেছিল। আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার ছিল। সাধারণ জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এইসব অসুস্থ মানুষদের কারো মুখে কোনো কথা ছিল না।

—প্রথম যখন তাদেরকে এখানে এনে ঢোকানো হয় তখন সবাই মিলে এমন শোরগোল তুলত যে নিজের মুখের কথা পর্যন্ত নিজের শোনার উপায় ছিল না। র‍্যাঁবেয়ার মন্তব্য করলেন—কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ওরা যেন সব নির্বাক হয়ে উঠছে।

তারিউ যে-ব্যাপারটাকে তাদের এই মৌনতার কারণ বলে অনুমান করেন সেটাকে তিনি তাঁর ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। গোড়ার দিকে তাদের অবস্থাকে তিনি কল্পনা করেছেন কতকটা এইভাবে : বিভিন্ন তাঁবুর ভেতর ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছে সে অসুস্থ লোকগুলোকে, তাদের চারপাশে সারাক্ষণ মাছি ভনভন করছে, নিজের গা

চুলকাচ্ছে প্রত্যেকে, আর সহৃদয় শ্রোতা পেলেই তার কাছে নিজের শঙ্কা বা ক্ষোভ প্রকাশ করছে। কিন্তু ক্যাম্পে আগত রোগীর সংখ্যা ক্রমেই যত বাড়তে থাকে, তাদের অভাব-অভিযোগের কথা মন দিয়ে শোনার মতো লোক খুঁজে পাওয়া ততই কঠিন হয়ে ওঠে। সুতরাং ক্রমেই নির্বাক হয়ে ওঠা এবং সবকিছুর প্রতি, সবার প্রতি একটা অবিশ্বাস পোষণ করা ছাড়া তখন আর তাদের গত্যন্তর ছিল না। বাস্তবিকই, এখানে দাঁড়ালে মনে হত যে মাথার ওপর উজ্জ্বল ধূসর আকাশ থেকে অদৃশ্য শিশিরকণার মতো যেন অবিরাম অবিশ্বাস ঝরে পড়ছে লাল ইটের গাঁথুনির এই ক্যাম্পগুলোর ওপর।

হ্যাঁ, এখনকার প্রত্যেকের চোখেই ছিল কেমন একটা অবিশ্বাসের দৃষ্টি। স্পষ্টত সবাই ভাবত, তাদের এই-যে জোর করে এখানে এনে আটক করে রাখা হয়েছে, তার নিশ্চয় কিছু-না-কিছু সঙ্গত কারণ আছে। কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়ে, কোনোরকম সমাধান খুঁজে না-পেলে মানুষ যেমন হতবুদ্ধি এবং শঙ্কিত হয়ে পড়ে তাদের সবার অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তখন ঠিক তেমনি। যখনই যার ওপর তার চোখ পড়ল, তারিউ লক্ষ করলেন তার চোখে কেমন একটা শূন্যদৃষ্টি এবং এটাও সুস্পষ্ট যে একদিন জীবন বলতে যা বোঝাত তার কাছে তার সবকিছু থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে অন্যত্র রাখা হওয়াই তার মনটা যেন সর্বক্ষণ ব্যথায় টনটন করছে। যেহেতু, কারো পক্ষেই সারাক্ষণ নিজের মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা করা সম্ভব নয়, তাই এখন আর তাদের মনের ভেতর কোনো চিন্তাই স্থান পেত না যেন। তাদের জন্যে এটা ছিল যেন কতকটা অবকাশ যাপনের মতো। কিন্তু সবচেয়ে যেটা বেদনাদায়ক—তারিউ তার ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন—তা হচ্ছে তাদের কথা, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব সবাই ভুলে গিয়েছিল এবং এ-ব্যাপারটা তাদেরও অগোচর ছিল না। যেহেতু ভিন্ন অনেক বিষয় নিয়েই তখন তাদের চিন্তাভাবনা করতে হত, কাজেই স্বাভাবিকভাবে বন্ধুবান্ধবরা তাদের কথা ভুলে গিয়েছিল। আর তারা নিজেরা একদিন যাদের ভালোবাসত তারা এদেরকে ভুলে যাবার আরো একটা প্রধান কারণ হল এদেরকে এখান থেকে খালাস করে নিয়ে যাবার বিভিন্ন পরিকল্পনা আঁটতে আঁটতে এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে নিতেই তাদের সমস্ত শক্তি এবং সময় ব্যয় হয়ে যেত। এইসব পরিকল্পনা আর ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে গিয়ে যাদের মুক্ত করার জন্যে এতসব করা তাদের কথাই ভাবতে ভুলে যেত যেন তারা এখন। এটাও খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে এসবের অর্থ দাঁড়াচ্ছে এইরকম : কারোরই সত্যিকারভাবে অপরের জন্যে চিন্তা করবার সামর্থ্য নেই, এমনকি নিদারুণ বিপদের দিনেও তা সম্ভব নয়। কারণ সত্যিকারভাবে কারো সম্পর্কে চিন্তা করার অর্থ হচ্ছে দিনের প্রতিটি মুহূর্ত সেই ব্যক্তিটি সম্পর্কে চিন্তা করা এবং কোনোক্রমেই অন্য কোনো বিষয়ে—যেমন খাওয়া-দাওয়া করা, গায়ে মাছি বসলে তা তাড়ানো বা সাধারণ সাংসারিক দায়িত্ব পালন করা কিংবা শরীরে কোথাও হয়তোবা চুলকাচ্ছে, সেখানে হাত নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কোনোকিছুর দিকেই আর মন না-দেয়া। কিন্তু মাছি বা চুলকানির হাত থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাওয়া তো সম্ভব নয়। এইজন্যেই বেঁচে থাকাটা সত্যিই বড় কষ্টকর। এবং ক্যাম্পের সবাই তা ভালোভাবে উপলব্ধি করত।

ক্যাম্পের ম্যানেজার তাদের কাছে এগিয়ে এসে বললেন—মঁসিয়ে অথন নামে এক ভদ্রলোক তাদের সাথে দেখা করতে চান। গনজালেসকে সেখানে রেখে, তিনি তারিউ এবং র‍্যাবেয়ারকে পথ দেখিয়ে বড় চত্বরটার কাছে নিয়ে গেলেন। মঁসিয়ে অথন তখন একাই সেখানে বসেছিলেন। তাদের সবাইকে এগিয়ে যেতে দেখে মঁসিয়ে অথন উঠে দাঁড়ালেন। আগের দিনের সেই একই পোশাক পরনে ছিল মঁসিয়ে অথনের, এমনকি শক্ত কলারটা পর্যন্ত ছাড়েননি তখনও তিনি। তারিউ মঁসিয়ে অথনের ভেতর যেটুকু পরিবর্তন লক্ষ করলেন তা হচ্ছে, তাঁর কপালের ওপর ঝুলে-পড়া চুলগুলোকে তিনি আগের দিনের মতো চিরুনি দিয়ে সুন্দরভাবে আঁচড়ে পিছনের দিকে ঠেলে দেননি আর তাঁর একটা জুতোর ফিতে বাঁধতে ভুলে গেছেন। মঁসিয়ে অথনকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, একটাবারের জন্যেও তিনি চোখ তুলে তাঁর অতিথিদের দিকে সোজা চাইতে পারলেন না। শুধু মুখে বললেন, তাদের দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। ডাক্তার রিও তার পরিবারের জন্যে যা-কিছু করেছেন তার জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানাতে অনুরোধ করলেন তাদেরকে।

এরপর কয়েক মুহূর্ত সম্পূর্ণ নীরবে কাটল। তারপর যেন বেশকিছুটা চেষ্টা করেই মঁসিয়ে অথন আবার শুরু করলেন—আশা করি জ্যাকুইসকে খুব বেশি কষ্ট পেতে হয়নি।

তারিউ এই প্রথম মঁসিয়ে অথনকে ছেলের নাম ধরে ডাকতে শুনলেন। এ থেকে তিনি অনুভব করলেন, মঁসিয়ে অথন হয়তো কিছুটা বদলে গেছেন।

তখন পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ডুবছিল। ভাঙা মেঘের ফাঁক দিয়ে তার কিরণ ছড়িয়ে পড়ছিল। সূর্যের কিরণ উজ্জ্বল ছটার মতো সমতল রেখায় এসে পড়ছিল স্ট্যান্ডগুলোর ওপর। সূর্যের কিরণে তাদের মুখের চেহারা দেখাচ্ছিল উজ্জ্বল সোনালি হলুদ।

—না, না, তারিউ জবাবে বললেন—সত্যিই সে তেমন কষ্ট পায়নি।

—তারা সবাই পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার পরও মঁসিয়ে অথন সূর্যের আলোর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

গনজালেসের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে তারিউ যখন ক্যাম্পের অফিসে গিয়ে উঠলেন, দেখলেন গনজালেস কাজের তালিকাটা নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে পড়ে দেখছেন। তাদের সঙ্গে করমর্দন করবার সময়ে তিনি হাসতে লাগলেন।

—যাই হোক, বহুদিন পরে আবার সেই পুরোনো ড্রেসিংরুমে ফিরে আসবার সুযোগ পেলাম—মৃদু হাসতে হাসতে তিনি মন্তব্য করলেন, এই দুর্দিনে সেটাই কি কম লাভ!

এর অল্পকিছুক্ষণ পরেই ক্যাম্প-ম্যানেজার যখন তারিউ এবং র‍্যাবেয়ারকে পৌঁছে দেবার জন্যে বাইরে আসলেন, তাঁরা শুনতে পেলেন কাছাকাছি স্ট্যান্ডগুলো থেকে কেমন একটা কর্কশ শব্দ ভেসে আসছে। প্লেগ শুরু হবার আগে যেসব মাইক থেকে খেলার ফলাফল ঘোষণা করা হত, অথবা নতুন নতুন খেলোয়াড়দলকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে ব্যবহার করা হত, সেই একই মাইক থেকে এখন সন্ধ্যার আহারের জন্যে ক্যাম্পের লোকদের তাদের নিজের নিজের তাঁবুতে ফিরে যাবার জন্যে অনুরোধ জানানো হচ্ছিল। ধীরে ধীরে স্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে এসে এক-পা দু-পা করে সবাই ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে চলল। যখন সবাই প্রায় তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়েছে, দেখা গেল

রেলস্টেশনে প্ল্যাটফরমের উপর মালপত্র সরাবার কাজে যেসব ট্রাক ব্যবহার করা হত, এমনি দুটি ইলেকট্রিক ট্রাক বিভিন্ন তাঁবুর ভেতরের রাস্তাগুলো ধরে এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে। ট্রাক প্রত্যেক তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের লোকেরা তাদের খাবারের পাত্র বাড়িয়ে ধরছিল, আর ট্রাকের ওপর রাখা দুটো বড় বড় কড়াই থেকে হাতায় করে খাবার তুলে তুলে সেইসব পাত্রে ঢেলে দেয়া হচ্ছিল। তারপরেই ট্রাক আবার এগিয়ে যাচ্ছিল সামনে তাঁবুর দিকে।

—দেখছি, বেশ তৎপরতার সঙ্গে এখানকার কাজকর্ম চলছে—তারিউ মন্তব্য করলেন।

তাদের সঙ্গে করমর্দন করবার সময় ক্যাম্পের ম্যানেজারের চোখমুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, দেখতেই তো পাচ্ছেন এখানে কাজকর্ম কীভাবে চলছে। এখানে আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে কাজকর্ম দ্রুত সেরে ফেলাটাই কর্তব্য।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। মাথার উপর পরিষ্কার আকাশ। ক্যাম্পের সবখানেই শান্তির কোমল আলো। সন্ধ্যার শান্ত নীরবতার ভেতর দিয়ে প্লেট আর চামচের ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছিল। বাদুড়গুলো চক্রাকারে ক্যাম্পের উপর অবিরাম ঘুরছিল, আবার মাঝে মাঝে অন্ধকারের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। দেয়ালের বাইরে শিকলে বাঁধা একটা কুকুর থেকে থেকে কেঁউ কেঁউ করছিল।

—এঁদের অবস্থার কথা ভাবলে বেশ খারাপ লাগে—গেটের বাইরে আসার পর তারিউ মন্তব্য করলেন : মনে হয় ওকে সাধ্যমতো সাহায্য করি। কিন্তু যে মানুষ বিচারক, তাকে সাহায্য করাটা কি অত সহজ।

৬

প্রায় অনুরূপ ক্যাম্প শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও আরো ছিল, কিন্তু তথ্যের অভাবের জন্যে এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবশত কাহিনীকার সেগুলো সম্পর্কে কোনো মন্তব্য এখানে সংযোজন করতে চান না। তবে এইটুকু তিনি বলতে চান : ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঠাসাঠাসি করে আটকে রাখা দুস্থ অসহায় মানুষদের ভেতর থেকে ভেসে আসা গন্ধ, প্রতি সন্ধ্যায় সেখান থেকে ভেসে আসা লাউডস্পিকারের বিকট চিৎকার, নিয়ত ক্যাম্পগুলোকে ঘিরে থাকত যে রহস্যের আবরণ, এবং নিষিদ্ধ স্থানগুলো যে আতঙ্কের সৃষ্টি করত—এই সবকিছু মিলিয়ে এই ক্যাম্পগুলোর অস্তিত্ব শহরের অধিবাসীদের মনোবলকে কেমন যেন শিথিল করে আনত; তাদের ভেতর অনিশ্চয়তা এবং ত্রাসের ভাবকে বাড়িয়ে তুলল। শান্তিভঙ্গ এবং ছোটখাটো গোলযোগ প্রায় লেগে থাকত।

নভেম্বর মাস যতই শেষ হয়ে আসতে থাকল, সকালে শীতের প্রকোপ ততই বাড়তে লাগল। প্রবল বর্ষণের ফলে রাস্তা যেমন হাড়গোড় বার হওয়া অবস্থা হয়ে উঠল, আকাশ হয়ে উঠল মেঘমুক্ত। সকালের দিকে ক্ষীণ সূর্যালোকে স্নাত সমস্ত শহরটা কোমল উজ্জ্বলতায় চকচক করতে থাকল। কিন্তু যতই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসত, বাতাস হয়ে উঠত উষ্ণ। এমনি এক সন্ধ্যায় তারিউ স্থির করলেন, ডাক্তার রিওকে তার

নিজের জীবন সম্পর্কে কিছু বললেন।

বিশেষ করে সেদিনটা তাদের বড় কর্মব্যস্ততার ভেতর দিয়ে কাটল। সন্ধ্যার দিকে তারিউ দুজনে একত্রে ডাক্তার রিও-র পুরোনো সেই হাঁপানির রুগীর বাসায় বেড়াতে যাবার প্রস্তাব দিলেন। পুরো শহরের বাড়িগুলোর মাথায় কেমন একটা কোমল আভা ছড়িয়েছিল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঝিরঝিরে একটা বাতাস কোমল স্পর্শ বুলিয়ে যেতে লাগল যেন তাদের চোখেমুখে। শহরের নিস্তব্ধ রাস্তা পেরিয়ে তার বাসায় পৌঁছানোর পর হাঁপানি রুগীকে অতিরিক্ত বকবক করতে শুনে একটু বিরক্তই বোধ করছিল তারা। তাদের সামনে এক দীর্ঘ বক্তৃতা জুড়ে দিল যেন সে : শহরে লোকেরা ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছে, চিরদিন সেই একই শ্রেণীর লোকদের দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তবে অনির্দিষ্টকাল ধরে এই একই অবস্থা চলতে পারে না। আবার শীঘ্রি তিনি হাত কচলাতে কচলাতে বললেন—হৈহুল্লোড়ের দিন ফিরে আসবে। যতক্ষণ ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করতে থাকলেন, তিনি এই একই কথা অবিরাম বকে চললেন।

হঠাৎ তারা ছাদের উপর পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। তারিউকে উপরের দিকে তাকাতে দেখে হাঁপানি রুগীর স্ত্রী বুঝিয়ে বললেন, পাশের বাসার মেয়েরা ছাদের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি আরো বললেন, ছাদের উপর থেকে চারপাশের দৃশ্য বেশ মনোরম দেখায়। আর সেখানকার ছাদের উপরের বারান্দাগুলো একদিকে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকায় বাইরে রাস্তায় না-নেমেই বাড়ির মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারে।

—যান না, উপরে গিয়ে দেখে আসুন একবার চারপাশের দৃশ্য—বৃদ্ধ হাঁপানির রুগী বললেন, কী চমৎকার নির্মল বাতাস উপরে।

উপরে বারান্দায় উঠে এসে তারা কাউকে পেলেন না, সেখানে দেখলেন শুধু তিনখানা শূন্য চেয়ার পড়ে রয়েছে। এদিকে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় পরপর শুধু ছাদের বারান্দা। সবচেয়ে দূরবর্তী যে-বারান্দাটা সেটা মনে হল অন্ধকারময় এবড়োখেবড়ো প্রকাণ্ড একটা কিছুর গায়ে গিয়ে ঠেকেছে—পরে তারা আন্দাজ করলেন, সেটা শহরের সবচেয়ে নিকটবর্তী পাহাড়। অপরদিকে, পরপর কয়েকটা রাস্তা আর অদৃশ্য বন্দর পেরিয়ে তাদের দৃষ্টি গিয়ে ঠেকল একেবারে দিগন্তে, যেখানে আকাশ আর সমুদ্র মিশেছে ধূসর কম্পমান অস্পষ্টতার ভেতর। তারই পর দেখা যাচ্ছিল একটা কালো ছোপের মতো। তারা জানতেন এই কালো ছোপটা আসলে পাহাড়ের চূড়া। এই চূড়া ছাড়িয়ে আরো কিছুটা দূরে একটা আভা একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল, অবশ্য তার উৎসটা তারা ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারল না। বন্দরের প্রবেশমুখের বাতিঘরটা তখনও কাজ করে যাচ্ছিল, যার ফলে বিভিন্ন জাহাজ অব্যবহৃত—ওরাও বন্দর পেরিয়ে সমুদ্র-উপকূলের অন্যান্য বন্দরে গিয়ে নোঙর করবার সুযোগ পেত। সন্ধ্যার বাতাসে আকাশ তখন সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেছে, আকাশের গায়ে তারাগুলোকে মনে হচ্ছিল রুপালি পাতের মতো, বাতিঘরের ঘূর্ণায়মান হলুদ আলোগুলো থেকে-থেকে মলিন হয়ে উঠছিল। মৃদু বাতাসে মশলার মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। চারিদিকে বিরাজ করছিল একটা অখণ্ড নীরবতা।

—হ্যাঁ, স্থানটা সত্যিই বড় চমৎকার—ডাক্তার রিও হেঁট হয়ে একটা চেয়ারে বসতে বসতে মন্তব্য করলেন—হঠাৎ ভুল হবে প্লেগের ছোঁয়া কোনোদিন এখানে পৌঁছায়নি।

ডাক্তারের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে তারিউ তখনও সমুদ্রের পানে চেয়েছিলেন। হ্যাঁ, তা বটে—মিনিটখানেক পরে তারিউ উত্তরে বললেন—এখানে মন্দ লাগে না।

তারপর ডাক্তার রিওর পাশের চেয়ারে বসে পড়লেন তারিউ। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন ডাক্তারের মুখের ওপর। দূরে দিগন্তের সেই আভাটা পরপর তিনবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল। রাস্তার উপরেই যার দরজা, নিচের তলার এমনি একটা ঘর থেকে বাসন-কোসন নাড়াচাড়ার ক্ষীণ মধুর শব্দ ভেসে আসছিল। বাড়িটার একটা ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ করে দেয়া হল।

—শোনো রিও, তারিউ খুব সাধারণ কণ্ঠে বললেন, তুমি কি ভেবে দেখেছ, কোনোদিন আমার সম্পর্কে কোনোকিছু জানবার চেষ্টা করোনি, জানবার চেষ্টা করোনি আমি লোকটা কে? এইরকম অবস্থায় তোমাকে একজন বন্ধু ভাবা আমার কি উচিত হবে?

—কেন নয়? তুমি তো জানো, আমরা পরস্পরের বন্ধু, তবে হয়তো এই বন্ধুত্ব প্রকাশের সময় এবং সুযোগ এখনও আমাদের হয়ে ওঠেনি।

—বেশ! তোমার কথা শুনে আশ্বস্ত হলাম। ধরো এই বন্ধুত্বের খাতিরে যদি আমরা ঘন্টাখানেকের জন্যে ছুটি নিই!

উত্তরে ডাক্তার রিও শুধু একটু হাসলেন।

—বেশ তাই হবে।

সামনের কয়েকটা রাস্তার পরের ছোট একটা রাস্তার ভিজা ফুটপাতের ধার ঘেঁষে একটা মোটরগাড়ি ছুটে গেল। স্তিমিত একটানা একটা হিসহিস শব্দ ভেসে আসছিল সেখান থেকে। শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল। চারিদিকের নীরবতা ছাপিয়ে দূরে আবার একটা অস্পষ্ট চিৎকার শোনা গেল।

মাথার উপরে নক্ষত্রখচিত আকাশ। পুরু আবরণের মতো যেন শান্তি নেমে এল ধীরে ধীরে তাদের দুজনের ওপর। ইতিমধ্যে তারিউ চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে বারান্দার প্যারাপিটের উপর বসেছিলেন, তারিউ সামনেই বসেছিলেন। ডাক্তার রিও নেতিয়ে পড়েছিলেন চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে। সেই মুহূর্তে ডাক্তার রিওকে মনে হচ্ছিল, উজ্জ্বল আকাশের পটভূমিকায় একটা প্রকাণ্ড অস্বচ্ছ প্রতিমূর্তির মতো। অনেক কথা বলার ছিল আজ তারিউ-র। এরপরে তার যা-কিছু বক্তব্য সেগুলো তার নিজের ভাষায় বলা হচ্ছে :

"শোনো রিও, ব্যাপারটাকে খুব সংক্ষেপে তোমার কাছে বলছি। প্রথমেই জেনে রেখো, এই শহরে আসবার এবং এখানে এসে প্লেগের সাথে পরিচয় ঘটবার বহু আগেই আমাকে একধরনের প্লেগে ধরেছিল। অর্থাৎ এখন এখানকার সবার অবস্থা যা, তা থেকে আমার অবস্থা কিছু একটা ভিন্ন ছিল না। তবে কথা কী জানো, অনেকেই নিজের এই অবস্থা সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়, এই অবস্থার মধ্যেও তারা কেমন নিজেদেরকে মানিয়ে নেয়। আবার এমন বহুলোক আছে যারা নিজেদের অবস্থার গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে। এর আওতা থেকে বার হয়ে যেতে চাই।

ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও সবসময় চেয়েছি এর ভেতর থেকে দূরে সরে যেতে। যখন বয়স কম ছিল, সবকিছুর কলুষতা থেকে নিজেকে মুক্ত বলে ভাবতাম। অর্থাৎ সেই সময় কোনোকিছু সম্পর্কেই সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না আমার। যারা আত্মকেন্দ্রিক অভ্যস্ত আমি তাদের গোত্রের মানুষ নই। জীবন আজও কাটিয়েছি মোটামুটি ভালোভাবেই। যে-কাজেই হাত দিতাম, সহজেই সফলতা লাভ করতাম। বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্রে আমার ছিল সহজ সঞ্চরণ। মেয়েদের সাথেও আমার সম্পর্ক গড়ে উঠত যেন সহজে, ছিন্নও হত তেমনি সহজে। তারপর হঠাৎ একদিন আমিও চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলাম। আর এখন—?

—জেনে রেখো তোমার মতো দারিদ্র্যের ভেতর শৈশব কাটাতে হয়নি। আমার বাবা বড় চাকুরি করতেন—সরকারি কৌঁসুলী তিনি। কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হত তিনি একজন দয়ালু এবং সৎপ্রকৃতির মানুষ। আর আসলে তিনি ছিলেনও তাই। মা ছিলেন অত্যন্ত সরল এবং কিছুটা লাজুক প্রকৃতির মেয়েছেলে। বলাবাহুল্য আমি মাকে অত্যন্ত ভালোবাসতাম। তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলতে চাইনে। বাবা আমার প্রতি সবসময় অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করতেন, হয়তো আমাকে কিছুটা বোঝবার চেষ্টাও করতেন তিনি। কিন্তু আদর্শ স্বামী বলতে যা বুঝায় কোনোদিনও তা ছিলেন না তিনি। এখন সে-ব্যাপারটা বুঝতে পারি, কিন্তু তার জন্যে যে মনে কোনোরকম আঘাত পাই তাও ঠিক নয়। দাম্পত্যজীবনে খুব একটা বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে না-পারলেও তার আচরণ কোনোদিন শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যেত না। যাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক অপবাদের সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো আচরণ কোনোদিনই তিনি করতেন না। অর্থাৎ তেমন কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না তিনি। আজ আর তিনি ইহজগতে নেই, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এগুলো এখন সহজেই অনুমান করতে পারি। নিষ্পাপ দেবত্বের প্রতিমূর্তি না হলেও, মানুষ হিসাবে তিনি মোটামুটি অঙ্ক ছিলেন। সব ব্যাপারেই তিনি মধ্যপথ অনুসরণ করে চলতেন। সেটাই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের সত্যকারের পরিচয়। তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী যার জন্যে সবাই মৃদু অথচ দীর্ঘস্থায়ী স্নেহবোধ করতে পারে। আর এই-ধরনের স্নেহবোধই সাধারণত দীর্ঘদিন টিকে থাকে।

—আমার বাবার একটা বিশেষত্ব অবশ্য ছিল। বড় যে রেলের সময়-তালিকা পাওয়া যায় তা সবসময় বিছানায় তার হাতের গোড়ায় থাকত। এমন নয় যে ট্রেনে চেপে সবসময় তাকে এখানে-ওখানে যেতে হত। তার বাইরে যাবার একমাত্র স্থান ছিল ট্রেটনি, সেখানে ছিল আমাদের গ্রামের বাড়ি, যেখানে প্রতি গ্রীষ্মে আমরা বেড়াতে যেতাম। কিন্তু তিনি ছিলেন যেন একটা চলমান সময়-তালিকা। প্যারিস এবং বার্লিনের মধ্যে যে এক্সপ্রেস-ট্রেন চলাচল করত, তিনি সেই ট্রেন ছাড়ার এবং পৌঁছানোর সময় যে-কোনো মুহূর্তে সঠিক বলে দিতে পারতেন। লিঁও থেকে ওয়ারস যেতে হলে কোথা দিয়ে যেতে হবে, কোন সময় কোন ট্রেন ধরতে হবে, এসব তার কণ্ঠস্থ থাকত। তেমনি যে-কোনো দুটো রেলস্টেশনের মাঝের সঠিক দূরত্বও তিনি যে- কোনো সময় বলে দিতে পারতেন। হঠাৎ যদি কেউ তোমার কাছে ব্রিয়া এবং চ্যাসের দূরত্ব জানতে চায়, বলতে পারবে যে-

আর অন্যকিছুর বা অপর কারো প্রতি আমার আর একটুও লক্ষ্য ছিল না। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন একটা হলদে পেঁচা যে হঠাৎ প্রচুর আলোর মধ্যে এসে পড়ার শঙ্কায় নিজের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছে। তার গলার টাইটাও তার নির্দিষ্ট স্থানে ছিল না। সে নিজের নখ কামড়াচ্ছিল বারে বারে, শুধুমাত্র একটা হাতের নখ, ডান হাতের। এর পরেও আর আমার কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করো? আমি কী ইঙ্গিত করতে চাইছি, নিশ্চয় অনুমান করতে পেরেছ—এই লোকটি ছিল একটা জলজ্যান্ত মানুষ।

—যাই হোক, সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে ছিল একটা আকস্মিক উপলব্ধির মতো। তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এই লোকটা সম্পর্কে চিন্তা করে এসেছি তার সরকারি পরিচয় ধরে, একজন সাধারণ অপরাধী হিসাবে। ঠিক কী কারণে তা অবশ্য এখন হয়তো বলতে পারব না, সেই মুহূর্তে সেখানে আমার বাবার উপস্থিতির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। আকস্মিক হৃদয়ের মর্মস্থলে যেন কিসের একটা খামচা অনুভব করেছিলাম, আমার মনোযোগ ছিল তখন আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানো একমাত্র সেই খুদে লোকটার প্রতি। কে কী বলছে তার কিছুই তখন আর আমার কানে যাচ্ছিল না। শুধু এইটাই উপলব্ধি করছিলাম, উপস্থিত সবাই এই লোকটার প্রাণ নেবার জন্যে একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছে। একটা আদিম অনুভূতি যেন প্রবল জোয়ারের মতো আমাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল অপরাধী এই লোকটার পাশে। আমার বাবা যখন আবার কথা বলার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন শুধু তখনি আবার আমার স্বাভাবিক চেতনা ফিরে এসেছিল।

লাল গাউন পরে আমার বাবা যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ, প্রাত্যহিক জীবনের সেই সৎস্বভাব এবং সহৃদয়তার কোনো ছাপ ছিল না এখন আর তার চেহারায়। দীর্ঘস্ফীত এক-একটা বাক্য বিরামহীন ধারায় সাপের মতো বেরিয়ে আসছিল তার মুখ দিয়ে। বুঝতে পারলাম আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্যে তিনি জুরিদের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। তাদের বোঝাতে চেষ্টা করছেন তাকে সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত করাটা তাদের সামাজিক দায়িত্ব। তিনি এমন দাবিও জানালেন যে শাস্তি হিসাবে আসামির মস্তকচ্ছেদের নির্দেশ দেয়া হোক। অবশ্য এটা সত্যি যে ঠিক এতখানি স্পষ্টভাবে এই দাবি তিনি করেননি। তাকে চরম মূল্য দিতে হবে;—এই ছিল তার দাবি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুটোর ভেতর কতটুকুই বা পার্থক্য ছিল এবং উভয় ক্ষেত্রেই ফল দাঁড়াত তো একই। আসামির মস্তকচ্ছেদের যে দাবি তুলেছিলেন তা শেষপর্যন্ত পূরণ হয়েছিল। অবশ্য মস্তকচ্ছেদের কাজটা আমার বাবাকে নিজের হাতে করতে হয়নি। আগাগোড়া ঘটনাটা দেখার পর ভাগ্যহত এই লোকটার সাথে এমন গভীর এবং ভয়ংকর একধরনের ঘনিষ্ঠতা বোধ করেছিলাম, যে ঘনিষ্ঠতা আমার বাবা নিশ্চয় কোনোদিন এই লোকটার প্রতি অনুভব করেননি। আমরা ভদ্রভাষায় যাকে বলি অন্তিম মুহূর্ত কিন্তু কার্যত যা হচ্ছে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড, এই লোকটার সেই হত্যাকাণ্ডের সময় আমার বাবাকে তার কর্তব্যের অংশ হিসাবে স্বয়ং উপস্থিত থাকতে হয়েছিল।

—এই দিনটার পর থেকে বাবার শখের সেই রেলের সময়-তালিকাটা চোখে পড়লেই, আমার সারাদেহে একটা কঠিন ঘৃণার শিহরণ বয়ে যেত যেন। এরপর থেকে

কোনো স্টেশনমাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলেও তাকে রীতিমতো মাথা চুলকাতে হবে। অথচ আমার বাবাকে এরকম কোনো প্রশ্ন করা হলে সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর এসে যেত। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় দেখতাম তিনি বসে যেতেন এ-বিষয়ে তার জ্ঞানবৃদ্ধির সাধনায় আর এ নিয়ে তার একধরনের গর্ববোধও ছিল। বাবার এই অদ্ভুত শখ দেখে ভারি মজা পেতাম। ভ্রমণ সম্পর্কে নানান জটিল প্রশ্ন করতাম তাকে, তারপর উত্তর পেলে সেগুলো আবার ট্রেনের সময়-তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখতাম। সবসময় দেখতাম তার উত্তর নির্ভুল হয়েছে। প্রতি সন্ধ্যায় আমরা দুজনে রেলভ্রমণের এই অদ্ভুত খেলায় মেতে উঠতাম। তার ফলে আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমার মতো একজন মনোযোগী এবং সমঝদার শ্রোতার প্রয়োজন ছিল হয়তো তার। আর পাঁচটা বিষয়ে পারদর্শিতার মতো তার এই বিশেষ পারদর্শিতাকে আমিও খানিকটা প্রশংসার চোখে দেখতাম।

—না, আমি হয়তো বড়বেশি বাড়িয়ে বলছি তার সম্পর্কে, বড়বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছি তাকে। আমার নিজের মনের যে পরিবর্তনের কথা তোমাকে বলতে যাচ্ছি তাতে আমার বাবার তেমন কোনো অবদান ছিল না। তিনি শুধু আমার মনে একটা সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাধারাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। বয়স আমার তখন সতেরো—বাবা একদিন বললেন কোর্টে গিয়ে তার বক্তৃতা শোনার জন্যে। সে-সময় স্থানীয় সামরিক আদালতে একটা মোকদ্দমার বিচার হচ্ছিল। বাবা হয়তো ভেবেছিলেন, এই বিচারে কৌসুলী হিসাবে তিনি শ্রেষ্ঠ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারবেন আর আমি তা দেখবার সুযোগ পাব। আরো একটা সন্দেহ জাগে আমার মনে। তিনি হয়তো আশা করছিলেন বিচার-আদালতের জাঁকজমক দেখে খুব প্রভাবান্বিত হব এবং আমি নিজেও ওকালতি পেশা হিসাবে গ্রহণ করবার জন্যে উৎসাহ বোধ করব। আমি যাতে এই উপলক্ষে আদালতে যাই এবং সেখানে উপস্থিত থাকি তার জন্যে বাবা খুব উৎসাহ দেখাতে লাগলেন। প্রতিদিন তাকে যেভাবে দেখতাম তা থেকে তার চরিত্রের ভিন্ন একটা দিককে দেখতে পাবার এই সুযোগ আমার মনের কাছেও কেমন একটা আবেদন জাগিয়ে তুলল। শুধুমাত্র এই কারণেই আমি আদালতে সেই বিচার দেখতে গিয়েছিলাম। স্কুলের বক্তৃতার দিন বা ১৪ জুলাইয়ের সামরিক প্যারেড ছিল যেমন প্রত্যাশিত স্বাভাবিক ঘটনা, বিচার আদালতে যেসব জিনিস ঘটত সেগুলোও ছিল অত্যন্ত সাদামাঠা, এ নিয়ে তেমন চিন্তাভাবনাও করিনি আগে কোনোদিন।

—সেদিন আদালতের কার্যবিবরণীর ভেতর যে-জিনিসটা আমার মধ্যে চিরদিনের জন্যে গেঁথে যায় তা হচ্ছে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সেদিনের সেই আসামির ছবি। সে যে সত্যিসত্যিই দোষী ব্যক্তি সে-ব্যাপারে আমার মনের মধ্যে কোথাও এতটুকু সন্দেহ ছিল না। অবশ্য সে যে কী-দোষে দোষী সে-প্রসঙ্গ এখানে সম্পূর্ণ অবান্তর। মাথায় কেমন একধরনের মেটে মেটে অল্প চুল, বছর-ত্রিশেক বয়সের অপরাধী এই খুদে লোকটা তার কৃত অপরাধের জন্যে এবং তার জন্যে তার প্রতি কী শাস্তির বিধান করা হয় না হয়—সেইসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে সে সত্যিই এমনই ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করবার জন্যে এমনই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল যে তার সেই ভাব দেখে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমিও অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম ; তখন

আইনের বিচার মৃত্যুদণ্ড, মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী করা—এগুলো সম্পর্কে একটা ভয়ংকর রকমের আগ্রহ যেন আমাকে পেয়ে বসল এবং তখন শঙ্কার সাথে এটাও উপলব্ধি করলাম এইসব নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সময় অনেকক্ষেত্রেই আমার বাবা সেখানে উপস্থিত থাকতেন। ব্যাপারটা তখন সঠিক অনুমান করতে পারিনি বটে তবে দেখেছি এইসব দিনগুলোয়ই তিনি সাধারণত খুব সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠতেন। আরো মনে পড়ে খুব সকালে জাগবার জন্যে এইসব দিনে তিনি ঘড়িতে এ্যালার্ম দিয়ে রাখতেন। বিষয়টা নিয়ে মা'র সাথে কোনোরকম আলাপ-আলোচনা করার সাহস জোগায়নি। তবে এখন থেকে মাকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করতাম। এটা বুঝেছিলাম, তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের আর কোনো অর্থই ছিল না, তার কাছে অনেক আগেই মা এ-ব্যাপারে সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটুকু অনুভব করার পর মাকে ক্ষমা করি, অন্তত সেইভাবে তখন ব্যাপারটা নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছি ক্ষমা করবার মতো তেমন কিছুই ছিল না এর ভেতর। বিয়ের আগে পর্যন্ত আমার মা'র জীবন কেটেছিল ভয়ংকর দারিদ্র্যের ভেতর, আর তা থেকে তিনি শিখেছিলেন নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে।

—হয়তো ভাবছ এর পরেই বলব যে আমি গৃহত্যাগ করে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু না, ঠিক তেমন কিছু ঘটেনি, তার পরেও দীর্ঘ কয়েক মাস, প্রায় বছরখানেক বাড়িতেই ছিলাম। তারপর হঠাৎ একদিন বাবা আমার কাছ থেকে এ্যালার্মঘড়িটা চাইলেন, কারণ পরের দিন খুব ভোরে তাকে ঘুম থেকে উঠতে হবে। সেদিন সত্যিই সারাটা রাত আমি একটুও নিদ্রা যেতে পারিনি। পরের দিন বাবা যখন বাসায় ফেরেন আমি তার অনেক আগেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছি।

—পরের ঘটনাগুলো যথাসম্ভব সংক্ষেপ করে বলছি। বাইরে থাকাকালে বাবার কাছ থেকে হঠাৎ একদিন একটা চিঠি পেলাম। আমাকে খুঁজে বের করবার জন্যে তিনি ইতিমধ্যেই অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন। সেইসূত্রে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। আমার পালিয়ে যাবার কোনোরকম কারণ না-দেখিয়েই শান্তভাবে তাকে জানিয়ে দিলাম, তিনি যদি আমাকে ফিরে আসতে বাধ্য করেন তাহলে আত্মহত্যা করব। শেষপর্যন্ত তিনি আমাকে আমার নিজের বেছে নেয়া পথে চলতে দিতে সম্মত হলেন। আগেই বলেছি অন্তরের দিক থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু মানুষ। আমার নিজের জীবন আমি নিজেই বেছে নেব, এটা যে সম্পূর্ণ মূর্খের চিন্তা সে-ব্যাপারে তিনি আমার ওপর একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে ছাড়লেন না এবং এই ধরনের প্রচুর উপদেশও দিলেন। এইভাবেই তিনি আমার তখনকার আচরণের ব্যাখ্যা করলেন, এবং মনে হয় আমিও তার সাথে খুব একটা প্রতারণা করিনি। তবে এটুকু বুঝেছিলাম তিনি মনে-মনে খুব একটা আঘাত পেয়েছেন। শুধু চোখের পানি ঠেকিয়ে রাখবার জন্যেই তার এতসব চেষ্টা। পরের দিকে অবশ্য বেশকিছু সময় পরে মাঝে মাঝে বাসায় গিয়ে মা'র সাথে দেখা করে আসবার একটা অভ্যাস গড়ে তুলেছিলাম। এই উপলক্ষে বাসায় গেলে বাবার সাথেও দেখা হত। মনে হয় মাঝে মাঝে মিশলে এই-যে একটা দেখাসাক্ষাৎ হত তাতেই বাবা খুশি ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তার প্রতি আমার মনে কোনো বিরূপ

মনোভাব ছিল না; তবে মনে-মনে কেমন একটা বোধ ছিল এই যা। বাবা মারা যাবার পর মাকে আমার নিজের কাছেই নিয়ে আসি। বেঁচে থাকলে হয়তো এখনও তিনি আমার সঙ্গেই থাকতেন।

—কীভাবে জীবন শুরু করি সেটা বলা প্রয়োজন, কারণ আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্রপাত এখান থেকেই। অবশ্য এখন থেকে আমার কথা আরো দ্রুত বলে যাবার চেষ্টা করব। বয়স যখন আঠারো তখন দারিদ্র্যের সাথে আমার প্রথম পরিচয়, তার আগে পর্যন্ত মোটামুটি সহজভাবে জীবন কাটিয়ে এসেছি। একের-পর-এক অনেক রকমের কাজ করবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কোনোটাতেই যে খুব একটা খারাপ করেছিলাম বলে তো মনে হয় না। কিন্তু তখন এ-ব্যাপারে আমার সত্যিকারের আগ্রহ ছিল যা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ডাদেশ : আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সেই-যে অন্ধ প্যাঁচাটাকে একদিন দেখেছিলাম তারই সাথে বোঝাপড়া করে নিতে চেয়েছিলাম জীবনে। সাধারণ কথায় যেমন বলে, আন্দোলন করা তাই শুরু করলাম এখন থেকে। খুব একটা ক্ষতিকর বা বিপজ্জনক তেমন কিছু যে করতে চাই না সেটা আমার কাছে ছিল সুস্পষ্ট। আমার কাছে মনে হত আমাদের চারপাশের সমস্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠছে এই অন্যায় মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার ওপর। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত এই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার অর্থ ছিল আমার কাছে এই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এটাই ছিল আমার সত্যাদর্শ। পরেও আমাকে তাই বলতেন, এবং এখনও আমার ধারণা আমার এই বিশ্বাস অনেকখানি সত্যি। যাদের তখন ভালোবাসতাম, এবং সত্যি কথা বলতে কী তাদের প্রতি আমার সেই ভালোবাসা আজো অক্ষুণ্ন রয়ে গেছে, এমন এক দলের সাথে আমি যোগ দিই। আমার জীবনের দীর্ঘসময় কেটেছে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায়। ইউরোপে এমন খুব কম দেশই আছে যেখানকার গণআন্দোলনে আমি কিছু-না-কিছু অংশ নিইনি। কিন্তু সেসব কথা এখন থাক।

—বলা বাহুল্য, অবশ্য জানতাম যে আমাদেরও মাঝে মাঝে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিতে হত। কিন্তু আমাদের বোঝানো হত যে যেখানে মৃত্যুদণ্ডাদেশ বলে কিছুই থাকবে না, এমন যে পৃথিবীর স্বপ্ন আমরা দেখতে থাকি তাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে এই ধরনের কিছু কিছু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কথাটা হয়তো খানিকটা সত্যি—অথবা হয়তো এমনও হতে পারে যে সত্যের পারস্পরিক গুরুত্ব বিচারের প্রশ্ন যখন ওঠে, তখনও যে নিজের আদর্শটাকেই আঁকড়ে থাকব, এতখানি দৃঢ়তা হয়তো আমার ছিল না। কারণ যাই হোক, আমার মনের ভেতর তখন সংশয় জাগতে শুরু করেছিল। তাছাড়া আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সেই প্যাঁচাটার কথা আমার স্মরণ ছিল, তার ফলে মনের ওপর একজনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী করা হল। ব্যাপারটা ঘটেছিল হাঙ্গেরিতে। সেই দ্বিধান্বিত ভাবটা রয়েই গেল। তারপর আসল সেই দিনটা যেদিন আমার চোখের

অল্পবয়সে একদিন বিভীষিকার অনুভূতি আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, সেই একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটল আমার জীবনে—সবকিছু যেন ঘুরতে থাকল আমার দৃষ্টির সামনে।

—একজন লোককে চোখ বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গুলি করে হত্যা করতে দেখেছ

কোনোদিন তোমার চোখের সামনে? না, নিশ্চয় তেমন সুযোগ তোমার জীবনে আসেনি, কারণ সেখানে যাদেরকে উপস্থিত থাকতে দেয়া হয় তাদেরকে হাতে বেছে নেয়া হয়। সেটা অনেকটা খুব ঘনিষ্ঠ লোকদের একত্রে মিলবার একটা উপলক্ষের মতো, সেখানে যোগ দেবার জন্য তোমাকে নিমন্ত্রণ পেতে হবে। অর্থাৎ এসব সম্পর্কে তোমার যা-কিছু চিন্তা বা ধারণা তার সবই বই এবং ছবির মাধ্যমে পাওয়া। পুরোভাগে দাঁড়-করানো একটা পোস্ট, তারই সামনে অপেক্ষমাণ চোখবাঁধা একজন মানুষ আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বন্দুকধারী কিছুসংখ্যক সৈনিক। প্রকৃত ঘটনার সাথে কিন্তু এর কোথাও মিল নেই। তুমি কি জানো বধ্যভূমিতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত লোকটাকে আর তাকে যারা গুলি করে হত্যা করবে সেই বন্দুকধারী সৈনিকদেরকে পরস্পরের থেকে মাত্র দেড়গজ দূরে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়! কল্পনা করতে পারো, এই অবস্থায় আসামি লোকটা যদি মাত্র দু-পাও সামনের দিকে এগিয়ে আসে তাহলে বন্দুকের নল দিয়ে ঠেকবে তার বুকে? আর এই সামান্য দূরত্ব থেকে সৈনিকরা তার বুকের যে-জায়গাটায় হৃদযন্ত্রটা থাকে সেই স্থানটা লক্ষ্য করে একত্রে কয়েকজনে মিলে গুলি ছোড়ে। সাথে সাথে আসামি লোকটার বুকের ওপর যে-ছিদ্রটা দেখা দেয় তার ভেতর দিয়ে হাতের একটা আস্ত মুঠো ঢুকিয়ে দেয়া যায়। এগুলো কিছুই নিশ্চয় তুমি জানতে না। এগুলো সম্পর্কে কেউ কোনোদিন কাউকে কিছু বলে না। যারা প্লেগে ভুগছে তাদের মানসিক শান্তি বজায় রাখাটা একজন মানুষের জীবনরক্ষার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন। যারা ভদ্রলোক মানুষ তারা যাতে নির্বিঘ্নে নিদ্রা যেতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে, তাই নয় কি? এইসব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে যদি আরো দীর্ঘ সময় ধরে ভেনাতে থাকি তাহলে নিশ্চয় একটা মারাত্মক রকমের কুরুচির পরিচয় দেয়া হবে। এবং সেটা খুবই সাধারণ কথা। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের কথাই যদি বলি, এরপর থেকে কোনো রাতেই আমি শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারিনি। এই তিক্ত স্বাদ বরাবরই যেন আমার মুখে লেগে রয়ে গেছে, আমি এইসব খুঁটিনাটি নিয়ে নিজের মনের মতো নাড়াচাড়া করি, নীরবে চিন্তাভাবনা করি অনুক্ষণ।

—এইভাবে ক্রমে উপলব্ধি করি যে দীর্ঘ সময় ধরে আমি নিজেও একধরনের প্লেগে ভুগি, যদিও সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে আমি বরাবর সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে এসেছি যে এরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছি। আরো উপলব্ধি করি আমি নিজেও পরোক্ষভাবে হলেও হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্যে দায়ী। এবং যেসব কাজ এবং নীতি এই ধরনের পরিণতির জন্যে দায়ী তাদের পেছনে সমর্থন জুগিয়ে আমি নিজেও এইসব হত্যার কাজে সাহায্য করেছি। কিন্তু এই ধরনের চিন্তা অপর কাউকে বিব্রত করছে বলে মনে হয় না, অন্তত মুখে তারা তা স্বেচ্ছায় কোনোদিন প্রকাশ করে না। কিন্তু আমার নিজের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন, একবার যা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি তা যেন আমার কণ্ঠে আটকে যায়। সবার সাথে একত্রে বাস করলেও আমার জীবন ছিল সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। যখন আমার মনের কথা অপর সবাইকে জানাতাম, তারা আমাকে বলত এমন ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে এমন এত খুঁতখুঁতে ভাব দেখানো উচিত নয়। যে মহত্তর আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্যে আমরা সংগ্রাম করেছিলাম, তারই কথা স্মরণ

করতে বলত আমাকে। এসব যাতে সহজে গলাধঃকরণ করতে পারি তার পক্ষে যুক্তিও দেখাত তারা। কোনো-কোনো সময় তাদের এই যুক্তিগুলোকে খুব মোক্ষম বলেও মনে হত আমার কাছে, কিন্তু যা আমার কণ্ঠে আটকে গিয়েছিল তাকে আমি কিছুতেই নিচের দিকে নামাতে পারিনি। উত্তরে কখনো কখনো বলতাম এই প্লেগ-আক্রান্ত ব্যক্তিদের ভেতর যারা সবচেয়ে খ্যাতিমান, যারা লাল পোশাক পরেন, নিজেদের আচরণের পক্ষে দেবার মতো চমৎকার যুক্তি তাদেরও থাকে, আর যারা অপেক্ষাকৃত কম খ্যাতিমান তাদের দেয়া প্রয়োজন এবং অবস্থার পরিপাকের এই যুক্তি যদি একবার মেনে নিই, তাহলে খ্যাতিমানদের দেয়া যুক্তিগুলো বাতিল করে দেয়া আর কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না। এর জবাবে তারা বলতেন, লাল পোশাক পরার খেলাটা খেলবার সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় হচ্ছে মৃত্যুদণ্ডের একচেটিয়া অধিকার তাদের হাতেই ছেড়ে দেয়া—উত্তরে আমি বলতাম, একবার যদি তা মেনে নিই তারপর সেটাই যে বরাবর চলতে থাকবে না তার কোনো নিশ্চয়তা আছে কি? এখন দেখা যাচ্ছে ইতিহাসের রায় আমার পক্ষে, কে সবচেয়ে বেশি মানুষকে হত্যা করতে পারে এই নিয়ে এখন রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এই নরহত্যার ব্যাপারে তারা যেন সবাই উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—এখন হাজার চাইলেও তা আর বন্ধ করা সম্ভব নয়।

—যাই হোক, যুক্তিতর্ক করাটাই তখন আমার কাছে বড় কথা ছিল না। আমার যা-কিছু উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ তার সবটাই ছিল সেই হতভাগ্য পাঁচাটাকে নিয়ে, সেই কলুষিত পদ্ধতিকে নিয়ে যার বিধান অনুসারে প্লেগের গন্ধ বার হচ্ছে, এমনি সব অপরিচ্ছন্ন মুখ দিয়ে প্রত্যেকটা বন্দি আসামিকে জানিয়ে দেয়া হয় যে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে, এবং এমন বৈজ্ঞানিক নিপুণতার সাথে প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করা হয় যার ফলে রাতের-পর-রাত অতিম মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে সেই কয়েদিকে অপেক্ষা করে থাকতে হয় সেই দিনটির জন্যে যেদিন তাকে নির্বিকার চিত্তে হত্যা করা হবে। মোটের ওপর আমার দুর্ভাবনা ছিল গুলিবিদ্ধ বুকের সেই বড় গর্তটাকে নিয়ে। আমি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে যতদিন মনের ভেতর এই উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগ থাকবে ততদিন অন্তত যা এই নৃশংস হত্যাকারীদেরকে সমর্থন করে এমন কোনো যুক্তিই আমাকে দিয়ে গ্রহণ করানো যাবে না। হ্যাঁ, কতকটা অন্ধভাবেই আমি এই একগুঁয়েমি মনোভাব বজায় রেখে চললাম আর অপেক্ষা করতে থাকলাম সেইদিনটির জন্যে যখন আমার সামনের পথ আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।
সেইদিনটির জন্যে যখন আমার সামনের পথ আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। বছরের-পর-বছর ধরে মনে-

—আজো আমার সেই মনোভাবের পরিবর্তন হয়নি। বছরের-পর-বছর ধরে মনে-মনে লজ্জা অনুভব করে আসছি। সাংঘাতিক রকমের লজ্জা অনুভব করে আসছি যে, অন্তরে যত সদিচ্ছাই থাক, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, আমি নিজেও এই হত্যাকারীদেরই একজন। পরবর্তীকালে হয়তো এইটুকু উপলব্ধি হয়েছে যে পৃথিবীতে যাদের আমরা কিছুটা উন্নতমনা বলে ভাবি, তাদের এখন আর এই খুন না করে পারে না—কখনো নিজে করে আর কখনো-বা অপরকে খুনের জন্যে প্ররোচনা দেয়, কারণ এটাই হচ্ছে তাদের কাছে বাঁচার যুক্তি। আর এটাও উপলব্ধি করেছি যে পৃথিবীতে অনেক সময় আমাদের সামান্য অঙ্গুলি-হেলনেও কারো-না-কারো মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। তারপর

কথাগুলো বলা শেষ করে তারিউ তার পা দোলাতে লাগলেন, পায়ের গোড়ালি দিয়ে আস্তে করে চাপ দিতে লাগলেন প্যারাপিটের ওপর। অল্পকিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ডাক্তার রিও নিজের চেয়ারে একটু উঁচু হয়ে বসলেন, তারিউকে জিজ্ঞাসা করলেন, শান্তিলাভের জন্যে মানুষের কোন পথ অনুসরণ করা উচিত সে-সম্পর্কে তার কোনো ধারণা আছে কিনা।

—হ্যাঁ, তারিউ জবাবে বললেন, সে পথ হচ্ছে সহানুভূতির পথ।

দূরে রাস্তা দিয়ে দুটো এ্যাম্বুলেন্স ছুটে যাচ্ছিল, একটানা যান্ত্রিক শব্দ ভেসে আসছিল তার। দূর থেকে বিচ্ছিন্ন চিৎকারের যে-শব্দ শোনা যাচ্ছিল, সেগুলো যেন শহরের প্রান্তদেশে শিলার পাহাড়টার কাছে এসে একত্র হল এবং কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতে সেখান থেকে বন্দুকের গুলির আওয়াজ বেজে উঠল। তারপর আবার চারিদিকে নিস্তব্ধতা নেমে এল। ডাক্তার রিও শুনলেন দূরে লাইটহাউসের সেই ঘূর্ণায়মান আলোটা দুবার চমক দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এতক্ষণ ধরে ঝিরঝিরে যে একটা মৃদু বাতাস বইছিল সেটা যেন আর একটু জোরে বইতে শুরু করল এবং অল্প পরেই সমুদ্র থেকে একটা দমকা হাওয়া উঠে এসে আশেপাশের বাতাসকে লোনা গন্ধে ভরিয়ে তুলল। ঠিক এমনি সময় তারা শুনতে পেল ছলাৎ ছলাৎ শব্দে সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের পাদদেশে।

—ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম—তারিউ কেমন একটা নির্বিকারভাবে বলে গেলেন—আমার এখানকার একমাত্র আগ্রহ হচ্ছে মানুষ কীভাবে মহাপুরুষের পর্যায়ে উন্নীত হয় তা জানা।

—কিন্তু তুমি তো স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করো না।

—কথাটা অবশ্য ঠিকই যেখানে স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই সেখানে মহাপুরুষের স্থান কোথায়? সমস্যাটা তো সেইখানেই। আর বাস্তবিকই, আজকে আমাদের একমাত্র সমস্যা হচ্ছে এটাই।

যে-জায়গাটা থেকে শব্দ ভেসে আসছিল, তার ওপর হঠাৎ একটা উজ্জ্বল আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ল। বাতাসের বাধা পেরিয়ে অনেকগুলো কণ্ঠের কোলাহল শোনা গেল আকস্মিক। দেখতে দেখতে আবার সেই আলোটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু একটা মরা মরা লালচে আভা ছড়িয়ে রইল এখনও আকাশে। তারপর আবার একটু জোরে বাতাস বইতে শুরু করতেই তারা পরিষ্কার কতকগুলো কণ্ঠের মিলিত কোলাহল শুনতে পেল এবং ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গে একটা বন্দুকের গুলির আওয়াজ এবং কিছুক্ষণ বাদেই আবার শুনতে পেল ক্রুদ্ধ জনতার চিৎকার। তারিউ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কান পেতে রইল। কিন্তু আর কিছুই শোনা গেল না।

—শহরের বাইরে যাবার গেটের সামনে নিশ্চয় আবার কোনো গোলযোগ বেধেছে।

—হ্যাঁ, তা হবে, তবে এতক্ষণে সব মিটে গেছে বলে মনে হয়—ডাক্তার রিও বললেন।

তারিউ আপনমনে নিচুগলায় বলে গেলেন—এসব গোলমাল কোনোদিনই মিটবে না বরং আরো লোক মারা পড়বে, কারণ সেটাই হচ্ছে প্রকৃতির বিধান।

—হয়তো তাই, তোমার কথাই ঠিক—ডাক্তার বললেন—তবে কি জানো, আমি

সত্যিকারের সহানুভূতি বোধ করি তাদের জন্যে, যারা জীবনে পরাজিত; মহাপুরুষদের জন্য ততটা নয়। এই-যে বীরত্বের কথা বলো, শুচিতার কথা বলো, এগুলোর আমার অন্তরের কাছে কোনো আবেদন নেই। আমি যে মানুষ, সাধারণ একজন মানুষ হয়ে জন্মেছি, সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে আগ্রহের বস্তু। হ্যাঁ, আমাদের দুজনেরই লক্ষ্য হয়তো এক, শুধু তোমার মতো কোনো উঁচু আকাঙ্ক্ষা আমার নেই।

রিও ভাবলেন, তারিউ বোধহয় চাটা করতে চাইছেন। তিনি হাসিমুখে তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়ালেন, কিন্তু সন্ধ্যার আকাশের অস্পষ্ট আভায় যে-মুখটা তার সামনে ফুটে উঠল তাতে তিনি দেখলেন যুগপৎ বিষাদ এবং আন্তরিকতার ছাপ। আবার একঝলক বাতাস এসে লাগল তাদের দেহে, এবারের বাতাসটা ডাক্তার রিও-র কাছে কিছুটা গরম বলে মনে হল। তারিউ তার দেহটায় একবার ঝাঁকানি দিলেন।

—কী মনে হচ্ছে তোমার? তারিউ বললেন—বন্ধুত্বের খাতিরে এখন আমাদের কী করা উচিত বলে তোমার ধারণা!

—তুমি যা চাও তাই করব তারিউ।

—চলো, কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে আসি। এটা এমন একটা নির্দোষ আনন্দ যা ভাবী মহাপুরুষরাও উপভোগ করতে পারেন। তোমার কী মত?

ডাক্তার রিও আবার একটু হাসলেন এবং তারিউ বলে চললেন—কাছে যখন পরিচয়পত্র রয়েছে, আমরা অনায়াসে বাইরে জেটি পর্যন্ত যেতে পারি। দিনরাত এই প্লেগের মাঝে বসে থাকা আর প্লেগের কথা চিন্তা করা—এটা সত্যিই মস্ত আহাম্মকি। প্লেগের শিকার যারা তাদের বাঁচাবার জন্য সংগ্রাম অবশ্যই আমাদের করে যেতে হবে। কিন্তু তার বাইরে কিছু যদি একেবারেই ভাবতে না পারি তাহলে সে-সংগ্রামও তো একদিন অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে।

—ঠিক বলেছ—ডাক্তার রিও বললেন—চলো যাই দেখি।

মিনিট কয়েক পরে তাদের গাড়িটা বন্দরের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। আকাশে ঢলঢলে পূর্ণিমার চাঁদ জ্বলজ্বল করছিল, একটা মৃদু শুভ্র উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়ছিল চারপাশে। তার মাঝে মাঝে ছিল ছায়ার আল্পনা। পেছনে পড়েছিল শহর, সেখানে চোখে পড়ছিল স্তরে-স্তরে সাজানো বাড়িঘর। শহরের ভেতর থেকে গরম দুর্গন্ধ বাতাস এসে লাগছিল তাদের দেহে, যেন সামনে সমুদ্রের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের। গেটে পৌঁছে পাহারাদারকে তাদের পরিচয়পত্র দেখালেন, সে সেগুলো তাদের হাত থেকে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখে আবার তাদের হাতে ফিরিয়ে দিল। গেটের বাইরে বড় বড় পিপা ছড়ানো কিছুটা খোলা জায়গা, সেটা পেরিয়ে তারা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চললেন। এখানকার বাতাস মদ আর মাছের আঁষটে গন্ধে ভারী। বন্দরে পৌঁছানোর ঠিক পূর্বে আইডিন এবং সামুদ্রিক আগাছার গন্ধ ভেসে এল তাদের নাকে। তা থেকে তারা বুঝতে পারলেন সমুদ্রের কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন—ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বড় বড় উপলখণ্ডের ওপর।

জেটির উপর এসে উঠতেই দেখতে পেলেন সামনে বিস্তৃত সমুদ্র, যেন স্তরে-স্তরে সাজানো কোমল মখমল, ধীরে ধীরে আন্দোলিত হচ্ছে, বন্যজন্তুর লোমশ দেহের মতো

নমনীয় আর মসৃণ। তাঁরা একটা বড় প্রস্তরখণ্ডের উপর বসলেন সামনের দিকে মুখ করে। ধীরে ধীরে উঠছে আর নামছে সমুদ্রের জলরাশি আর তাদের শান্ত ওঠানামার সাথে সাথে তেলের মতো চিকচিক করে উঠছে আলোর প্রতিফলন, কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে যাচ্ছে সেই প্রতিফলন, তারপর অসংখ্য প্রতিফলন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, দূরে অস্বচ্ছতার মাঝে মিলিয়ে যাচ্ছে। তাদের সামনে অনন্ত দিগন্তব্যাপী ঘন অন্ধকার। রোদে বৃষ্টিতে ক্ষয়প্রাপ্ত এবড়োখেবড়ো প্রস্তরখণ্ডের স্পর্শ অনুভব করলেন ডাক্তার রিও তাঁর হাতের তালুতে। আকস্মিক অদ্ভুত খুশিতে তাঁর মন ভরে উঠল। তারিউর দিকে ফিরতেই তার মুখের ওপরও দেখলেন সেই একই প্রশান্তির প্রতিফলন, যে প্রশান্তির মাঝে মানুষ কোনোকিছুকেই বিস্মৃত হতে চায় না, এমনকি হত্যাকাণ্ডকেও না।

পরনের কাপড়চোপড় খুলে রাখলেন তারা। ডাক্তার রিওই প্রথম পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুব দিলেন। হিমের প্রথম স্পর্শের আকস্মিকতা কেটে যাবার পর আবার যখন পানির উপর ভেসে উঠলেন, দেখলেন হিমের সেই তীক্ষ্ণতা আর নেই, পানির উপরভাগটা মৃদু উষ্ণ মনে হল। কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর রাতের সেই সমুদ্রকে বেশ উষ্ণ বলেই মনে হল তার কাছে। গ্রীষ্মের দীর্ঘদিনের উত্তপ্ত তটের সঞ্চিত উত্তাপকে বুকে নিয়ে শরতের যেসব সমুদ্র তাদের দেহের উষ্ণতাকে বাড়িয়ে তোলে, এও ছিল যেন তেমনি উষ্ণ।

একভাবে সাঁতার কাটতে কাটতে ডাক্তার রিও সামনের দিকে এগিয়ে চললেন, তারপর সঞ্চালনের ফলে ফেনার একটা রেখা যেন চিহ্নিত করে দিচ্ছিল তার গতিপথকে। সমুদ্রের জল তার দুবাহুর ভেতর দিয়ে গলে গলে গিয়ে যেন তার দুখানা পা-কে কোমলভাবে জড়িয়ে ধরছিল। পেছনে জল উছলে ওঠার শব্দ থেকে তিনি অনুমান করলেন তারিউ পানির ওপর ঝাঁপ দিলেন। রিও চিৎ হয়ে নিশ্চল পড়ে রইলেন পানির ওপর। মাথার উপর বিশাল আকার গম্বুজের মতো আকাশের ছাউনি, চাঁদ আর অসংখ্য তারার আলোয় ঝলমল করছে। ডাক্তার রিও একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন সেইদিকে। তিনি বড় করে শ্বাস নেবার চেষ্টা করলেন একবার। এবার পানির ওপর আঘাতের শব্দ শুনতে পেলেন। শব্দ ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠতে থাকল। রাতের শূন্য নীরবতার ভেতর থেকে অদ্ভুত স্পষ্টভাবে শোনা যেতে লাগল সেই শব্দ। তারিউ তার কাছাকাছি এগিয়ে আসছিলেন, ডাক্তার রিও তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন।

ডাক্তার রিও আবার উপুড় হলেন। দুই বন্ধু পাশাপাশি সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে চললেন। দুজনের পা একই তালে পড়তে লাগল জলের ওপর। তারিউ তার চেয়ে অনেক ভালো সাঁতারু। কাজেই তার সঙ্গে সমতা রক্ষার জন্যে ডাক্তার রিও সাঁতারের গতি বাড়িয়ে দিলেন। বেশ-কয়েক মিনিট ধরে তাঁরা দুজনে একইভাবে পাশাপাশি সাঁতার কেটে চললেন। দুজনের অন্তরেই সমান উৎসাহ। একই তালে পা পড়ছিল তাদের দুজনের। বাইরের পৃথিবী থেকে এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন তাঁরা। শহরের দূষিত পরিবেশ আর প্লেগের ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত।

ডাক্তার রিওই প্রথম থামলেন। আবার তাঁরা জেটির দিকে ফিরলেন ধীরে ধীরে। একজায়গায় এসে হঠাৎ বরফের মতো হিম স্রোতের মাঝখানে পড়ে গেলেন দুজনে।

সমুদ্রের এই অতর্কিত ফাঁদের মধ্যে পড়ে গিয়ে তাঁদের দুজনেরই শক্তি যেন চাড়া দিয়ে উঠল, আরো জোরে জোরে হাত-পা ছুড়তে থাকলেন তাঁরা।

জেটিতে উঠে কাপড়চোপড় পরে নিয়ে আবার তাঁরা শহরের দিকে ফিরলেন। দুজনেই নীরব, কিন্তু দুজনেই সচেতন যে সেই মুহূর্তে তারা একাত্ম, তাদের ভেতরের সব ব্যবধান যেন ঘুচে গেছে। আজকের রাতের এই স্মৃতি চিরদিন তাঁদের হৃদয়ের মণিকোঠায় অম্লান হয়ে থাকবে।

শহরের গেটে পৌঁছে পাহারাদারের ওপর যখন আবার তাদের নজর পড়ল, ডাক্তার রিও অনুমান করলেন তারিউ নিশ্চয় তারই মতো ভাবছে যে সাময়িকভাবে হলেও প্লেগের ছোঁয়াচ থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছিল এবং সেইটুকুই ছিল তাদের জন্যে মঙ্গল। এখন আবার কাজের দায়িত্বভার তুলে নিতে হবে তাদের।

৭

হ্যাঁ, বাস্তবিকই, প্লেগ যেন অল্প কিছুক্ষণের জন্যে অবকাশ দিয়েছিল তাদের, আবার সেই পুরোনো দায়িত্বভার তুলে নিতে হল তাদের। সারাটা ডিসেম্বর ধরে শহরবাসীদের অন্তরে যেন ধিকিধিকি করে জ্বলতে থাকল প্লেগের আগুন। শহরের বাইরের সেই শবদাহ করবার যন্ত্রটার খোরাক জুগিয়ে চলল প্লেগ আর শত শত মানুষকে সে রোগাক্রান্ত অবস্থায় গৃহহারা করে পাঠাল ক্যাম্পে ক্যাম্পে। ঝাঁকি দিতে দিতে নির্ভুলভাবে নিজের পথে প্লেগের সেই-যে এগিয়ে যাওয়া তার আর কোনো বিরাম হল না যেন। শাসন-কর্তৃপক্ষ আশা করছিল, শীত শুরু হলে হয়তো প্লেগের এই একটানা অগ্রগতি কিছুটা বাধা পাবে, কিন্তু শীতের প্রথম ঝলকটা পার হয়ে গেল তবুও প্লেগের আক্রমণের একটুকু উপশম হতে দেখা গেল না। সুতরাং সেই অবস্থায় সবার জন্যে একমাত্র পথ রইল নীরবে অপেক্ষা করে যাওয়া। আর দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর মানুষ যেমন ভরসা ছেড়ে দেয় তেমনি সবরকমের আশা ত্যাগ করে সারা শহরের লোক এমনভাবে বেঁচে রইল যেন তাদের সামনে ভবিষ্যৎ বলে কিছু ছিল না। শান্তি এবং বন্ধুত্ব লাভের যে সামান্য অবকাশ ডাক্তার রিও-র জীবনে ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তির সুযোগ আর এল না। তার পুনরাবৃত্তির সুযোগও ছিল না। শহরে আর একটা নতুন হাসপাতাল খোলা হল। এখন ডাক্তার রিও-র কথাবার্তা বলার সুযোগ ছিল শুধু রোগীদের সঙ্গে। ক্রমেই নিউমোনিয়া প্লেগের রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় এই সময়টায়ই তিনি একটা নতুন পরিবর্তন লক্ষ্য করতে থাকলেন। তাদের নিজের নিজের মতো করে প্লেগের রোগীরা এখন সব ব্যাপারেই যেন ডাক্তার রিও যেটা করতেন সেটাকেই মেনে নিতে শুরু করেছিল। প্লেগের প্রথমদিকে তারা যেমন রোগ-সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে কেমন নেতিয়ে-পড়া ভাব দেখাত বা কেমন একটা উন্মত্ত ভাব দেখাত, এখন তার বদলে তারা নিজেরাই যেন পরিষ্কার বুঝতে পারত তাদের সত্যিকারের স্বার্থ কোনখানে। এখন তারা নিজেরাই আগ্রহ দেখিয়ে ডাক্তার রিও-র কাছে জানতে চাইত কোন্ জিনিসটাতে তাদের সত্যিকারের উপকার হবে। যাতে তাদের সবসময় পাশাপাশি

থেকে লজ্জায় ক্ষোভে অন্তর ভরে আছে। সেদিন থেকে উপলব্ধি করেছি আমরা সবাই যেন প্লেগে ভুগছি। মানসিক শান্তি হারিয়ে ফেলছি সেদিন থেকে। আজো সেই শান্তি ফিরে পাবার চেষ্টা করে চলেছি, চেষ্টা করে চলেছি অন্যদের বোঝাবার যাতে কারো মারাত্মক শত্রু হয়ে না বসি। শুধু এইটুকু বুঝেছি যে, এই প্লেগের ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আমাকে কিছু-না-কিছু একটা করে যেতে হবে। হয়তো শুধুমাত্র এই পথেই কিছুটা মানসিক শান্তি ফিরে পেতে পারি, আর যদি তা নাই-ই সম্ভব হয় তাহলে অন্তত মৃত্যুটা অতটা নোংরাভাবে হবে না। হয়তো এর দ্বারা শুধুমাত্র এই পথেই অপরের বেদনার কিছুটা লাঘবও করতে পারি। এবং হয়তো মানুষকে বাঁচাতে না-পারলেও তাদের তেমন কোনো ক্ষতিসাধন করতে হবে না, এমনকি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এর দ্বারা কিছুটা কল্যাণও হতে পারে মানুষের। সুতরাং এখন স্থির করেছি যে প্রত্যক্ষভাবেই হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক, মহৎ কোনো উদ্দেশ্যের জন্যেই হোক আর অসৎ কোনো লক্ষ্যের জন্যে হোক, মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে বা মৃত্যুর সহায়ক হতে পারে এমন কোনোকিছুর সঙ্গেই আর নিজেকে জড়িত হতে দেব না।

—আর এই কারণেই হয়তো এই দুর্বিপাক থেকে আমি নতুন কোনো শিক্ষালাভ করিনি। যেটুকু শিখেছি তা হচ্ছে আমার এখানকার কর্তব্য হচ্ছে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। আমি নিশ্চিত করে জানি—হ্যাঁ, রিও, আমি খুব জোরের সাথেই বলতে পারি, পৃথিবীতে বোধ হয় এমন কিছুই নেই যার সম্পর্কে আমাকে নতুন করে জানতে হবে, শিখতে হবে, আর সেটা তুমি নিজেও নিশ্চয় অনুধাবন করতে পেরেছ। আমি নিশ্চিত জানি পৃথিবীতে আমরা সবাই অসুস্থ, সবাই প্লেগে ভুগছি, এমন কেউ নেই। সত্যিই এমন কেউ নেই যে এই রোগের ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পেরেছে। আর আমি এও বুঝেছি যে নিরন্তর আমাদের প্রত্যেকের নিজের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, পাছে হঠাৎ অসতর্ক মুহূর্তে কারো মুখের ওপর এমন নিশ্বাস ফেলি যা থেকে তার দেহে এই প্লেগের বীজাণু সংক্রমিত হয়ে যায়। পৃথিবীতে একমাত্র স্বাভাবিক জিনিস হচ্ছে প্লেগের বীজাণু। বাকি যা-কিছু—স্বাস্থ্য বলো, চারিত্রিক দৃঢ়তা বলো, শুচিতা বলো—সবই মানসিক প্রচেষ্টার ফল, নিরলস মানসিক সচেতনতার ফল। পৃথিবীতে সত্যিকারের ভালোমানুষ অর্থাৎ যে মানুষ সহসা অপরের মধ্যে এই রোগকে সংক্রামিত করে না, সেই-ই হচ্ছে যার দৃষ্টি নিয়ত সজাগ; আর সেই সজাগ দৃষ্টি বজায় রাখতে চাইলে নিজের মধ্যে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে, নিরন্তর মানসিক উত্তেজনার মধ্যে কাটাতে হবে তোমাকে। সত্যি বলছি রিও, এই প্লেগে ভোগার ব্যাপারটা বড় ক্লান্তিকর। আরো ক্লান্তিকর এই প্লেগের সংক্রমণ বাঁচিয়ে চলতে যাওয়াটা। তাই দ্যাখো, আজকের পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের চোখেমুখে কেমন একটা অবসাদের ছাপ। সবার অন্তরে প্লেগের প্রতি কঠিন বিতৃষ্ণা এবং আমাদের ভেতর কেউ কেউ, বিশেষ করে যারা দেহের ভেতর থেকে প্লেগের জীবাণুকে সম্পূর্ণ দূর করে দিতে চায় তারা এমন একধরনের গভীর অবসাদে ভোগে যা থেকে একমাত্র মৃত্যুই তাদেরকে মুক্ত করতে পারে।

অবশ্য জানি এই মুক্তি অর্জন করতে না-পারা পর্যন্ত এ-পৃথিবীতে আমাদের কোনো স্থান নেই। আমি যদি একবার সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিই যে, এই হত্যাকাণ্ডে অংশ নেব না, তাহলে নিজের ওপর এমন এক নির্বাসনের অভিশাপ ডেকে আনব যার কোনো শেষ নেই। তাদের বিচার করবার যোগ্যতা যে আমার নেই সে-ব্যাপারে আমি সচেতন। আমার মানসিক গঠনের ভেতর কোথায় যেন কিসের অভাব আছে, আর সেই অভাবের জন্যেই আমি হয়তো বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ঘাতকদের একজন হতে পারিনে, তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারিনে। সুতরাং সেদিক থেকে বিচার করলে, আমি অপরের তুলনায় অক্ষম, অধিকতর যোগ্য নই। কিন্তু চারপাশের অবস্থা যা দেখি তাতে আমি আমার সক্ষমতা নিয়েই সন্তুষ্ট, বিনয়ী হবার শিক্ষা আমার হয়েছে। আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে পৃথিবীতে যেমন দুর্বিপাক আছে তেমনি আছে তার অসহায় শিকার। এইরকম অবস্থায় আমাদের যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখা উচিত যেন দুর্বিপাকের পক্ষ নিয়ে তার পেছনে শক্তি না-জোগাই। যুক্তিটা অত্যন্ত সরল বলে মনে হতে পারে, এমনই সরল যে, কতকটা ছেলেমির পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। বাস্তবিকই এ যুক্তি অতটা সরল কিনা সে-বিচারের ক্ষমতা আমার নেই, তবে এটুকু নিশ্চিত জানি যে এটাই সত্য। জানি, এই হত্যাকাণ্ডের সমর্থনে এত যুক্তি শুনেছি যে আমার মাথা বিগড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, আর শুধু আমার নিজের কথাই বা বলি কেন, এইসব যুক্তিতর্ক বহু লোকের মাথা বিগড়ে দিয়েছে; যার ফলে, তারা সবাই এখন এই হত্যাকাণ্ডের সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব দেখেশুনে আমার এই উপলব্ধি জন্মেছে যে, আমাদের সবকিছু দুঃখ-দুর্দশার মূলে আছে সহজ সরল ভাষা-ব্যবহারে আমাদের অক্ষমতা। তারপর থেকে স্থির করেছি যা-কিছু বলি বা করি তা যেন সবসময় সুস্পষ্ট হয়। কারণ নিজেকে সঠিক পথে চালাবার এটাই একমাত্র উপায়। আর সেই কারণেই বলি : এ-পৃথিবীতে আছে শুধু দুর্বিপাক আর অসহায় শিকার, তার বাইরে আর কিছুর অস্তিত্বই নেই। আমার এই বক্তব্যের জন্যে যদি দেখা যায় আমিও প্লেগের বীজাণু ছড়াচ্ছি, তাহলে অন্তত জানব তা আমি স্বেচ্ছায় করিনি। সংক্ষেপে আমি চাই যে আমার দ্বারা যদি কোনো হত্যা সংঘটিত হয়ই তা যেন সজ্ঞানে আমাকে না করতে হয়। নিশ্চয় এখন এটুকু অনুমান করতে পেরেছ যে জীবনে তেমন বড়কিছুর আকাঙ্ক্ষা আমি করিনি। সত্যই তেমন বড় কোনো আকাঙ্ক্ষা আমার নেইও।

অবশ্য স্বীকার করছি আরো এমন এক শ্রেণীর মানুষ পৃথিবীতে আসেন যাঁরা হচ্ছেন সত্যিকারের ত্রাণকর্তা! সেইসঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে যে তাদের আবির্ভাব হয় কদাচিৎ। আর তাছাড়া এই কাজকে যাঁরা পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন তাঁদেরকে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করতে হয়, সইতে হয় অনেক কিছু এবং এই কারণে যে-কোনো সাকটের মুহূর্তে যারা সেই দুর্বিপাকের শিকার হয়, আমি তাদের পক্ষ নেবার চেষ্টা করি, যাতে করে তাদের যে অনিষ্ট সাধন হতে যাচ্ছে তার কিছুটা উপশম করতে পারি। মানুষ কীভাবে ত্রাণকর্তার পর্যায়ে উঠতে পারে অর্থাৎ সম্পূর্ণ শান্তি লাভ করতে পারে সেটা যে আমি এই দুর্বিপাকের শিকার সব মানুষ তাদের ভেতর আবিষ্কারের চেষ্টা করে।"

নমনীয় আর মসৃণ। তাঁরা একটা বড় প্রস্তরখণ্ডের উপর বসলেন সামনের দিকে মুখ করে। ধীরে ধীরে উঠছে আর নামছে সমুদ্রের জলরাশি আর তাদের শান্ত ওঠানামার সাথে সাথে তেলের মতো চিকচিক করে উঠছে আলোর প্রতিফলন, কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে যাচ্ছে সেই প্রতিফলন, তারপর অসংখ্য প্রতিফলন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, দূরে অস্বচ্ছতার মাঝে মিলিয়ে যাচ্ছে। তাদের সামনে অনন্ত দিগন্তব্যাপী ঘন অন্ধকার। রোদে বৃষ্টিতে ক্ষয়প্রাপ্ত এবড়োখেবড়ো প্রস্তরখণ্ডের স্পর্শ অনুভব করলেন ডাক্তার রিও তাঁর হাতের তালুতে। আকস্মিক অদ্ভুত খুশিতে তাঁর মন ভরে উঠল। তারিউর দিকে ফিরতেই তার মুখের ওপরও দেখলেন সেই একই প্রশান্তির প্রতিফলন, যে প্রশান্তির মাঝে মানুষ কোনোকিছুকেই বিস্মৃত হতে চায় না, এমনকি হত্যাকাণ্ডকেও না।

পরনের কাপড়চোপড় খুলে রাখলেন তারা। ডাক্তার রিওই প্রথম পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুব দিলেন। হিমের প্রথম স্পর্শের আকস্মিকতা কেটে যাবার পর আবার যখন পানির উপর ভেসে উঠলেন, দেখলেন হিমের সেই তীক্ষ্ণতা আর নেই, পানির উপরভাগটা মৃদু উষ্ণ মনে হল। কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর রাতের সেই সমুদ্রকে বেশ উষ্ণ বলেই মনে হল তার কাছে। গ্রীষ্মের দীর্ঘদিনের উত্তপ্ত তটের সঞ্চিত উত্তাপকে বুকে নিয়ে শরতের যেসব সমুদ্র তাদের দেহের উষ্ণতাকে বাড়িয়ে তোলে, এও ছিল যেন তেমনি উষ্ণ।

একভাবে সাঁতার কাটতে কাটতে ডাক্তার রিও সামনের দিকে এগিয়ে চললেন, তারপর সঞ্চালনের ফলে ফেনার একটা রেখা যেন চিহ্নিত করে দিচ্ছিল তার গতিপথকে। সমুদ্রের জল তার দুবাহুর ভেতর দিয়ে গলে গলে গিয়ে যেন তার দুখানা পা-কে কোমলভাবে জড়িয়ে ধরছিল। পেছনে জল উছলে ওঠার শব্দ থেকে তিনি অনুমান করলেন তারিউ পানির ওপর ঝাঁপ দিলেন। রিও চিৎ হয়ে নিশ্চল পড়ে রইলেন পানির ওপর। মাথার উপর বিশাল আকার পদ্মফুলের মতো আকাশের ছাউনি, চাঁদ আর অসংখ্য তারার আলোয় ঝলমল করছে। ডাক্তার রিও একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন সেইদিকে। তিনি বড় করে শ্বাস নেবার চেষ্টা করলেন একবার। এবার পানির ওপর আঘাতের শব্দ শুনতে পেলেন। শব্দ ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠতে থাকল। রাতের শূন্য নীরবতার ভেতর থেকে অদ্ভুত স্পষ্টভাবে শোনা যেতে লাগল সেই শব্দ। তারিউ তার কাছাকাছি এগিয়ে আসছিলেন, ডাক্তার রিও তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন।

ডাক্তার রিও আবার উপুড় হলেন। দুই বন্ধু পাশাপাশি সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে চললেন। দুজনের পা একই তালে পড়তে লাগল জলের ওপর। তারিউ তার চেয়ে অনেক ভালো সাঁতার। কাজেই তার সঙ্গে সমতা রক্ষার জন্যে ডাক্তার রিও সাঁতারের গতি বাড়িয়ে দিলেন। বেশ-কয়েক মিনিট ধরে তাঁরা দুজনে একইভাবে পাশাপাশি সাঁতার কেটে চললেন। দুজনের অন্তরেই সমান উৎসাহ। একই তালে পা পড়ছিল তাদের দুজনের। বাইরের পৃথিবী থেকে এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন তাঁরা। শহরের দূষিত পরিবেশ আর প্লেগের ছোঁয়াচ থেকে এখন মুক্ত।

ডাক্তার রিওই প্রথম থামলেন। আবার তাঁরা জেটির দিকে ফিরলেন ধীরে ধীরে। একজায়গায় এসে হঠাৎ বরফের মতো হিম স্রোতের মাঝখানে পড়ে গেলেন দুজনে।

সমুদ্রের এই অতর্কিত ফাঁদের মধ্যে পড়ে গিয়ে তাঁদের দুজনেরই শক্তি যেন চাড়া দিয়ে উঠল, আরো জোরে জোরে হাত-পা ছুড়তে থাকলেন তাঁরা।

জেটিতে উঠে কাপড়চোপড় পরে নিয়ে আবার তাঁরা শহরের দিকে ফিরলেন। দুজনেই নীরব, কিন্তু দুজনেই সচেতন যে সেই মুহূর্তে তারা একায়, তাদের ভেতরের সব ব্যবধান যেন ঘুচে গেছে। আজকের রাতের এই স্মৃতি চিরদিন তাঁদের হৃদয়ের মণিকোঠায় অম্লান হয়ে থাকবে।

শহরের গেটে পৌঁছে পাহারাদারের ওপর যখন আবার তাদের নজর পড়ল, ডাক্তার রিও অনুমান করলেন তারিউ নিশ্চয় তারই মতো ভাবছে যে সাময়িকভাবে হলেও প্লেগের ছোঁয়াচ থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছিল এবং সেইটুকুই ছিল তাদের জন্যে মঙ্গল। এখন আবার কাজের দায়িত্বভার তুলে নিতে হবে তাদের।

৭

হ্যাঁ, বাস্তবিকই, প্লেগ যেন অল্প কিছুক্ষণের জন্যে অবকাশ দিয়েছিল তাদের, আবার সেই পুরোনো দায়িত্বভার তুলে নিতে হল তাদের। সারাটা ডিসেম্বর ধরে শহরবাসীদের অন্তরে যেন ধিকিধিকি করে জ্বলতে থাকল প্লেগের আগুন। শহরের বাইরের সেই শবদাহ করবার যন্ত্রটার খোরাক জুগিয়ে চলল প্লেগ আর শত শত মানুষকে সে রোগাক্রান্ত অবস্থায় গৃহহারা করে পাঠাল ক্যাম্পে ক্যাম্পে। ঝাঁকি দিতে দিতে নির্ভুলভাবে নিজের পথে প্লেগের সেই-যে এগিয়ে যাওয়া তার আর কোনো বিরাম হল না যেন। শাসন-কর্তৃপক্ষ আশা করছিল, শীত শুরু হলে হয়তো প্লেগের এই একটানা অগ্রগতি কিছুটা বাধা পাবে, কিন্তু শীতের প্রথম ঝলকটা পার হয়ে গেল তবুও প্লেগের আক্রমণের একটুকু উপশম হতে দেখা গেল না। সুতরাং সেই অবস্থায় সবার জন্যে একমাত্র পথ রইল নীরবে অপেক্ষা করে যাওয়া। আর দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর মানুষ যেমন ভরসা ছেড়ে দেয় তেমনি সবরকমের আশা ত্যাগ করে সারা শহরের লোক এমনভাবে বেঁচে রইল যেন তাদের সামনে ভবিষ্যৎ বলে কিছু ছিল না।

শান্তি এবং বন্ধুত্ব লাভের যে সামান্য অবকাশ ডাক্তার রিও-র জীবনে ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তির সুযোগ আর এল না। তার পুনরাবৃত্তির সুযোগও ছিল না। শহরে আর একটা নতুন হাসপাতাল খোলা হল। এখন ডাক্তার রিও-র কথাবার্তা বলার সুযোগ ছিল শুধু রোগীদের সঙ্গে। ক্রমেই নিউমোনিয়া প্লেগের রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় এই সময়টায়ই তিনি একটা নতুন পরিবর্তন লক্ষ্য করতে থাকলেন। তাদের নিজের নিজের মতো করে প্লেগের রোগীরা এখন সব ব্যাপারেই যেন ডাক্তার রিও যেটা করতেন সেটাকেই মেনে নিতে শুরু করেছিল। প্লেগের প্রথমদিকে তারা যেমন রোগ-সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে কেমন নেতিয়ে-পড়া ভাব দেখাত বা কেমন একটা উন্মত্ত ভাব দেখাত, এখন তার বদলে তারা নিজেরাই যেন পরিষ্কার বুঝতে পারত তাদের সত্যিকারের স্বার্থ কোনখানে। এখন তারা নিজেরাই আগ্রহ দেখিয়ে ডাক্তার রিও-র কাছে জানতে চাইত কোন জিনিসটাতে তাদের সত্যিকারের উপকার হবে। যাতে তাদের সবসময় পানীয়

কিছু খেতে দেয়া হয় তাই নিয়ে অবিরাম ঝগড়াঝাঁটি করত। তাদের দেহ যাতে গরম রাখবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয় তা নিয়েও জেদাজেদি করত। নিয়ত তাদের দেখাশোনা করার কাজের চাপ আগের মতোই তার কাছে শ্রান্তিকর মনে হলেও, ডাক্তার রিওকে এখন আর এটা অনুভব করতে হত না যে তিনি এককভাবে এই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। রোগীদের দিক থেকেও তখন তিনি যথেষ্ট সহযোগিতা পেতেন।

ডিসেম্বরের শেষের দিকে ডাক্তার রিও মঁসিয়ে অথনের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলেন। মঁসিয়ে অথন তখন কোয়ারেনটাইন ক্যাম্পেই ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন তার ক্যাম্পে থাকার নির্দিষ্ট সময় ইতিমধ্যেই পার হয়ে গেছে এবং এখনও যে তাকে ক্যাম্পে ধরে রাখা হয়েছে তার কারণ তার ক্যাম্পে ঢোকার তারিখটা নিশ্চয় অফিসে কেউ গোলমাল করে ফেলেছে। তার স্ত্রী কিছুদিন হল ক্যাম্প থেকে ছাড়া পাবার পর এই নিয়ে প্রিফেক্টের অফিসে দরবার করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে তার সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে তারা তাকে মুখের ওপর জানিয়ে দিয়েছে যে অফিসের কাজে কোনোদিন ভুল হতে পারে না। ব্যাপারটা সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নেবার জন্যে ডাক্তার র‍্যাবেয়ারকে অনুরোধ করলেন।

কয়েক দিন পরে মঁসিয়ে অথন নিজেই এসে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলেন। ক্যাম্পে তার ভর্তির দিন নিয়ে সত্যি সত্যিই কিছুটা ভুল হয়েছিল। একথা শোনবার পর ডাক্তার রিও মনে-মনে রাগে জ্বলে উঠলেন। দেখলেন এরই মধ্যে মঁসিয়ে অথন বেশ রোগা হয়ে গেছেন। শীর্ণ হাত তুলে তিনি ডাক্তারকে শান্ত হতে বললেন। মাপা-মাপা কথায় তিনি ডাক্তারকে বোঝাতে চাইলেন যে, যে-কোনো লোকের পক্ষেই ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। ডাক্তার রিও মনে-মনে ভাবলেন, নিশ্চয় মঁসিয়ে অথনের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে।

—কী করবেন বলে স্থির করেছেন এখন?—ডাক্তার মঁসিয়ে অথনকে জিজ্ঞাসা করলেন।—প্রচুর কাজ জমে উঠছে নিশ্চয়, আপনার ওখানে।

—দেখুন সত্যি বলতে কী, ভেবেছি আপাতত কিছুদিনের জন্যে ছুটি নেব।

—অবশ্যই, আপনার এখন কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম নেবার দরকার।

—না, ঠিক তার জন্যে নয়। আমি আবার ক্যাম্পে ফিরে যেতে চাই।

ডাক্তার রিও-র মনে হল তিনি যেন কথাগুলো ভুল শুনছেন।—এই না মাত্র কদিন আগে ক্যাম্প থেকে বার হয়ে আসলেন?

—মাফ করবেন, কথাটা আমি ঠিক আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারিনি। শুনেছি কিছু কিছু সরকারি কর্মচারী স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে এখনও ক্যাম্পে কাজ করছেন—মঁসিয়ে অথন তার গোল গোল চোখজোড়া বারকয়েক ঘোরালেন। মাথার যে একগোছা চুল সামনের দিকে ঝুলে পড়েছিল, সেটাকে আবার পাট করে যথাস্থানে রাখলেন তিনি। —আমি তাদের কাজে কিছু কিছু সাহায্য করতে চাই। নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চাই তাদের মাঝে। আর তাছাড়া কথাটা অবশ্য একটু অদ্ভুত শোনাবে, এতে আমি হয়তো খানিকটা সান্ত্বনা পাব যে ছেলেটার সঙ্গে যোগাযোগ এখনও সম্পূর্ণ কেটে যায়নি।

ডাক্তার রিও স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মঁসিয়ে অথনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মঁসিয়ে

অথনের আগের সেই ভাবলেশহীন কঠিন দৃষ্টিতে কি সত্যিই কোনো কোমল ভাব এসেছে? হ্যাঁ, সত্যিই তার চোখদুটো যেন একটু ভেজাভেজা, আগের সেই তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতা আর নেই সেখানে।

—ওই, অবশ্যই, ডাক্তার রিও বললেন—আপনি নিজেই যখন তা চাইছেন, নিশ্চয় তার ব্যবস্থা করে দেব।

মঁসিয়ে অথন যাতে কিছুদিন ক্যাম্প দেখাশোনার কাজে সাহায্য করতে পারেন, ডাক্তার রিও প্রতিশ্রুতিমতো তার ব্যবস্থা করে দিলেন।

বড়দিনের পর্ব না-আসা অবধি প্লেগ-আক্রান্ত শহরের জীবনধারার আর-কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। প্রতিটি সমস্যার সমাধানে দেখা গেল তারিউ-র শান্ত কর্মদক্ষতার প্রভাব। র‍্যাবেয়ার একদিন ডাক্তার রিওকে চুপি চুপি বললেন যে জোয়ান পাহারাদার দুজনের সঙ্গে যোগসাজশ করে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠাচ্ছেন এবং দু-একবার উত্তর পেয়েছেন তার। তিনি পরামর্শ দিলেন যে ডাক্তার রিও নিজেও ইচ্ছা করলে এই গোপন পথে স্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠাতে পারেন। ডাক্তার তাতে সম্মত হলেন। দীর্ঘ বেশ কয়েক মাস পরে এই প্রথম তিনি আবার চিঠি লিখতে বসলেন। দেখলেন, কাজটা সত্যিই যেন বড় কঠিন, বড় পরিশ্রমের। মনে হল বহুদিনের বিস্মৃত একটা ভাষাকে নানা কৌশলে তিনি আবার আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছেন। পরে একটা চিঠি পাঠালেনও সেইভাবে। উত্তর আসতে বেশ দেরি হল।

কটার্ড কিন্তু আগের মতোই দিন দিন ফেঁপে উঠছিলেন, ছোটখাটো চোরাকারবারে প্রচুর পয়সা উপার্জন করছিলেন তিনি। গ্রাঁদের ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, বড়দিনের উৎসব-আয়োজনের সঙ্গে তিনি যেন মোটেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলেন না।

বাস্তবিকই, আগের বছরের বড়দিনের উৎসবের সঙ্গে এবারের বড়দিনের যেন কোথাও কোনো মিল ছিল না। এবারকার উৎসবের মধ্যে স্বর্গীয় ভাবের চেয়ে নারকীয় চেহারাটাই যেন বেশি প্রকট হয়ে উঠছিল। আলোহীন শূন্য দোকান পসার, মিষ্টির দোকানে দেখা হয় নকল চকোলেট আর নইলে শূন্য বাক্স। রাস্তার ট্রামগুলোতে যেসব যাত্রী চেপে ছিল তাদের সবার চোখেমুখে কেমন একটা অনুৎসাহের উদাসীনতার ছাপ। সবকিছুই যেন আগের দিনের বড়দিনের উৎসবে যা যা দেখা যেত তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আগের দিন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে শহরের সবাইকে যোগ দিতে দেখা যেত এই বাৎসরিক আনন্দ-উৎসবে। কিন্তু এবার দেখা গেল শুধু যাদের সুযোগসুবিধা আছে, প্রচুর অর্থের সংস্থান আছে, কেবল তারাই এই উৎসবে মেতেছে, লজ্জায় চুপিচুপি রাস্তার পেছনের কোনো দোকানে বসে অথবা নিজের ঘরে বসে মদ খাচ্ছে। গির্জায় গির্জায় দেখা গেল, আনন্দগীতির চেয়ে প্রার্থনার আয়োজনটাই অনেক বেশি। তাদের সামনে যে অতবড় একটা সংকট ওঁত পেতে রয়েছে সেটা উপলব্ধি করবার মতো শক্তি ছিল না যাদের, শুধু এমনি অল্পবয়সী কিছু ছেলে-ছোকরার দল, কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তার নিরানন্দ পরিবেশের ভেতর এখানে-ওখানে খেলছিল। যিনি মানুষের জন্যে চিরদিন উপহার বয়ে আনেন, যার অস্তিত্ব মানুষের দুঃখ-বেদনার মতোই প্রাচীন, আবার যুবক-হৃদয়ের আশার মতো নবীন, সেই স্রষ্টাকে আগের দিনের মতো করে গৃহে আহ্বান জানাবার

জন্যে কেউ যে তাদের আদেশ করবে সে সাহস কারো ছিল না। যা মানুষকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিতে সাহস পায় না এমনি একটা জীর্ণ ধূসর আশা শুধু বেঁচে ছিল এখন সবার অন্তরে, আর ছিল টিকে থাকবার এক একগুঁয়ে আকাঙ্ক্ষা।

আগের দিন সন্ধ্যায় গ্রাঁদকে তার প্রতিদিনের অভ্যাসমতো হাসপাতালে আসতে দেখা গেল না। ডাক্তার রিও মনে-মনে বেশ খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। খুব সকালেই তিনি গ্রাঁদের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। গ্রাঁদকে না-পেয়ে তার পরিচিত বন্ধুবান্ধবকে তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার জন্যে অনুরোধ করে আসলেন। সন্ধ্যার সময় র‍্যাঁবেয়ার হাসপাতালে এসে খবর দিলেন, তিনি দূর থেকে অল্পসময়ের জন্যে গ্রাঁদকে দেখেছেন, কেমন যেন একটা উদ্দেশ্যহীন তার চলাফেরা, কেমন যেন একটু অদ্ভুত দেখতে তাকে। দুর্ভাগ্যবশত চোখে পড়ার পরের মুহূর্তেই গ্রাঁদ ভিড়ের ভেতর এমনভাবে হারিয়ে যান যে, র‍্যাঁবেয়ার আর তাঁর হদিশ করতে পারেননি। তারিউ এবং ডাক্তার রিও গ্রাঁদকে খুঁজে বার করার জন্যে গাড়ি নিয়ে বার হয়ে পড়লেন।

দুপুরের দিকে রাস্তার মাঝে একজায়গায় ডাক্তার রিও গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। রাস্তায় চারিদিকে তখন ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। কিছুটা দূরে আকস্মিক গ্রাঁদকে দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। যেনতেন প্রকারে বানানো একটা কাঠের খেলনার দোকানের সামনের আলমারির কাচে মুখ লাগিয়ে গ্রাঁদ দাঁড়িয়েছিলেন। বৃদ্ধ গ্রাঁদের দুই গণ্ড বেয়ে অবিরাম ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। এই দৃশ্য চোখে পড়তেই ডাক্তার রিও-র অন্তরটা যেন ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। এই নীরব অশ্রুপাতের কারণ যে কী, তা তিনি সহজেই অনুধাবন করতে পারলেন। মনে হল করুণায় সহানুভূতিতে তার নিজের চোখও অশ্রুসজল হয়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে বহুদিনের পরিচিত একটা ছবি ভেসে উঠল তার চোখের সামনে :

এক বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে ঠিক এমনিভাবে গ্রাঁদ আর জেনি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন একটা দোকানের সামনের কাচের আলমারির পাশে। হঠাৎ একসময় আবেগের আতিশয্যে জেনি তার দিকে মুখ তুলে চেয়েছিল, অস্ফুট স্বরে বলেছিল কত সুখী সে। অতীতের দীর্ঘদিনের অস্বচ্ছতা পেরিয়ে তার নিজের অন্তরের অবিচ্ছিন্ন নিরাশাকে দূরে ঠেলে রেখে ডাক্তার রিও অনুভব করলেন, আবার যেন জেনির নবীন গলার স্বর ক্রমেই চড়ছে, গ্রাঁদের কানে বাজছে সেই স্বর। অশ্রুসিক্ত মুখে গ্রাঁদ যে কী ভাবছিলেন তাও যেন ডাক্তার অনুধাবন করলেন। কারণ তার নিজের মনের মধ্যেও তখন পাক খাচ্ছিল সেই একই ভাবনা : যেখানে স্নেহ-ভালোবাসা নেই, সে পৃথিবী মৃত। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন একটা মুহূর্ত আসে, যখন তার পাশের এইসব কারাগার ব্যাঙ্কের দায়িত্বভার কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠাবোধ সবকিছুকেই মনে হয় ক্লান্তিকর, বেদনাদায়ক বোঝার মতো, তখন তার সারা অন্তর উন্মুখ হয়ে ওঠে। স্নেহ-ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত একটু সুখের জন্যে, স্নেহশীলা প্রেমাতুর একটা অন্তরের উষ্ণতা আর বিস্ময়ের চমক লাভের জন্যে।

গ্রাঁদ দোকানের জানালার কাচের ওপর ডাক্তার রিও-র প্রতিফলন দেখতে

পেলেন। তখন তেমনি নীরবে কাঁদছিলেন তিনি। এবার ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, দোকানের সামনের ভাগে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ডাক্তার রিও-র পৌঁছার অপেক্ষা করতে থাকলেন।

—ওহ্! ডাক্তার, ডাক্তার! আর কিছুই যেন বলতে পারলেন না তিনি।

ডাক্তারের নিজের মুখ দিয়েও কোনো কথা বেরুতে চাইছিল না। যেন সবই অনুমান করতে পেরেছেন, বুঝেছেন তিনি, এমনি একটা অনির্দিষ্ট ভঙ্গি করলেন শুধু। সেই মুহূর্তে গ্রাঁদের দুঃখে তিনি নিজেও দুঃখবোধ করলেন। সবাই যাতে সমানভাবে শরিক হতে পারে এমনি কোনো ব্যথা, হতাশা বা বঞ্চনার মুখোমুখি হলে মানুষ যেমন একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ বোধ করে তেমনি ক্রুদ্ধ আক্রোশে ভরে উঠেছিল তার সারাটা অন্তর।

—সবই বুঝেছি, বুঝেছি আপনার দুঃখ কোথায়।—ডাক্তার অস্ফুটভাবে বললেন।

—ওহ্! শুধু যদি একবার তাকে চিঠি লেখবার সুযোগ পেতাম। শুধু যদি তাকে জানতে পারতাম...সে যেন সুখী হয়; মনের ভেতর যেন কোনোরকম অনুতাপ না রাখে।

ডাক্তার রিও গ্রাঁদের বাহু ধরে তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে চললেন। গ্রাঁদ নিজেও কোনোরকম বাধা দিলেন না, শুধু ভাঙা-ভাঙা কথায় বলে চললেন : অনেকদিন, অনেকদিন ধরে চলছে এই দ্বন্দ্ব। সবসময় মনে হয়েছে আর নয়, আর নিজেকে এইভাবে বেঁধে রাখা নয়। তারপর একদিন সত্যিই সেই বাঁধন খুলে দিতে হয়েছে। দেখুন ডাক্তার, সবাই জানে আমি খুব শান্ত মানুষ, আর পাঁচজনের মতোই সাধারণ। কিন্তু সবার চোখে নিজেকে এইভাবে সাধারণ প্রমাণ করানোর জন্যে কী কঠিন চেষ্টাই না আমাকে করতে হয়েছে বরাবর। আর আজ, সেই চেষ্টাটুকু করবার মতো ক্ষমতাও আর নেই আমার।

গ্রাঁদ আকস্মিক সম্পূর্ণ থেমে গেলেন। তার সমস্ত শরীর ভীষণভাবে কাঁপছিল, দেয়ে উত্তাপ থাকলে যেমন দেখায় তেমনি জ্বলজ্বল করছিল তার চোখদুটো। ডাক্তার রিও গ্রাঁদের হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় নিলেন, মনে হল তার সারাদেহ প্রচণ্ড তাপে পুড়ে যাচ্ছে।

—এক্ষুনি আপনাকে ফিরে যেতে হবে বাসায়।

গ্রাঁদ আকস্মিক নিজেকে ডাক্তারের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করলেন। কয়েক পা দৌড়ে গিয়ে তিনি হঠাৎ থামলেন, দুবাহু দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে একবার এপাশে একবার ওপাশে দুলতে থাকলেন। তারপর সম্পূর্ণ একটা ঘুরপাক খেয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানেই রাস্তার ওপর সটান পড়ে গেলেন। তার দুচোখ দিয়ে তখনও অবিরাম ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল, যার ফলে তার চোখেমুখে ময়লা জমেছিল।

পথচারীদের কেউ কেউ চলার মাঝে আকস্মিক থামছিল, দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল কিছুক্ষণ দৃশ্যটা, তারপর আবার আগের মতোই এগিয়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে, যেন কাছে আসতে সাহস করছিল না কেউ। ডাক্তার নিজেই বৃদ্ধ গ্রাঁদকে তুলে নিয়ে গেলেন গাড়িতে।

গ্রাঁদ বিছানায় শুয়েছিলেন, তার শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল, যেন ফুসফুস বন্ধ হয়ে

আসছিল। ডাক্তার গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকলেন। গ্রাঁদের পরিবার-পরিজন বলতে তো কেউ ছিল না। সুতরাং তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করেই বা লাভ কী? তারিউ সঙ্গে থাকলে তারা দুজনেই তো তাকে দেখাশোনা করতে পারেন।

গ্রাঁদের মাথাটা বালিশের মধ্যে ডুবেছিল। তার দুই গণ্ডে একটা ধূসর সবুজের আভা ফুটে উঠেছিল। চোখদুটো মনে হচ্ছিল ঘোলাটে, দৃষ্টিহীন। তারিউ একটা ভাঙা পুরোনো কাঠের বাক্স দিয়ে যে সামান্য আগুনের ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করেছিলেন গ্রাঁদ যেন একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়েছিলেন।—আমার অবস্থা বোধ হয় খুব খারাপ—গ্রাঁদ বিড়বিড় করে বললেন। যখনই তিনি কথা বলার চেষ্টা করছিলেন, তার জীর্ণ পোড়া ফুসফুসের ভেতর থেকে একটা চড়চড়ে শব্দ বেরিয়ে আসছিল যেন। ডাক্তার রিও তাকে কথা বলতে বারণ করলেন এবং চলে যাবার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন, আবার সত্বর ফিরে আসবেন। গ্রাঁদের ঠোঁটদুটো শুধু একটু ফাঁক হল। একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল সেই ঠোঁটের ফাঁকে। যেন হাসি-তামাশা করছেন এমনি একটা ক্ষণিক ভাব ফুটে উঠল গ্রাঁদের বিবর্ণ উষ্ণমুখ চেহারায়।

—আবার যদি সুস্থ হয়ে উঠতে পারি ডাক্তার, টুপি খুলে অভিবাদন জানাচ্ছি।

মুহূর্তের মধ্যে গ্রাঁদ যেন আবার সম্পূর্ণ আচ্ছন্নতার মাঝে নেতিয়ে পড়লেন।

কয়েকঘণ্টা পরে আবার যখন তারা গ্রাঁদকে দেখতে আসলেন, গ্রাঁদ তখন আধাশোয়া অবস্থায় বিছানায় উঠে বসেছেন।

যে রোগ প্রতিমুহূর্তে তাকে নিঃশেষ করে আনছিল, তার দহনে গ্রাঁদের চেহারায় এরই মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছিল তা লক্ষ্য করতেই ডাক্তার রিও ভীষণভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। যা হোক, আগের চেয়ে তাকে অনেকটা সুস্থিরচিত্ত বলে মনে হল। তারা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে গ্রাঁদ তার টেবিলের ড্রয়ারে নিজের লেখার যে পাণ্ডুলিপিটা রাখতেন সেটা বার করে আনার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

তারিউ পাণ্ডুলিপিটা তার হাতে দিতেই গ্রাঁদ তার দিকে না-তাকিয়ে শুধু সেটাকে তারিউ-র হাত থেকে নিয়ে নিজের বুকে একবার চেপে ধরলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে ডাক্তার রিও-র দিকে এগিয়ে দিলেন সেটা এবং ইশারায় ডাক্তার রিওকে পড়ে শোনাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। মোটা-পঞ্চাশেক খাতার পাতা জুড়ে ছিল এই পাণ্ডুলিপি। ডাক্তার রিও দ্রুত একবার তাদের ভেতর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলেন। দেখলেন পাণ্ডুলিপির বেশির ভাগ পাতায় একটা কথাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। কোথাও কোথাও সংক্ষেপ করা হয়েছে, আবার কোথাও সেই একই কথা বিশদভাবে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। "মে মাস, এক অশ্বারোহী মহিলা আর বয় ব্যান্ডিনি" এই কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, বিভিন্ন প্যাটার্নে তাদের সাজাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়াও ছিল বিভিন্ন ব্যাখ্যাসূচক নোট, যার কোনো-কোনোটা বেশ দীর্ঘ আর ছিল বিভিন্ন প্রতিশব্দের কয়েকটা তালিকা। কিন্তু শেষ পাতার নিচে অত্যন্ত পরিষ্কার হাতে লেখা ছিল : "প্রিয়তম জেনি, আজ বড়দিন। আর...।" মাত্র এই কয়েকটা শব্দ। তার ঠিক উপরেই ছিল তার রচিত সেই বাক্যের সর্বশেষ সংস্কৃত রূপ।—পড়ে দেখুন—গ্রাঁদ বললেন।

ডাক্তার রিও পড়ে গেলেন :

মে মাসের এক সুন্দর প্রভাতে ফীণাঙ্গি তন্বী এক অশ্বারোহীকে বয় ব্যান্ডিনি ধরে উজ্জ্বল পাটল রঙের এক মাদিঘোড়ায় চেপে অনেকেই যেতে দেখে থাকতে পারেন। তার চারপাশে পুষ্পেস...।

—তাই আছে না?—গ্রাঁদের বৃদ্ধ গলার স্বরে জ্বরের কম্পন। ডাক্তার রিও গ্রাঁদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। গ্রাঁদ বিছানার উপর পড়ে ছটফট করতে থাকলেন।—হ্যাঁ, জানি, আমি জানি কী ভাবছেন এখন আপনি। সুন্দর এই শব্দটা, ঠিক নয়? তাই—

ডাক্তার রিও বিছানার চাদরের তলায় রাখা গ্রাঁদের হাত দুখানাকে সজোরে চেপে ধরলেন।

—থাক, ডাক্তার সাহেব, আর নয়। বড় বিলম্ব হয়ে গেছে—আর সময় কই...।

তার বুকখানা ভীষণভাবে ওঠানামা করতে থাকল। তারপরেই তীক্ষ্ণ চিৎকারের স্বরে গ্রাঁদ আবার বলে উঠলেন : পুড়িয়ে ফেলেন ওটাকে, পুড়িয়ে ফেলেন।

ডাক্তার রিও কেমন যেন ইতস্তত করতে লাগলেন। কিন্তু গ্রাঁদ এমন জোরগলায় এবং যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে তার নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন যে, ডাক্তার রিও চুল্লির দিকে এগিয়ে গিয়ে নিভন্ত আগুনের ওপর পাণ্ডুলিপিটা ছুড়ে ফেলে দিলেন। হঠাৎ আগুন আবার দপ করে জ্বলে উঠল। আকস্মিক সমস্ত ঘরটা আলোয় ভরে গেল যেন। একটা ক্ষণিক উষ্ণতা দিয়ে গেল। ডাক্তার আবার যখন বিছানার কাছে ফিরে এলেন, গ্রাঁদ তখন পিঠ ফিরে শুয়েছেন, তার মুখটা প্রায় দেয়ালে গিয়ে ঠেকেছিল। গ্রাঁদের দেহে সিরাম দেবার পর, ডাক্তার তার বন্ধুকে কানে কানে বললেন : রাতটুকুও টিকবে কিনা সে ভরসা নেই।

তারিউ স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে রাতে সেখানে থাকতে সম্মত হলেন। ডাক্তার রিও নিজেও সেটা অনুমোদন করলেন।

সেদিন সারাটা রাত যে-চিন্তাটা ডাক্তার রিও-র মাথায় ঘোরাফেরা করতে থাকল তা হচ্ছে গ্রাঁদের আসন্ন মৃত্যু। কিন্তু পরের দিন সকালে দেখলেন, গ্রাঁদ বিছানায় উঠে বসেছে, তারিউ-র সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। তার দেহের উত্তাপ নেমে স্বাভাবিক হয়েছে। একটা নেতিয়ে-পড়া ভাব ছাড়া রোগের আর কোনো লক্ষণই ছিল না তার দেহে।

—দেখুন, ডাক্তার—গ্রাঁদ বললেন—বড় তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। যা হোক, ফের শুরু করতে চাই লেখাটা। দেখলেনই তো, কথাগুলো সবই আমার স্মরণ আছে।

ডাক্তার রিও কেমন একটু সন্দেহসূচকভাবে তারিউ-র দিকে তাকালেন—দেখা যাক শেষপর্যন্ত অবস্থা কী দাঁড়ায়।

কিন্তু দুপুরের দিকেও অবস্থার তেমন একটা পরিবর্তন দেখা গেল না। সন্ধ্যার পর গ্রাঁদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত বলে মনে হল। গ্রাঁদের এই পুনরুজ্জীবন ডাক্তার রিওকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেলল। কিন্তু আরো বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল তার জন্যে। ঠিক এরই কাছাকাছি সময় একদিন প্লেগ-আক্রান্ত একটা মেয়েকে হাসপাতালে আনা হল। ডাক্তার রিও তাকে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন,

মেয়েটার জীবনের কোনো আশা নেই। মুমূর্ষু রোগীদের যে-ওয়ার্ডে রাখা হয় তক্ষুনি তাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি নির্দেশ দিলেন।

মেয়েটা ভুল বকছিল এবং নিউমোনিয়া প্লেগের সব লক্ষণই ছিল তার মধ্যে। কিন্তু পরের দিন সকালেই দেখা গেল তার জ্বর নেমে গেছে। গ্রাঁদের বেলায় যেমন ভেবেছিলেন, সকালে মেয়েটার জ্বর নেমে যেতে দেখেও তিনি সেই একই সিদ্ধান্ত করলেন, কারণ তিনি তার অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছিলেন যে, সকালে এইভাবে জ্বর পড়ে যাওয়াটা মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। কিন্তু দুপুরের দিকেও মেয়েটার দেহের উত্তাপ আর বাড়তে দেখা গেল না। রাতে আবার জ্বর উঠলেও সামান্য কয়েক ডিগ্রি মাত্র উঠল। পরের দিন সকালে দেখা গেল তার দেহের উত্তাপ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বেশ পরিশ্রান্ত দেখালেও মেয়েটা স্বাভাবিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছিল। ডাক্তার রিও তারিউ-র কাছে মন্তব্য করলেন—মেয়েটার এই নিরাময়ের বেলায় কিন্তু কোনো নিয়মই খাটেনি। পরের সপ্তায় আরো চারটা একই ধরনের রোগী তার নজরে পড়ল।

সপ্তাহের শেষের দিন ডাক্তার রিও এবং তারিউ যখন তার বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলেন, দেখলেন তার পুরোনো সেই হাঁপানির রোগী যেন উত্তেজনায় ছটফট করছেন।

—বিশ্বাস করবেন, ওগুলো আবার বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।

—কাদের কথা বলছেন?

—কেন, জানেন না, ইঁদুরগুলো?

—এপ্রিলের পর থেকে মরাই হোক আর জ্যান্তই হোক, একটা ইঁদুরও কারো চোখে পড়েনি। তারিউ উদ্বিগ্নভাবে ডাক্তারের দিকে তাকালেন।

—তার মানে কি আবার নতুন করে প্লেগ শুরু হতে যাচ্ছে?

বৃদ্ধ হাঁপানি রোগী তাদের সামনে দাঁড়িয়ে তার অভ্যাসমতো হাত কচলাতে থাকলেন।

—বুঝলেন ডাক্তার সাহেব, ইঁদুরগুলো যেভাবে ছোটাছুটি করে বেড়ায় সত্যিই তা দেখবার মতো।

তিনি নিজে দুটো ইঁদুরকে বাইরের দরজা দিয়ে বাসার ভেতর ঢুকতে দেখেছেন। তার প্রতিবেশীরা অনেকেই তাকে বলেছেন, তারাও মাটির তলার ভাঁড়ারে আবার ইঁদুর দেখতে পেয়েছেন। কোনো-কোনো বাসায় লোকেরা কাঠের তিনিসপত্রের ভেতর আবার ইঁদুরের সেই পরিচিত কিচকিচ শব্দ এবং ছোটাছুটির খসখসানি শুনতে পেয়েছেন। প্রতি সোমবারে মৃত্যুর যে পরিসংখ্যান ঘোষণা করা হত, ডাক্তার রিও গভীর আগ্রহের সঙ্গে সেই ঘোষণার জন্যে অপেক্ষা করে রইলেন। ঘোষণা থেকে দেখা গেল মৃত্যুর সংখ্যা নেমে এসেছে।

পঞ্চম পর্ব

প্লেগের প্রকোপ এইভাবে কমে আসাটা আমাদের শহরবাসীদের কাছে একদিকে যেমন স্বাগত লাভ করেছিল, তেমনি তা ছিল অপ্রত্যাশিত। সুতরাং তাই নিয়ে তক্ষুনি কোনোরকম স্ফূর্তিতে মেতে ওঠার তাড়া ছিল না। গত কয়েক মাস ধরে কে কখন সংকটের ভেতর দিয়ে তাদের জীবন কেটেছে তার ফলে প্লেগের হাত থেকে দ্রুত নিষ্কৃতি পাবার ইচ্ছাটা যেমন তাদের বেড়েছিল তেমনি আবার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা চিন্তাভাবনা করতেও শিখেছিলেন তারা—দুর্বিপাকের শীঘ্রি যে একটা উপশম হবে সে-সম্ভাবনাটা ক্রমেই তাদের কাছে সুদূর বলে মনে হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন দেখা গেল সত্যিই প্লেগের প্রকোপ কমে আসছে তখন তা নিয়ে শহরবাসীরা সবাই আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে নানান রকম আশাও পোষণ করতে থাকল তারা। সে আশা অনিশ্চিত ছিল বলে তার পেছনে যে আন্তরিকতা ছিল না এমন নয়। মৃত্যুর হার যে কমতে শুরু করেছিল তখন সেটাই তাদের কাছে ছিল বড় সত্য, অন্য সবকিছুর স্থান ছিল তার অনেক পরে; তখনও যে প্রতিদিন মানুষ মরছিল, এই বিস্ময়কর সত্যের কাছে তার যেন কোনো তাৎপর্যই ছিল না। স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের সেই স্বর্ণময় দিনে ফিরে যাওয়াটা যে সবাই গোপনে মনে-মনে প্রত্যাশা করত, তার একটা বড় প্রমাণ যে আমাদের শহরের অধিবাসীরা দুর্বিপাকের উপশম সম্পর্কে নিজেদের প্রত্যাশাকে প্রকাশ করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধান থাকলেও প্লেগের উপশমের পর যে নতুন জীবনধারা শুরু হবে, তা নিয়ে খুব নির্বিকারভাবে হলেও নিজেদের ভেতর আলাপ-আলোচনা শুরু করেছিল।

অতীতে তারা যেসব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে এসেছে সেগুলোকে যে সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না, সে-ব্যাপারে তাদের মধ্যে দ্বিমত ছিল না; কোনোকিছু ধ্বংস করে ফেলাটা যতটা সহজ, যতটা দ্রুত সম্ভব নতুন করে আবার তা গড়ে-তোলার ব্যাপারটা ততখানি সহজ নয়। সে যাই হোক, সবাই এখন ভাবত, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার যে কিছুটা উন্নতি হবে সেটা হয়তো খানিকটা নিশ্চিত বলে ধরে নেয়া যায়, আর তা হলেই প্রত্যেক পরিবারকে যে-সমস্যাটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথাব্যথা করতে হচ্ছিল, তার কিছুটা উপশম তো হবে। প্রকৃতপক্ষে এসব ছোটখাটো আকাঙ্ক্ষার পেছনে গোপন থাকত উদ্দাম, অযৌক্তিক সব প্রত্যাশা এবং সে-সম্পর্কে সচেতন থাকাতে মাঝে মাঝে কেউ কেউ হঠকারিতার সঙ্গে বলেই ফেলত : খুব বেশি আশা করলেও দু-একদিনের ভেতরেই যে প্লেগের উপশম হবে তা ভাবাটা ঠিক নয়।

প্রকৃতপক্ষে দুর্বিপাক দু-একদিনের ভেতর না-থামলেও, সঙ্গতভাবে যতটা আশা করা যেতে পারত তার চেয়ে অনেক দ্রুত উপশমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে একটা তীব্র ঠান্ডা আবহাওয়া একটানা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকল এবং মনে হল সেটা হয়তো শহরে থেকেই যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সাধারণত যা ঘটে না, আকাশ দেখা গেল গাঢ় নীল, বরফের মতো সাদা একটা উজ্জ্বল প্রভা বন্যাস্রোতের মতো বয়ে যেতে লাগল শহরের ওপর দিয়ে, উজ্জ্বল ধবধবে হয়ে উঠল শহরের চেহারা। তুষার নির্মল বাতাসের মধ্যে দুর্বিপাকের প্রকোপ স্তিমিত হয়ে আসতে থাকল, পরপর তিন সপ্তাহ ধরে প্লেগে মৃত্যু সম্পর্কে যে পরিসংখ্যান ঘোষণা করা হল তাতে দেখা গেল, মৃত্যুর সংখ্যা সত্যিই যথেষ্ট নেমে এসেছে।

গত কয়েক মাস ধরে একটু একটু করে প্লেগ যে সংহারের ক্ষমতা অর্জন করেছিল, তুলনামূলকভাবে অনেক অল্পসময়ের ভেতর সে আবার তা হারিয়ে ফেলল। তার সুনিশ্চিত শিকার হওয়াটা যাদের ভাগ্যের লিখন বলে কার্যত ধরে নেয়া হয়েছিল, যেমন গ্রঁদ এবং ডাক্তার রিও-র চিকিৎসাধীন সেই মেয়ে-রোগীটি, শেষপর্যন্ত তাদেরকে তার শিকারে পরিণত করতে তার অক্ষমতা, পরপর দু-তিন সপ্তাহ ধরে কোনো-কোনো অঞ্চলে তার কর্মতৎপরতা আকস্মিক বেড়ে যাওয়া এবং আবার তারই পাশাপাশি অঞ্চলে সেই একই সময়ে তার অস্তিত্ব অনুভূত না-হওয়া, আকস্মিক কোনো এক সোমবার তার শিকারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া কিন্তু ঠিক তার পরের বুধবারেই তার শিকারদের সবার নিষ্কৃতি লাভ করা—সংক্ষেপে আকস্মিক একবার তার কর্মতৎপরতা প্রবলভাবে বেড়ে যাওয়া এবং পরের সপ্তাহে তা আবার স্তিমিত হয়ে আসা—এসব থেকে এই ধারণাই জন্মাতে শুরু করেছিল যে প্লেগের সংহারক্ষমতা ক্রমেই কমে আসছে; কমে আসছে ক্লান্তিতে ক্রোধে, আর সেইসঙ্গে প্লেগ হারিয়ে ফেলেছে তার আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, তার নিষ্ঠুরতা, তার সেই আঙ্কিক দক্ষতা যা এতদিন ধরে সে ট্রাম্পকার্ড হিসাবে ব্যবহার করে এসেছে।

আকস্মিক মাঝে মাঝে ডাক্তার কাসেলের তৈরি সেই প্লেগের বীজাণুনাশক সিরাম ফলদায়ক হয়ে উঠতে লাগল, যা আগে কোনোদিনই সম্ভব হয়নি। বাস্তবিকই, ডাক্তার এতদিন ধরে যেসব চিকিৎসা শুধুমাত্র পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করে এসেছেন অথচ কোনো সুফল পাননি, সেইগুলোই এমন আশ্চর্যজনকভাবে ফলদায়ক হয়ে উঠতে লাগল। মনে হচ্ছিল, প্লেগকে এতদিন ধরে তাড়া করে নিয়ে বেরিয়ে এবার কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে, আর এখন সে নিস্তেজ হয়ে পড়ায় একদিন যে-অস্ত্র তার বিরুদ্ধে ভোঁতা মনে হত সেই অস্ত্রই এখন মহাশক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কেবল কোনো-কোনো দুর্লভ মুহূর্তে প্লেগ আবার তার তেজ এবং শক্তি ফিরে পেত, যেন কতকটা অন্ধভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়ত গোটা তিন-চার এমন রোগীর ওপর যাদের নিরাময় আশা করা হয়েছিল; চরম প্রত্যাশার মধ্যেও যাদের কেউ কেউ প্রাণ হারাত। কোয়ারেন্টাইন ক্যাম্প থেকে ছাড়া-পাওয়া ম্যাজিস্ট্রেট মঁসিয়ে অথনও ছিলেন তাদেরই একজন। তারিউ তার সম্পর্কে বলেন, লোকটার ভাগ্য ভালো নয়। কিন্তু মঁসিয়ে অথনের মৃত্যুর না জীবনের কথা তারিউ বোঝাতে চেয়েছিলেন তা বলা শক্ত।

সাধারণভাবে বলতে গেলে দুর্বিপাক সর্বত্রই তখন পিছু হটতে শুরু করেছিল। সরকারি ইস্তেহারগুলোর প্রথমদিকে যে অস্পষ্ট এবং দ্বিধান্বিত আশার কথা প্রচার করা হত, এখন সেগুলোতেও সাধারণ বিশ্বাসকেই সমর্থন করা হত যে দুর্বিপাকের পরাজয় এবার সুনিশ্চিত, সে তার অগ্রবর্তী অবস্থানগুলো গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে। প্রকৃতপক্ষে তখনকার সেই অবস্থাকে সত্যিকারের বিজয় বলা যেত কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল। তবে তখনকার অবস্থা সম্পর্কে এইটুকুই বলা যেতে পারত যে দুর্বিপাকের আবির্ভাবের পেছনেও যেমন কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না, তার এই পিছু হটাও ছিল অনেকটা তেমনি। আমাদের রণকৌশলের সত্যিই যে কোনো পরিবর্তন হয়েছিল তা ঠিক নয়, তবে আগে তা যেমন ফলপ্রসূ হত না, এখন দেখা যেত সেই একই রণকৌশল অবলম্বন করেই বিজয় আমাদের করায়ত্ত হয়েছে। বস্তুত প্রধান যে-ধারণাটা তখন সবার মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, তা হচ্ছে এই যে দুর্বিপাক তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুবার পর স্বেচ্ছায় পিছু হটতে শুরু করেছে। তার উদ্দেশ্য ইতিমধ্যে হাসিল হয়েছে।

সে যাই হোক, তখনও শহরের দিকে তাকালে এটাই মনে হত যে, তেমন কিছুই পরিবর্তন হয়নি। এখন আগের মতোই দিনের বেলায় শহরের রাস্তাঘাট দেখা যেত শূন্য, নিস্তব্ধ, কিন্তু আবার রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের সমাগমে রাস্তাঘাট ভরে উঠত। তাদের সবার গায়ে ওভারকোট, গলায় স্কার্ফ। কাফে এবং সিনেমাহলের মালিকেরাও আগের মতোই জোরেশোরে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু একটু ভালোভাবে লক্ষ করলে চোখে পড়ত, আগের সেই উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার ছাপটা মুছে গেছে সবার চেহারা থেকে। এখন মাঝে মাঝে হাসত সবাই। এ থেকে আরো একটা ব্যাপার সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে প্লেগ শুরু হবার পর থেকে রাস্তাঘাটে বড় একটা কাউকে হাসতে দেখা যেত না। সত্যিকারের ব্যাপারটা ছিল এই যে, গত কয়েক মাস ধরে শহরটা যেন একটা বায়ুহীন ঢাকনার তলায় চাপা পড়ে দম আটকে মারা যাচ্ছিল, আর এখন যেন সেই ঢাকনার ভেতর একটা ছিদ্র করা হয়েছে, প্রতি সোমবার রেডিওটা খুলে দিলেই শোনা যেত সেই ছিদ্রটা দিন দিন বড় হচ্ছে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আবার সবার ইচ্ছামতো শ্বাস নিতে পারবে।

কিন্তু খুব বড় করে দেখলেও আসলে এটা ছিল একধরনের নেতিবাচক সান্ত্বনা, মানুষের সামগ্রিক জীবনধারার ওপর এর কোনো আশু প্রভাব ছিল না। অথচ একমাস আগেও যদি কেউ বলত যে ট্রেন ছেড়ে যেতে দেখে এসেছে অথবা নদীতে নৌকা নামানো হয়েছে অথবা শীঘ্রি রাস্তায় আবার গাড়ি বার করবার অনুমতি দেয়া হবে, তাহলে খবরটা শোনার পর সন্দেহে অনেকেরই ভ্রূ কুঁচকে উঠত। কিন্তু জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় এ-খবর পেলে আর কেউ বিস্ময় প্রকাশ করত না। পরিবর্তনটা নিঃসন্দেহে ছিল খুব সামান্য, কিন্তু তা যত সামান্যই হোক না কেন, তখন শহরের অধিবাসীদের প্রত্যাশা যে কতকাল বেড়ে গিয়েছিল এ ছিল তারই একটা প্রমাণ। আর বাস্তবিকই এটাও বলা যায় যে, যেদিন থেকে মানুষের মনে এই ক্ষীণ আশার সঞ্চার শুরু হয়, সেদিন থেকে প্লেগের প্রতিপত্তিও যেন বেশকিছুটা হ্রাস পেতে থাকে।

একটা কথা এখানে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এই সময়টায়ই শহরের

অধিবাসীদের ভেতর এত বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা যেত যে, সেগুলো কতকটা অসংলগ্নতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাত। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, একসময় যেমন দেখা যেত তাদের হৃদয় বিপদমুক্তির আশায় উদ্বেগ হয়ে উঠেছে, তেমনি একসময় মনে হত তারা হতাশায় সম্পূর্ণ মুষড়ে পড়েছে। শুধুমাত্র এই আবার ভিন্ন আর একসময় মনে হত তারা হতাশায় সম্পূর্ণ মুষড়ে পড়েছে। এই কারণেই হয়তো এই সময় এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে দেখা যায়। যখন সরকারি ঘোষণায় মৃত্যুর পরিসংখ্যান দেখে অবস্থা মনে হচ্ছিল সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক তখনও দেখা যায় কিছু লোক গেটের পাহারাদারদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে শহরের বাইরে পালাবার চেষ্টা করে। এতে সরকারি কর্তৃপক্ষ বেশকিছুটা বিব্রত বোধ করেন, পাহারাদাররা তো বটেই, কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের সে চেষ্টা সফল হয়। ব্যাপারটাকে আর একটু তলিয়ে দেখলে সহজেই পরিষ্কার হয়ে যেত যে তাদের এই পালাবার চেষ্টার পেছনে যে উদ্দেশ্য সচরাচর কাজ করত তা অনুধাবন করাটা তেমন শক্ত ছিল না। প্লেগ তাদের কারো কারো অন্তরে এমন একটা গভীর সন্দেহের ভাব জাগিয়ে তুলেছিল, যা যেন কতকটা তাদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। এখন কোথাও আশার আলো দেখলেও আর তারা তা বিশ্বাস করতে চাইত না। ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, প্লেগের সম্পূর্ণ উপশম হবার পরও সেই আগের মতোই জীবন যাপন করত সবাই। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছিল না কেউ। অপর যারা ছিলেন, প্রধানত এতদিন যারা প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন, এই দীর্ঘ কয়েকমাসের সহিষ্ণুতা এবং মানসিক অবসাদের পর আশার নতুন হিল্লোল তাদের মনের ভেতর এমন একটা অস্থিরতার প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল, যার সামনে আত্মসংযমের কোনো বাঁধন যে টিকে থাকবে তেমন অবস্থা ছিল না। যে লক্ষ্যের দিকে চেয়ে এতদিন তারা দিন গুনেগুনে তার এত কাছাকাছি পৌঁছে যদি তাদেরকে প্লেগের শিকার হতে হয় তাহলে যে তাদের এতদিনের বঞ্চনার কোনো পূরণই হবে না, এই চিন্তা এখন যেন একটা ভয়ংকর আতঙ্কের মতো পেয়ে বসেছিল তাদেরকে। সুতরাং ক্লান্তিকর দীর্ঘ মাসের-পর-মাস ধরে এই অগ্নিপরীক্ষায় তারা যে সহিষ্ণুতা বজায় রেখে এসেছিল, শঙ্কা এবং নৈরাশ্য এতদিনও যাকে ধ্বংস করতে পারেনি, এখন আশার প্রথম সঞ্চরণের মুখে তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। এখন যে উদ্দাম তাড়না জেগেছিল তাদের মনের ভেতর তা যেন প্লেগের অস্তিত্বকে পেছনে ফেলে রেখে তাদেরকে সামনে ঠেলে নিয়ে যেতে শুরু করেছিল। প্লেগের উপশমের গতির সঙ্গে যে তাল রেখে চলবে সে শক্তি-সামর্থ্য যেন আর ছিল না তাদের।

ইতিমধ্যে সবার মনে উত্তরোত্তর যে আশাবাদের সঞ্চার হচ্ছিল, তার অনুকূলে বিভিন্ন লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জিনিসপত্রের দাম দ্রুত নামতে শুরু করেছিল। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে এই মূল্যহ্রাসের পেছনে কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। বরাবর আমাদের যেসব অসুবিধা ভোগ করতে হত এখনও তার কিছুমাত্র উপশম হয়নি, তখনও শহরের বাইরের গেটে নিয়মিত পাহারার ব্যবস্থা ছিল এবং খাদ্য-পরিস্থিতির যে কিছুমাত্র উন্নতি হয়েছিল তারও কোনো সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল না। সুতরাং এই মূল্যহ্রাস সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র মানসিক

প্রতিক্রিয়ার ফলে, যেমন যখন প্লেগের উপশমের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে তখন নিশ্চয় তার কিছু কিছু প্রভাব সর্বত্র অনুভূত হওয়া উচিত। চারদিকে এই আশাবাদী মনোভাব ছড়িয়ে পড়ার ফলে আরো যারা লাভবান হল তারা হচ্ছে সেইসব শ্রেণীর মানুষ, যারা আগে বরাবর দল বেঁধে বসবাস করে এসেছে কিন্তু প্লেগের আবির্ভাবের পর থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। শহরের কসাইখানা দুটো আবার খোলা হল, আবার শুরু হল সেখানকার সংঘবদ্ধ জীবন। প্লেগের সংকটের সময় যেসব ব্যারাক খালি করে দেয়া হয়েছিল অথচ সরকারিভাবে সফল নেয়া হয়নি, সৈনিকদের ডেকে এনে সেগুলো আবার ভর্তি করা হল, আবার দুর্গের জীবন শুরু হল তাদের জন্য। একদিক থেকে বিচার করতে গেলে এগুলো হয়তো খুবই সাধারণ খুঁটিনাটি ঘটনা, কিন্তু তখনকার সেই পরিস্থিতির ভেতর এসবের একধরনের তাৎপর্য ছিল বৈ কি।

কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসলেও সক্রিয়ভাবে উত্তেজনার এই-যে অবস্থা এটা কিন্তু স্থায়ী হয় জানুয়ারির পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত; তারপর সাপ্তাহিক মৃত্যুর সংখ্যা এমন উল্লেখযোগ্যভাবে নেমে আসে, যার ফলে শাসন-কর্তৃপক্ষ মেডিক্যাল বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করার পর ঘোষণা করতে বাধ্য হন যে, এখন ধরে নেয়া যেতে পারে যে দুর্বিপাককে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা গেছে। অবশ্য এটাও সত্যি যে, এ প্রসঙ্গে প্রচারিত সরকারি ইস্তেহারে একথাও ছিল যে, ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রিফেক্ট স্থির করেছেন এবং তিনি আশা করেন যে, শহরের অধিবাসীরাও নিশ্চয় তা অনুমোদন করবেন যে, শহরে বাইরে যাবার গেট আপাতত আরো দুসপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখা হবে এবং স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত যেসব বিধিনিষেধ এতদিন চালু ছিল, সেগুলোও আরো একমাস জারি থাকবে। এই সময় বিপদের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা দেখা দিলে, ইতিমধ্যে যেসব বিধি বা নির্দেশ চালু রয়েছে সেগুলোকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে। প্রয়োজনবোধে তারপরেও যতদিন বাঞ্ছনীয় মনে হয়, সেগুলোর আয়ুকাল বাড়ানো হবে। শহরের অধিবাসীরা অবশ্য ইস্তেহারের এইসব ঘোষণাকে কতকগুলো সরকারি বাকচাতুরি হিসাবে গণ্য করত।

পঁচিশে জানুয়ারির রাতটা বিভিন্ন আনন্দ-উৎসবের একটা উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এইসব সাধারণ আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে তিনি নিজেও যে জড়িত তা দেখানোর জন্যে হয়তো প্রিফেক্ট ঘোষণা করেছিলেন, আগের মতো এদিন থেকে আবার শহরের রাস্তাঘাটে আলো দেয়া হবে। কোলাহলমুখর উৎফুল্ল জনতা দলে দলে আলোক-উজ্জ্বল শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে থাকল, তারা কখনও প্রচণ্ড উল্লাসে মিলিত কণ্ঠে গান ধরে দিচ্ছিল। অবশ্য এটাও সত্যি যে এই এখনও দেখা যায় যে কোনো-কোনো বাড়িতে দরজা-জানালার পর্দা নামিয়ে রাখা হয়েছে এবং এইসব গৃহের লোকজন নীরবে বসে বাইরের আনন্দমুখর জনকোলাহলের দিকে কান পেতে আছে। কিন্তু শোকে নিমজ্জিত এইসব গৃহেও একটা স্বস্তির ভাব বজায় ছিল। তবে তাদের এই মানসিক স্বস্তি বা প্লেগ যে ভবিষ্যতে পরিবারের আর কাউকে তাদের মাঝ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে সেই আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূর হওয়ার জন্যে, না, ব্যক্তিগত মানসিক উদ্বেগের যে ছায়া নিরন্তর তাদের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রাখত তা অপসৃত হবার জন্যে

তা বলা শক্ত ছিল। সেই মুহূর্তেও যেসব পরিবারের কেউ অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল, তারাই সাধারণত বাধা হয়ে নিজেদেরকে এই সাধারণ আনন্দ-উৎসব থেকে সবচেয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

কোয়ারেনটাইন ক্যাম্পেই হোক আর নিজের বাসাতেই হোক, তাদের ওপর জোর করে যে নির্বাসন চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তার অন্তরাল থেকে তারা দিন গুনছিল। প্লেগ অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যে একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছে সেই রফা তাদের সঙ্গে সে কবে করবে। এইসব পরিবারের লোকদের অন্তরও যে আশা উজ্জীবিত হয়ে ওঠেনি তেমন নয়। কিন্তু সে-আশাকে তারা নিজেদেরকে অন্তরে যেন গোপনে আগলে রেখেছিল এবং আনন্দ-উৎসবের জন্যে সেই বিশেষ ক্ষণটার অপেক্ষা করছিল যখন তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারবে যে, তাদের জন্যেও এইরকম আনন্দ যুক্তিসঙ্গত। নীরবে নির্বাসনে অপেক্ষা করা এই যে সময়টা যা আনন্দময়ও নয়, আবার বিষাদময় নয়, এই দুয়ের মাঝামাঝি তাদের তখনকার যে মানসিক অবস্থা, তা চারপাশের এই আনন্দ-উচ্ছলতার দরুন তাদের কাছে যেন আরো নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছিল।

কিন্তু এইরকম সামান্য দুএকটা ব্যতিক্রম শহরের অধিকাংশ লোকের অন্তরের যে প্রফুল্লতা তাকে কিছুমাত্র ম্লান করতে পারেনি। কিন্তু তখনও যে প্লেগের সম্পূর্ণ উপশম হয়নি সেটাও নিঃসন্দেহে সত্যি এবং এই বাস্তব সত্যকে সেই মুহূর্তে শহরের অধিবাসীদের স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল হয়তো। তা সত্ত্বেও শহরের অধিবাসীরা তখনই, ট্রেন এবং স্টিমার চলা শুরু হবার বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই কল্পনা করতে শুরু করেছিল যে, তারা যেন শুনতে পাচ্ছে হুইসেল দিতে দিতে আবার ট্রেন ছুটে চলেছে শহর ছেড়ে বাইরের পৃথিবীতে, সীমাহীন দূরত্বের সন্ধানে; যেমন হুঙ্কার দিতে দিতে বন্দর ছেড়ে জাহাজ গিয়ে পড়তে শুরু করেছে ইস্পাতের মতো চকচকে সমুদ্রের বুকে। পরের দিন সকালেই হয়তো এইসব কল্পনা বুদবুদের মতো উবে গিয়ে তার বদলে দেখা দিত আবার সেই মানসিক সংশয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে শহরের অধিবাসীরা যেন শুরু করেছিল এক নতুন অভিযাত্রা। বিষাদময় অন্ধকার কারার জীবন যা ইতিমধ্যেই যেন শহরের পাথরের মতো শক্ত শিকল গেড়ে ফেলেছিল, সেই জীবনকে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে শেষপর্যন্ত আবার পথে পা বাড়িয়েছিল তারা। সংকটময় কালো রাত্রির অবসানের পর প্রাণে বেঁচেছিল যারা, তেমনি একদল যাত্রী যেন প্রতিশ্রুত ভূমিকা উদ্দেশ্য করে আবার পার তুলে দিয়েছিল সমুদ্রের বুকে।

সেদিন রাতে তারিউ, ডাক্তার রিও, র‍্যাম্বেয়ার এবং তাদের অপর সহকর্মীরা যখন কিছুক্ষণের জন্যে নতুনের অভিযাত্রী এই জনতার মাঝে এসে দাঁড়ালেন, সেই মুহূর্তে তাদেরও মনে হচ্ছিল যেন শূন্যের ভেতর দিয়ে ভেসে চলেছেন। শহরের বড় বড় রাস্তাগুলোকে পেছনে ফেলে মোড় নেবার পরেও, এমনকি যখন জনশূন্য গলিপথের পর্দা-নামানো জানালার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তারা, তখনও সেই উল্লাসময় জনকোলাহল যেন তাদের কানে বাজছিল। তখনকার দৈহিক ক্লান্তির জন্যেই হয়তো তারা পর্দার আড়ালের এই বিষাদময় জীবনকে বড় বড় রাস্তার ওপর প্রবহমান আনন্দ-উচ্ছল জীবনধারা থেকে যেন পৃথক করে নিতে পারছিলেন না। সুতরাং আসন্ন মুক্তির এইসব নিদর্শন সেই মুহূর্তে যেন পরস্পরবিরোধী দুটো বিভিন্ন অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল তাদের অন্তরে—একটা হাসির আনন্দের, অপরটা দুঃখ বেদনার।

একসময় যখন দূরে বড় রাস্তার ওপর জনতার উল্লাসধ্বনি সমুদ্রগর্জনের মতো ফেটে পড়ছিল, তারিউ আকস্মিক রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখতে ছোটখাটো, উজ্জ্বল চকচকে একটা প্রাণী লাফিয়ে লাফিয়ে বড় রাস্তাটা পার হচ্ছিল ; একটা বেড়াল। বসন্তের পর আবার এই প্রথম বেড়াল চোখে পড়ল। বেড়ালটা রাস্তার মাঝে থামল, একবার ইতস্তত করল কিছুক্ষণ, নিজের একটা পা তুলে ধরে চাটল কয়েকবার, তারপর সেই পা-টাকে নিজের ডান কানের ওপর দিয়ে দ্রুত ঘুরিয়ে আনল, আবার এগুতে থাকল সামনের দিকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকারের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। তারিউ আপনমনে হাসলেন একবার ; ব্যালকনির সেই বৃদ্ধ লোকটাও এ-দৃশ্য দেখলে নিশ্চয় মনে খুশি হতেন।

২

কিন্তু এই-যে দিনগুলো যখন মনে হচ্ছিল প্লেগ পরাজিতের মতো পিছু হটতে শুরু করেছে, যখন সে চেষ্টা করছিল একদিন যে অন্ধকার গুহার ভেতর থেকে সন্তর্পণে বার হয়ে এসেছিল এখন আবার চুপি চুপি পালিয়ে গিয়ে সেখানে আত্মগোপন করবার, সেই সময় আর কেউ না হলেও অন্তত একজন প্লেগের এই পশ্চাদপসরণ অত্যন্ত ভীতির চোখে দেখতে শুরু করেছিল। এই লোকটা ছিলেন কটার্ড।

সত্যি কথা বলতে কী, যেদিন থেকে শহরে মৃত্যুসংখ্যা নামতে শুরু করে সেদিন থেকে তারিউ-র ডাইরিতে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময়কার তার হাতের লেখা পাঠ করা প্রায় দুঃসাধ্য। দৈহিক ক্লান্তির জন্যে অবশ্য এটা ঘটতে পারে। কিন্তু এক প্রসঙ্গ ছেড়ে ভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করবার সময়ও দেখা যায় তিনি তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা যোগসূত্র বজায় রাখার ব্যাপারে নজর দেননি। তার চেয়ে বড় কথা, এই সময়কার তার ডাইরি আগের মতো নৈর্ব্যক্তিক গুণসম্পন্ন নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত বিচার-বিশ্লেষণের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় তার ডাইরিতে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন নোটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পরপর দীর্ঘ কয়েক পঙ্‌ক্তি জুড়ে যেখানে তিনি শুধু কটার্ডের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাদের মাঝখানে একস্থানে ঢুকিয়েছেন ব্যালকনির সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং তার সহচর সেই বেড়ালগুলোর প্রসঙ্গ। এই ভদ্রলোকটা সম্পর্কে তারিউ এককথায় আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে তার সম্পর্কে তারিউ যে সাধারণ গুণগ্রাহিতা তা প্লেগের জন্যে কিছুমাত্র প্রভাবিত হয়নি। প্লেগের উপশম হবার পরও তার সম্পর্কে জানবার জন্যে তারিউ-র সমান আগ্রহ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, ভদ্রলোক নিজে তারিউ-র সেই আগ্রহ বজায় রাখবার সুযোগ দেননি। যদিও এ ব্যাপারে তারিউ-র দিক থেকে সদিচ্ছার কোনোরকম অভাব ছিল না। পুনরায়

ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পাবার জন্যে তারিউ যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। স্মরণীয় ২৫ জানুয়ারির কয়েকদিন পর তারিউ একদিন সেই ছোট্ট রাস্তাটার মোড়ে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকের ব্যালকনিতে বার হয়ে আসার অপেক্ষা করতে থাকেন। বিড়ালগুলো আবার তাদের নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে এসেছিল। ব্যালকনির ছায়ায় সূর্যের আলোর আল্পনা আঁকা হয়েছিল যেখানে, সেখানে শুয়ে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল তারা। কিন্তু নির্দিষ্ট যে-সময়টায়ই ব্যালকনির আশেপাশের জানালাগুলো নিয়মিত খোলার কথা, সেদিন সেগুলো আর খুলতে দেখা গেল না। তারপরেও আর কোনোদিন তারিউ এই জানালাগুলো খোলা দেখেননি।

এই ঘটনা থেকে তারিউ এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করেন যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক হয় মারা গেছেন, নইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন। যদি সত্যিই তিনি বিরক্ত হয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয় এই কারণে যে, তার ধারণা ছিল যে তার চিন্তাভাবনা ছিল সঠিক, কিন্তু প্লেগ প্রমাণ করে যে সেতলো সবই ভুল। অবশ্য যদি তার মৃত্যু হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, যেটা ডাক্তার রিও-র সেই পুরোনো হাঁপানির রোগীর বেলায় কিছুটা সত্যি, তিনি কি মহাপুরুষের পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছেন? তারিউ কিন্তু সহজে তা ভাবতে পারেন না। তবে বৃদ্ধলোকটার ব্যাপারটা তার কাছে এ-সম্পর্কে একটা সংকেত বলে মনে হয়। সম্ভবত এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে তারিউ তার ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করেন : পুরোপুরি মহাপুরুষ হওয়াটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, হয়তো তার কাছাকাছি পৌঁছাতে পারি মাত্র। তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে অন্তত যেখানে কল্যাণের প্রয়াস আছে অথচ শয়তানির মাত্রাটা কম এমন ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের রফা করে চলতেই হবে।

কটার্ডের সম্পর্কে এইসব মন্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে তারিউর ডাইরিতে এখানে-ওখানে ছড়ানো দেখা যায় গ্রাঁদ এবং ডাক্তার রিও, যার সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য। গ্রাঁদ কিন্তু তখনও ঠিক সুস্থ হয়ে ওঠেননি। তা সত্ত্বেও এমনিভাবে আবার নিয়মিত কাজকর্ম করে যাচ্ছিলেন যেন কখনও তাকে প্লেগে ধরেনি। তারা যখন একই বাসায় থাকতেন, সেই সময় ডাক্তার রিও, যার সঙ্গে তার মাঝে মাঝে যেসব কথাবার্তা হত, এই বৃদ্ধা মহিলার বিভিন্ন মনোভাব, প্লেগের সম্পর্কে তার মতামত, এসবই তারিউ বিস্তারিতভাবে তার ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করেন। সবকিছুর মাঝে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে নিষ্প্রভ করে রাখার প্রতি তার নিরন্ত সজাগ দৃষ্টি, প্রত্যেকটা বিষয়কে সহজ কথায় বোঝাবার একটা বিশিষ্ট ধরন, একটা বিশেষ জানালার ধারে গিয়ে বসার জন্যে তার আগ্রহ—এগুলোর ওপরই তারিউ তার ডাইরিতে গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করেন। প্রতিদিন সন্ধ্যে হবে হবে সময়টায়ই বিশেষ করে তিনি এই জানালাটার ধারে গিয়ে বসতেন, সোজা খাড়া হয়ে থাকত তার দেহটা, হাত দুখানা শান্তভাবে রাখা থাকত কোলের ওপর আর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত নিচে বাইরের নিস্তব্ধ রাস্তার উপর। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যেত, ধীরে ধীরে অন্ধকার ছেয়ে ফেলত ঘরটাকে। সেই অন্ধকারের ভেতর তার দেহটাকে মনে হত একটা গতিহীন আকৃতির মতো, যা একসময় মিশে একাকার হয়ে যেত দ্রুত ঘনায়মান সেই অন্ধকারের ভেতর। লঘু ত্রস্তপদে তার এঘর-ওঘর করে বেড়ানো,

সবার জন্যে তার একটা স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহবোধ এর বিশেষ দৃষ্টান্ত কোনোদিন নজরে পড়েনি সত্যি, কিন্তু এই বৃদ্ধা যা-কিছু বলতেন বা করতেন, তার সবই তার এই স্নেহবোধের নির্মল আভায় সমুজ্জ্বল বলে মনে হত তারিউর কাছে। কোনোরকম চিন্তাভাবনা (বাহ্যত) না-করেই প্রত্যেকটা বিষয় অনুধাবন করার তার সহজাত ক্ষমতা এবং সবশেষে বাস্তব সত্যের সামনে, বিশেষ করে প্লেগের মতো একটা বড় বাস্তবের সামনে তার মতো নিষ্প্রভ এবং মৌন ব্যক্তিত্বের নির্ভীকতা—এগুলো সম্পর্কে তারিউর নিজের মন্তব্য ছিল তার ডাইরিতে।

ডাইরির এই অংশে এসে চোখে পড়ে তারিউর লেখার মান অদ্ভুতভাবে পড়ে গেছে—তার লেখা পরের লাইনগুলো পাঠ করা প্রায় দুঃসাধ্য বললেই চলে। তিনি যে ক্রমেই আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেছিলেন, বোধহয় তারই নিদর্শনস্বরূপ, তার ডাইরির শেষ ছত্র কটাতে দেখা যায়—অবশ্য এইধরনের ব্যাপার এই প্রথম চোখে পড়ে। তার ডাইরিতে তিনি ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন :

তাকে দেখলে সবসময় আমার নিজের মা'র কথা মনে পড়ে যায়। মা'র চরিত্রের যেদিকটা আমার কাছে সবচেয়ে আদরণীয় বলে মনে হত, তা হচ্ছে সবকিছু থেকে তাঁর নিজেকে সরিয়ে রাখার অর্থাৎ যাকে বলে নিজের ব্যক্তিত্বকে নিষ্প্রভ করে রাখার অভ্যাস। মা'র কাছে ফিরে যাবার একটা ব্যাকুল বাসনা সবসময় বয়ে গেছে আমার মনে। আট বছর আগের কথা কিন্তু আজও যেন ভাবতে পারি না যে মা সত্যি সত্যিই বেঁচে নেই। ভাবতাম হয়তো এমন হবে যে একটু বেশি করে তিনি নিজেকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁর দিকে যখন আবার দৃষ্টি দিলাম দেখি তিনি চিরতরে হারিয়ে গেছেন।

এবার আবার কটার্ডের প্রসঙ্গ। যে-সময় দেখা যায় মৃত্যুর সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে, কটার্ড বিভিন্ন অজুহাতে বেশ কয়েকবার ডাক্তার রিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, দুর্বিপাকের সম্ভাব্য গতি কোনদিকে, স্পষ্টত সে-সম্পর্কে ডাক্তার রিওর মতামত জানাটাই ছিল তার এইসব সাক্ষাতের উদ্দেশ্য।

—আপনার কি ধারণা, সত্যিই এইভাবে দুর্বিপাকের শেষ হবে, এইরকম আকস্মিক?

সত্যিই যে প্লেগের উপশম ঘটতে পারে সে-সম্পর্কে কটার্ডের নিজের মনেও তখন সন্দেহ ছিল, অন্তত মুখে তিনি তাই বলতেন। কিন্তু মুখে যাই বলুন-না কেন, তিনি যে বারে বারে এসে ডাক্তারকে এইভাবে প্রশ্ন করতেন, তা থেকে এটাই প্রমাণ হত যে নিজের ধারণা সম্পর্কে তিনি নিজেও খুব একটা নিশ্চিত ছিলেন না। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় থেকে ডাক্তার বরাবর তাকে আশাবাদের কথাই শোনাতেন। কিন্তু এইধরনের উত্তর সাধারণত কটার্ডের খুব একটা মনঃপূত হত না এবং উত্তর শুনে বিভিন্ন সময়ে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা যেত বিভিন্ন; কখনও ক্রোধ প্রকাশ করতেন, আবার কখনও নিরাশায় ভেঙে পড়তেন। কটার্ডের এই মনোভাব লক্ষ্য করে ডাক্তার একদিন তার প্রতি অনুকম্পাবশত বলতে বাধ্য হলেন যে মৃত্যুর পরিসংখ্যান দেখে যদিও মনে হচ্ছে যে, দুর্বিপাক সত্যিই দ্রুত উপশমের দিকে যাচ্ছে, তবুও আমরা যে সত্যিই সংকট পেরিয়ে এসেছি এখুনি নিশ্চিত করে তা বলা কঠিন।

অর্থাৎ আপনার ধারণা—কটার্ড যেন ডাক্তার রিও-র মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উত্তরে বললেন—এখনও নিশ্চিত কিছুই বলা যায় না। যে-কোনো মুহূর্তে আবার প্লেগের প্রকোপ শুরু হলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না, তাই না?

—ঠিকই বলেছেন, অবস্থা বর্তমানে কতকটা তাই-ই। যেমন আবার প্লেগের প্রকোপ বাড়তে পারে তেমনি অবস্থার দ্রুত উপশমও হতে পারে।

অন্য সবার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক মনে হলেও, এই অনিশ্চিত অবস্থাটাকে কটার্ডের কাছে খুবই কাম্য বলে মনে হত। এই সময় কটার্ডের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তারিউ বলেন—ডাক্তার রিওর এইসব মতামত সাধারণের ভেতর ছড়িয়ে দেবার জন্যে কটার্ড শহরের যে-অঞ্চলে বাস করতেন, সেখানকার দোকানদারদের সাথেও এই নিয়ে প্রায়ই আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। বাস্তবিকই এর জন্যে কটার্ডকে যে খুব একটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত তা ঠিক নয়।

প্লেগে মৃত্যুর সংখ্যা দ্রুত নেমে আসছে—এই ঘোষণা প্রচার হওয়ার সাথে সাথে জনসাধারণের ভেতর যে একটা উদ্দীপনার ভাব সঞ্চারিত হয়েছিল, সেটা যখন আবার কমে আসতে থাকল, তখন অনেকের মনেই আবার সংশয় জাগতে শুরু করল এবং তাদের ভেতর এই উদ্বেগের ভাব লক্ষ করে কটার্ড নিজে মনে-মনে খুব আশ্বস্ত হয়ে উঠতেন। যেমন অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখলে আবার তিনি ঠিক সমানভাবে হতাশায় ভেঙে পড়তেন।—হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে, একদিন খুব হতাশভাবে তিনি তারিউর কাছে মন্তব্য করলেন।

—এখন যে-কোনো দিন আবার শহরের বাইরে যাবার গেট খুলে দেয়া হবে। আর তখন দেখবেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো সবাই দূরে ছুড়ে ফেলে দেবে আমাকে।

জানুয়ারির প্রথম তিন সপ্তাহ বরাবর কটার্ডের মনোভাবের ঘন ঘন এই পরিবর্তন দেখে সবাই কতকটা অবাক হয়ে যেত যেন। যদিও প্রতিবেশী এবং পরিচিতজনদের ভেতর নিজেকে প্রিয় করে তোলার জন্যে তার চেষ্টার অন্ত ছিল না, তবুও এখন মাঝে মাঝে দিনের-পর-দিন ধরে তিনি যেন সবাইকে এড়িয়ে চলতে চাইতেন। পরে তারিউ জানতে পারেন যে, এই সময়গুলো কটার্ড তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়ে বিষণ্ণভাবে নিজের বাসায় আত্মগোপন করে কাটিয়ে দেন। তখন তাকে না রেস্তোরাঁয়, না থিয়েটার হলে, না তার প্রিয় কাফেতে পাওয়া যেত। যা হোক, দুর্বিপাকের আগে যেরকম অপরিচিত সাধারণ জীবন যাপন করতেন তাতে আবার ফিরে যাওয়া তার পক্ষে শক্ত ছিল। নির্জন বাসায় একাই থাকতেন তিনি, পাশের একটা রেস্তোরাঁর সাথে ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন, তারা সময়মতো তাকে খাবার পৌঁছে দিয়ে যেত। শুধুমাত্র টুকিটাকি দু-একটা কিছু কেনার জন্যে রাতের বেলায় তিনি বাইরে যেতেন, তাও আবার কেনাকাটা সারা হয়ে গেলে, যে-পথে লোকজনের চলাচল কম, আলোর ভালো ব্যবস্থা নেই, সেইসব পথে তক্ষুনি চুপি চুপি বাসায় ফিরে আসতেন। এই ব্যবস্থায় পথে কয়েকবার তারিউর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তখন হাজার চেষ্টা করেও তারিউ তার মুখ থেকে কড় কয়েকটা এক-অক্ষরের শব্দ ছাড়া কোনো কথা বার করাতে পারেননি। এই অবস্থা কেটে গেলে দু-একদিনের মধ্যেই

কটার্ড আবার সবার সাথে স্বাভাবিক মেলামেশা শুরু করলেন, উঁচুগলায় প্লেগের সম্পর্কে আলোচনায় উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠতেন, প্লেগের সম্পর্কে অপরের মতামত জানতে চাইতেন এবং বেশ উৎফুল্ল-মনে রাস্তার জনসমুদ্রের মাঝে মিশে যেতেন।

২৫ জানুয়ারি অর্থাৎ যেদিন সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল যে প্লেগের অবস্থা উপশমের দিকে যাচ্ছে, সেদিন থেকে কটার্ড আবার আত্মগোপন করলেন। এর ঠিক দুদিন পরে হঠাৎ আবার তারিউর সাথে দেখা হয়ে গেল। একটা নির্জন গলিপথে তিনি একা একা পায়চারি করছিলেন। কটার্ড যখন তারিউকে তার বাসায় নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তাব দিলেন, তারিউ ইতস্তত করতে থাকলেন। সেদিন সারাটা ক্ষণ তার ওপর দিয়ে বড় ধকল গেছে, তখন অবসাদে তার দেহ প্রায় ভেঙে পড়ছিল। কটার্ড কিন্তু নাছোড়বান্দা, যেমন করেই হোক সে তারিউকে বাসায় নিয়ে যাবেই। কটার্ডকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি আবার খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, মুখে যেমন অবিরাম বকছিলেন, তেমনি ধীরে ধীরে বলতে চাইছিলেন অনেককিছু, আবার গলার স্বরও চড়িয়ে দিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। কটার্ড প্রথমেই তারিউর কাছ থেকে জানতে চাইলেন যে, তারিউর কি সত্যিই ধারণা যে সরকারি ইস্তেহারের অর্থ এই যে, দ্রুত প্লেগের উপশম হতে যাচ্ছে। তারিউ উত্তরে বললেন, এটা অবশ্যই সত্যি যে শুধুমাত্র এইধরনের একটা সরকারি ইস্তেহার প্রচার করার ফলেই প্লেগের উপশম হবে না। তবে এটাও আবার ঠিক যে আকস্মিক যদি কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, তাহলে প্লেগ যে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিদায় নেবে, বাইরের অবস্থা থেকে সেটা কিছুটা সুনিশ্চিত বলেই মনে হয়।

—হ্যাঁ, ঠিক বলছেন—কটার্ড বললেন—যদি তেমন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে তবেই যা-কিছু সম্ভব। কিন্তু দুর্ঘটনা কিছু-না-কিছু তো ঘটবেই, তাই নয় কি?

তারিউ এবার কটার্ডকে বুঝিয়ে বললেন যে, সে-সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করেই তো কর্তৃপক্ষ শহরের বাইরে যাবার গেট আরো একপক্ষকাল বন্ধ রাখা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

—খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তারা—আগের মতো উত্তেজিত কণ্ঠে কটার্ড চিৎকার করে উঠলেন।—সবকিছু যেদিকে এগোচ্ছে তাতে আমার নিশ্চিত ধারণা যে, শেষপর্যন্ত কর্তৃপক্ষকে এই ঘোষণা বাতিল করতে হবে।

তারিউ তার কথায় সায় দিয়ে বললেন যে, সেরকম একটা কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে। তারপর যোগ করলেন—তবুও তার বিশ্বাস যে শহরের গেট আবার খুলে দেয়া হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে যে সবকিছু আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে সে-সম্ভাবনাটাই বেশি।

—আপনার কথা নাহয় মানলাম—কটার্ড বললেন—কিন্তু সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে আসবে বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?

তারিউ শুধু হাসলেন—ছবিঘরগুলোয় আবার নতুন ছবির আমদানি হবে।

কটার্ডের মুখে কিন্তু হাসির কোনো চিহ্ন ছিল না। তিনি আবার প্রশ্ন তুললেন—তার অর্থ কি এই যে এতবড় দুর্বিপাকের পরেও শহরের জীবনধারার কোনোরকম পরিবর্তন হবে না? মধ্যের এই সময়টায় যেন কিছুই ঘটেনি এমনিভাবে শহরের

জীবনধারা আগেও যেমন চলত এখন আবার তেমনই চলতে থাকবে?

তারিড বললেন, তার ধারণা প্লেগের ফলে শহরের অনেককিছুই যে বদলে যাবে সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু বাস্তবে তা নাও ঘটতে পারে, কারণ স্বভাবতই শহরবাসীদের একটা জোর প্রবণতা হবে যেন কিছুই ঘটেনি এমনিভাবে আচরণ করে যাওয়া এবং সেইরকম আচরণ করবেও তারা; সেই কারণেই এক অর্থে কোনোকিছুর ভেতরই তেমন সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা নাও যেতে পারে। এটাও যেমন সত্যি তেমনি আবার সমস্ত অবস্থাটাকে ভিন্ন আর একটা দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করা সম্ভব। মনের মধ্যে যে বড় ইচ্ছাই থাক না কেন, মানুষ সত্যি সত্যিই সবকিছুকে ভুলে যেতে পারে না। মানুষের অন্তরে প্লেগের কিছু-না-কিছু স্মৃতি থেকে যাবেই।

তারিডর এই যুক্তির উত্তরে কটার্ড কিছুটা অশিষ্টভাবে সংক্ষেপে বললেন, মানুষের অন্তরে কখন কী ঘটে না-ঘটে তা নিয়ে মাথাব্যথা করার তার একটুও আগ্রহ নেই। আর বাস্তবিকই, এ নিয়ে তিনি মাথাব্যথা করেননিও কোনোদিন। তার যেটুকু জানার আগ্রহ তা হচ্ছে, সমস্ত শাসনব্যবস্থার খোল-নলচে সম্পূর্ণ পালটে দেয়া হবে, না দৃষ্টান্তস্বরূপ সরকারি সংস্থাগুলোর কথাই ধরা যাক, সেগুলো আগেও যেমন চলত তেমনই চলতে থাকবে?

তারিড স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে এসব সম্পর্কে ভেতরের কোনো খবর তার জানা নেই। তবে তার ব্যক্তিগত ধারণা যে দুর্বিপাকের মতো এতবড় একটা অস্বাভাবিক ঘটনার পর শাসনযন্ত্রকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বেশকিছুটা সময়ের প্রয়োজন হবে। আর তাছাড়া এটাও ঠিক যে বর্তমান অবস্থায় এমন কতকগুলো নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে, যেগুলো মুরাহা করার জন্যে শাসনব্যবস্থার কিছু-না-কিছু পুনর্বিন্যাস অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে।

কটার্ড এবার সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন।

—ঠিকই তো, এটুকু যে-কেউ অনুমান করতে পারে। সত্যি কথা বলতে কী, সবাইকে আবার নতুনভাবে জীবন শুরু করতে হবে।

ইতিমধ্যে তারা কটার্ডের বাসার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। কটার্ডকে এখন যেন আগের চেয়ে কিছুটা উৎফুল্ল বলে মনে হল। মনে হল, ভবিষ্যৎকে প্রত্যয়ের সঙ্গে নেবেন বলে তিনি যেন মনোবল দৃঢ় করে ফেলেছেন। স্পষ্ট তিনি যেন কল্পনা করতে শুরু করেছিলেন যে শহরে আবার সম্পূর্ণ নতুনভাবে জীবন শুরু হতে যাচ্ছে, অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে দিয়ে নতুন যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে আবার, সবকিছুকে নতুনভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

সুতরাং, আপনিও তাহলে এখন ব্যাপারটা অনুমান করতে পারেন। তারিড আবার হাসলেন একটু—আপনার সমস্ত অপরাধও দেখবেন ধুয়েমুছে যাবে, আপনার জন্যেও নতুন সুযোগ আসবে। সেরকম সম্ভাবনাটাই এখন বেশি। আর সত্যিই তেমন কিছু যে ঘটবে না, তা কি কেউ জোর করে বলতে পারে? অর্থাৎ আমাদের সবার জন্যেই যে নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করবার সুযোগ আসবে সেটাই স্বাভাবিক।

কটার্ডের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে এবার তারা দুজনে করমর্দন করলেন।

—এখন মনে হচ্ছে, আপনার কথাই হয়তো ঠিক—কটার্ড আবার যেন কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—সবাই আবার নতুন করে জীবন শুরু করবার সুযোগ পাবে, সত্যিই কতবড় একটা আদর্শ আমাদের সামনে।

সামনের অন্ধকার হলঘরটা থেকে হঠাৎ দুজন লোক বার হয়ে আসল। অস্পষ্টভাবে শুধু তারিডর কানে এল তার সঙ্গী বিস্ময়ের সুরে বলছেন—এ দুই ছিঁড়িয়া আবার আমদানি হল কোথা থেকে? কী চায় এরা? এমন সময় অপরিচিত লোক দুজনের ভেতর যাকে মনে হচ্ছিল ধোপদুরস্ত কাপড়েচোপড়ে সজ্জিত একজন নিম্নপদস্থ সরকারি কর্মচারী, তিনি কটার্ডের কথার মাঝে বাধা দিয়ে জানতে চাইলেন তার নাম কটার্ড কিনা। চাপা একটা অস্ফুট শব্দ করে কটার্ড হঠাৎ সুরে দাঁড়ালেন এবং দ্রুত অন্ধকারের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারিড এবং অপরিচিত লোক দুজন বিস্ময়ে থমকে গেলেন যেন, কয়েক মুহূর্ত নীরবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকলেন। তারিড একসময় তাদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, কী চান তারা। আসল উদ্দেশ্যটা কী তা না বলে, তারা শুধু জানালেন, কটার্ডের কাছ থেকে কিছু তথ্য চান। তারপর কটার্ড যে-পথে অন্ধকারের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন তারা দুজনেও ধীরে ধীরে সেইদিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন।

বাসায় ফিরে তারিড তার ডাইরিতে এই অদ্ভুত ঘটনাটার একটা বিবরণ লিখে ফেললেন, বিবরণের শেষে গিয়ে মন্তব্য করলেন, 'আজ রাতে বড় ক্লান্ত বোধ করছি।' ডাইরিতে তার সেদিনের হাতের লেখা থেকেও সেটা প্রমাণিত হয়। ডাইরিতে পরে গিয়ে একস্থানে যোগ করলেন : সামনে এখনও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, কিন্তু নিজেকে প্রস্তুত না-রাখার সেটাই যথেষ্ট কারণ নয়। এরপরেই আবার তিনি প্রশ্ন করলেন : আমার সে প্রস্তুতি সত্যিই আছে কি?

পুনশ্চ হিসাবে, বাস্তবিক পক্ষে, এখানেই তাঁর ডাইরি শেষ হয়েছে, তিনি লিপিবদ্ধ করেন যে, রাত এবং দিনের মধ্যে এমন কতগুলো নির্দিষ্ট সময় আছে যখন মানুষের শক্তি এবং সাহস প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে এবং এই সময়গুলোকে তিনি অত্যন্ত ভয় করেন।

৩

পরের দিন, শহরের গেট খুলে দেবার জন্যে যে দিনটা স্থির হয়েছিল তারও বেশ কয়েক দিন আগের ঘটনা, দুপুরের দিকে ডাক্তার একবার বাসায় ফিরে আসলেন। কদিন ধরে স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি একখানা টেলিগ্রাম আশা করছিলেন। মনে-মনে ভাবছিলেন, টেলিগ্রামটা আসল কিনা। দুর্বিপাকের প্রকোপ যখন চরমে উঠেছিল তখন যে গুরুভার দায়িত্ব তিনি হাত বাড়িয়ে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, এখন যে তার কিছুমাত্র উপশম হয়েছিল তা ঠিক নয়। কিন্তু আসন্ন মুক্তির সম্ভাবনাকে চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখে সমস্ত ক্লান্তি যেন ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। অন্তরে একটা নতুন আশার সঞ্চার হওয়ায় জীবনের উৎসাহ-উদ্দীপনা যেন আকস্মিক বেড়ে গিয়েছিল। যদি এমন হয় যে, দেহের সমস্ত শক্তি এবং মনোবলকে একত্র করে এমন এক পর্যায়ে

এসে যেলা হয়েছে যখন যে-কোনো মুহূর্তে তা আবার অবিনাস্ত হয়ে পড়তে পারে, তাহলে সেইরকম উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার ভেতর মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে বাঁচতে পারে না। এইরকম একটা অবস্থার শেষে মনের বাঁধনগুলোকে আবার একটু হালকা করে দিতে পারা এবং যে স্নায়ু এবং পেশিগুলোকে একটা কঠিন সংগ্রামের জন্যে দৃঢ় করা হয়েছিল সেগুলোকে আবার কিছুটা শিথিল করে দেবার অবকাশ পাওয়া নিশ্চয় আনন্দের। তিনি যে টেলিগ্রামের আশা করছিলেন তাও যদি সুসংবাদ বয়ে আনে তাহলে ডাক্তার রিও নিশ্চয় নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করবার একটা সুযোগ পাবেন। প্রকৃতপক্ষে, তখন তার মনে এইরকম একটা অনুভূতিই জেগেছিল যে সবাই বুঝি আবার নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করতে যাচ্ছে।

হলঘরে দারোয়ানের ঘরটা পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ডাক্তার রিও। বৃদ্ধ মিশেলের স্থলাভিষিক্ত নতুন দারোয়ান হলঘরের দিকের তার জানালায় মুখ লাগিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তারকে দেখতেই সে একটু হাসল। ডাক্তার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে চললেন। ক্লান্তিতে বক্তনায় মলিন অথচ হাসি-হাসি দারোয়ানের মুখটা তার চোখের সামনে ভাসছিল।

হ্যাঁ, এই বিমূর্ত সময়টা পার হয়ে যাবার পর ভাগ্য যদি তার সত্যিই সুপ্রসন্ন হয়, তাহলে আবার নতুনভাবে জীবন শুরু করবেন তিনি। ডাক্তার নিজের ফ্লাটের বাইরের দরজা খোলার চেষ্টা করছিলেন আর এইসব চিন্তা তাঁর মাথার মধ্যে ভিড় করছিল। এমন সময় তার নজরে পড়ল তাঁর মা হলঘর পেরিয়ে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। তিনি কাছে এসে ডাক্তারকে জানালেন যে মঁসিয়ে তারিউ অসুস্থ বোধ করছেন। সকালে নিয়মিত সময়েই তিনি ঘুম থেকে উঠেছিলেন বটে, কিন্তু পরে বাইরে যাবার মতো সুস্থবোধ না-করায় আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছেন। মাদার রিও তারিউর সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করতে থাকলেন।

—খুব সম্ভবত এটা মারাত্মক তেমন কিছু নয় মা—ডাক্তার বললেন।

তারিউ চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়েছিলেন। তার ভারী মাথাটা বালিশের মধ্যে ডুবেছিল যেন। চাদরের ঢাকনার তলায় তার প্রশস্ত বুকখানা বেশ উঁচুই দেখাচ্ছিল। তার দেহের উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছিল, যেমন বাড়ছিল তার মাথার যন্ত্রণা। লক্ষণগুলো তেমন খুব সুস্পষ্ট নয়। তবে প্লেগের আক্রমণ শুরু হওয়াটাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, তারিউ ডাক্তারকে বললেন।

ডাক্তার তার দেহটা পরীক্ষা করার পর মন্তব্য করলেন—না, তেমন সুস্পষ্ট কোনো লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু তারিউর প্রচণ্ড পিপাসা পাচ্ছিল। ঘরের বাইরে এসে ডাক্তার মাকে বললেন—খুব সম্ভবত তারিউর প্লেগই হয়েছে।

—বলিস কী! মা চিৎকার করে উঠলেন।—তা কী করে সম্ভব, অন্তত এখনা তারপর কিছুটা ভেবেচিন্তে নিয়ে আবার বললেন—বার্নার্ড, আমার মনে হয় ওকে আমাদের কাছে রাখাটাই বোধহয় ভালো হবে।

ডাক্তার রিও কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করলেন।

—দ্যাখো মা, যদি সবকিছু ঠিকভাবে মেনে চলতে হয়, তাহলে আমরা তারিউকে এইভাবে বাসায় রাখতে পারিনে।—ডাক্তারের গলায় কেমন একটা দ্বিধান্বিত সুর।—তবে একটা কথা, খুব শীঘ্রি হয়তো শহরের বাইরে যাবার গেট খুলে দেয়া হবে। সেই সময় তুমি যদি শহরের বাইরে যাবার ব্যবস্থা করো, আমি তারিউর দায়িত্ব নিতে পারি।

—বার্নার্ড, আমি বলি কী, তারিউও থাকুক আমিও থাকি। মনে নেই, এই তো সেদিন হল আমি আবার টিকা নিয়েছি।

ডাক্তার রিও মাকে বুঝিয়ে বললেন যে টিকা তারিউও তো নিয়েছিল। তবে হয়তো এমন হতে পারে যে অত্যন্ত দৈহিক ক্লান্তির জন্যে শেষবারের টিকা সে নিতে ভুলে গিয়েছিল বা অন্যান্য দরকারি সাবধানতা নেয়নি।

কথা বলতে বলতে ডাক্তার রিও তার অস্ত্রোপচারের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। আবার যখন তিনি তার সামনে এসে দাঁড়ালেন, তারিউ দেখলেন সিরামের বড় বড় কাচ-কুজি ভর্তি একটা বাক্স তার হাতে।

—আচ্ছা, এতক্ষণে বুঝলাম। তাহলে আমাকেও প্লেগে ধরেছে, তাই বলো।—তারিউ বললেন।

—তা নাও হতে পারত, নিশ্চিত করে এখনও কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে কোনোরকম ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হবে না, তাই এই ব্যবস্থা।

আর কোনোরকম প্রত্যুত্তর না করে তারিউ টিকা নেবার জন্যে তার একখানা হাত ডাক্তার রিওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। এই টিকা তিনি নিজেও বহু লোককে দিয়েছেন, বড় সময়সাপেক্ষ কাজ।

—আজ সন্ধ্যার দিকে হয়তো কিছুটা নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে—সত্যিই অসুখটা কী! ডাক্তার তারিউর চোখের দিকে তাকালেন।

—কিন্তু আমাকে পৃথক করে রাখার কী ব্যবস্থা করছ রিও?

—এখনও তো নিশ্চিত হতে পারিনি যে, প্লেগেই ধরেছে তোমাকে।

তারিউ কষ্টের হাসি হাসলেন।—দ্যাখো রিও, এই প্রথম বোধহয় রোগীকে পৃথক না-করেই তুমি টিকা দিলে।

ডাক্তার রিও বাইরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রইলেন।

—দ্যাখো এখানেই বোধহয় তোমার দেখাশোনাটা ভালো হবে। মা এবং আমি দুজনেই থাকব তোমার পাশে।

তারিউ আর কোনোরকম উচ্চবাক্য করলেন না। ডাক্তার রিও টিকার জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে বাক্সে তুলছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন তারিউর কাছ থেকে কিছু শোনার পর তবে তিনি মুখ ফেরাবেন। কিন্তু তারিউর দিক থেকে কোনো জবাব এল না। ডাক্তার তারিউর বিছানার পাশে এগিয়ে গেলেন। তারিউ স্থিরদৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকাতে লাগলেন। তার চেহারা কিছুটা বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল বটে কিন্তু তার চোখের ধূসর দৃষ্টি তখনও শান্ত।

ডাক্তার রিও হাসলেন।—কিছুক্ষণ ঘুমোবার চেষ্টা করো, এবার শীঘ্রি ফিরবে। ডাক্তার বাইরে যাবার জন্যে কয়েক পা এগিয়ে গেছেন এমন সময় শুনলেন, তারিউ

পিছন থেকে ডাকছেন। তিনি আবার ফিরলেন। তারিউর সেই সময়কার মনোভাবটা তার কাছে কেমন একটু অদ্ভুত বলে ঠেকল। তার বলার কথা তিনি যেন কিছুতেই বলতে চান না অথচ বলার জন্যেও যেন ভেতরে ভেতরে একটা তাড়না অনুভব করছিলেন।

—রিও—অবশেষে তিনি মুখ খুললেন—নিশ্চয় তুমি সবটা খুলে বলবে আমাকে।

অন্তত এটুকু নিশ্চয় তোমার কাছ থেকে আশা করতে পারি।

—হ্যাঁ তারিউ, সে-ব্যাপারে আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

তারিউর গম্ভীর মুখখানা ম্লান হাসিতে যেন কিছুটা হালকা হয়ে এল।

—অশেষ ধন্যবাদ! অনুমান করতে পারছ নিশ্চয় আমি মৃত্যু কামনা করছিনে। সুতরাং মৃত্যুকে বাধা দেবার জন্যে সাধ্যমতো সবরকমের সংগ্রাম করে যাব। তবে যদি ধরো শেষপর্যন্ত হেরেই যাই, আমি চাই মৃত্যুটা যেন ভালোভাবে হয়।

তারিউর দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাক্তার রিও তার কাঁধের ওপর একটু চাপ দিলেন।

—না না, মৃত্যু নয়। যাতে মহাপুরুষদের পর্যায়ে উঠতে পারো, তার জন্যে তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। সুতরাং সংগ্রাম করে যাও।

সেদিন সকালের দিকে আবহাওয়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা ছিল, পরে ঠাণ্ডা ভাবটা অনেকটা কেটে গেল বটে, কিন্তু তার পরেই থেমে থেমে কয়েকবার শিলাবৃষ্টি আর ঝড় হল এবং তারপরেই আবার শুধু বৃষ্টি।

সন্ধ্যার দিকে আবহাওয়া কিছুটা পরিষ্কার হল। কিন্তু আবার ঠাণ্ডা পড়া শুরু হল। সন্ধ্যার সময় ডাক্তার রিও বাসায় ফিরলেন। তাঁর গায়ে তখনও ওভারকোট চাপানো, সেই অবস্থায় তারিউর শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। তারিউর অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হল না তার। জ্বরের প্রকোপে তার ঠোঁটজোড়া ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। দৃঢ় সংবদ্ধ এই ঠোঁটজোড়া থেকে সুস্পষ্ট অনুমান করা যাচ্ছিল তখনও তিনি মৃত্যুর সাথে কঠিন সংগ্রাম করে চলেছেন।

—কেমন বোধ করছ? ডাক্তার রিও তারিউকে জিজ্ঞাসা করলেন।

চাদরে ঢাকা তার কাঁধজোড়া শুধু একটু তুলে ধরলেন তারিউ।—হ্যাঁ, তারিউ উত্তরে বললেন—মনে হচ্ছে সংগ্রামে হেরেই যাচ্ছি।

ডাক্তার রিও বিছানায় তারিউর দেহের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তারিউর উত্তপ্ত দেহের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থিস্ফীতি দেখা যাচ্ছিল, তার বুকের ভেতর থেকে শুধু একটা ঘর্ঘর শব্দ বেরিয়ে আসছিল, যেন একটা লুকিয়ে রাখা হাঁপরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল শব্দটা। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, দুই ধরনের প্লেগেরই লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল তারিউর দেহে।

ডাক্তার রিও এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, সিরামের কাজ এখন শুরু হয়নি।

তারিউ যেন কী বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু জ্বরের ঘোরে বলতে পারলেন না, তাঁর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল।

রাতের আহার শেষ করে ডাক্তার রিও এবং তার মা রোগীর পাশে এসে বসলেন। একটা কঠিন সংগ্রামের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে যেন সেদিনের রাতটা শুরু হল। ডাক্তার

রিও জানতেন, প্লেগের দূতের সাথে এই সংগ্রাম রক্তক্ষয়ের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কিন্তু তারিউর পেশিবহুল চওড়া কাঁধ এবং তার বলিষ্ঠ বুক হয়তো ততখানি সাহায্যে আসবে না, যতখানি আসবে তারিউর দেহে টিকা দেবার সময় ডাক্তার রিওর হাতের ছুঁচের মুখে চুঁইয়ে পড়েছিল যে-রক্ত এবং যে-রক্তের মধ্যে ছিল এমন একটা কিছু যা মানুষের আত্মার চেয়েও শক্তিশালী এবং যার বয়সে মানুষের অর্জিত কোনো দক্ষতাই আজও উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়নি। ডাক্তার রিওর তখনকার কর্তব্য ছিল শুধু তার বন্ধুর সেই প্রতিরোধ-সংগ্রামকে যতদূর সম্ভব চোখে-চোখে রাখা। তিনি তখন যা করে যাচ্ছিলেন তা হচ্ছে ইনজেকশনের সাহায্যে উত্তেজক কিছু ঔষধ তারিউর দেহে ঢুকিয়ে দেয়ার ফ্লেটকগুলোকে দ্রুত উত্তেজিত করা, কিন্তু দীর্ঘ এই সময়ের পুনঃপুন ব্যর্থতার ফলে তিনি অনুধাবন করতে শিখেছিলেন এইসব উপশম-কৌশলের মূল্য এবং কার্যকারিতা কতটুকু।

সত্যি তিনি শুধু এইটুকুই অনুধাবন করেছিলেন যে তার কাজ হচ্ছে নৈবের নয়ার জন্যে সুযোগ করে দেয়া, যে দৈবকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে না দিলে অনেক সময় তা সুপ্তই থেকে যায়। দৈব ছিল এখন এমন একটা মিত্র যাকে আমল না দিয়ে পেরে ওঠা সম্ভব ছিল না যেন। কারণ ডাক্তার রিওকে প্লেগের এমন একটা প্রকৃতির সাথে মোকাবেলা করতে হচ্ছিল, যার সামনে যেন তিনি সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছিলেন। এই শেষবারের মতো প্লেগ যেন আবার তার বিরুদ্ধে যতরকমের কলাকৌশল ব্যবহার করা হচ্ছিল, তার প্রত্যেকটাকে বানচাল করে দিচ্ছিল। যেখানে তার আক্রমণের কোনো সম্ভবনাই ছিল না, সেইসব জায়গায় অতর্কিতে এসে যেন আক্রমণ শুরু করছিল, আবার যেখানে মনে হচ্ছিল সে তার অবস্থানকে পাকা করে ফেলেছে সেখান থেকে আকস্মিক যেন সে পিছু হটে যাচ্ছিল। আবার যেন সে সবরকমের চিন্তাভাবনাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল।

তারিউ নিশ্চলভাবে প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সারাটা রাত ধরে তিনি একের-পর-এক প্লেগের আক্রমণ প্রতিহত করে চললেন। কিন্তু ক্ষণেকের জন্যেও তাকে কোনোরকম চঞ্চলতা বা উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গেল না। তার অতবড় দেহটাতে যেন বোধশক্তি বলে কিছু ছিল না। এমনিভাবে নীরবে সংগ্রাম করে চললেন তিনি সারাটা ক্ষণ। তিনি একবারও কথা বলার চেষ্টা করলেন না। যেন এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চাইছিলেন যে, এখন মুহূর্তের জন্যও মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হতে দেয়া সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। সংগ্রামের কখন হারজিত হচ্ছিল, ডাক্তার রিও তা অনুমান করেছিলেন তারিউর চোখজোড়া দেখে। চোখজোড়া কখনো খুলছিল, কখনো বন্ধ হচ্ছিল, তার চোখের পাতা দেখে যা কখনো চোখের মণির সাথে জুড়ে যাচ্ছিল, আবার কখনো হঠাৎ বিস্ফারিত হচ্ছিল, আর তার চোখের দৃষ্টি থেকে যে দৃষ্টি একবার নিবদ্ধ হচ্ছিল ঘরের ভেতরের কোনো-না-কোনো আসবাবপত্রের উপর, আবার কখনো ফিরে আসছিল ডাক্তার রিও এবং তার মা'র মুখের দিকে এবং যখনই ডাক্তার রিওর সাথ তার দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছিল, তারিউ যেন জোর করে হাসছিল।

আচমকা একসময় অনেক লোক একসাথে দ্রুতপায়ে চলার শব্দ ভেসে এল বাইরে থেকে। দূর থেকে একটা গভীর স্পন্দনের অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে আর তারই

আশঙ্কায় রাস্তার লোকজন চারিদিকে ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছিল যেন। শব্দটা ক্রমেই নিকটতর হল এবং দেখতে দেখতে বাইরে চারিদিক প্রবল বর্ষণের শব্দে ভরে উঠল। আবার একটা ঝড়ো বৃষ্টির আবহাওয়া নেমে এল শহরের ওপর। তার সঙ্গে ছিল শিলাপাত। রাস্তার দুধারে ফুটপাতের ওপর তার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। জানালার উপরের শামিয়ানাগুলো যেন উন্মত্তভাবে ছটফট করছিল। বৃষ্টির জন্যে ডাক্তার রিও কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন বিমনা হয়ে পড়েছিলেন, তারপর আবার যেন অন্ধকারের এপার থেকে তারিউর মুখের দিকে চাইলেন। বিছানার পাশের একটা ছোট বাতি থেকে আলো এসে পড়ছিল তারিউ-র মুখের ওপর। ডাক্তারের মা-ও রোগীর পাশেই বসেছিলেন, কী একটা বুনছিলেন তিনি আর মাঝে মাঝে হাতের কাছ থেকে চোখ তুলে নিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে রোগীর দিকে চাইছিলেন। তার নিজের দিক থেকে যা-কিছু করার, সবই তখন ডাক্তার রিও সেরে ফেলেছিলেন।

বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর ঘরের ভেতর নিস্তব্ধ ভাবটা হঠাৎ যেন আরো বেড়ে গেল। শুধু একটাই অনুভূতি জেগে রইল সেখানে। একটা অদৃশ্য সংগ্রামের নিঃশব্দ কোলাহলে যেন ঘরটা ভরেছিল। দীর্ঘ সময় ধরে ঠিকভাবে ঘুমাতে না-পারার ফলে উত্তেজনায় ডাক্তারের স্নায়ুগুলো যেন দপদপ করছিল, তার মনে হচ্ছিল ঘরের অখণ্ড নীরবতার প্রান্তদেশ থেকে একটা ভূতুড়ে হিসহিস শব্দ তার কানে বাজছিল। দুর্বিপাকের গোড়া থেকেই তিনি শুনে আসছিলেন এই শব্দটাকে। ডাক্তার বিছানায় যাবার জন্যে মাকে নীরবে ইশারা করলেন। মা নীরবে মাথা নাড়লেন, তার চোখদুটো হঠাৎ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ছুঁচের ডগার ফাঁসটা ঠিকভাবে পড়ছে কিনা তিনি মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করতে থাকলেন। ডাক্তার রিও উঠে দাঁড়িয়ে তারিউর মুখে একটু পানি দেবার চেষ্টা করলেন। তারপর আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন।

রাস্তার দুধারে ফুটপাতের উপর পায়ের শব্দ বেড়ে উঠল, মনে হল শব্দ ক্রমেই কাছাকাছি এগিয়ে আসছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার যেন তা দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় রাস্তার লোকজন দ্রুত গৃহে ফিরে যাচ্ছিল। দীর্ঘদিন পরে এই প্রথম আবার ডাক্তার রিও উপলব্ধি করলেন, সেদিনের রাতটাকে প্লেগ শুরু হবার আগের যে-কোনো রাতের সাথে তুলনা করা যেতে পারত যেন। রাস্তাঘাটে কোথাও এ্যাম্বুলেন্সের সেই ঝনঝনানি ছিল না। যাদের বাসায় ফিরতে দেরি হয়ে গেছে এমনি সব লোকজনের চলাফেরার শব্দে ভরেছিল রাস্তা। তখনকার সেই অবস্থাটা ডাক্তারের কাছে মনে হচ্ছিল কতকটা এই রকম : একদিকে বাইরের সেই প্রচণ্ড শীত, অন্যদিকে শহরের রাস্তায় রাস্তায় উজ্জ্বল আলো আর লোকজনের ভিড়। এগুলোকে এড়িয়ে প্লেগ যেন শহরের মধ্যস্থল থেকে সন্তর্পণে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল তারিউর ঘরের সেই উষ্ণ পরিবেশের মাঝে। তার শেষ শক্তি একত্র করে সে যেন আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল তারিউর অসাড় দেহের ওপর। একসময় শহরের বাড়িঘরের ওপর শূন্যে প্লেগের সেই-যে প্রকাণ্ড দণ্ডটা বনবন করে ঘুরত, এখন আর তার কোনো আভাস ছিল না কোথাও। কেবল রোগীর ঘরের বন্ধ হাওয়ার ভেতর তার ফিসফিসানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল যেন। তারিউর ঘরে এই দীর্ঘ প্রহরা শুরু করার প্রথম থেকেই ডাক্তার যেন

এই ফিসফিসানি শুনে আসছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ঘরেও তার ফিসফিসানি সম্পূর্ণ বন্ধ হচ্ছে, প্লেগ এখানেও পরাভব স্বীকার করছে, ততক্ষণ তাকে এখানে এইভাবে অপেক্ষা করতে হবে, বিনিদ্র প্রহর গুনতে হবে।

তখন ভোর হয় হয়। ডাক্তার রিও মা'র কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন : মা, তুমি যাও, এবার একটু বিশ্রাম করে নাওগে। মনে থাকে যেন সকাল আটটায় আবার তোমাকে এখানে এসে বসতে হবে। আমাকে ছুটি দিতে হবে। আর শোনো, বিছানায় যাবার আগে চোখে কয়েক ফোঁটা ওষুধ দিতে ভুলো না যেন।

মাদাম রিও এবার উঠে পড়লেন। তার হাতের কোণার জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিলেন, তারপর তারিউর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারিউ বেশ কিছুক্ষণ ধরে চোখ বন্ধ করে ছিলেন। তার দৃঢ় একগুঁয়ে মনোভাবের প্রতিফলন ফুটে উঠছিল যেন তার কপালে। ঘামে জট-পাকানো চুলের গোছা ছড়িয়েছিল সেই কপালের চারপাশে। মাদাম রিও একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারিউ চোখ খুলে তাকালেন তার দিকে। দেখলেন শান্ত স্নেহভরা সেই মাতৃমুখ ঝুঁকে রয়েছে তার ওপর। প্রবল জ্বরের ঘোরকে কাটিয়ে তারিউর ঠোঁটের ফাঁকে আবার হাসি ফুটে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখদুটো আবার বুজে এল। মাদাম রিও ঘর থেকে বার হয়ে যাবার পর ডাক্তার মা'র ছেড়ে যাওয়া চেয়ারটাতে গিয়ে বসলেন। বাইরের রাস্তাঘাট নিস্তব্ধ, নিদ্রিত শহরে কোথাও যেন কোনো সাড়াশব্দ ছিল না। প্রত্যূষের ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছিল।

হালকা তন্দ্রার ঘোরে ডাক্তার চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছিলেন। এমন সময় বাইরের রাস্তায় সকালের গাড়িঘোড়া চলার শব্দে তার তন্দ্রা ছুটে গেল। তার গা'টা একটু শিরশির করে উঠল। তিনি একবার তারিউর দিকে তাকালেন। দেখলেন তারিউর চেহারায় একটা শান্ত অবসাদের ভাব ফিরে এসেছে। সে ঘুমুচ্ছে যেন। লোহার পাতের হাল পড়ানো গাড়ির চাকার ঘর্ঘর শব্দ আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল। অন্ধকার যেন তখনও বাইরে জানালার কাচের গায়ে লেপটে লেগেছিল। যখন ডাক্তার রিও তারিউর বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন, তারিউ একটা ভাবলেশহীন শূন্য দৃষ্টি মেলে তার দিকে চেয়ে রইলেন, ঘুমের ঘোর তখনও তার সম্পূর্ণ কাটেনি।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলে বোধ হয়, তাই না? ডাক্তার রিও জিজ্ঞাসা করলেন।

—হ্যাঁ, তা হবে।

—শ্বাস নিতে আর কষ্ট হচ্ছে?

—এখনও অল্প কষ্ট আছে। তা থেকে কিছু অনুমান করা যাবে বলে মনে করো তুমি?

ডাক্তার রিও কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন—না তারিউ, এ থেকে তেমন কিছুই অনুমান করা যাবে না। তুমি তো জানো, সকালের দিকে সাধারণত রোগের কিছুটা উপশম হয়।

—ধন্যবাদ।—তারিউ মাথা নেড়ে যেন ডাক্তারের কথায় সায় দিলেন। প্রকৃত অবস্থাটা কখন কীরকম থাকে না-থাকে আমাকে সবসময় জানতে দেবে, সেটুকু তোমার কাছ থেকে আশা করতে পারি নিশ্চয়।

ডাক্তার রিও তারিউর বিছানার ধারে বসেছিলেন। কবরের ওপর দাঁড় করানো

কুশপুত্তলিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো তারিউর শক্ত অনড় দুখানা পা তার গায়ে এসে ঠেকছিল। আবার তারিউর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

—আবার জ্বর উঠবে, তাই না রিও?

—তা হতে পারে। তবে দুপুরের দিকে অনুমান করতে পারব সত্যিকারের অবস্থাটা কী।

তারিউ আবার চোখ বুজলেন। মনে হচ্ছিল ভেতরে ভেতরে তিনি যেন শক্তি সঞ্চয় করছিলেন। তার চোখেমুখে ক্লান্তির গভীর অবসাদের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। আবার কখন জ্বরের প্রকোপ শুরু হবে তারই অপেক্ষা করছিলেন যেন তিনি। ইতিমধ্যেই তার সন্তার গভীরে হয়তো জ্বর বাড়া শুরু হয়েছিল। তারিউ আবার যখন চোখ খুললেন মনে হল তার চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। কিন্তু ডাক্তার রিওকে একটা গ্লাস হাতে তার বিছানার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার চোখের দৃষ্টি আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—এটা খেয়ে ফ্যালো দিকি।

তারিউ গ্লাসের পানিটুকু খেয়ে ফেললেন। তারপর আবার মাথাটা আস্তে আস্তে বালিশের ওপর রাখলেন।

—বড় বেশি সময় নিচ্ছে মনে হয়—তারিউ অস্ফুটভাবে বললেন।

ডাক্তার রিও তারিউর একখানা বাহু জড়িয়ে ধরলেন, কিন্তু তারিউর মুখখানা অন্যদিকে ফেরানো ছিল, তার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তারপর আকস্মিক বাঁধ ভেঙে গেলে যেমন অবস্থা হয় তেমনি দুর্বার বন্যাস্রোতের মতো আবার জ্বর উঠতে থাকল, তার দুই গণ্ড এবং কপাল লাল হয়ে উঠল জ্বরের প্রকোপে। তারিউ এবার ডাক্তার রিওর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। ডাক্তার রিও ঝুঁকে পড়ে স্নেহভরা দৃষ্টিতে চাইলেন তার দিকে, যেন উৎসাহ দিলেন তাকে। তার মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলেন একবার, কিন্তু মনে হল মুখ শুকিয়ে যাওয়ায় তার দুই চোয়াল এবং ঠোঁট আটকে গেছে, হাসি বার হতে চাইল না। গমগমে মুখের ওপর শুধু তার চোখদুটো তখনও দেখাচ্ছিল জীবন্ত, সাহসে উজ্জ্বল।

সকাল সাতটা আন্দাজ মাদাম রিও এসে দাঁড়ালেন তারিউর বিছানার পাশে। ডাক্তার তার অস্ত্রোপচারের ঘরে গিয়ে হাসপাতালে টেলিফোন করলেন। সেখানে তার জায়গায় অন্য একজন ডাক্তারের ডিউটির ব্যবস্থা করলেন। প্রতিদিন অন্যান্য ডাক্তারের সঙ্গে নিয়মিত যে-পরামর্শ করতেন তা বাতিল করে দিলেন সেদিন। তারপর কয়েক মিনিট অস্ত্রোপচারের ঘরের কৌচের ওপর শুয়ে রইলেন চুপচাপ। মিনিট-পাঁচেক পরে তিনি আবার তারিউর শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তারিউর বিছানার ঠিক পাশেই বসেছিলেন মাদাম রিও, তার হাত দুখানা কোলের ওপর রাখা। ঘরের অস্পষ্ট আলোয় তাকে খানিকটা গাঢ় ছায়ার মতো মনে হচ্ছিল।

তারিউর মুখখানাও তারই দিকে ফেরানো ছিল। তারিউ এমন নিবদ্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে থাকলেন যে মাদাম রিও নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে বিছানার পাশের বাতিটা নিভিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে জানালার বাইরে চারিদিকে আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছিল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তারিউর মুখখানা স্পষ্ট হয়ে উঠল। মাদাম রিও দেখলেন, তারিউ সেই একইভাবে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে

তার দিকে চেয়ে আছে। বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে মাদাম রিও তারিউর বিছানাটা ঠিক করে দিলেন। সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগে তার একখানা হাত রাখলেন তারিউর ঘামে-ভেজা জট-পাকানো চুলের ওপর। তারপর অনেকদূর থেকে যেন একটা অস্পষ্ট চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল তার কানে : ধন্যবাদ, এখন মোটামুটি ভালোই লাগছে। তিনি আবার যখন নিজের চেয়ারে এসে বসলেন, দেখলেন, তারিউ ইতিমধ্যেই চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। তারিউ সম্পূর্ণ মুখ বুজেছিলেন। তার চেহারাটাও ভয়ংকর বিকৃত দেখাচ্ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা কোমল হাসি যেন তার মুখের চাপপাশে খেলা করছিল।

দুপুরের দিকে জ্বর বাড়তে বাড়তে গিয়ে চরমে উঠল। তারিউর দেহের ভেতর থেকে প্রচণ্ড বেগে এমন একটা কাশি এল যার ফলে তার সমস্ত শরীরটা যেন একটা প্রবল ঝাঁকানি খেল, রক্ত উঠে এল থুতুর সঙ্গে। গ্রন্থিগুলোর স্ফীতি বন্ধ হয়ে এসেছিল বটে কিন্তু সারাটা দেহে এবং হাতে পায়ের গিটে গিটে লোহার টুকরোর মতো শক্ত ফোলা তখনও রয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার রিও লক্ষ্য করে দেখলেন, স্ফীতিস্থলোকে যে ছুরি দিয়ে ফেড়ে দেবেন তারও কোনোরকম উপায় নেই। জ্বরের প্রকোপ এবং প্রবল কাশির ঝাঁকানির ফাঁকে ফাঁকে তারিউ তখনও পরিচিত জনদের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাইছিলেন। আস্তে আস্তে তার চোখ খোলাটা কমে আসতে থাকল। পরিচিতজনদের সঙ্গে সঙ্গে তার বিধ্বস্ত চেহারার যে একটা উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠছিল আগে, সেটাও ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে আসল। প্রবল ঝঞ্ঝায় ঝাঁকানি খেয়ে তার দেহটা যে মাঝে মাঝে নড়েচড়ে উঠছিল, বিদ্যুতের চমকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল থেকে থেকে, তাও ক্রমেই দুর্লভ হয়ে আসতে থাকল। তারিউর দেহটাকে এখন মনে হচ্ছিল প্রবল ঝঞ্ঝার মুখে পরিত্যক্ত একটা নিমজ্জমান জাহাজের মতো, যা অনির্দিষ্ট পথে অসহায়ভাবে ভেসে চলেছে। ডাক্তার রিওর সামনে বিছানার ওপর এমনভাবে পড়েছিল শুধু মুখোশের মতো একটা মুখ যা সম্পূর্ণ অসাড়, হাসির ছোঁয়াচে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না যা আর কোনোদিন। ডাক্তারের চোখের সামনে পড়েছিল এই যে একটা মানুষের দেহ, তারই বন্ধুর দেহ, তা যেন প্লেগের বর্শার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে, লেলিহান দৈব আগুনে দগ্ধ হয়ে, প্রবল ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্ত হয়ে, তারই চোখের সামনে দুর্বিপাকের অতল বন্যাস্রোতের মাঝে নিমজ্জিত হচ্ছিল। অথচ এই বিপর্যয়কে রোধ করার জন্যে তার দিক থেকে করার মতো কিছুই ছিল না। আবার বিপর্যয়ের এই আক্রমণের সামনে শূন্য হাতে, ক্ষুব্ধ হৃদয়ে, নিরস্ত্র অসহায় অবস্থায় উপকূলে দাঁড়িয়ে তাকে যেন শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে হচ্ছিল। সুতরাং বিপর্যয়ের চরম পরিণতি ঘটে যাবার পর ডাক্তার রিওর দুচোখ ছাপিয়ে যে অশ্রুর বন্যা নেমে এল সে অশ্রু ছিল অসহায় ক্রোধের।

এরই ভেতর তারিউ যে কখন ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ করে শুলেন, তার সন্ধান গভীরে কোথায় যেন মূল তার ছিন্ন হয়ে গেল, আর অমনি একটা শূন্য আর্তনাদ করে তিনি নিজেকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিলেন, ডাক্তার রিও এসবের কিছুই লক্ষ্য করলেন না। পরের দিনের যে-রাতটা সেটা ছিল একটানা শান্তির; সংগ্রামের নয়। তখন মৃতের সেই নিথর গৃহে দৈনন্দিন সাধারণ পোশাকে সজ্জিত তারিউর মৃতদেহের পাশেও যেন সেই শান্তিরই প্রহরা চলছিল। বেশ কিছুদিন আগে এক রাতে শহরের বাইরে যাবার

গেটের সম্মুখে একটা গণ্ডগোল ঘটে যাবার পর ডাক্তার রিও প্লেগের ছোঁয়াচ থেকে দূরে এক বালকনিতে বসে চারপাশে যে এক অনাবিল আদিম শান্তির অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন, এখানকার মৃতের ঘরের এ শান্তিও ছিল ঠিক তেমনি। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুশয্যার পাশে তিনি যে শান্তি বিরাজ করতে দেখেছেন সেই শান্তির কথাও ইতিমধ্যে তার মনে পড়েছিল। দুপক্ষের মধ্যে একটা তুমুল সংগ্রামের পর যে একটা প্রশমনে শান্ত অবস্থা নেমে আসে, আগের আগের দিনের মতো আজকের এ শান্তিও ছিল যেন তারই সমতুল্য—এ শান্তি ছিল পরাজয়ের। কিন্তু এখন তারিউর দেহকে ঘিরে বিরাজ করছিল যে-শান্তি তা ছিল এত গভীর, নির্জন পথে-পথে রাত্রিকালে যে শান্তি বিরাজ করে, সংগ্রামের একটা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যে শহর শত্রুর হাত থেকে মুক্তিলাভ করেছে সেখানে নেমে আসে যে শান্তি, এ ছিল তারই এত কাছাকাছি যে, অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে হলেও ডাক্তার রিও পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে তাকে যে-পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে, সে-পরাজয় চূড়ান্ত। এ ছিল যেন যুদ্ধ-অবসানের পূর্বে শত্রুর সঙ্গে শেষ মোকাবিলা এবং চরম বিপর্যয়ের পর যে শান্তি নেমে আসে সেই শান্তি যে শান্তিকে মনে হয় এমনই একটা অভিশাপ যার কোনো উপশম নেই। ডাক্তার রিও জানতেন না যে এখন যখন সবকিছুর অবসান হয়েছে, তারিউর আত্মা সত্যিই শান্তি লাভ করেছে কিনা। নিজের সম্পর্কে তিনি এটুকু অনুধাবন করেছিলেন, সন্তানহারা মা যেমন জীবনে আর কোনোদিন শান্তি ফিরে পায় না, যে ব্যক্তি নিজের প্রিয়তম বন্ধুকে কবর দিয়ে এসেছে তার অন্তরে যেমন আর শান্তি ফিরে আসে না, তেমনি এর পর থেকে তার জন্যেও শান্তির প্রত্যাশা হবে শুধু একটা ব্যর্থ হাহাকার মাত্র।

সেদিন রাতে আবার ঠান্ডা পড়া শুরু হল। মাথার উপর শীতের পরিষ্কার আকাশ। তারাগুলো স্বচ্ছ কুয়াশার অন্তরাল থেকে মিটমিট করছিল। ঘরের ভেতর তেমন আলো ছিল না। মনে হচ্ছিল বন্ধ-জানালার বাইরের কাচের ওপর যেন একটু একটু করে হিম এসে জমছে। [illegible] থেকে রাতের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ কানে আসছিল যেন। মাদাম রিও তার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তারিউর বিছানার পাশে বসেছিলেন। তার মুখের ডানপাশটা বিছানার ধারের বাতির আলোয় উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। ঘরের মাঝখানে, আলোর বৃত্তের বাইরে বসে ডাক্তার রিও নীরবে অপেক্ষা করছিলেন। মাঝে মাঝে স্ত্রীর কথা স্মরণ হতে তার চিন্তা যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছিল, কিন্তু তিনি যেন জোর করে স্ত্রীর চিন্তা মন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিলেন।

সন্ধ্যার গোড়ার দিকে শীতে-জমে-যাওয়া হাওয়ার ভেতর থেকে পথচারীদের দ্রুত পায়ের শব্দ ভেসে উঠছিল ফুটপাতের উপর।

—সব ব্যবস্থা মোটামুটি সারা হয়ে গেছে নিশ্চয়।—মাদাম রিও জিজ্ঞাসা করলেন।

—হ্যাঁ, মা, টেলিফোনে সব সেরে ফেলেছি।

এখন তারা দুজনে মৃতের পাশে বসে পাহারা শুরু করেছিলেন। মাদাম রিও থেকে-থেকে আড়চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। যখনই তাদের চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছিল, ডাক্তার রিও হাসছিলেন। বাইরে রাস্তার ওপর চারদিকে বিরাজ করছিল একটা থমথমে নীরবতা, সেই নীরবতাকে ছাপিয়ে মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল রাতের

স্বাভাবিক নানারকমের শব্দ। সরকারিভাবে অনুমতি না-দেয়া হলেও তখনই রাস্তায় বেশকিছু সংখ্যক মোটরগাড়ি চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছিল। টায়ারের হিসহিস শব্দ করে মোটরগুলো ছুটে চলছিল সামনের দিকে, পিছু হটছিল, আবার ফিরে আসছিল। মাঝে মাঝে বহু লোকের মিলিত কোলাহল ভেসে আসছিল, ভেসে আসছিল দূরাগত ডাক, তারপরেই আবার শুরু হচ্ছিল দীর্ঘ একটানা নীরবতা। ক্ষণিক বাদেই সেই নীরবতা ভেঙে ভেসে আসছিল ঘোড়ার খুরের শব্দ, মোটরগাড়ির হর্ন, মোড় ফেরার সময়কার ঝাঁকানির আওয়াজ, তার শেষে আবার কানে আসছিল রাত্রির শ্বাসপ্রশ্বাসের একটানা নীরব ধ্বনি।

—বার্নার্ড।

—বলো, মা।

—খুব বেশি ক্লান্ত মনে হচ্ছে?

—না, মা।

মা যে তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সেই মুহূর্তে তিনি যে কী চিন্তা করছিলেন তা ডাক্তার রিও জানতেন এবং তার এ উপলব্ধি হয়েছিল যে কাউকে ভালোবাসা এই ব্যাপারটার মধ্যে বোধহয় তেমন কোনো তাৎপর্য নেই। অথবা এমন হতে পারে যে ভালোবাসাটা কোনো সময় একখানি প্রগাঢ় বা গভীর হয়ে ওঠে না যখন তাকে প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা মানুষ খুঁজে পায়। মাতা-পুত্র দুজনেই তারা বরাবর পরস্পরকে হয়তো এমনিভাবে নীরবে ভালোবেসে যাবে। তারপর একদিন হয়তো মা মারা যাবেন অথবা তিনি নিজেই। কিন্তু এমনিভাবে নীরবে ভালোবেসে যাওয়া ছাড়া তাদের পরস্পরের স্নেহবোধকে প্রকাশের জন্যে সারাজীবনে এর বাইরে যে কিছু করবেন, মনে হয় না। ঠিক একইভাবে দীর্ঘসময় ধরে তার জীবন কেটেছে তারিউর পাশাপাশি, কিন্তু তাদের দুজনের ভেতর যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, তা তাদের পরস্পরের জীবনে পূর্ণতা লাভের আগেই তারিউ সেদিন সন্ধ্যায় মারা গেল। তারিউ যেমন বলত জীবনের খেলায় সে হেরে গেছে; কিন্তু রিও, নিজে যিনি এই খেলায় জিতেছেন, তিনিই বা কী এমন পেয়েছেন তাঁর জীবনে? প্লেগকে জানা আর তার নিষ্ঠুর স্মৃতি বয়ে বেড়ানো, বন্ধুত্ব লাভ করা আর তারপর তার স্মৃতি লালন করে যাওয়া, স্নেহের বন্ধনে জড়িয়ে পড়া তারপর একদিন নিয়তি হিসাবে তার স্মৃতিকে মনের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখা—এইসব অভিজ্ঞতা ছাড়া এই জয়ের ফলে কী এমন পেয়েছেন তিনি? প্লেগ এবং জীবন, এ দুয়ের দ্বন্দ্বের মাঝে মানুষ যা-কিছু লাভ করে তা হচ্ছে কিছু জ্ঞান, কিছু অভিজ্ঞতা আর কিছু কিছু স্মৃতি। তারিউ হয়তো এগুলোকেই বলত জীবনের খেলায় জয়লাভ করা।

বাইরে থেকে আর-একখানা মোটরগাড়ি ছুটে চলার শব্দ ভেসে এল। মাদাম রিও নিজের চেয়ারে যেন একটু নড়েচড়ে বসলেন। ডাক্তার রিও মা'র দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। তিনি যেন ছেলেকে আশ্বস্ত করতে চাইছিলেন যে সত্যিই তিনি তেমন ক্লান্তি বোধ করছেন না। ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, এবার দূরে পাহাড়ে কোনো স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে তার কিছুদিন বিশ্রাম নেয়া দরকার।

—হ্যাঁ, মা, তাই করব এবার।

সত্যি সত্যিই এবার দূরে কোথাও গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেবেন তিনি। তখন সেটাও আবার স্মৃতির উৎস হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সত্যিই এই খেলায় জেতার অর্থ যদি শুধু এই হয়, তাহলে যেখানে কোনোরকম প্রত্যাশা নেই, শুধু এই জ্ঞান আর স্মৃতিকে নিয়ে মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে? খুব সম্ভবত এইভাবেই তারিউ তার জীবন কাটিয়ে গেছে। যে জীবনের সামনে কোনোরকম বিভ্রমের মোহ নেই, সে জীবন যে কতখানি নিষ্ফল তাও সে উপলব্ধি করে গেছে নিশ্চয়। যেখানে কোনোকিছুর প্রত্যাশা নেই, সেখানে শান্তিলাভের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হাহাকারের মতো। আর একে অন্যকে দোষারোপ করবার, বিচারক সেজে একে অন্যকে মৃত্যুদণ্ড দেবার অধিকার যে আমাদের আছে, যেহেতু তারিউ তা কোনোদিনই মেনে নিতে পারেনি—যদিও সে এটাও উপলব্ধি করত যে এছাড়া ভিন্ন গতি নেইও আমাদের জন্যে, কারণ আজ যে দণ্ড প্রাপ্তিকাল তাকেই আবার হয়তো দণ্ড দেবার জন্যে এগিয়ে যেতে হবে। সুতরাং তাকেও নিশ্চয় বিভিন্ন অসঙ্গতির ভেতর জীবন কাটিয়ে যেতে হয়েছে। জীবনে প্রত্যাশা থাকার যে সান্ত্বনা তা কোনোদিনই হয়তো লাভ করেনি সে। অপরের সেবার মধ্যদিয়ে মানসিক শান্তিলাভের তার যে গভীর ইচ্ছা, মহাপুরুষের পর্যায়ে উন্নীত হবার জন্যে, দেবত্ব লাভের জন্যে সে যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত, তাদের তাৎপর্যও কি এই-ই? সত্যি বলতে কী, প্রশ্নের জবাব যে কী হতে পারে সে-সম্পর্কে ডাক্তারের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তারিউর সম্পর্কে যে-স্মৃতিটুকু তার অন্তরের মণিকোঠায় চিরদিন জাগরূক থাকবে তা হচ্ছে, তারিউ ছিল এমন একজন মানুষ যে গাড়ি চালাতে বসলে স্টিয়ারিং ধরত শক্ত হাতে। অথবা ঐ যে তার বিশাল দেহটা নিসাড় পড়ে রয়েছে হয়তো এই চিত্রটাই। একে অন্যকে জানার ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে এই : একটা সচেতন উষ্ণ সান্নিধ্য পরিশেষে একটা মৃত্যুর চিত্র।

পরের দিন স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পরও যে ডাক্তার রিওকে কিছুমাত্র বিচলিত হতে দেখা গেল না তার পেছনেও হয়তো ছিল তার এই একই উপলব্ধি। অস্ত্রোপচারের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। মা এসে ঢুকলেন, কতকটা ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকলেন যেন তিনি ডাক্তার রিওর হাতে একখানা টেলিগ্রাম এগিয়ে দিলেন। তারপর টেলিগ্রামটা এনেছিল যে ছোকরা তাকে কিছু বকশিশ দেবার জন্যে ফিরে গেলেন তিনি। আবার যখন উঠে এলেন দেখলেন, ডাক্তার রিও খোলা টেলিগ্রামখানা হাতে ধরে তেমনি বসে আছেন। তিনি ছেলের দিকে চাইলেন। ডাক্তার রিও যেন কতকটা জোর করেই তার দৃষ্টি বাইরের জানালার ওপর নিবদ্ধ রাখলেন। দূরে বন্দরের ওপর প্রভাতের সূর্য উদয় হচ্ছিল, তার উজ্জ্বল রশ্মিচ্ছটা এসে পড়েছিল তার জানালার ওপর।

—বার্নার্ড।—মাদাম রিও শান্তভাবে ডাকলেন।

ডাক্তার ফিরে দাঁড়িয়ে মা'র দিকে তাকালেন। মনে হল তিনি যেন একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখছেন।

—খবর কী?

—ওইই। হ্যাঁ, একই খবর, একসপ্তাহ আগে সে মারা গেছে।

মাদাম রিও নিজেও এবার জানালার দিকে মুখ ফেরালেন। ডাক্তার কিছুক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ করলেন না। তারপর মাকে কাঁদতে বারণ করলেন। বললেন, কিছুদিন থেকে এইরকম একটা সংবাদই প্রত্যাশা করছিলেন তিনি। তবে ব্যাপারটা নিশ্চয় অত্যন্ত দুঃখজনক একথা বললেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও যেন উপলব্ধি করলেন এই দুঃখ নতুন কিছু নয়। গত কয়েক মাস ধরে, বিশেষ করে গত দুদিন ধরে এই একই দুঃখ একই বেদনা সইতে হচ্ছে তাকে।

৪

অবশেষে ফেব্রুয়ারির এক উজ্জ্বল প্রভাতে জনসাধারণ, সংবাদপত্র, রেডিও এবং সরকারি ইস্তেহারের প্রচুর প্রশংসার উচ্ছ্বাসের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে শহরের বাইরের গেটগুলো খুলে দেয়া হল। এরপর কাহিনীকারের যা-কিছু কর্তব্য তা হচ্ছে গেট খোলার পর যে আনন্দ-উৎসব পালন করা হয় সাধ্যমতো তারই একটা বর্ণনা, অবশ্য যদিও অনেকের মতো তিনি নিজেও পুরোপুরি আন্তরিকতার সঙ্গে এই উৎসবে অংশ নিতে পারেননি।

এই উপলক্ষে দিনরাতব্যাপী এক ব্যাপক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল এবং সেইদিনই একসঙ্গে দেখা গেল একদিকে যেমন স্টেশনে বিভিন্ন ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া উঠছে, তেমনি বাইরে থেকে জাহাজ এসে পৌঁছুতে শুরু করেছে এই বন্দরে অর্থাৎ এই সবই যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যে আজই হচ্ছে বহুপ্রতীক্ষিত সেই পুনর্মিলনের দিন, বিচ্ছেদকাতর মানুষ এতদিন ধরে যে অশ্রুপাত করে এসেছে আজ তার অবসানের দিন।

এই-যে দীর্ঘ বিচ্ছেদের অনুভূতি যা এতদিন ধরে শহরের অধিকাংশ অধিবাসীর অন্তরকে অনুক্ষণ পীড়া দিয়েছে তার ফল যে কী হতে পারে তা এই অবস্থায় আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। সেদিন সারাটা দিন ধরে স্টেশন ছেড়ে যে ট্রেনগুলো বাইরে গেল তাতেও যেমন ভিড় দেখা গেল, ঠিক তেমনি ভিড় দেখা গেল যে ট্রেনগুলো স্টেশনে এসে ঢুকল তাদের ভেতর। প্রত্যেকটা যাত্রী বহু আগে থেকেই সিট রিজার্ভ করে রেখেছিল এবং গত একপক্ষকাল ধরে তারা যেন শূলের ওপর কাটাচ্ছিল, এই আশঙ্কায় যে শেষমুহূর্তে গিয়ে কর্তৃপক্ষ এইদিন ট্রেন চালু করার তাদের সিদ্ধান্তটা হয়তো বাতিল করে দেবে। যারা ফিরে আসছিলেন তাদের অনেকের হৃদয় যেন অনিশ্চয়তার দ্বন্দ্বে কাঁপছিল। তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের কার ভাগ্যে কী ঘটেছে তা আগে থাকতে জানতে পারলেও অপর এমন অনেকে ছিলেন যাদের সম্পর্কে এবং বিশেষ করে শহরের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তারা তখনও কিছুই জানতেন না। অথচ শহরের অবস্থা সম্পর্কে আগে থাকতেই মনে-মনে তারা এক বিভীষিকাময় চিত্র কল্পনা করে রেখেছিলেন। এই কথাগুলো অবশ্য শুধু তাদের বেলায় প্রযোজ্য যারা এই দীর্ঘ নির্বাসনকালে কোনো সময় তেমন সন্ত্রস্তবোধ করেননি, কিন্তু বিরহকাতর নরনারীদের বেলায় এই মন্তব্য খাটে না।

বাস্তবিক বিরহকাতর নরনারীর যেন এই দীর্ঘ সময় ধরে তাদের ধরাবাঁধা চিন্তার ভেতরেই ডুবেছিলেন। তাদের মধ্যে শুধু একটা জিনিসেরই পরিবর্তন হয়েছিল। বিচ্ছেদের দিনগুলোতে যেমন তাদের সময় যেন কিছুতেই কাটতে চাইত না, আর সবসময় তারা মনে-মনে ভাবতেন কী করলে সময় আরো দ্রুত পার করে দেয়া যায়। এখন শহরের কাছাকাছি পৌঁছে তারা চাইছিলেন সময়ের গতি আরো মন্থর হোক। ব্রেক কষতে কষতে ট্রেন যখন স্টেশনের ভেতর ঢুকছিল তাদের মনে হচ্ছিল প্রত্যেকটা মুহূর্তের অনিশ্চয়তা আরো বাড়ুক। তাদের প্রেমময় জীবনের যে দিন, সপ্তাহ এবং মাসগুলো ব্যর্থতায় কেটে গেছে, সেই সময়কার তাদের যে-অনুভূতি সে-অনুভূতি হয়তো খুবই অস্পষ্ট, কিন্তু তাই বলে তার ভেতর যে তীক্ষ্ণতা ছিল না এমন নয়, সে অনুভূতি তাদের মনে এই ধারণার জন্ম দিয়েছিল যে এই দীর্ঘ সময়ের ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাদের কিছু প্রাপ্য জমেছে; তারা আশা করছিলেন অতীতের অপেক্ষার দীর্ঘ দিনগুলো কেটেছে যেভাবে, এখনকার আনন্দময় মুহূর্তগুলো তার চেয়ে অনেক মন্থর গতিতে, তার অর্ধেক গতিতে কাটবে। আর যারা বাসায় বা স্টেশনের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে তাদের ফেরার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন, তারা ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠে বিরক্তি প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন, অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় তাদের বুক দুরুদুরু কাঁপছিল। র‍্যাঁবেয়ার নিজেও ছিলেন এদেরই একজন, কারণ আগে থাকতেই তিনি স্ত্রীকে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। তার স্ত্রী সময়মতো প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা সেরে নিয়েই প্রথম ট্রেনেই শহরে আসছিলেন। তখনকার সেই অবস্থায় র‍্যাঁবেয়ার নিজেও মনে-মনে বেশ দুর্বল হয়ে উঠেছিলেন, তারও বুক কাঁপছিল এই ভেবে যে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাকে এমন এক ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততার মুখোমুখি হতে হবে, যা এই দীর্ঘ ন'মাসে মার্জিত হতে হতে একটা বিমূর্ত ধারণায় পরিণত হয়েছে। মুখোমুখি হতে হবে রক্তমাংসের গড়া সেই নারীমূর্তির, যাকে ঘিরে তার ভালোবাসার অনুভূতির জন্ম এবং যে এখন তার কাছে এই বিমূর্ত ধারণা মাত্র। সেই মুহূর্তে র‍্যাঁবেয়ারের মনে হচ্ছিল যে, সময়ের গতি যদি হঠাৎ পেছনে ফিরে যেত, আবার যদি তিনি দুর্বিপাকের গোড়ার দিকের সেই মানুষটাতে ফিরে যেতে পারতেন, যার অন্তরের কামনা এবং চিন্তা ছিল মাত্র একটাই : কী করে পালিয়ে আবার নিজের প্রিয়ার কাছে ফিরে যাবেন। কিন্তু তিনি জানতেন, তা এখন সম্পূর্ণ অসম্ভব, অনেক বদলে গেছেন তিনি এরই ভেতর। প্লেগের এই ক'মাসে তার অন্তরে এমন একটা নিরাসক্ত ভাবের জন্ম হয়েছিল, যাকে হাজার যুক্তিতর্ক দিয়েও মন থেকে যেন সরাতে পারছিলেন না, যা একটা অবয়বহীন শঙ্কার মতো অনুক্ষণ তার অন্তরে ঘোরাফেরা করত। ইতিমধ্যে তিনি এমন চিন্তাও শুরু করেছিলেন যে বড় আকস্মিক প্লেগের উপশম হয়েছে, এখনকার এই পরিবর্তিত অবস্থার জন্যে নিজেকে যে তিনি প্রস্তুত করে নেবেন সে-সুযোগও পাননি তিনি। সুখ এবং আনন্দ যেন সম্পূর্ণ আকস্মিক, অপ্রত্যাশিতভাবে তার সামনে উপস্থিত হয়েছিল; বাস্তবে যা ঘটেছিল তা যেন তার সব প্রত্যাশাকেই ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। র‍্যাঁবেয়ার এটাও অনুভব করেছিলেন যে, হয়তো নিমেষের মধ্যে আবার তিনি তার সবকিছু ফিরে পাবেন, প্রদীপ্ত শিখার মতো আনন্দের

শিহরণে লাফিয়ে উঠবে তার অন্তর, যাকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারবেন না তিনি।

প্রকৃতপক্ষে প্লাটফরমের ওপর অপেক্ষমাণ সবাই তখন কতকটা সচেতনভাবে র‍্যাঁবেয়ারের মতো এই একই বিষয় উপলব্ধি করছিলেন। তাদের কথাই বলা হবে এখন। নিজের নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ফিরে যাবার জন্যে সবাই তখন উন্মুখ কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ভেতর একটা সখ্যের ভাব পুরোমাত্রায় বজায় ছিল, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিলেন তারা, খুশির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন পরস্পরের দিকে। কিন্তু এগিয়ে আসা ইঞ্জিনের ধোঁয়া তাদের চোখে পড়তেই নিমেষের মধ্যে একটা দুর্বার উন্মত্ত আনন্দে তাদের অন্তর ছাপিয়ে উঠল; নির্বাসনের সেই অনুভূতি যেন ভেসে গেল তার সামনে। তারপর ট্রেন যখন স্টেশনের ভেতরে এসে থামল, যে বিচ্ছেদকে একদিন মনে হত অন্তহীন এবং অনেক ক্ষেত্রেই যার সূত্রপাত হয়েছিল এই প্লাটফরমের ওপর, এক মহাআনন্দময় লগ্নে এখানেই আবার তার সমাপ্তি ঘটল। দেখতে দেখতে শত শত বাহু দীর্ঘদিনের বঞ্চিত অধিকারকে ফিরে পাবার ব্যাকুল আগ্রহে এমন সব দেহকে জড়িয়ে ধরতে এগিয়ে গেল, হয়তো সময়ের ব্যবধানে যাদের সত্যিকারের আকৃতিও তখন তাদের স্মরণ ছিল না।

র‍্যাঁবেয়ারের কথাই ধরা যাক, যে স্ত্রীলোকটা তার দিকে ছুটে আসছিলেন তার দেহের দিকে তিনি যে একবার ভালো করে চাইবেন সে অবসরটুকুও হল না, ইতিমধ্যেই স্ত্রী তার বুকের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুবাহু দিয়ে তিনি স্ত্রীর দেহটাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর তার মাথাটাকে চেপে ধরলেন নিজের কাঁধের ওপর। মাথার সেই পরিচিত চুলগুলি ছাড়া এখন আর কিছুই তার চোখে পড়ছিল না। তার দুচোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারছিলেন না, অশ্রুর কারণ তার সেই মুহূর্তের আনন্দ, না দীর্ঘদিনের চাপা দুঃখ। তিনি শুধু এইটুকু সচেতন ছিলেন যে অশ্রুর প্লাবন তাকে নিশ্চিতভাবে জানতে দিচ্ছিল না যে তার কাঁধের ফাঁকে লুকানো মুখটা কি সত্যি সেই মুখ—অসংখ্যবার তার স্বপ্নের মাঝে যার উদয় হত না? এ মুখ কোন্ অপরিচিতার? সেই মুহূর্তে তার চারপাশের অন্য সবাই যারা বিশ্বাস করতেন অথবা অনুরূপ বিশ্বাসের ভান করছিলেন যে প্লেগ হয়তো বারে বারে এই পৃথিবীতে আসবে কিন্তু তার ফলে মানুষের হৃদয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না, তারা যেমন আচরণ করছিলেন ঠিক সেইরকম আচরণ করবার ইচ্ছা জাগল তার মনে।

পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে তারা নিজের নিজের বাসার দিকে ফিরে চললেন। বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে তারা যেন তখন আর সচেতন ছিলেন না। প্লেগকে যে সম্পূর্ণ পরাভব মানানো গেছে, তার ওপর যে একটা সুনিশ্চিত জয় হয়েছে, সেটাই তখন ছিল সবার অন্তরের একমাত্র উপলব্ধি। এমনকি দুঃখ-বেদনার কথাও যেন তখন সবাই ভুলে গেলেন, ভুলে গেলেন তাদের দুর্দশার কথা যারা একই ট্রেনে তাদের সঙ্গে দেশে ফিরে দেখলেন প্ল্যাটফরমে তাদের জন্যে কেউ অপেক্ষা করে নেই। প্রিয়জনদের দীর্ঘ নীরবতা একদিন তাদের অন্তরে যে-আশঙ্কার জন্ম দিয়েছিল, এখন বাসায় ফিরে হয়তো দেখবেন সেই আশঙ্কা সত্যি—এই ভেবে সেই অবস্থার মোকাবিলার জন্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত করলেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তিদের জন্যে

যাদের তখন থেকে একমাত্র সহচর হয়ে দাঁড়াল এই নতুন শোক, যারা সারাজীবন ধরে বিয়োগব্যথার স্মৃতিকে বয়ে বেড়াবার জন্যে নিজেদেরকে সমর্পণ করতে প্রস্তুত হলেন, এইসব অসুখী মানুষদের জন্যে সবকিছু হয়ে দাঁড়াল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিচ্ছেদের চরম বেদনা তাদের জন্যে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। এইসব মা, স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা এবং প্রিয়জন মৃত্যুর গহ্বরে মুঠো কলিচুনের তলায় ঢাকা পড়ে যাওয়ার জন্যে অথবা মৃত্যুর পর সামান্য একমুঠো ভস্মে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার জন্যে যাদের অন্তরে আনন্দের উৎস চিরদিনের জন্যে এইভাবে শুকিয়ে গেল, তাদের জন্যে কিন্তু প্লেগের দুর্বিপাকের সত্যিই অবসান হল না।

কিন্তু এইসব নিঃসঙ্গ শোকার্ত মানুষদের কথা কেই-বা চিন্তা করছিল তখন? সকাল থেকে যে একটা দমকা বাতাস বইছিল, এখন আর ছিল না সেটা, সূর্য উঠে এসেছিল মাথার উপর, স্রোতের মতো অবিরাম ধারায় শান্ত সূর্যের কিরণ নেমে আসছিল শহরের ওপর। নির্মল ঢালা-নীল আসমানের নিচে পাহাড়ের উপরের দুর্গ থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণের শব্দ ভেসে আসছিল। আমাদের অগ্নিপরীক্ষার সবে শেষ হয়েছে, অথচ তার স্মৃতি মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যাওয়া তখনও শুরু হয়নি, এরই মাঝামাঝি যেসব ঘটনাবহুল মুহূর্ত সেগুলো উদ্‌যাপনের জন্যে সবাই রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল।

রাস্তায় রাস্তায় পার্কে পার্কে মানুষ নাচতে শুরু করেছিল। চব্বিশ ঘণ্টায় রাস্তায় মোটরগাড়ির সংখ্যা বাড়ল দ্বিগুণ। ক্রমেই অধিকসংখ্যক গাড়ি রাস্তার মোড়ে মোড়ে উৎসবমুখর জনতার সামনে আটকা পড়ে যেতে থাকল। সারাটা বিকালভর গির্জার ঘণ্টা বেজে চলল পুরোদমে, তাদের প্রতিধ্বনিতে নীল আর সোনালি আকাশ ভরে উঠল যেন। সত্যি সত্যিই শহরের প্রত্যেকটা গির্জায় দুর্বিপাকের হাত থেকে মুক্তিলাভ উপলক্ষে ত্রাণকার্যকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে প্রার্থনা চলছিল। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-ফূর্তির আড্ডাগুলোও ভরে উঠেছিল। প্রত্যেকটা কাফেতে মদের শেষ বোতলটা পর্যন্ত বার করে আনা হল, কেউ একবার ভাবলও না পরবর্তী দিনের কথা। প্রত্যেকটা মদের দোকানের সামনে দেখা যাচ্ছিল উত্তাল জনতা, প্রেমিক-প্রেমিকারাও ছিল তাদের ভেতর, পরস্পরকে সোহাগ করছিল তারা সবার সামনে, কে কী ভাবছে খেয়াল দিচ্ছিল না সেদিকে তারা। সবাই হাসছিল, প্রাণভরে চিৎকার করছিল কেউবা। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে জীবনের শিখা যেন ক্ষীণ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল সবার জন্যে। তাই সংকট থেকে মুক্তিলাভের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনটি পালনের উপলক্ষে সবাই যেন অন্তরের চাপা অনুভূতিকে বেপরোয়াভাবে উজাড় করে দিচ্ছিল। পরের দিন থেকে আবার শুরু হবে বাস্তব জীবন—শুরু হবে তার বাধানিষেধ। কিন্তু এই মুহূর্তে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অবাধে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করছিল, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলছিল সবাই সবাইকে। মনে হচ্ছিল আসন্ন মৃত্যুর ভয়ও কার্যত যে সমতা বিধান করতে পারেনি, মুক্তির এই আনন্দমুখর লগ্নে শেষপর্যন্ত তা যেন সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু বাইরের আড়ম্বরপূর্ণ এই-যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস, এ ছিল সেদিনের শহরের জীবনধারার একটা দিক মাত্র। সেদিনের সন্ধ্যায় যারা শহরের রাস্তাটা ভরে তুলেছিলেন, তাদের অনেকেই বাইরে একটা শান্তি-প্রশান্তির ভাব দেখালেও ভেতরে

ভেতরে অন্য একধরনের সূক্ষ্মতর আনন্দ উপভোগ করছিলেন। র‍্যাঁবেয়ার এবং তার স্ত্রীও ছিলেন এই দলে। বাস্তবিকই, অনেক স্বামী-স্ত্রী এমনকি সম্পূর্ণ পরিবারের লোকজনদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন সাধারণভাবে বেড়াতে বেরিয়েছেন, তা ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে একদিন তারা যেসব জায়গায় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেছিলেন এখন যেন প্রবল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সেইসব স্থানগুলোর কথা স্মরণ করছিলেন। আবার নতুন যারা শহরে এসেছিলেন, বেড়াতে বেড়াতে তাদেরকে তারা প্লেগের আক্রমণের ছোট বড় স্বাক্ষরতার ধ্বংসাবশেষ দেখাচ্ছিলেন। তারা নিজেরা দুর্বিপাক ভোগ করেছেন, তারপর কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে গেছেন, তারা ছিলেন এর সাক্ষী। এইসব দেখানো শোনানোর ব্যাপারে তারা শুধু পরিচালকের কাজ করছিলেন, নিজেদের ব্যক্তিগত শঙ্কার কথা উল্লেখ না করে তারা শুধু সাধারণভাবে প্লেগের বিপদের কথা গল্প করছিলেন। এই গল্প করাটা ছিল একধরনের শান্ত আনন্দ উপভোগ, অনেকটা সাধারণ আমোদ-প্রমোদের মতো।

কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে শহরের চারপাশে এই ঘুরে-বেড়ানোর ভেতরও অনেক আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের ব্যাপার ছিল। যেমন, এইভাবে বেড়াতে বেড়াতে কোনো-কোনো পুরুষ যার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অনেক কোমল স্মৃতি জড়িয়ে আছে এমনি একটা স্থানের দিকে আঙুল দেখিয়ে তার সঙ্গের মেয়ে বা স্ত্রীলোকটাকে বলছিল : এই জায়গাটায় ঠিক এমনি এক সন্ধ্যায় তোমাকে কাছে পাবার জন্যে ভারি ইচ্ছা হচ্ছিল জেনি, কিন্তু তখন কোথায় পাব তোমাকে?

এমনি আবেগপ্রবণ যেসব লোক সেদিন শহরের রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, তাদেরকে সহজেই চিহ্নিত করা চলত, বিক্ষুব্ধ জনতার মাঝে তারা যেন ছিলেন ফিস-ফিসানির মরূদ্যান, সবকিছুর ছোঁয়াচ থেকে দূরে সরে, তাঁরা যেন নিজেদের মধ্যে নিজেরা বিভোর হয়েছিলেন। পার্কে বা উদ্যানে যে উৎসবের বাজনা বাজছিল তার চেয়ে অনেক জোরালোভাবে তারাই যেন প্রকাশ করছিলেন মুক্তির সত্যিকারের সুখ-আনন্দকে। মোহাবিষ্ট, পরস্পরের দেহলগ্ন, প্রায় নির্বাক, পরিতৃপ্ত মানুষের যে অহমিকা-অন্যায়ের স্পর্ধা, তা যেন পরিস্ফুট তাদের চোখেমুখে, আনন্দ-উৎসবের সেই হট্টগোলের ভেতর এইসব একমাত্র প্রেমিক-প্রেমিকারাই যেন ঘোষণা করছিলেন প্লেগের অবসান হয়েছে, অবসান হয়েছে সন্ত্রাসের রাজত্বের। সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা যেন শান্তভাবে অস্বীকার করে যাচ্ছিলেন, এই কিছুদিন আগেও মানুষকে এক উন্মাদ পৃথিবীতে বাস করতে হচ্ছিল, যেখানে নির্দ্বিধায় মানুষকে মশামাছির মতো হত্যা করা হত। অস্বীকার করে যাচ্ছিলেন প্লেগের সেই সুনির্দিষ্ট বর্বরতা, পূর্বকল্পিত উন্মত্ততা বা যা তাৎক্ষণিক বা তৎকালীন নয় এমন সবকিছু সম্পর্কে মনের ভেতর জন্ম দিয়েছিল একটা ঘৃণ্য স্বাধীনতার। আর অস্বীকার করছিলেন শবাগারের সেই কঠিন দুর্গন্ধকে, যার জন্যে যেসব মানুষ প্লেগের শিকার হত না, তাদের অনুক্ষণ মনে হত যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। সংক্ষেপে তারা যেন অস্বীকার করছিলেন, এই কিছুদিন আগেও আমরা ছিলাম অভিশাপগ্রস্ত এমন এক জনসমাজ যার কিছু অংশ প্রতিদিন শহরের সেই মস্ত চুল্লিটার ইন্ধন জোগাতে গিয়ে তেলতেলে ধোঁয়ার আকারে নিঃশেষ

হয়ে যেত আর বাকি অংশ এক অসহায় বন্দিত্বের মাঝে সেই একই পরিণতির অপেক্ষায় দিন গুনত।

গির্জার ঘণ্টা, বন্দুকের আওয়াজ, বাজনার সুমধুর তান, কানে তালা-লাগানো বহু কণ্ঠের চিৎকার ইত্যাদির মিলিত গর্জনের ভেতর দিয়ে সেদিন পড়ন্ত বেলায় ডাক্তার রিও যখন নিঃসঙ্গ অবস্থায় শহরের উপকণ্ঠের দিকে যাচ্ছিলেন, সেই সময়টায় অন্তত এইরকম একটা ধারণা তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। মাঝে এক-আধদিন যে বিশ্রাম নেবেন সে উপায় তার ছিল না, কারণ রোগীদের তো আর ছুটি নেই। সারাটা শহরকে ঘিরে বিরাজ করছিল যে একটা স্বচ্ছ শান্ত আলো, তার ভেতর থেকে কাবাব এবং মদের গন্ধ ভেসে আসছিল। তার চারপাশে আনন্দ-উজ্জ্বল অসংখ্য মুখ তাকিয়েছিল উজ্জ্বল আকাশের দিকে। কামনাজড়িত অস্ফুট কণ্ঠের চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে নারীপুরুষ পরস্পরকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরছিল, তাদের গণ্ডদেশ চিকচিক করে উঠছিল। হ্যাঁ, সত্যিই এবার মনে হচ্ছিল প্লেগের অবসান হয়েছে, অবসান হয়েছে সন্ত্রাসের। প্রবল আবেগভরে নারীপুরুষ যে তাদের বাহু পরস্পরের দিকে প্রসারিত করে দিচ্ছিল তা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল প্লেগ আর তার সন্ত্রাসের অর্থ কী ছিল : গভীরতর অর্থে নির্বাসন এবং বঞ্চনা বলতে যা বোঝায় এ ছিল তা-ই।

এই প্রথম ডাক্তার রিও অনুভব করলেন, রাস্তায় চোখে পড়ত যেসব মুখ তাদের ভেতর তিনি যে একটা পারিবারিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করতেন তার বোধ হয় একটা সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন ছিল শুধু নিজের চারপাশে একটু গভীরভাবে দৃষ্টি দেবার। প্লেগ আর তার দুর্দশা এবং বঞ্চনার অবসান হবার পর, এইসব নরনারী এতদিন ধরে যে-ভূমিকায় অভিনয় করে আসছিলেন তা যেন এখন তাদের চেহারায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল—তারা যে বিদেশী, এতদিন পরে সুদূর বিদেশে নির্বাসিত জীবনযাপন করে যাচ্ছিলেন, সেটা প্রকাশ পেত প্রথমে তাদের চেহারায়, পরে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদে। প্লেগ শুরু হবার পর যেদিন থেকে শহরের গেট বন্ধ করে দেয়া হয়, সেদিন থেকে তারা যে জীবন্ত উচ্ছ্বাস মানুষকে সবকিছু ভুলিয়ে রাখে, তার ছোঁয়াচ হারিয়ে ফেললেন, সেদিন থেকে তাদের জন্যে শুরু নির্বাসিত জীবন। সেদিন থেকে শহরে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের অন্তরে পুনর্মিলনের আকুতি জাগতে থাকে, হয়তো এই আকুতির মাত্রা সবক্ষেত্রে এক ছিল না, হয়তো তাদের প্রত্যেকের আকৃতি একরকমেরও ছিল না, কিন্তু প্রত্যেকের জন্যেই এই পুনর্মিলনের পথ ছিল একইভাবে বন্ধ। অনুপস্থিত প্রিয়জনকে ফিরে পাবার জন্যে তাদের অধিকাংশ অন্তরে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগত, আকাঙ্ক্ষা জাগত এক উষ্ণদেহের সান্নিধ্য লাভের, অপরের ভালোবাসা পাবার অথবা নিছক অভ্যাসের বশে যে-জীবন একদিন তাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল সেই জীবনকে ফিরে পাবার। অনেকেই নিজেদের অজান্তেই প্রিয়জনদের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হবার জন্যে, বন্ধুত্ব রক্ষার সাধারণ মাধ্যম—চিঠি, ট্রেন বা নৌকা এগুলোর সাহায্যে বন্ধুদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার অক্ষমতার জন্যে, মনে-মনে গভীর দুঃখ অনুভব করতে থাকেন। আবার কেউ কেউ, তারা অবশ্য সংখ্যায় কম, তারিও নিজেও ছিলেন এই দলেরই একজন, এমন কিছুর সঙ্গে

পুনর্মিলনের কামনা করতেন যার সঠিক সংজ্ঞা হয়তো তাদের জানা ছিল না, কিন্তু যা তাদের কাছে মনে হত পৃথিবীতে একমাত্র কাম্যবস্তু। হয়তো উপযুক্ত সংজ্ঞার অভাবেই কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তারা তার নাম দিয়েছিলেন শান্তি।

ডাক্তার রিও একইভাবে হেঁটে চললেন। যতই তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন, রাস্তায় মানুষজনের ভিড় বাড়তে থাকল। তেমনি বাড়তে থাকল শোরগোল। ডাক্তারের মনে হল যতই তিনি এগুচ্ছেন তাঁর গন্তব্যস্থান দূরে সরে যাচ্ছে। ক্রমেই তিনি যেন সেই বিক্ষুব্ধ কলকণ্ঠ জনস্রোতের মাঝে মিশে যাবার একটা আকর্ষণ অনুভব করতে থাকলেন। জনসমুদ্রের মাঝে থেকে যে চিৎকার উঠছিল ধীরে ধীরে তা তিনি অনুধাবন করলেন। এই চিৎকারের সবটা না হলেও তার কিছুটা ছিল তার নিজের অনুভূতির প্রকাশ। সত্যিই তো তারা সবাই একই সঙ্গে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া এক নিষ্ঠুর অবসরের জন্যে এমন এক নির্বাসনের জন্যে যার কোনো উপশম ছিল না, এমন এক তৃষ্ণার জন্যে যার কোনো নিবৃত্তি ছিল না এবং এই দুঃখ-যন্ত্রণা যতখানি ছিল দৈহিক, ঠিক ততখানিই ছিল মানসিক। রাশি রাশি শবের স্তূপের ভেতর থেকে, সাধারণ কথায় বলে নিয়তি তার সতর্কবাণীর ভেতর থেকে, এ্যাম্বুলেন্সের ঘণ্টার ঝনঝনানির ভেতর থেকে, প্রত্যেকের মনের ভেতর বিরামহীন স্রোতোধারার মতো একের-পর-এক যে শঙ্কা জাগত তার ভেতর থেকে, তাদের অন্তরে বিদ্রোহের নিষ্ঠুর বেদনাদায়ক যে অনুভূতি জাগত তার ভেতর থেকে, এবং সর্বশেষে এই সবকিছুর মিলিত যে বিভীষিকা তার ভেতর থেকে একটা জোরালো কণ্ঠে যেন অনুক্ষণ এই পরিত্যক্ত সন্ত্রস্ত জনতার কানে বাজত: একটা জোরালো কণ্ঠ যেন অনুক্ষণ তাদেরকে আকাঙ্ক্ষিত ভূমিতে, নিজের দেশে ফিরে যাবার জন্যে আহ্বান জানাত। আর এই আকাঙ্ক্ষিত ভূমির অবস্থান ছিল এই শ্বাসরোধকারী, রুদ্ধকণ্ঠ শহরের চার-দেয়ালের বাইরে; অবস্থান ছিল পাহাড়ের সুবাসিত লতাগুল্মের মাঝে, সমুদ্রের উত্তাল ঊর্মির মাঝে, নির্মল মুক্ত আকাশের নিচে, ভালোবাসার আলিঙ্গনের মাঝে। প্রগাঢ় বিরক্তির সঙ্গে এই সবকিছুকে পেছনে ফেলে তারা সবাই যেন ফিরে যেতে চাইত হারিয়ে যাওয়া এক আবাসভূমিতে, নির্বিঘ্ন প্রশান্তির কোলে।

এই-যে নির্বাসন, পুনর্মিলনের এই-যে একটা দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, দুপাশে মানুষের ভিড় কী সে-সম্পর্কে কিন্তু ডাক্তার রিওর কোনো ধারণাই ছিল না। দুপাশে মানুষের ভিড় ঠেলতে ঠেলতে, এখানে-ওখানে দুএকটা পরিচিত মুখের দেখা পেতে, যতই তিনি এমন রাস্তায় এসে পড়তে থাকলেন যেখানে মানুষজনের ভিড় অনেক কম, ততই তিনি যেন উপলব্ধি করতে থাকলেন, এসবের সত্যিই কোনো গূঢ় অর্থ আছে কিনা সে-প্রশ্ন অবান্তর : মানুষ নিজের নিজের প্রত্যাশার উত্তরে কে কী পেয়েছে শুধু সেইটুকুই বিচার্য।

এরপর থেকে প্রত্যাশার উত্তরে কে যে কী পেয়েছিল তা আর ডাক্তার রিওর অজানা ছিল না এবং যেহেতু এখন তিনি শহরের প্রায় উপকণ্ঠে জনশূন্য পথে এসে পড়েছিলেন এসব সম্পর্কে তার উপলব্ধি আরো গভীরতর হল। যারা সারা অন্তর দিয়ে শুধু কামনা করেছিলেন নিজের প্রিয়জনকে গৃহে ফিরে পেতে এবং সেই আশায় এই ছোট শহরটাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, তাদের কেউ কেউ সে প্রত্যাশার পুরস্কার

পেয়েছিলেন, অবশ্য যদিও তাদের ভেতর তখনও এমন অনেকেই ছিলেন যারা তখনও নিঃসঙ্গ অবস্থায় পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, কারণ তখনও তার আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জনকে ফিরে পাননি। আর মোটামুটিভাবে সুখী হয়েছিলেন তারা, যাদেরকে এই সময় দুরকম বিচ্ছেদের শিকার হতে হয়নি, যা আমাদের অনেকের ভাগ্যেই ঘটেছিল, বিশেষ করে তাদের যারা প্লেগ শুরু হবার আগে নিজেদের ভালোবাসার সম্পর্ককে প্রথম থেকেই একটা শক্ত ভিত্তির ওপর গড়ে তুলতে পারেননি বরং দীর্ঘদিন ধরে অন্ধভাবে শুধু হাতড়েছেন সেই বোঝাপড়ার জন্যে যাকে আয়ত্তে পাওয়াটা সময়সাপেক্ষ এবং বড় কঠিন, কিন্তু যা পরিশেষে, যাদের ভেতর প্রকৃতিগত কোনোরকম মিল নেই এমন প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যেও একটা ভালোবাসার বাঁধন গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

এই শ্রেণীর লোকেরা, ডাক্তার রিও নিজেও ছিলেন তাদের একজন, খুব বড় একটা হঠকারিতা করে ফেলেছিলেন। তারা সময়ের ওপর বড়বেশি করে নির্ভর করতে চেয়েছিলেন, যার ফলে এখন তাদের বিচ্ছেদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল চিরন্তন। অপর যারা ছিলেন, যেমন র‍্যাঁবেয়ার, যাকে ডাক্তার রিও সেদিন সকালে বলেছিলেন—এখন শুধু সাহস চাই। আপনার চিন্তাভাবনাই যে ঠিক তা প্রমাণ করাটা এখন সম্পূর্ণ আপনার ওপর নির্ভর করছে—তারা যে প্রিয়জন চিরতরে হারিয়ে গেছে বলে ভেবেছিলেন, তাকেই এখন আবার ফিরে পেয়ে নির্দ্বিধায় আগ্রহের সঙ্গে নিজের মাঝে টেনে নিয়েছিলেন। আর যাই হোক, অন্তত সামনের কিছুদিন যে তাদের সুখে-শান্তিতে কাটবে সে নিশ্চয়তা ছিল। তাদের ভেতর এখন এই উপলব্ধি জেগেছিল যে পৃথিবীতে যদি সত্যিই এমন কিছু থাকে যা পাবার জন্যে মানুষ চিরদিন মনেপ্রাণে কামনা করে এসেছে এবং কখনো কখনো হয়তো পেয়েছেও তা হচ্ছে মানুষের ভালোবাসা।

কিন্তু যারা ব্যক্তিমানুষের ভালোবাসার ঊর্ধ্বে কিছুর প্রত্যাশা করেছিলেন, যারা এমন একটা কিছুর জন্যে হৃদয়ে আকুলতা পোষণ করে চলেছিলেন, যাকে কল্পনায়ও ছোঁয়া যায় না, তাদের সে আকুলতার কোনো উত্তর মেলে না। তারিউ যে দুর্লভ শান্তির কথা প্রায়ই বলতেন, সে শান্তি তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু পেয়েছিলেন মৃত্যুর মাঝে, তা পেয়েছিলেন এত দেরিতে যখন তার আর কোনো মূল্য ছিল না তার কাছে। অপর যাঁরা ছিলেন, যাঁদেরকে ডাক্তার রিও সেদিনের সেই পড়ন্ত বেলার বিলীয়মান আভায় প্রতিটি গৃহের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল আগ্রহে পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরতে, একটা ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখেছিলেন—তারা যদি তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পেয়ে থাকেন তা পেয়েছিলেন শুধুমাত্র এই কারণে যে, তারা এমন একটা কিছুর প্রত্যাশা করেছিলেন যা সহজেই নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়। গ্রাঁদ এবং কটার্ড যেখানে থাকতেন সেই রাস্তাটার মোড় ঘুরতেই, ডাক্তার রিও উপলব্ধি করলেন যে এটা হয়তো কিছুটা সঙ্গত যে যাদের কামনা ব্যক্তিমানুষ আর তার ক্ষুদ্র অথচ যা সময়ে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে সেই ভালোবাসাকে পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ—তারা যে মাঝে মাঝে তাদের সেই কামনার সার্থকতা খুঁজে পাবে, তার উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করবে।

৫

এই ঘটনাপঞ্জি এখন সমাপ্তির মুখে, সুতরাং মনে হয় ডাক্তার বার্নার্ড রিও নিজেই যে এর কাহিনীকার সেই স্বীকারোক্তির এটাই হচ্ছে উপযুক্ত মুহূর্ত। কিন্তু একেবারে শেষের কয়েকটা দৃশ্য বর্ণনার আগেই কেন যে তিনি এই ঘটনাপঞ্জি সংকলনের দায়িত্ব নিজের ওপর তুলে নিয়েছিলেন তার সমর্থনে কিছু বলতে চান। সেইসঙ্গে এটাও লিপিবদ্ধ করতে চান যে, একেবারে গোড়া থেকেই তিনি স্থির করে নিয়েছিলেন যে, একজন নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করবেন। যখন শহরে প্লেগের দাপট চলছিল, তখন পেশাগত কারণে তাকে শহরের বহু লোকের সংস্পর্শে আসতে হয় এবং প্লেগের সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন মতামত জানবারও সুযোগ ঘটে তার। সুতরাং তিনি যা যা দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন সেগুলো সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা দেবার উপযুক্ত যোগ্যতা তার ছিল। কিন্তু এই বর্ণনা দেবার সময় যেখানে যে সীমারেখা রক্ষা করা বাঞ্ছিত তা তিনি করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাধারণভাবে তিনি শুধু সেইসব জিনিসের বর্ণনা দিয়েছেন যেগুলো তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। যাদেরকে তার সঙ্গে সমভাবে এই দুর্বিপাকের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল তাদের কারো ওপর এমন কোনো চিন্তাভাবনা আরোপ করেননি, যা সাধারণ বিচারে তাদের পক্ষে সঙ্গত বলে মনে হয় না। আর তিনি শুধুমাত্র সেইসব দলিলপত্রই ব্যবহার করেছেন, যেগুলো ক্রমেই হোক অথবা দুঘটনার ফলেই হোক, তার হস্তগত হয়।

একধরনের অপরাধমূলক ঘটনার সাক্ষী দেবার জন্যে তলব পেয়ে একজন বিবেকবান সাক্ষীর পক্ষে যতটুকু সংযম এবং দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া প্রয়োজন তাও তিনি দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও হৃদয়ের তাগিদে যারা ছিলেন এই দুর্বিপাকের শিকার, তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাদের পক্ষ নেবার চেষ্টা করেছেন। তার সহনাগরিকদের সঙ্গে যেগুলো ছিল তখনকার সময়ের একমাত্র নিশ্চয়তা, সেই সাধারণ নির্বাসন ভালোবাসা এবং দুর্দশার সমভাবে শরিক হয়েছে। তাই তিনি সত্যিকারভাবে দাবি করতে পারেন যে তখনকার দিনে এমন কোনো দুশ্চিন্তা বা সংকট ছিল না যাতে তিনি শরিক হননি।

একজন সৎ এবং বিবেকবান সাক্ষী হিসাবে তার দায়িত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র সেইগুলোই সবার সামনে তুলে ধরা, যা তখন মানুষ বলত বা করত; যা তিনি বিভিন্ন প্রামাণিক দলিলপত্র থেকে উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে যেখানে তিনি সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন বা যেখানে তার মনে সন্দেহ জেগেছে সেখানে তার কর্তব্য হচ্ছে নীরব থাকা। তা সত্ত্বেও যেখানে তিনি এইসব প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন, তা করেছেন শুধু এই ভেবে যে, সেগুলো হয়তো তার সহনাগরিকদের তখনকার অবস্থার ওপর আলোকপাত করবে অথবা যেসব জিনিস তারা অধিকাংশ সময় কতকটা অভিভূতের মতো অনুভব করতেন, তার যতটা সম্ভব সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট চিত্র সবার সামনে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করবে। প্রকৃতপক্ষে, এই স্বেচ্ছা-আরোপিত মৌনতা রক্ষার জন্যে তাকে সক্রিয়ভাবে তেমন কিছুই করতে হয়নি। প্লেগের নির্যাতন এবং দুঃখ-যন্ত্রণার শিকার সেই অগণিত মানুষের কণ্ঠের সঙ্গে যখনই তার ব্যক্তিগত কোনো

অভিজ্ঞতা সংযোগ করবার প্রলোভন তার সামনে উপস্থিত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে চিন্তা জেগেছে যে তার এমন কোনো ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা সেই অপর সবাইকে যার শরিক হতে হয় না। ফলে ভয় পেয়ে তাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কোনোকিছু বলা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। আর তাছাড়া যে-পৃথিবীতে দুঃখ-বেদনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিঃসঙ্গ উপলব্ধির ব্যাপার, সেখানে এই বিরত থাকাটা একধরনের সুবিধাও বটে। সুতরাং সেক্ষেত্রে সবার পক্ষ থেকে কিছু বলাটাই নিঃসঙ্গতার পক্ষে সঙ্গত এবং সহজ।

শহরে তখন অন্তত একজন লোক ছিলেন, যার পক্ষ থেকে ডাক্তার রিওর বলার মতো কিছু ছিল না। এই লোকটা সম্পর্কে তারিউ একবার ডাক্তার রিওকে বলেছিলেন : তার একটাই অপরাধ যে তিনি মনে-মনে এমন একটা কিছু অনুমোদন করেন যা নির্বিচারে নারীপুরুষ এবং শিশুদের হত্যার কারণ। বাকি যা-কিছু তার দোষ সেগুলো কিছুটা অনুধাবন করাটা সহজ এবং শুধু তারই জন্যে তাকে ক্ষমা না করে পারি না। সুতরাং এটাই সঙ্গত যে এই ঘটনাপঞ্জিও এই লোকটা যার হৃদয় ছিল অন্ধ অর্থাৎ যাকে বলে নিঃসঙ্গ তার সম্পর্কে কিছু আলোচনা দিয়ে শেষ হবে।

শহরের প্রধান রাস্তা, যেখানে উৎসবের হাসি-আনন্দ তখনও পুরোদমে চলছিল, সেখান থেকে মোড় নিয়ে গ্রাঁদ এবং কটার্ড যেখানে থাকতেন সেই রাস্তায় ঢুকতেই, ডাক্তার রিও দেখলেন, একদল পুলিশ তার সামনে চলার পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেছে। তখনকার সেই পরিবেশে এর চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার আর কিছুই ছিল না তার কাছে। উৎসবের আনন্দ-ফূর্তির দূরাগত শব্দের জন্যে শহরের এই স্বাভাবিক শান্ত অঞ্চলটাকে যেন আরও শান্ত বলে মনে হচ্ছিল। ডাক্তারের কল্পনায় স্থানটা ছিল যেমন শান্ত তেমনি নির্জন।

—মাফ করবেন, ডাক্তার সাহেব—একজন পুলিশ বলল—আপনাকে ওপারে যেতে দিতে পারব না। একটা পাগল বন্দুক নিয়ে সামনে যাকে দেখছে তার দিকে গুলি ছুড়ছে। আপনি বরং এখানেই অপেক্ষা করুন। আপনার সাহায্যের প্রয়োজন পড়তে পারে।

এমন সময় ডাক্তার দেখলেন, গ্রাঁদ তার দিকে এগিয়ে আসছেন। আসলে কী যে ঘটেছিল, সে-সম্পর্কে গ্রাঁদের কোনো ধারণা ছিল না, পুলিশ তাকেও সামনে এগুতে দেয়নি, তারা শুধু তাকে জানিয়েছে তার বাসার দিক থেকেই গুলি আসছিল। রাস্তাটা ধরে সামনে কিছুদূর অগ্রসর হলেই তাদের বাসা, এখান থেকেও চোখে পড়ছিল, সন্ধ্যার শান্ত আলো এসে পড়ছিল বাড়িটার সম্মুখভাগের ওপর। সামনেই যে পুলিশগুলো তাদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল, তাদের থেকে আরো কিছুদূর গিয়ে আর একদল পুলিশ ঠিক তেমনিভাবে পথে বাধা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর এই পুলিশলাইনটার ঠিক পেছনেই দেখা যাচ্ছিল আশেপাশের প্রতিবেশীরা দ্রুতপায়ে এদিক-ওদিক রাস্তা পার হচ্ছে। বাড়িটার ঠিক সামনের রাস্তাটুকু ছিল নির্জন। শূন্য স্কয়ারটার মাঝখানে পড়েছিল একটা টুপি আর একটুকরো ছেঁড়া মলিন কাপড়। আরো কিছুটা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতেই তারা দেখতে পেলেন রিভলবার হাতে বেশকিছু সংখ্যক পুলিশ বাড়িটার ঠিক সামনের বিভিন্ন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি

দিচ্ছে। গ্রাঁদরা যে-বাড়িটায় থাকতেন, তার জানালাগুলো বন্ধ, শুধু তিনতলার একটা জানালা খোলা এবং সেটাও মনে হচ্ছিল আলগাভাবে মাত্র একটা কবজার ওপর ঝুলছে। রাস্তায় কোথাও কোনো সাড়াশব্দ ছিল না, শুধুমাত্র শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে মাঝে মাঝে সংগীতের শব্দ ভেসে আসছিল।

আকস্মিক দুটো রিভলবারের গুলির আওয়াজ জেগে উঠল। গ্রাঁদের বাসার বিপরীত দিকের একটা বাড়ি থেকে রিভলবারের গুলি আসছিল। গুলিতে তাদের বাড়িটার তিনতলার সেই ভাঙা জানালাটা থেকে কয়েকটা টুকরো ছিটকে পড়ল নিচে। তারপর আবার চারদিকে নিস্তব্ধ। সারাদিনের আমোদ-উৎসবের পর দূর থেকে সমস্ত ঘটনাটা ডাক্তার রিওর কাছে মনে হচ্ছিল অবাস্তব, মনে হচ্ছিল স্বপ্নের মাঝে ঘটা একটা কিছু।

—আরে ওটা তো কটার্ডের জানালা—হঠাৎ গ্রাঁদ চিৎকার করে উঠলেন—কিছুই বুঝতে পারছিনে। আমি ভেবেছিলাম কটার্ড কোথায় উধাও হয়েছেন।

—ওরা ওভাবে গুলি ছুড়ছে কেন?—ডাক্তার রিও সামনের পুলিশটাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—বুঝছেন না, লোকটাকে ব্যস্ত রাখতে চাই। শুধু একটা পুলিশের গাড়ি এসে পড়ার অপেক্ষা করছি। তাতেই দরকারি মাল-মশলা আসবে। সামনের দরজা দিয়ে কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেখলেই গুলি ছুড়ছে পাগল লোকটা। এই কিছুক্ষণ আগেও একজন পুলিশকে সে গুলিবিদ্ধ করেছে।

—কিন্তু তার এইভাবে গুলি ছোড়ার কারণ কী?

—আমারও তো সেই একই প্রশ্ন। রাস্তার ওপর কিছু লোক আনন্দ-ফুর্তি করছিল, এমন সময় ছাদ থেকে কে একজন তাদের দিকে গুলি ছোড়ে। প্রথমে তারা বুঝতেই পারেনি ব্যাপারটা। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই গুলি আসে, তারা চিৎকার করতে করতে এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে, তাদের ভেতর একজন আহত হয়, বাকি সবাই ছুটে পালিয়ে যায়। মনে হয় হঠাৎ কারো মাথাটা বিগড়ে গেছে।

চারদিকের সেই শান্ত পরিবেশের ভেতর এক-একটা মুহূর্তকে মনে হচ্ছিল অনন্তকালের মতো। হঠাৎ তারা রাস্তার অপরপারে একটা কুকুরকে বেরিয়ে আসতে দেখলেন, দীর্ঘ কয়েক মাস পরে এই প্রথম আবার কুকুর দেখতে পেলেন ডাক্তার রিও, রোগা হ্যাংলা গোছের একটা স্প্যানিয়েল, সম্ভবত তার মনিব এতদিন কুকুরটাকে লুকিয়ে রেখেছিল। দেয়ালের গা ঘেঁষে ধীরে ধীরে, পা ফেলে এগুচ্ছিল কুকুরটা, বাড়িটার দরজার সামনে এসে থামল, বসে পড়ল রাস্তার উপর, তারপর পা থেকে মাছি তাড়াতে শুরু করল। পুলিশদের কেউ কেউ শিস দিয়ে কুকুরটাকে সাবধান করে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল। কুকুরটা একবার তার মাথাটা তুলল, সামনের রাস্তার ওপর এগিয়ে এল, রাস্তার ওপর পড়ে-থাকা সেই টুপিটা শুঁকল বারকয়েক, এমন সময় তিনতলার সেই জানালাটা থেকে প্রচণ্ড শব্দে রিভলবারের একটা গুলি এসে লাগল তার দেহে। কতকগুলো পিঠাকে একসঙ্গে তাল করে ওপরের দিকে ছুড়ে দিলে যেমন দেখায়, কুকুরটা শূন্যে তেমনি একটা ডিগবাজি খেল, পাগুলো দিয়ে শূন্যের মাঝে কী যেন ধরবার চেষ্টা করল। তারপর একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেল।

আবার চারিদিক নিস্তব্ধ। সূর্যটা ইতিমধ্যে আরো কিছুটা নিচে হেলে পড়েছিল; ছায়াটা এসে পড়েছিল এখন জানালা বরাবর। হঠাৎ ক্যাঁচ করে ব্রেক কষার একটা শব্দ হল, ডাক্তার রিও পেছনেই রাস্তার ওপর একটা গাড়ি এসে থামল।

এই যে এসে পড়েছে—একজন পুলিশ বলল।

বেশ কয়েকজন পুলিশ-অফিসার গাড়ির ভেতর থেকে রাস্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর গাড়ির ভেতর থেকে তারা নামিয়ে আনল দড়ির মস্ত তাল একটা, একটা মই এবং অয়েলক্লথে ঢাকা আয়তাকার দুটো মোড়ক। এবার তারা সবাই গ্রাঁদদের বাসার বিপরীত দিকে যে-বাড়িগুলো তারই পেছনের একটা গলির ভেতর গিয়ে ঢুকল। যদিও কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, মিনিটখানেক যেতে-না-যেতে মনে হল প্রত্যেকটা বাড়ির সামনের দরজায় নড়াচড়া শুরু হয়েছে। তারপর আবার কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষা। কুকুরটার নড়াচড়া ইতিমধ্যেই থেমে গিয়েছিল। তার দেহের চারপাশে অল্প কিছুটা জায়গা জুড়ে জমে-যাওয়া কালো রক্ত চকচক করছিল।

আকস্মিক বিপরীতদিকের বাড়িগুলোর একটার জানালা থেকে একঝাঁক মেশিনগানের গুলি এসে পড়ল। পুলিশ-অফিসাররা ইতিমধ্যে পেছনদিকের দরজা দিয়ে এই বাড়িগুলোতে ঢুকে পড়ছিলেন। তারা তখনও কটার্ডের জানালার দিকে লক্ষ্য করে সমানে মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়ছিলেন। জানালাটা দেখতে দেখতে টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেল, দেয়ালে সেখানে শুধু একটা বড় ফাঁক রয়ে গেল। গ্রাঁদ এবং ডাক্তার রিও যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখান থেকে দেয়ালের এই ফাঁক দিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

প্রথম মেশিনগানটা এবার থেমে গেল। রাস্তার সেই একই পারের আরো কিছুটা সামনে একটা বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নদিক থেকে লক্ষ্য নিয়ে দ্বিতীয় একটা মোশনগান গুলি-ছোড়া শুরু করল এবার। স্পষ্ট গুলির লক্ষ্য ছিল জানালার সেই ফাঁকটা। কিছুক্ষণের মধ্যে বেশকিছু পরিমাণ ইট এবং চুন-সুরকি ভেঙে পড়ল ফুটপাতের ওপর। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনজন পুলিশ-অফিসার রাস্তার ওপর থেকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে কটার্ডের বাসার সদর-দরজার ভেতর ঢুকে পড়ল। মেশিনগান থেকে গুলি-ছোড়া আবার বন্ধ হল। তারপর কিছুক্ষণ ধরে শুরু হল আবার আগের মতো সেই অপেক্ষা। বাড়িটার ভেতর দুটো চাপা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। তারপরেই শুরু হল ছোটাছুটি, হুড়োহুড়ি। ছোটাছুটি ক্রমেই বাড়তে থাকল। সবশেষে দেখা গেল রাতের পোশাক-পরা খুদে একটা লোক প্রাণপণ চিৎকার করছে আর পুলিশ তাকে টেনে হিঁচড়ে দরজার বাইরে আনবার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ যেন একটা সংকেত পেয়ে আশেপাশের সমস্ত বাড়ির জানালাগুলো প্রায় একসঙ্গে খুলে গেল, প্রত্যেক জানালায় দেখা গেল উৎসুক-মুখ। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটা বাড়ির সদর-দরজাগুলোও খুলে গেল, মানুষ বেরিয়ে আসতে লাগল রাস্তার ওপর। পুলিশদের লাইন ভেঙে দেবার জন্যে ঠেলাঠেলি শুরু হল। ডাক্তার রিও এরই ভেতর একফাঁকে খুদে লোকটার চেহারা দেখবার সুযোগ পেলেন। রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল তাকে, তার দুই হাত পেছনদিকে পিঠমোড়া করে ধরে রেখেছিল দুজন

পুলিশ অফিসার। সমানে চিৎকার করছিল সে। একজন পুলিশ সামনের দিকে এগিয়ে লোকটার চোয়ালে কড়া দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল। বেশ ভেবে-চিন্তে সজ্ঞানেই যেন সে করল কাজটা।

—মনে হচ্ছে, কটার্ড। উত্তেজিত তীক্ষ্ণকণ্ঠে গ্রাঁদ চিৎকার করে উঠল। কটার্ড শেষপর্যন্ত পাগল হয়ে গেলেন!

কটার্ড পিছু হটে চিৎ হয়ে রাস্তার ওপর শুয়ে পড়লেন। রাস্তার ওপর গড়াগড়ি যেতে থাকলেন। সঙ্গের একটা পুলিশ সজোরে একটা লাথি মারল তার দেহে। সমবেত জনতার ক্ষুদ্র একটা অংশ ভিড় ঠেলে ডাক্তার রিও এবং তার বন্ধুর দিকে এগিয়ে গেল।

—সরে দাঁড়ান।—পুলিশটা গর্জে উঠল। একে একে কটার্ড তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল যে-পুলিশগুলো এবং তাদের অনুসরণ করছিল যে-দলটা, ডাক্তারকে পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ডাক্তার রিও দৃষ্টি ফিরিয়ে রইলেন।

অবশেষে ডাক্তার রিও আবার যখন পথ চলতে শুরু করলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, রাত ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে। এই অঞ্চলটা সবসময় নিরিবিলি। তেমন কর্মচঞ্চলতা দেখা যেত না কোনো সময়। কিন্তু কটার্ডকে নিয়ে আজকের এই ব্যাপারটা ঘটে যাবার পর মনে হচ্ছিল চারপাশের সেই শান্তভাব যেন আর নেই। আকস্মিক একটা আঘাত পেয়ে সমস্ত স্থানটা যেন কেমন প্রাণবন্ত সচেতন হয়ে উঠেছিল। শহর থেকে দূরবর্তী এই অঞ্চলের রাস্তায় রাস্তায়ও উৎফুল্ল জনতা ভিড় করতে শুরু করেছিল।

গ্রাঁদ তার বাসার দরজায় পৌঁছে ডাক্তারকে শুভরাত্রি জানালেন। ডাক্তারকে বললেন, এখন থেকে আবার তিনি তার সন্ধ্যার কাজ শুরু করবেন। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে যাবেন, এমন সময় হঠাৎ থেমে আবার বললেন, ইতিমধ্যে তিনি জেনির কাছে পত্র লিখেছেন। মনটা তার এখন অনেকখানি হালকা হয়েছে। সেই-যে বাক্যটা রচনা করা শেষ হবার আগেই তিনি লেখাটা বন্ধ রেখেছিলেন, সেটা আবার নতুনভাবে রচনা করেছেন তিনি। বললেন : এবারে বিশেষণগুলো বাদ দিয়ে ফেলেছি।

তার চোখদুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গ্রাঁদ তার মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেললেন, টুপিসুদ্ধ হাতটা একটা অভিবাদনের ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনলেন।

কিন্তু ডাক্তার রিও তখন কটার্ডের কথা ভাবছিলেন কীভাবে একটার-পর-একটা ঘুসি এসে পড়ছিল তার মুখের ওপর। তার পুরোনো সেই হাঁপানির রোগীর বাসার দিকে ডাক্তার রিও অগ্রসর হলেন। কটার্ডকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করার সেই দৃশ্যটা তখন তার চোখের সামনে ভাসছিল। তার মনে হল একজন মৃতব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা করার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ একজন অপরাধীর সম্পর্কে চিন্তা করাটা।

ডাক্তার যখন হাঁপানি রোগীর বাসায় গিয়ে পৌঁছলেন, তখন চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। হাঁপানি রোগীর শোবার ঘরটা থেকে নবলব্ধ স্বাধীনতা-উৎসবের আনন্দ-কোলাহল ক্ষীণভাবে শোনা যাচ্ছিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তার নিয়মিত অভ্যাসমতো মটরদানাগুলো গুনে গুনে রাখছিল একটা পাত্র থেকে অপর একটা পাত্রে।

—এখন এই-যে আনন্দ-ফূর্তি করছে সবাই মনে হয়, ঠিকই করছে তারা —বৃদ্ধ

বললেন—যেমন কথায় বলে, দশ রকমের মানুষ নিয়েই সমাজ। আচ্ছা ডাক্তার সাহেব, আপনার সেই সহকর্মীর খবর কী?

—তিনি মারা গেছেন—ডাক্তার রিও বেশ মনোযোগ দিয়ে রোগীর বুকের ঘর্ঘর শব্দ শুনতে থাকলেন।

—আহা! সত্যি? ভদ্রলোক যেন কিছুটা বিব্রতবোধ করলেন।

—হ্যাঁ, প্লেগে মারা গেছেন—ডাক্তার বললেন।

—আচ্ছা! মিনিটখানিক নীরব থাকার পর ভদ্রলোক বললেন—পৃথিবীতে দেখি যারা ভালো লোক তারাই মারা যায় তাড়াতাড়ি। এটাই হয়তো পৃথিবীর নিয়ম। কিন্তু ভদ্রলোক বড় কাজের লোক ছিলেন, যখন যা করতে চাইতেন করতেন।

—হঠাৎ এসব কথা বলছেন কেন? ডাক্তার স্টেথোটা গুছিয়ে রাখছিলেন।

—না, তার অবশ্য নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই—তবে কী, দেখেছি তিনি কোনো সময় বাজেকথা পছন্দ করতেন না। আমার লোকটাকে বড় ভালো লাগত। কিন্তু ঐ দেখুন! লোকে বলাবলি করছে এই শহরে প্লেগ এসেছিল। প্লেগের আবির্ভাব হয়েছিল এখানে। তাদের কথা বলার ধরন দেখে মনে হয় যেন এর জন্যে তারা পুরস্কারস্বরূপ মেডেল পেতে চায়। কিন্তু 'প্লেগ'-এর অর্থ কী? এও তো জীবন, তাছাড়া ভিন্ন কিছু নয় তো।

—ফুসফুসে টানবার জন্যে যে-ওষুধটা দিয়েছি, সেটা নিয়মিত চালিয়ে যান।

—দেখুন, ডাক্তার সাহেব, আমাকে নিয়ে আপনি অত চিন্তা করবেন না। আমার এখন প্রচুর প্রাণশক্তি আছে। আমি সবার অনেক আগেই দেখব তাদের অনেকে কবরে গেছে। কীভাবে বাঁচতে হয় তা আমি জানি।

এমন সময় দূর থেকে হর্ষধ্বনির একঝলক শব্দ ভেসে এল। মনে হল এ যেন হাঁপানি রোগীর গর্বের উক্তির প্রতিধ্বনি। বাইরে বেরিয়ে যাবার পথে ডাক্তার হঠাৎ ঘরের মাঝখানে থামলেন—যদি কিছুক্ষণের জন্যে একবার ছাদের উপর থেকে ঘুরে আসি, কিছু মনে করবেন না নিশ্চয়!

—অবশ্যই না, কিছু মনে করব কেন? বাইরে চারদিকের অবস্থাটা কেমন একনজর দেখে নিতে চান, তাই না? কিন্তু দেখবেন, ব্যাপারটা আসলে চিরদিন যা ঘটে তাইই। ডাক্তার রিও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হাঁপানি রোগীর মনে যেন আবার একটা নতুন চিন্তা জাগল। তিনি বললেন—আচ্ছা শুনেছি, যারা প্লেগে মারা গেছে তাদের জন্যে একটা স্মৃতিস্তম্ভ গড়া হবে, সত্যি নাকি?

—কাগজে তো তাই লিখেছে। একটা স্মৃতিস্তম্ভ নইলে শুধু একটা উৎকীর্ণ-ফলক।

—এরকম কিছু যে একটা ঘটবে সেটা আমি হলফ করে বলতে পারতাম। নিশ্চয় সেখানে বক্তৃতা দেয়ারও ব্যবস্থা হবে?—তিনি হা হা করে হাসলেন—বক্তৃতায় কী বলা হবে তাও যেন এমনি শুনতে পাচ্ছি : আমাদের প্রিয়জনদের মৃত্যুর... । আর তারপর যে-যার ঘরে ফিরে গিয়ে আরাম করে খাওয়াদাওয়া করবে, তাই না?

ডাক্তার রিও ইতিমধ্যে সিঁড়ি বেয়ে অর্ধেক পথ উপরে উঠে এসেছিলেন। মাথার উপর ঝলমল করছিল শান্ত সুদূর আকাশ, দূরে পাহাড়ের ওপর নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। প্লেগের কথা বিস্মৃত হবার জন্যে সেদিন রাতে ছাদে

উঠে এসে যেমন দেখেছিলেন, আজকে রাতেও চারপাশের পরিবেশটা মনে হচ্ছিল অনেকটা ঠিক তেমনি। তফাৎ এই যে, আজ রাতে সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন আরও প্রচণ্ড শব্দে পাহাড়ের পাদদেশে এসে আছড়ে পড়ছিল। চারপাশের আবহাওয়া মনে হচ্ছিল আরো স্বচ্ছ এবং শান্ত, শরতের ঝড়ো হাওয়ায় ভেসে আসা সমুদ্রের সেই লোনা গন্ধ ছিল না বাতাসে। দূর শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে ভেসে আসছিল অসংখ্য উৎসবের কলরোল, তরঙ্গের মতো অবিরাম ধারায় এসে আঘাত করছিল সারি-সারি ছাদের বারান্দার কানায়! কিন্তু আজকের এই কোলাহল ছিল মুক্তির অসংখ্যধ্বনি, সেদিনের মতো বিদ্রোহের রণহুঙ্কার নয়। দূরে শহরের রাস্তা আর জোয়ারের ওপর একটা উজ্জ্বল লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। আজকের রাতে নবলব্ধ স্বাধীনতা ছিল যেন সম্পূর্ণ বাধামুক্ত, আর তারই কোলাহল শুনছিলেন ডাক্তার রিও।

শহরে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ আতশবাজি পোড়ানোর যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন, অন্ধকার বন্দর থেকে তারই প্রথম রকেট নিক্ষিপ্ত হল আকাশে। শহরের লোকজন দীর্ঘ আনন্দ-উল্লাসের ভেতর দিয়ে তাকে স্বাগত জানাল যেন। কটার্ড, তারিউ এবং এমনি বহু পুরুষ আর সেই নারী যাকে ডাক্তার রিও একদিন ভালোবেসেছিলেন এবং পরে হারিয়েছিলেন, তারা মৃতই হোন আর অপরাধীই হোন, সবাই একইভাবে কোনো বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, বৃদ্ধ হাঁপানি রোগী ঠিকই বলেছিলেন; এসব মানুষ চিরদিনই একরকম, কিন্তু এটাই হচ্ছে একাধারে তাদের শক্তি এবং সরলতার উৎস। সবকিছু দুঃখ-বেদনার ঊর্ধ্বে কেবলমাত্র এই একটা জায়গায় ডাক্তার রিও তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারতেন।

চারিদিক থেকে তুমুল হর্ষধ্বনির এক-একটা প্রকাণ্ড তরঙ্গ যেন উত্তাল উর্মিমালার মতো এসে আঘাত করছিল ছাদের বারান্দার দেয়ালে, গর্জে ফুলে ফুলে উঠছিল সেই তরঙ্গ, দীর্ঘতর হচ্ছিল তাদের আকার। অপরদিকে বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল আলো যেন টিং পর্বতের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া জলপ্রপাতের মতো অজস্রধারায় নেমে আসছিল শূন্য অন্ধকারের ভেতর দিয়ে; আর তারই মাঝে দাঁড়িয়ে ডাক্তার রিও মনে-মনে স্থির করলেন, এই ঘটনাপঞ্জি সংকলিত করবেন তিনি। যারা মৌন থাকতে চায় তাদের দলে না গিয়ে প্লেগে উৎপীড়িত জনসমাজের পক্ষে সাক্ষী হিসাবে দাঁড়াবেন তিনি। তাদের ওপর যে অন্যায় এবং নির্যাতন নেমে এসেছিল তারই একটা অবিনশ্বর স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে রেখে যাবেন, আর এইরকম দুর্বিপাকের মাঝে মানুষ যা-কিছু শিক্ষালাভ করতে পারে সেগুলো সহজ ভাষায় বিবৃত করে যাবেন : মানুষের মধ্যে যদি ঘৃণার অবজ্ঞার কিছু থাকে তো তার চেয়ে বেশি কিছু আছে যা প্রশংসা পাবার যোগ্য, যা স্তুতিগানের যোগ্য।

তা সত্ত্বেও তিনি জানতেন যে যে-কাহিনী তিনি রচনা করে যাবেন তা নিশ্চয় কোনো চূড়ান্ত বিজয়ের কাহিনী নয়। দুর্বিপাকের সময় আমাদের যা যা করতে হয়েছিল, এ হবে শুধু তারই বিবরণী। যারা মহাপুরুষদের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেননি, আবার দুর্বিপাকের কাছেও নতি স্বীকার করতে চান না; সমাজ এবং তার নিষ্ঠুর আক্রমণের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামে ব্যক্তিগত শোককে কষ্টকে তুচ্ছ করে যারা ত্রাণকার্য চালিয়ে যেতে চান—তাদেরকে সুনিশ্চিতভাবে পুনরায় যা যা করতে হবে,

এই ঘটনাপঞ্জি হবে শুধু তারই একটা বিবরণী।

আর বাস্তবিকই দূর শহর থেকে ভেসে-আসা সেই তুমুল হর্ষধ্বনির দিকে কান পেতে থাকার সময় ডাক্তার রিও মনে-মনে ভাবতে থাকলেন মানুষের এই বিজয়-উল্লাস যে-কোনো মুহূর্তে আবার যে বিপন্ন হবে সেটাই হয়তো স্বাভাবিক নিয়ম। এই হর্ষ-উৎফুল্ল জনতা যা জানত না অথচ বইপত্র ঘাঁটলে তারাও হয়তো অবহিত হতে পারত তা। কিন্তু তার অজানা ছিল না প্লেগের জীবাণু কোনোদিন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না, চিরতরে অদৃশ্যও হয় না তা; বছরের-পর-বছর এই জীবাণু শুধু আসবাবপত্রের মাঝে কাপড়চোপড়ের বাক্সের মধ্যে সুপ্ত থাকে; শোবার ঘরে, ভাঁড়ারে, বড় বড় ট্রাঙ্কে, বইয়ের শেলফে এ শুধু ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করে থাকে। তারপর সেই দিনটা আবার ফিরে আসে যেদিন মানুষের সর্বনাশ এবং তার শিক্ষার জন্যে এই প্লেগের জীবাণু আবার তার ইঁদুরগুলোকে জাগিয়ে উত্তেজিত করে তোলে মরবার জন্যে, ঝাঁকে ঝাঁকে তাদেরকে পাঠিয়ে দেয় আনন্দমুখর কোনো শহরের মাঝে।

কাজী মুজাম্মিল হক

জন্ম : ১ এপ্রিল, ১৯২৯ সাল, মাগুরা, যশোর।

[illegible] পিতৃবিয়োগ। একেবারে অজপাড়া গাঁ থেকে [illegible] সালে বৃহত্তর ভারত উপমহাদেশের তৎকালীন [illegible] ৮ম স্থান লাভ। স্বীয় [illegible] ও অধ্যবসায় [illegible] কলকাতা প্রেসিডেন্সি [illegible] ও ঢাকা [illegible]দ্যালয় থেকে বি.এ. এবং এম.এ. পরীক্ষায় ১ম [illegible] লাভ। বহুভাষাবিদ [illegible] একাধারে [illegible], ইংরেজি, আরবি, হিন্দি, উর্দু [illegible] ফরাসি ভাষায় [illegible] ছিলেন।

কর্মজীবনে আত্মপ্রকাশ করেন পাকিস্তান অব[illegible] পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে। পরবর্তীকালে ঐ পত্রিকার সম্পাদক। দীর্ঘ ২৫ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তরের উপ-পরিচালক হিসেবে। সম্পাদনা করেছেন 'সচিত্র বাংলাদেশ', 'নবারুণ' এবং 'মিট বাংলাদেশ'। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে 'The Newyork Times of USA'-তে।

একাধারে সাহিত্যিক, কলামিস্ট, কবি, লেখক এবং অনুবাদক— স্বনামে ও ছদ্মনামে।

১৯৯৭ সালের ২৬ মার্চ, স্ত্রী, ৫ পুত্র, ৩ কন্যা, ১ নাতনি এবং বোনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে শায়িত আছেন। বর্তমানে তাঁর সন্তানরা দেশে ও বিদেশে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নিরহংকার, পরোপকারী, প্রচারবিমুখ, সৎ এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর ব্যক্তিত্বে 'মানুষ সৃষ্টির সেরা'-এর সবটুকুই সার্থকরূপ পেয়েছিল।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ